পর্যটকের পত্র

PARJYATAKER PATRA
A Bengali Travelogue by
Dey's Publishing
31/1B, Mahatma Gandhi Road, Calcutta-700009
Rupees Fifteen only.

— গ্রন্থকারের কয়েকটি বই —

দেবতাত্মা হিমালয়
উত্তর হিমালয় চরিত
মহাপ্রস্থানের পথে
রত্নদ্বীপ শ্রীলংকা
বনস্পতির বৈঠক
রাশিয়ার ডায়েরী

পর্যটকের পত্র

প্রবোধকুমার সান্যাল
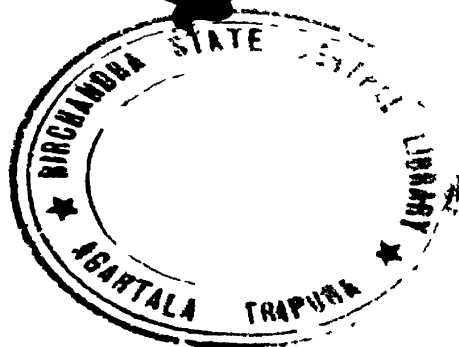
দে'জ পাবলিশিং ॥ কলিকাতা ৭০০০৭৩.

পর্যটকের পত্র

প্রথম প্রকাশ : ১৯৫৯

প্রচ্ছদশিল্পী : পূর্ণেন্দু পত্রী

পনেরো টাকা

প্রকাশক : শ্রীসুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং
৩১/১বি মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৭০০০০৯

মুদ্রাকর : শ্রীভূমি মুদ্রণিকা
৭৭ লেনিন সরণী, কলিকাতা ৭০০০১৩

উৎসর্গ

অধ্যাপক শ্রীমৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়
সুহৃদ্‌বরেষু

পূর্বভাষণ

'পর্যটকের পত্র'গুলির অধিকাংশই দেশ পত্রিকার সম্পাদক বন্ধুবর সাগরময় ঘোষকে লেখা। বিদেশযাত্রার ঠিক আগে তাঁর সঙ্গে এইরূপই চুক্তি ছিল। ফিরে এসে শেষাংশ যোগ করে দিই।

যতদূর খবর পেয়েছিলুম, দিল্লীর সেন্সর বোর্ড আমার দুখানা 'পত্র' বাজেয়াপ্ত করেন। অতি উৎসাহী এই বোর্ড 'রজ্জুতে সর্পভ্রম' করেছিলেন। 'এমারজেন্সি' থাকার ফলে আমার মুখে তালাচাবি পড়েছিল। উক্ত পত্র দুখানায় বিদেশী এবং প্রবাসী ভারতীয়দের কিছু কিছু রাজনীতিক মন্তব্য উদ্ধৃত করেছিলুম।

যদিও ভারত গভর্ণমেণ্ট আমাকে সাংস্কৃতিক পর্যটন উপলক্ষে যুক্তরাষ্ট্রে পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁরা আমার উপরে একটি অনুশাসন আরোপ করেছিলেন, আমি যেন 'দু-একটি স্টেট' ভ্রমণ করে সপ্তাহ তিনেকের মধ্যেই দেশে ফিরে আসি। তাঁদের এই অনুশাসন আমার পক্ষে মেনে চলা সম্ভব হয়নি। আমি ছয় মাসকাল অবধি আমার ভ্রমণ অব্যাহত রেখেছিলুম। দুই পাশ্চাত্য মহাদেশের চলতিকালের জীবনধারাকে আমি প্রতিফলিত করতে চেয়েছি এই পত্রগুলিতে। বহু বিদেশী এবং ভারতীয়—যাঁরা আমার এই ভ্রমণকে সাফল্যমণ্ডিত করতে সহায়তা করেছিলেন এই সূত্রে তাঁদের সকলকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

গ্রন্থকার

নিউ ইয়র্ক
গ্রীনউইচ ভিলেজ
(মানহাটন্)

প্রিয়বরেষু,

এখানে এসে প্রথম দিন দুই অকাতরে ঘুমিয়ে ছিলুম। আসবার পথে লণ্ডনে ছিলুম মাত্র একদিন। কিন্তু এখানে কেনেডি বিমান ঘাঁটিতে যখন নামি তখন থেকেই ঘুমে ঢুলছিলুম। এটি সময়-বদলের ফলাফল। ভারতে যখন মধ্যরাত, এখানে তখন দুপুর। এখানে যখন কর্মচঞ্চল দিবাভাগ, ভারত তখন ঘুমে অচেতন। সেই কারণে সময়ের অভ্যাসে ঘুম ছাড়ানো যায়নি। ধাতস্থ হতে সময় লাগল।

নিউ ইয়র্ক জেলা ৫টি দ্বীপ নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। যেমন মান্হাটন্, কুইনস, ব্রুকলিন, স্টাটেন্ এবং ব্রঙকস্। কিন্তু শেষেরটির সঙ্গে বৃহত্তর স্থলভাগ সংযুক্ত। বাকিগুলি বড় বড় পুলের দ্বারা সংবদ্ধ। সমগ্র নিউ ইয়র্ক যেন এক বৃহৎ ঊর্ণ-নাভের জাল,—এত পথ, এত ফ্লাই-ওভার, এত সংখ্যক সাঁকো, এবং একটির পর একটি ভূগর্ভ পথ। মানহাটনের একদিকে হাডসন নদী, অন্যদিকে ইস্ট নদী। হাডসনের তলা দিয়ে লিন্কন টানেল পথ চলে গেছে বৃহত্তর দেশের দিকে। আর ওই ইস্ট নদীর ধারে দেখছি রাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রধান দপ্তর এক বহুতল অট্টালিকা। একটু এগিয়ে গেলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকেন্দ্র—যার মূল কাজ হল সমগ্র পৃথিবীর ব্যবসা-বাণিজ্যকে নিয়ন্ত্রণ করা। এই অট্টালিকা একটি ১১৪ তলা বাড়ি—রাত্রে বাড়িটি তেমন দেখা যায় না,—শুধু দেখছিলুম দূর আকাশে শতশত প্রদীপের মালা ঝুলছে! এখন এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিংয়ের সম্মান বিপন্ন, কারণ তার মাত্র ১০২ তলা। প্রকৃতপক্ষে নিউ ইয়র্কের সর্বাপেক্ষা ধনবান অঞ্চল হল মান্হাটন্—যেখানে কথায় কথায় মিলিয়নের বদলে বিলিয়ন ডলারের আলোচনা ওঠে, অর্থাৎ এক হাজার মিলিয়নে যখন এক বিলিয়ন হয়—সেই অঞ্চলে তখন শত শত বহুতল অট্টালিকাগুলি অনেক সময় একটু যেন একঘেয়ে লাগে। অনেক পথে সূর্যালোক আসে না, অনেক পথের অন্ধকারে ক্বচিত জ্যোৎস্নার ছায়াপথ দেখলে গা ছমছম করে।

তেরো বছর আগে যখন মাস দুয়েকের জন্য ইউরোপ ঘুরে যাই, তখন মনে হয়েছিল চেষ্টা চালিয়ে গেলে শ' দেড়েক বছরের মধ্যে ভারতবর্ষ হয়তো ইউরোপের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে। কিন্তু নিউ ইয়র্কে পা দিয়ে আমার অন্য একটি ভুল ভাঙলো। ইউরোপ এদের সম্পদ-প্রাচুর্যের তুলনায় শিশু। এ দেশের জনসংখ্যা কম-বেশি ২৩ কোটির মতো, কিন্তু কেবলমাত্র প্রাইভেট কার-এর সংখ্যা এখানে প্রায় ১১ কোটি। পুরনো গাড়ি, রেডিয়ো যন্ত্র, টি ভি সেট—এগুলো এরা পথে ফেলে দেয়, আবার নতুন কেনে। চারিদিকে এত রিসেসন এবং বেকারবৃত্তি—কিন্তু সমাজ জীবনে তার ছায়া পড়ে না। একজন বেকার প্রতি সপ্তাহে ৯৫ ডলার পায়। তার নিজের মোটর, টি ভি, কুকিং রেঞ্জ, গ্যাস, ইলেকট্রিক, নিজস্ব বড়-মানষি বাসব্যবস্থা,

দামি পোশাকপত্র—কী নেই! কারণ ভারতীয় টাকায় তারও উপার্জন প্রায় ৩০০০ টাকা। কিন্তু ভারতীয় হিসাববোধ নিয়ে এখানকার জীবনযাত্রার মান বিচার করলে চলবে না। সমগ্র আমেরিকায় পৃথিবীর প্রত্যেক মহাদেশের প্রায় সকল সম্প্রদায় বর্তমান। আফ্রিকার বিভিন্ন কৃষ্ণাঙ্গ সম্প্রদায়, এশিয়ার বহু জাতি, ইউরোপের প্রায় সবাই—এ ছাড়া জাপানী, চীনা, অস্ট্রেলীয়, আরবীয়, ইরানী, আফগানী, ভারতীয় ও বাঙালী—কে নয়? সম্প্রতি আবার এসেছে ইন্দো-চীন থেকে এক লাখ পঁচিশ হাজার পরিবার। কিন্তু তারা সঙ্গে এনেছে বহু কোটি ডলার মূল্যের সোনা ও অর্থাদি। তারা রেফুজি। তারা ইতিমধ্যেই কিনছে গাড়ি, পাচেছ জমি জায়গা ও বাসস্থান, কিনে ফেলছে টি ভি সেট। তারা ছিল পেন্টাগনের খয়ের খাঁ—সুতরাং মার্কিন ফেডারাল গভর্নমেণ্টের আশ্রয়ের দাবিদার।

আমি যাঁর অ্যাপার্টমেণ্টে এসে আশ্রয় নিয়েছি তিনি এক অবিবাহিতা বাঙালী মহিলা এবং বিশিষ্ট এক সমাজকর্মী। এখানেই এম এ পি এইচ ডি করেছেন। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি যুক্ত, বহু সম্প্রদায়ের সঙ্গে মিলিত তাঁর কর্মজীবন এবং উপার্জন প্রচুর। বই, কাগজ, সাময়িক পত্র, বুলেটিন, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের দলিলপত্রাদি ইত্যাদিতে তাঁর ফ্ল্যাটটি ঠাসা। এমন হাসিখুশী, অধ্যবসায়ী, অক্লান্ত পরিশ্রমী মহিলা—অল্পই দেখা যায়। সাহেব, মেম, কৃষ্ণাঙ্গ, বাঙালী—সকলেই তাঁর গুণমুগ্ধ এবং বশম্বদ। সকাল সাড়ে আটটায় তিনি কাজে চলে যান, ফেরেন বিকাল সাতটায়। এখন এ দেশে সন্ধ্যা হয় প্রায় পৌনে ন'টায়। ডঃ শ্রীমতী রেণুকা বিশ্বাসের এই ফ্ল্যাটটি এক পুরনো বাড়ির পাঁচতলায়। এখানে প্রায় দেড় হাজার বাঙালী পরিবার বাস করেন নানা অঞ্চলে ছড়িয়ে। রেণুকার ঘনিষ্ঠতা সকলের সঙ্গে।

একটা কথা এখানে পরিষ্কার থাকা দরকার। ভারতীয় এক টাকা এবং এখানকার এক ডলার—উভয়ের ক্রয়শক্তির তফাৎ কম। তুমি যদি মুদ্রা বিনিময় ব্যবস্থায় একটি ডলারকে ভারতীয় ৮ টাকায় বাঁধো—সে তোমার খুশি। এখানে আমার কাছে এক ডলার মানে এক টাকা মাত্র। আমি তারই অনুপাতে বলছি এখন এখানে এক পাউন্ড খাঁটি মাখনের দাম ৮০ আমেরিকান পয়সা, এক গ্যালন শ্রেষ্ঠ দুধ দেড় টাকার মধ্যে। এক ব্যক্তির নৈশ ভূরিভোজের খরচ দেড় থেকে দু টাকা। এক ডজন বড় বড় ডিম ৫৫ পয়সা। খাদ্যসামগ্রীর এই সর্বব্যাপী প্রাচুর্য বোধ হয় পৃথিবীর অপর কোথাও নেই। আমার বিস্ময়াবিষ্ট চোখ ও মন নিউ ইয়র্কের পথে পথে এবং দোকানে-বাজারে অশ্রান্তভাবে ঘুরে বেড়িয়েছে।

আমি দরিদ্র দেশের মানুষ হয়ে ভিন্ন দেশের সম্পদপ্রাচুর্য নিয়ে কথায় কথায় হাততালি দেবো—এমন দৈন্য আমার নেই, এবং ওটা আত্মসম্মানে লাগে। এ দেশ দেখে নিজের দেশকে ধিক্কার দেবো, এটি চিত্তের দৈন্য। আমাদের দেশের কোন কোনও লেখক এই মনোবৃত্তির ফাঁদে ধরা দিয়ে অনেক সময় ধিকৃত হয়েছেন। কিন্তু দুএকটা কথা না বলেও পারিনে। এই সুবৃহৎ নগরীর প্রতি অট্টালিকার প্রত্যেক ফ্ল্যাটে সচ্ছল বসবাসের মধ্যে যে মনোরম বিলাসসজ্জা চোখে পড়েছে সেটি অতুলনীয়। যে কোনও বাঙালী পরিবার যে কোনও ঝকঝকে ফ্ল্যাটে বাস করেন—সেখানে সুরুচিপূর্ণ আসবাবপত্র, টি ভি, রেডিয়ো, ফ্লোর কার্পেট, ডাইনিং হল, সুসজ্জিত স্টাডি, মখমলের আসনমোড়া বাথরুম, সেণ্ট্রাল হিটিং ও কুলিং ব্যবস্থা, কী নেই? বহু অধ্যাপক চিকিৎসক, বিজ্ঞানী, উচ্চতন চাকুরিজীবী, যন্ত্রবিশারদ অর্থাৎ বিভিন্ন কাজে

বাঙালীরা মোতায়েন রয়েছেন। প্রত্যেক ফ্ল্যাটেই দেখতে পাচ্ছি মহিলাদের পক্ষে রাজরাজত্ব। বোতাম টিপলে আর কাঁটা ঘোরালে গ্যাসের উনুন জ্বলে, এবং মেসিনের মধ্যে বাসনপত্রাদি মাজাঘষা, ধোওয়া, মোছা হয়ে যায়। সাবানের গুঁড়ো মেসিনে দিয়ে বোতাম টিপলে পোশাকপত্র কাচা হয়, বাটনা বাটা হয়, টোস্ট হয়ে বেরিয়ে আসে এবং মেসিন ঠেলে ঘরের মেঝে বা কার্পেট সাফ করা যায়। যে পরিবারে স্বামী স্ত্রী দুজনেই কাজ করেন—এমন শত শত পরিবার আছেন—তাঁদের শিশু, বালক বা বালিকাদের রাখার জন্য 'বেবি-সীটার' আছেন। বেবি-সীটার সাধারণত বেশি বয়সের বালিকা তরুণী বা বর্ষীয়সী মহিলারাই হন। এঁদের কাজ সারা দিন ধরে কয়েকটি শিশুর রক্ষণাবেক্ষণ করা। শিশুদের আহারাদির খরচ পিতামাতার। প্রতি শিশুরক্ষার জন্য পারিশ্রমিক ঘণ্টায় এক ডলার। যে মহিলা সাত আট ঘণ্টার জন্য ৪।৫টি শিশুর দায়িত্ব নেয়, তার দৈনিক উপার্জন ৩৫।৪০ ডলার। মাসিক স্থায়ী ব্যবস্থায় প্রতি শিশুর জন্য ১২৫ ডলার লাগে। সুতরাং, একজন বেকার মহিলা খুব সহজে মাসে হাজার ডলার উপার্জন করতে পারেন। এখানে প্রতি ক্ষেত্রেই ডলার খরচ। কবিতা পাঠের জন্য সাহিত্যসভায় যোগ দিতে যাও—প্রবেশ মূল্য এক ডলার।

এ দেশে প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ বই-কাগজ গ্রন্থাদি ছাপা হচ্ছে, তাদের প্রচার প্রচুর। কিন্তু উচ্চাঙ্গের সাহিত্যগ্রন্থ কম। সুন্দর অঙ্গসজ্জা, পরিচ্ছন্ন মুদ্রণ, মূল্যবান কাগজ, চমৎকার বাঁধাই—কিন্তু সে হয়তো গাছপালার কথা, বীজ বপণের শিক্ষা, জন্তু-জানোয়ার প্রতিপালনের পদ্ধতি, পিতামাতার কর্তব্য, খাদ্য তালিকার আলাপ, রান্না ও মাংসাদির গল্প। প্রাচীন (!) কবি ওয়াল্ট হুইটম্যান থেকে গল্প লেখক ও-হেনরি এখন লোকে ভুলতে বসেছে। জীবনীসাহিত্য, ইতিহাস, সমাজ জীবন, ব্যবহারিক দিনযাত্রা, বিভিন্ন বৈদেশিক কাহিনী—এবং বহুবিধ ধরনের বই এখানে পাওয়া যায়, ভারতে যা দুষ্প্রাপ্য। এ দেশে কাগজের খরচ লক্ষ্য করার বিষয়। কাগজের বাক্সে এক এক গ্যালন দুধ, মাংস, সব্জি, মাখন, ফল, পোশাক, বিভিন্ন খাদ্য—এবং কাগজের থলে, কাগজের থালা-গেলাস-পেয়ালা-বাটি। হোটেল মানেই কাগজের খরচ। খাদ্যবস্তু কাগজ দিয়ে ধরে কামড় দিচ্ছে, হাত মুছছে কাগজে, কাগজের ব্যাগ নিয়ে বাজার করছে। আর বাজারও তেমনি। ওটা রাজপ্রাসাদের অন্দরমহল, কিংবা মাছ মাংস, আলু বেগুন, পোশাকপত্রের বাজার—এ বলা কঠিন। ভিতরে ঢুকতে গেলে পায়ের চাপে নিজের থেকেই দরজা খোলে, ছোট ছোট গাড়ি ঠেলে এক-একটি সামগ্রী বাঁধা দরে কেনো—তোমার পায়ের তলায় মসৃণ মখমলের কার্পেট পাতা। ভিতরে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত এত বৃহৎ, এত ব্যাপক এবং সম্পদের ভারে এত সমৃদ্ধ যে, দেখলে মনে হবে অন্তত ৫ কোটি ডলার মূল্যের সামগ্রী মজুত আছে। সাধারণ ভাল হোটেলে ঢোকো, দেখবে যেন মায়াপুরী। বোতাম টিপলে কোক (কোকা-কোলা), নয়ত গরম চা বা কফি, নয়ত গরম খাবার—সব সামগ্রীর জন্য বোতাম আর যন্ত্রের কাঁটা! এরা নিজেদের ভবিষ্যৎ ভাবে না, গৃহস্থরা পুঁজিবাদী হয় না। উপার্জনের যে অংশটা কোনমতেই খরচ হতে চায় না, সেটা হাতে নিয়ে দূর দেশে খরচ করে আসে। হয় পশ্চিমের কোনও দেশে, নয় ইউরোপে, নয়ত বা এশিয়ার কোথাও। ভোগে, সম্ভোগে, বিলাসে—এদের ভয় নেই, কেননা এরা জানে উপার্জন হবেই হবে। আঠারো বছর বয়স হলেই ছেলে বা মেয়ে উপার্জনে বেরোয়। শ্রমের মর্যাদা এ দেশে সর্বব্যাপী। ঝাড়ুদাররা মেসিনের সাহায্যে রাস্তার জঞ্জাল তোলে। যে কোনও হোটেলে

একদিন কাজ করলে ২০ বা ২৫ ডলার। মা-বাপের ইচ্ছা, আঠারো বছরের মেয়ে যেন অবিলম্বে প্রণয়াসক্ত হয় এবং বিশেষ যুবকের সঙ্গে সময় বা রাত্রিযাপনের 'ডেট্' পায়। ওই আঠারো বছরের মেয়ে একা কোথাও ঘরভাড়া নিয়ে থাকতে পারে, নিষেধের এক্তিয়ার পিতামাতার নেই। ছেলের বেলাও একই কথা।

মাঝখানে গিয়েছিলুম নিউ পালৎস্-এ—নিউ ইয়র্ক থেকে ৮০ মাইল দূর, বাসে দেড় ঘণ্টা লাগে—এক মিনিট এদিক ওদিক নয়। শ্রীমান শিখীন্দ্র মিত্র আমাকে গাড়ি করে পৌঁছিয়ে দিল পোর্ট অথরিটি বাস টার্মিনালে। এখানে দোতলা ও তেতলায় ভূগর্ভ রেলপথ চলেছে গমগমিয়ে। এ সব নির্মাণ কার্য বিজ্ঞানের বিস্ময়কর কীর্তি। আমার ভাবনার মধ্যে আমি যেন নিজেই দিশাহারা হই। এর নাম 'আদিরনডক্ ট্রেলওয়েজ'। এক সময় আমি এক আরামদায়ক বাসে চড়ে চললুম। আমি নিজে অস্থিরগতি এবং অস্থিরমতি। আমি যেন এবার বেরিয়েছি সমগ্র আমেরিকা মহাদেশকে গ্রাস করতে। শুধু দেখতে দেখতে যাব যত দিন বা যত মাস লাগুক। জানতে জানতে যাব, ভাবতে ভাবতে যাব। আমি নিজে এক প্রকার নিঃস্ব, কিন্তু ভারত গভর্নমেণ্ট আমাকে এ দেশে সাংস্কৃতিক পর্যটনে পাঠাবার সময় সে কথা ভাবেননি। তাঁরা টিকিট কেটে দিয়ে আমাকে এখানে ছেড়ে দিয়েছেন মাত্র। সুতরাং এখন আমার পিছনে না আছে ভারত, না আছে বা আমেরিকা। আমি এখন স্বচ্ছন্দ, অবারিত—এখানে আমার চরম মুক্তি। আমি নিজেই জানিনে কবে কোথায় কোন্ অজানায় আমার এই দীর্ঘ ভ্রমণ শেষ হবে। কিন্তু এখানে হেঁয়ালি না রেখেই বলি, এ দেশে আমার অজানা বন্ধুবান্ধব ও শুভানুধ্যায়ীর অভাব কোথাও নেই।

আমার পাশে বসেছিলেন এক প্রবীণ আমেরিকান। আমার মুখে চোখে তিনি বোধ হয় চঞ্চল কৌতূহল দেখতে পাচ্ছিলেন। এক সময় প্রশ্ন করলেন, কোন্ দেশ থেকে আসছি, এই প্রথম কিনা, কোথায় যাব, কত দিন থাকব, এ দেশ কেমন লাগছে—ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমরা অতি প্রশস্ত হাইওয়ে ধরে উত্তর দিকে যাচ্ছিলুম। পথ শুধু মসৃণ নয়, পালিশ করা টেবিলের মতো ঝকঝকে। পথের দু দিকে পার্বত্য উপত্যকা এবং বহুক্ষেত্রে অরণ্যময়। মাঝে মাঝে পাইন, ওক, সিসম, বার্চ প্রভৃতি বিশাল বৃক্ষশ্রেণী—এদেরই ভিতর দিয়ে প্রায় প্রতি মিনিটে শত শত গাড়ি বিভিন্ন সুন্দর শাখা পথ ধরে চলেছে—যাদের সংখ্যার পরিমাপ করা কারো সাধ্য নয়। পৃথিবীব্যাপী তেলের সংকট চলছে এখন, কিন্তু এ দেশে এলে অন্তত সেই সংকট চোখে পড়ে না। লক্ষ লক্ষ গ্যালন তেল পুড়ছে প্রতি শহরে প্রতিদিন, কিন্তু কই, ভ্রূক্ষেপ কোথাও দেখিনে। এখানে এখনও প্রতি গ্যালন গ্যাসোলিন বা পেট্রল ৫৫ আমেরিকান পয়সা।

এবার আমি ভদ্রলোকটির সঙ্গে কথা আরম্ভ করলুম। —আপনাদের দেশের জঙ্গল বা অরণ্যে দুএকটা সাপ বা কিছু হরিণ দেখা যায়—এই মাত্র। চারিদিকে থই থই করছে আপনাদের সম্পদ এবং বিত্তবিলাস। আপনারা পরিশ্রমী, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ যন্ত্রবিশারদ এবং বিপুল আপনাদের নির্মাণশিল্প। ভোগে, বিলাসে, কর্মময়তায়, আবিষ্কারে, বিজ্ঞান বৈচিত্র্য রচনায়—আপনাদের জুড়ি কোনও দেশেই নেই। প্রায় দেড়শ বছরের মধ্যে আপনাদের দেশে যুদ্ধ বা সশস্ত্র বিদ্রোহ আপনারা দেখেননি। জীবনযাপন আপনাদের কাছে অনায়াসসাধ্য। কিন্তু ভারতবর্ষ অন্যদিক থেকে

অনেকটা সৌভাগ্যবান। আমরা সমস্ত জীবন ধরে লড়াই করে বাঁচি। হিংস্র জন্তুজানোয়ার, রোগ, দারিদ্র্য, অজন্মা, জলপ্লাবন, শত্রুর আক্রমণ, দুর্ভিক্ষ ও স্বল্পাহার—এদের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াই, সেই আমাদের পৌরুষ আর মানবতা। আমরা ভয় পাইনে, স্বদেশ রক্ষার জন্য প্রাণ দিই, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালাইনে, অন্য দেশে গিয়ে তাদের ঘরে আগুন জ্বালাইনে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রভুত্ব পিপাসা আমাদের নেই, সম্পদের আত্মাভিমানে আমরা ধরাকে সরা জ্ঞান করিনে।

নিউ পালৎস্ এসে পড়েছিল কাঁটায় কাঁটায় দেড় ঘণ্টায়। ভদ্রলোক হাসিমুখে আমার কাঁধে হাত রেখে বাস থেকে নামলেন এবং অভিনন্দন জানিয়ে এক সময় বিদায় নিলেন।

॥ ২ ॥

নিউ ইয়র্ক

করকমলেষু,

নিউ পালৎস-এ দিন তিনেক বাস করেছিলুম। এটিকে সবাই বলে গ্রাম। এ যদি গ্রাম হয়, তবে চৌরঙ্গী, পার্ক স্ট্রীট, রডন-লাউডন-ক্যামাক স্ট্রীট অঞ্চলকে অনায়াসে গ্রাম্যপরিবেশ বলতে দ্বিধা করব না। এখানকার অগণিত সংখ্যক রাস্তাগুলি এত চিক্কণ, মসৃণ ও পরিচ্ছন্ন যে, সিগারেটের ছাই ফেলতেও হাত ওঠে না। প্রতি বাড়িতে সেণ্ট্রাল হীটিং ও কুলিং ব্যবস্থা। গ্যারাজ, আউট হাউস, ফুল ও সব্জির বাগান এবং ইলেকট্রিকের সাহায্যে তার বহুবিধ কর্মবৈচিত্র্য ও সুচারু ব্যবস্থাদি। এখানে রয়েছেন অধ্যাপক পার্বতীকুমার সরকার ও তাঁর স্ত্রী প্রসিদ্ধা নৃত্যশিল্পী ও নৃত্যশিক্ষিকা শ্রীমতী মঞ্জুশ্রী সরকার। ইউরোপে, আফ্রিকায় এবং এ-দেশে এঁর নৃত্যকলা প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেছে। ভারতীয় নৃত্য দেখার জন্য নিউ ইয়র্কের প্রেক্ষাগৃহগুলি উপচিয়ে পড়ে। এঁদের সঙ্গে বহুদিন আমার পত্রালাপ ছিল। এঁদের বালিকা কন্যা শ্রীমতী রঞ্জাবতী মাত্র ১২ বছর বয়সেই ভাল ইংরেজী কবিতা রচনা করে—যাদের অনেকগুলি ছত্র পাকা হাতের পরিচয় দেয়। শ্রীমতী মঞ্জুশ্রী যদিও নারীর স্বকীয়তা ও স্বাধিকারে বিশ্বাসী, তবু তিনি জননী,—তাঁর দুর্ভাবনা এই, পাছে তাঁর কন্যাটি অদূর ভবিষ্যতে আমেরিকান অষ্টাদশীর রীতিনীতিতে অভ্যস্ত হয়।

বনবাগান ও পাখির কাকলিতে ভরা এই গ্রাম একটি পার্বত্য উপত্যকার অংশবিশেষ মাত্র। প্রচুর জনবসতি বিলাসবৈভবে ঝলোমলো। প্রতি পরিবারে একখানি অবশ্যম্ভাবী মোটর, টেলিফোন, ফ্রীজ, কুকিং রেঞ্জ, বাসন মাজা ও কাপড় কাচার যন্ত্রসিন্দুক। কান পেতে যত দূর শোনা সম্ভব, শত শত পরিবার শান্তিপূর্ণ, সর্বত্র নিশ্চুপ। শুধু খেলাধুলোর মাঠগুলিতে বালক-বালিকাদের মৃদু কলরব শোনা যায়। গ্রামের ভিতর দিয়েই উপত্যকাপথ পাহাড়ের ভিতর দিয়ে উঁচুতে উঠে গেছে। পাহাড় হাজার আড়াই ফুট উঁচু। নাম 'মোহঙ্ক'। অনেকেই এই পাহাড়ের নিরিবিলি অরণ্য অঞ্চলে সর্বসুবিধাযুক্ত বাংলোয় বাস করে প্রাচুর্যের মধ্যে। লোকে এখানে ফুলগাছের চারা, বহুবিধ গাছের বীজ প্রভৃতি কিনতে আসে।

প্রথম দিনেই এসে হাজির হলেন সস্ত্রীক অধ্যাপক ডক্টর অমিয় চক্রবর্তী মহাশয়।

তিনি এখন বৃদ্ধ হয়েছেন। আমার সঙ্গে তাঁর ৪০ বছরেরও বেশী বন্ধুত্ব। তিনি প্রথিতযশা কবি। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যসচিব হয়ে তিনি ছিলেন প্রায় দশ বছর॥ আমার জীবনে এমন অমায়িক, সজ্জন, নিরভিমান ও বিদ্বজ্জন কমই দেখেছি। একদা তিনি ও আমি তৎকালে সদ্যপ্রসূত পূর্ব-পাকিস্তানে সাংস্কৃতিক পরিভ্রমণে গিয়েছিলুম। সেই ভ্রমণকালে কিছু কৌতুক ও হাসির ঘটনা ঘটে। তাঁকে কাছে পেয়ে সেই ২৮ বছর আগেকার গল্পটি বলি। এই গ্রামের সুবৃহৎ বিশ্ববিদ্যালয়ে অমিয়বাবু অধ্যাপনা করেন। ছাত্র, অধ্যাপক, অধ্যক্ষ—এঁরা সকলেই এই সর্বজন-শ্রদ্ধেয় দার্শনিক পণ্ডিতকে একান্ত আপন মনে করেন। ডক্টর চক্রবর্তী এ-দেশে অনেকটা জাতীয় অধ্যাপকের সম্মানে ভূষিত। তাঁকে নিয়ে যে সংবর্ধনা-সভার অনুষ্ঠান হয়, আমি সেই সভায় উপস্থিত থেকে তাঁর প্রতি আমেরিকান শিক্ষিত সমাজের যে শ্রদ্ধার্ঘ্য-নিবেদন দেখেছিলুম, সেটি ভারতের পক্ষে বিশেষ গৌরবের কথা। পরদিন অমিয়বাবু 'দেশ' পত্রিকায় ছাপা তিনটি চমৎকার কবিতা আমাকে উপহার পাঠিয়েছিলেন, এবং নিউ ইয়র্কে ফিরে তাঁর হাতের যে প্রীতিশ্রদ্ধাপূর্ণ চিঠি পাই, আমি আজও তার যোগ্য হয়ে উঠিনি।

নিউ ইয়র্কের মধ্য মানহাটন অঞ্চলের গগনচুম্বী বহুতল অট্টালিকাগুলি বোধ হয় আমার মনকে ঈষৎ পীড়া দিয়ে থাকবে। ওতে বিস্ময়াবেশ আছে, রাত্রির আলোক-মালাদলের সজ্জায় রূপকথারও আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু সমগ্র নীলাকাশ ও রৌদ্রচ্ছটা ওদের উভয়ের মধ্যপথে অবরুদ্ধ হয়ে যেন করুণ বিষণ্ণতায় স্তব্ধ হয়ে থাকে। সম্ভবত এইসব কারণে এক শ্রেণীর নাগরিক সপ্তাহান্তে প্রতি শুক্রবারের অপরাহ্নে নিউ ইয়র্ক ছেড়ে গাড়ি নিয়ে বাইরে চলে যায়। বাইরে অবারিত বৃহৎ দেশাঞ্চলে মুক্তি। সেদিন বহুজনের ভিতর দিয়ে আমিও চললুম আমেরিকার স্বাধীনতার প্রতীক-মূর্তি 'স্ট্যাচু অব লিবার্টি' দেখতে। হাডসন নদীর তটে লিবার্টি পার্কের পশ্চিম ঘাটে মস্ত এক স্টীমারে চড়ে বসলুম। স্টীমার ছাড়লেই সমগ্র নিউ ইয়র্কের মানহাটন-এর দৃশ্য চোখে পড়ে। এই মানহাটন পূর্ব আমেরিকায় সর্বাপেক্ষা অর্থসম্পদে সমৃদ্ধ। কিন্তু সম্প্রতি দেশ-জোড়া মন্দা-বাজারে কর্তৃপক্ষ নাকি নিউ ইয়র্কের খরচ কুলোতে পারছেন না। তাঁদের এই অসুবিধা লক্ষ্য করে এই সেদিন তৈলরাজ ইরানের শাহ বুঝি বলে গেলেন, বেশ তো, অসুবিধা আর কি! আমার কাছে আপনাদের মানহাটন অঞ্চলটি বিক্রি করুন না কেন? বিশ-তিরিশ পঞ্চাশ হাজার বিলিয়ন ডলার যা লাগে, আমিই দেবো।

সেদিন আমার সঙ্গী শ্রীমান তড়িৎ চৌধুরী অঙ্ক কষে আমাকে জানালো, একশ' কোটি ডলারে মাত্র এক বিলিয়ন হয়। ইতিহাসের চাকা ঘুরছে, মধ্য এশিয়া এবার পৃথিবীর সম্পদ গ্রাস করতে উদ্যত। ওখানকার মরুলোকের তলায় লক্ষ কোটি বছরের তেল জমা রয়েছে। সেই তৈল-সমুদ্রে থৈথৈ করছে শুধু পেট্রোডলার। তেল এ-কালে অমৃতবৎ।

হাডসন নদীর মোহানায় কয়েকটি ছোট ছোট দ্বীপ দেখছি। একটি দ্বীপ নিউ ইয়র্কের গভর্নরের অট্টালিকা ও বনবাগানে পূর্ণ। যে দ্বীপটি আটলাণ্টিক মহাসাগরকে বহির্বিশ্বের দিকে শাসন করছে, সেটির মধ্যস্থলে এক কালজয়ী নারী-মূর্তি মশালের অগ্নিপাত্র হাতে নিয়ে উচ্চবেদীর উপরে দণ্ডায়মানা। বেদীটি নিয়ে এই মূর্তির সামগ্রিক উচ্চতা মোট ৩০৫ ফুট। শুধু হাত-উঁচু-করা মূর্তিটি ১৫২

ফুট, এবং কেবলমাত্র নারীমূর্তির উচ্চতা ১১১ ফুট। এই মূর্তির অন্য হাতে যে বইখানা রয়েছে, কেবলমাত্র তারই সাইজ হল ২১ ফুট। এই মূর্তিটি উপহারস্বরূপ দান করেন ফরাসী গভর্নমেণ্ট উভয় রাষ্ট্রের বৈপ্লবিক বন্ধুত্বের প্রতীক হিসাবে। মূর্তিটি প্রতিষ্ঠায় উভয় রাষ্ট্রেরই খরচ হয় তৎকালীন মোট ৬ লক্ষ ৫০ হাজার ডলার। যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন প্রেসিডেণ্ট গ্রোভার ক্লীভল্যাণ্ড ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দে এই মূর্তির আবরণ উন্মোচন করেন। সেই থেকে এই সাগরতরঙ্গাহত ক্ষুদ্র দ্বীপটির নামকরণ হয়, লিবার্টি আইল্যাণ্ড।

এই মূর্তির নিচে বেদীর ভিতরভাগে একটি মস্ত যাদুঘর—সেটি বিভিন্ন চিত্রে, সামগ্রী সম্ভারে, বিচিত্র অলঙ্করণে সমৃদ্ধ। তাদেরই মাঝখানে একটি মার্বেল-ফলকে যে কবিতাটি উৎকীর্ণ করা রয়েছে, সেটি উদ্ধৃত করার লোভ সামলাতে পারছিনে। সেটি এই :

"Not like the brazen giant of Greek fame,
With conquering limbs astride from land to land ;
Here at our sea-washed, sunset gates shall stand
A mighty woman with a torch, whose flame
Is the imprisoned lightning, and her name
Mother of exiles. From her beacon-hand
Glows world-wide welcome ; her mild eyes command
The air-bridged harbor that twin cities frame.
"Keep ancient lands, your storied pomp !" cries she
With silent lips. "Give me your tired, your poor,
Your huddled masses yearning to breathe free,
The wretched refuse of your teeming shore.
Send these, the homeless, tempest-tossed to me,
I lift my lamp beside the golden door !"

এই অপূর্ব কবিতাটি ১৮৮৩ সালে লিখেছিলেন আমেরিকান মহিলা কবি শ্রীমতী এম্মা ল্যাজারাস।

এই মূর্তিটি নির্মাণের কাজে ১০০ টন তামা ও ১২৫ টন ইস্পাত-লোহা লেগেছিল।

প্রসঙ্গত বলি, নিউ ইয়র্কে বাঙ্গালীর সংখ্যা কমবেশী চার হাজারের মতো। এ-দেশে উচ্চশিক্ষিত ছাড়া বিশেষ কোনও বাঙ্গালী আসেন না। এম-এ বা এম-এসসি পাস করে যাঁরা আসেন অথবা উচ্চ পর্যায়ে যাঁরা ইঞ্জিনিয়র বা বিজ্ঞানী হয়ে আসেন, তাঁরাও এ-দেশে এসে পি-এচ-ডি করে থাকেন। গ্রাজুয়েট বা কেবলমাত্র পোস্ট গ্রাজুয়েটের দাম এ-দেশে কম। তাঁরা এ-দেশে এসে অফিসের কেরানী হতে পারেন। কিন্তু সেই সুযোগও সম্প্রতি বিঘ্নসংকুল হয়েছে মন্দা-বাজারের জন্য। এখন বিশেষ-বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া কারোকে প্রবেশপত্র দেওয়া হচ্ছে না। যেসব ছেলে বা মেয়ে ভাগ্যঅন্বেষণে আসে, তারা হোটেলে, বাজারে, গৃহস্থ-ঘরে, দোকানে বা কারখানায় বলে-কয়ে কাজ নিতে পারত। যে-কোনও কাজ একটা পেলেই সচ্ছলতা

আসে। প্রতি সপ্তাহে ভালভাবে আহারাদির খরচ পড়ে ২০ বা ২৫ ডলার। চারজনে মিলে ডরমিটরির ঘর পেলে এবং নিজের সব কাজ নিজে করলে মাসে ১০০ ডলারে খাওয়া ও থাকা চলে। কিন্তু দোকান ও বাজারে সাংঘাতিক লোভের আকর্ষণ। পেটুকদের পক্ষে এটি ভূস্বর্গ। অনেক বেকার বাঙালী যুবক—যারা আগে থেকে আছে—তারা এ রাষ্ট্রের জনকল্যাণ দপ্তরের আপিস থেকে প্রতি সপ্তাহে ৯৫ ডলার পায়। যারা আদি আফ্রিকান বা কৃষ্ণাঙ্গ,—এ-দেশে যারা শতকরা ১১ জন—তাঁদের সমাজের লক্ষ লক্ষ নরনারী এই জনকল্যাণ দপ্তরের আনুকূল্যে অনেকটা নিষ্কর্মা হয়েই থাকে। সম্প্রতি কয়েক বছর আগে এখানে সিভিল রাইটস বিল পাস হবার ফলে কৃষ্ণাঙ্গরা এখন প্রচুর পরিমাণে স্বাধিকার-প্রমত্ততা লাভ করেছে। বহু ক্ষেত্রে মাইনরিটির সমাজবিরোধী চেহারা প্রকাশ পাচ্ছে।

সেদিন নিউ ইয়র্কের ভারতীয় কনসাল জেনারেল শ্রীযুক্ত অশোক রায় মহাশয়ের স্ত্রী শ্রীমতী গায়ত্রী রায় তাঁদের বাসস্থানে একটি চায়ের মজলিসে ডেকেছিলেন। পথ অনেকটা। সেণ্ট্রাল পার্ক পেরিয়ে বড় পোস্ট অফিস ছাড়িয়ে ব্রডওয়ে বাঁ দিকে রেখে নিরিবিলি পথে ট্যাক্সি নিয়ে তাঁদের ওই প্রাসাদসদৃশ অট্টালিকার উপরে উঠে এলুম। ওখানে উপস্থিত হয়েছেন রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রসিদ্ধ গায়িকা শ্রীমতী সুচিত্রা মিত্র। তাঁর সঙ্গে এসেছেন মোট ৩২ জন। তাঁকে দেখে খুব আনন্দ পেলুম। কলকাতার রবীন্দ্রসদনে আমরা উভয়েই সহকর্মী। এই যাত্রায় তিনি প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা নিজের চেষ্টায় সংগ্রহ করেছেন এবং পশ্চিমবঙ্গের কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে তিনি উপযুক্ত সহযোগিতা না পেয়ে বিভিন্ন অসুবিধায় পড়েছিলেন। তাঁর সবিস্তার কাহিনী ঈষৎ দুঃখদায়ক। সে যাই হোক, নিউ ইয়র্কের সুশিক্ষিত ও ভদ্র বাঙালীদেরকে সহজেই বলা যায়, Cream of the society। শ্রীমতী গান্ধী যখন বলেন, আমেরিকা আমাদেরকে যেমন খাদ্যসামগ্রী দিয়ে সহায়তা করেছে, আমরাও তেমনি ব্রেন দিয়ে তাঁদেরকে সাহায্য করেছি—কথাটি যে অত্যুক্তি নয়, এটি এ-দেশে না এলে তেমন বোঝা যায় না। পৃথিবীর অপর প্রান্তে একটি সীমাবদ্ধ অঞ্চলের মধ্যে এতগুলি একত্রিত 'মেরিট' দেখে মন আনন্দিত হয়ে ওঠে। ভয় ছিল পাছে এঁদেরকে উন্নাসিক মনে হয়। কিন্তু তা হয়নি। এঁদের মিষ্টমধুর ব্যবহার ও আতিথেয়তা খুবই আন্তরিক। বন্ধুত্ব ঘটতে দেরি লাগে না। অশোক রায় মহাশয় ও গায়ত্রী দেবী যেমন সজ্জন ও মিষ্টভাষী, তেমনি কৌতুকপ্রিয়। বাঙালী মহলে তিনি খুবই সুখ্যাত।

এই ভ্রমণকালে নিউ ইয়র্ক হবে আমার মধ্যকেন্দ্র। অর্থাৎ যেখানে এবং যত দূরেই যাই, নিউ ইয়র্কে আমাকে ফিরতেই হবে। ভারত গভর্নমেণ্টের এইটিই নির্দেশ। আমি কোথায় যাচ্ছি, কি করছি বা কেমনভাবে কাটাচ্ছি,—এটি তাঁদের বিচার্য নয়। সাংস্কৃতিক পর্যটনে এই ধরনের অবাধ স্বাধীনতাই আমার প্রয়োজন ছিল।

জনৈক ইহুদি-আমেরিকান মহিলার ওখানে সেদিন আমার নৈশ-ভোজ ছিল। ১৯০৬ সালে তাঁর পিতা তাঁকে রাশিয়া থেকে এ-দেশে আনেন। তখন তিনি নাবালিকা এক নর্তকী ছিলেন। ওখানে আমাকে নিয়ে যান সর্বত্র পরিচিতা ডক্টর রেণুকা বিশ্বাস—যাঁর কথা আছে বলেছি। বৃদ্ধার নাম শ্রীমতী আন্না। আন্না নামটি রুশীয় এবং রুশ রাষ্ট্রে এই নামটি খুবই লোকপ্রিয়। আন্না পাবলোভা, আন্না

কারেনিনা—কে না জানে। বৃদ্ধার দুটি বর্ষীয়সী কন্যা এবং এক-আধটি নাতি-নাতনী। ওঁদেরই সঙ্গে রয়েছে একটি বছর ২২।২৪এর স্বাস্থ্যবতী সুশিক্ষিতা তরুণী, —মেয়েটি পালিয়ে এসেছে আফ্রিকার উগাণ্ডা থেকে রাষ্ট্রপতি ইদি আমিনের বহিষ্করণের ধাক্কায়। এরা নামে এশীয়, কিন্তু পূর্বপুরুষ ভারতীয় গুজরাটী। ইংরেজ কোনও এককালে এদেরকে ব্রিটিশ নাগরিক—এই আখ্যা দিয়ে উগাণ্ডায় নিয়ে যায়—যে দেশে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশের অবাধ প্রভুত্ব ছিল। একালে ইদি আমিনের তাড়নায় ইংরেজদের সঙ্গে এরাও উগাণ্ডা ছাড়তে বাধ্য হয়। এখন এই ব্রিটিশ নাগরিক এশিয়ানরা—যারা প্রধানত 'ভারতীয়'—যারা তাদের শিক্ষাদীক্ষা ও জীবন-যাত্রায় ভারতীয়ত্ব সম্পূর্ণ ভুলেছে, তাদের অধিকাংশকে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছেন ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ। ফলে এশিয়ানদের সংখ্যা বেড়ে গেছে বিলাতে। এখন সাম্রাজ্যহীন ব্রিটেনকে কথায় কথায় কই-মাছের কাঁটা গিলতে হয়। যাই হোক, এই তরুণীর নাম খাতিজা এবং ইনি পরম্পরায় খবর পেয়ে ইমিগ্রেশন আপিস থেকে শ্রীমতী রেণুকার কর্মস্থলে এসে হাজির হন। রেণুকা এঁর পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেন এই বাড়িতে—এঁরা রেণুকার বিশেষ বন্ধু। শ্রীমতী খাতিজা এখন পি-এইচ-ডি করার জন্য থেসিস প্রস্তুত করছে।

এ-দেশে সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রিকাদির সংখ্যা কত লক্ষ আমি হিসেব করিনি। গৃহনির্মাণ, মোটর, খাদ্যসামগ্রী, কৃষি, ফুল ও গাছের চারা, বিমান ও জাহাজ, নাগরিক জীবন, গৃহসজ্জা প্রভৃতি বিষয় নিয়ে এক একটি আর্ট পেপারে ছাপা যে ধরনের সাময়িক পত্রিকা প্রকাশিত হয় তা আমাদের কাছে স্বপ্নবৎ। সমগ্র দেশে দৈনিক লক্ষ লক্ষ টন কাগজ খরচ হয়। খাদ্যসামগ্রী মাত্রই কাগজের বা পলিথিনের প্যাকেট, থালা-গেলাস-বাটি কাগজের বা প্লাস্টিক কাগজের, কাগজে হাত মোছা, হোটেলে অজস্র বর্ণবাহার কাগজের খরচ. কাগজ দিয়ে ধরে এরা হামবার্গার নামক ,খাবারে কামড় দেয়,—প্রতি গৃহস্থের বাড়ি থেকে প্রতি দিন রাশি রাশি কাগজের নুটি ফেলা যায়। প্রকৃতপক্ষে শহরের জঞ্জালের অধিকাংশ হল কাগজ। রান্নাঘরে মেয়েরা কথায়-কথায় যা দিয়ে হাত মোছে, তা কাগজ। সেই কারণে কাগজের বড় বড় রোল থাকে রান্নাঘরে।

এবার কিছু দিনের জন্য বেরিয়ে যাচ্ছি নিউ ইয়র্ক থেকে। সঙ্গে আছে শ্রীমান আদিত্য দাস ও তার তরুণী স্ত্রী শ্রীমতী জলি। জলি গাড়ির মধ্যে জমা করেছে বিবিধপ্রকার খাদ্য—সবই বাজার থেকে কেনা। আমরা হাডসন নদীর তলায় হলাণ্ড টানেলের ভিতর দিয়ে নিউ জার্সি অঞ্চল ধরেছিলুম। চারিদিকে দূরদূরান্তরে দেখা যাচ্ছে বিরাট এক-একটি শিল্পাঞ্চল। আমরা এক-একবার ফ্লাইওয়ে ও একটির পর একটি সাঁকোর তলা দিয়ে বা উপর দিয়ে চলে যাচ্ছিলুম। এটি ৯৫নং জাতীয় রাজপথ। আপ ও ডাউনে মোট ১২টি 'লেন'। অর্থাৎ আপ লেনগুলি ধরে মোট ৬ খানা গাড়ি অবাধে ও নিশ্চিন্তে ছুটতে পারে। ডাউনেও তাই। কিছুকাল আগেও গাড়ির গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় ৭০ থেকে ৯০ মাইল। এখন স্পীড কমিয়ে ৫৫ মাইলে আনা হয়েছে তেলসংকটের জন্য। এর ফলে মোটর অ্যাকসিডেণ্টের সংখ্যা কমেছে। এই দু শ' ফুট চওড়া রাজপথে পথচারীর পক্ষে হেঁটে চলা নিষিদ্ধ। প্রতি এক মিনিটে শত শত গাড়ি এ পথে ছুটোছুটি করে। পথের দুই ধারে মাঝে মাঝে টেলিফোন ব্যবস্থা, গাড়ি খারাপ হওয়ার বা যে-কোনও দুর্বিপাকের খবর

পাবা-মাত্রই পুলিস ছুটে আসে। এক একটি জাতীয় সড়কে প্রত্যেক সপ্তাহশেষে লক্ষ লক্ষ গাড়ি যাতায়াত করে।

এখন দুপুরে বেশ গরম, চড়া রোদ। মে মাসের শেষ সপ্তাহ। কিন্তু গাড়ির মধ্যে এয়ার-কনডিশন থাকলে আরাম। এ-দেশে দোকান, বাজার, বিদ্যালয়, জনপ্রতিষ্ঠান, প্রতি গৃহস্থ ঘর, আপিস-আদালত—যা কিছু চার দেওয়ালে ঘেরা, সবই এয়ার-কনডিশনড। যাই হোক, পথের দু' দিকে হরিৎ উপত্যকা দেখতে দেখতে আমরা পেনসিলভানিয়ার প্রান্তপথে দেলাওয়ার ও বল্টিমোর নগরীর সীমানা ঘেঁষে ওয়াশিংটনের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলুম। আমরা ২৪০ মাইল পথ অতিক্রম করছিলুম।

রাজধানী ওয়াশিংটন ডি সি-তে প্রবেশকালে মনে হচ্ছিল যেন এক বৃহৎ অরণ্যলোকে ঢুকছি। যেদিকে তাকাই বনময় পার্বত্য উপত্যকা। রাজধানীর ভিতরে ও বাইরে এমন আরণ্য-প্রকৃতি ইউরোপের কোথাও নেই। এমন মসৃণ ও চিক্কণ, এমন পরিচ্ছন্ন, প্রশস্ত ও প্রশান্ত পথের শোভা আর কবে দেখেছি? প্রতি পথের দু দিকে বনময়, মাঝে মাঝে সবুজ প্রান্তর, মাঝে মাঝে প্রাসাদপ্রতিম অট্টালিকাশ্রেণী। দূরে দেখা যাচ্ছে ওয়াশিংটন মেমোরিয়াল মনুমেণ্ট—যার উচ্চতা ৫৫৫ ফুট। আকাশের দিকে এই স্মৃতিস্তম্ভ সূচ্যগ্র হয়ে উঠেছে। রাজধানীকে দ্বিধাবিভক্ত করে বয়ে চলেছে বনময় নদী 'পটোমাক্'। আমরা লক্ষ্যস্থলের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলুম।

আমাদের সময়-গণনায় কিছু ভুল ঘটেছিল। পেঁছবার কথা ছিল মধ্যাহ্নের আগে। কিন্তু এখন প্রায় সন্ধ্যা, অর্থাৎ আটটা বাজে। আমরা এসে পেঁছলুম 'লক্‌উড ড্রাইভ'-এ। কয়েকটি বহুতল অট্টালিকা নিয়ে এই লক্‌উড ড্রাইভ কমপ্লেক্স। আমাকে ভয়েস অব আমেরিকা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা শ্রীযুক্ত রমেন পাইন মহাশয়ের কাছে পেঁছিয়ে দিয়ে আদিত্যরা গিয়ে উঠবে রাজধানীর এক মটেলে—এই স্থির ছিল। কিন্তু আমার আশা-ভরসা ছেড়ে দিয়ে পাইন মহাশয় চলে গেছেন রবীন্দ্র-নাথের এক নৃত্যনাট্য অভিনয়ের পরিচালনায়। কিন্তু তাঁর বদলে হঠাৎ লাউঞ্জে এসে ঢুকলেন এক সৌম্যদর্শন বাঙ্গালী স্বামী-স্ত্রী। আমাদের কথা শোনা মাত্র তিনি আমাদের তিনজনকে লুফে নিলেন এবং কোনওপ্রকার ওজর-আপত্তি না শুনে আমাদেরকে নিয়ে তুললেন তাঁর সাততলা উপরের অ্যাপার্টমেন্টে। আমরা তাঁকে বিব্রত করছি কিনা, এসব কথায় তিনি কানও দিলেন না। ইনি হলেন বাংলাদেশ রাষ্ট্রদূত দপ্তরের ফার্স্ট সেক্রেটারি আনোয়ারুল করিম চৌধুরী। এমন অমায়িক, সজ্জন এবং অতিথিবৎসল বাঙ্গালীকে পেয়ে আমি অভিভূত হয়েছিলুম। আদিত্য এবং জলি সেই রাত্রে আর ছাড়া পেল না। সেদিন আমাদের এক রাত্রির জীবন আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল।

আনোয়ারুলের বেসরকারী নাম জয় চৌধুরী, তাঁর স্ত্রী হলেন মলী, দুটি ছেলের নাম শান্তনু ও আনন্দ এবং কিশোরী মেয়েটির নাম সুদেষ্ণা। এ ধরনের নামকরণের কারণ কি, এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানালেন, আমরা ভারতীয় সংস্কৃতিতে মানুষ, এবং মহাভারত-রামায়ণ আমাদের আদিশিক্ষার প্রতীক।

একটি রাত্রি আমরা ওঁদের কাছে বড় আনন্দে কাটিয়েছিলুম।

পরদিন প্রায় মধ্যাহ্নকালে মেরিল্যাণ্ডের ব্রুক্‌ভিল থেকে ডক্টর অরুণ গুহ পূর্বব্যবস্থা অনুযায়ী আমাকে তাঁর নিজস্ব বাড়িতে নিয়ে যেতে এলেন। পথ

সামান্য, মাইল দশেক। ওয়াশিংটন শহরের তিন দিকে মেরিল্যান্ডের ফ্রেম, এবং একদিকে ভার্জিনিয়া অঙ্গরাজ্যের সীমানা অংশ। এই অংশগুলির সঙ্গে মিলে ওয়াশিংটন হয়ে উঠেছে ডি সি অর্থাৎ ডিস্ট্রিক্ট অব কলামবিয়া। যেমন দিল্লী নগরী—হরিয়ানা ও পাঞ্জাবের অংশ নিয়ে সে বিস্তারলাভ করেছে।

আরণ্য উপত্যকার পথ ধরে শ্রীমান অরুণ যেন আমাকে কোন্ এক অমরাবতীর দিকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। পথচারী কারোকে দেখা যাচ্ছে না। দেখছি শুধু শত শত মোটরগাড়ি, যারা সংখ্যাগণনার অতীত। আমরা 'তান্তেরা ওয়েতে' পেঁছিলুম।

॥ ৩ ॥

রুকভিল
মেরিল্যান্ড

প্রিয়বরেষু,

রাজধানী ওয়াশিংটন থেকে যখন আমি মেরিল্যান্ড স্টেটের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলুম তখন এ দেশের ভিতরের ভৌগোলিক চেহারাটা আমার কাছে তেমন স্পষ্ট হয়নি। কোন্ পথ দিয়ে কোথায় চলে যাচ্ছিলুম তার হিসাবটাও ছিল কম। এখন আমি আমার গতিপথ মিলিয়ে দেখছি, এ অঞ্চলে আমি প্রবেশ করেছিলুম নিউ জার্সি, দেলাওয়ার, উইলমিংটন ও শিল্পনগরী বলটিমোরের উপর দিয়ে।

এখানকার এই উপত্যকাপথের শোভা আমাকে তন্ময় করে রেখেছিল। কথায় কথায় আমাকে মনে করিয়ে দিচ্ছিল কুমায়ুনের পাহাড়তলির পথ, মনে করিয়ে দিচ্ছিল রাঁচির ওদিক দিয়ে সেই নেতারহাটে যাবার অরণ্যপথ।

আমরা যাকে পল্লীগ্রাম বলে জানি, এখানে সেই পল্লীগ্রাম পেয়েছে নন্দনকাননের শোভা ও সম্পদ। কথায় কথায় পচা ডোবা, আগাছার জঙ্গল, পাঁদাড়ের নোংরা, আদুল গায়ের ছেলেমেয়ে, রোগা আধপেটা খাওয়া ও জীর্ণবস্ত্রা স্ত্রীলোক, কঙ্কালসার গরু বা খোঁটায় বাঁধা ছাগল, গ্রামের নেড়ি কুকুর—এ সব কিছু নেই। আছে শুধু চিক্কণ পথের দুধারের বনশোভা, ফসলের ময়দান, মাঝে মাঝে উপত্যকা এবং দূরে দূরে চিত্রবৎ উদ্যানবাটি, গল্‌ফ ক্লাব, শপিং সেন্টার, এক আধটি গীর্জা, কোথাও বড় লাইব্রেরি, কোথাও টাউন হল, কোথাও বা খেলাধূলার আয়োজন। সুশ্যাম ঘন দূর্বাদল সর্বত্র যেন সবুজ শয্যা রচনা করেছে। অরুণ আমাকে নিয়ে যাচ্ছিল অল্‌নি নামক এক কাউন্টির ভিতর দিয়ে। ঘন বনপথ ধরে আমরা 'তান্তেরা ওয়ে' পেরিয়ে 'রুকভিল' নামক এক গ্রামে এসে পেঁছিলুম। এই গ্রামেরই পোস্ট আফিসের একটি ঘরে প্রাক্তন প্রেসিডেণ্ট ম্যাডিসন জাতীয় অন্তর্দ্বন্দ্বের কালে প্রাণভয়ে পালিয়ে এসে আত্মগোপন করেছিলেন।

একদা ইউরোপ থেকে বিভিন্ন জাতির লোকেরা যারা এসে এ দেশে জায়গাজমি অধিকার করতে থাকে, সেই 'পাইওনিয়ারদের' মধ্যে ইংরেজের সংখ্যাও ছিল প্রচুর। সেই কাল হল ব্রিটিশ সাম্রাজ্য সৃষ্টির প্রারম্ভ কাল—যাত্রী জাহাজ ও যুদ্ধ জাহাজ নির্মাণের যুগ। আমেরিকায় এসে 'রত্নখনির' সন্ধান পেয়ে সেদিনকার দ্বীপবাসী

ইংরেজের দল অন্যান্য এংলো-স্যাক্সন জাতির সঙ্গে একতাবদ্ধ হয়ে মোড়লী আরম্ভ করে এবং তাদের আধিপত্য প্রসারিত হয়। ওদিকে জার্মান, ইতালিয়ান, ফরাসী, সুইডিস প্রভৃতি জাতির লোকেরা দলগত-ভাবে এ দেশে একটির পর একটি উপনিবেশ স্থাপন করতে থাকে। অতঃপর আরম্ভ হয় জমি নিয়ে কাড়াকাড়ি ও মারামারি, প্রশাসন ব্যবস্থা নিয়ে খুনোখুনি, আধিপত্য-লাভের জন্য সংগ্রাম, পাইয়োনিয়ার্সদের মধ্যে বিদ্বেষ ও দ্বন্দ্ব, আদিবাসীদের উচ্ছেদ করার সঙ্ঘবদ্ধ চেষ্টা—ওই সঙ্গেই ইংরেজ দলে ভাঙ্গন দেখা দেয়। একদল হয়ে ওঠে শাসক, অন্য দল বলতে থাকে তারা এখন 'আমেরিকান'। এইভাবে সকল জাতির 'পাইয়োনিয়ার' গোষ্ঠী পরবর্তীকালে আমেরিকান হয়ে ওঠে এবং ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে থাকে। ম্যাডিসন স্বয়ং ছিলেন জাতিতে ইংরেজ। কিন্তু ইংরেজের সঙ্গে খন্ড যুদ্ধকালে তিনি আমেরিকান বলেই পরিচিত ছিলেন। বলা বাহুল্য, 'আমেরিকা' শব্দটির জন্ম হয় এক ইতালীয় পরিব্রাজক বা পাদ্রির নাম থেকে। তাঁর নাম ছিল 'আমেরিগো ভেসপুসি।' ১৪৯৯ সালে তিনি কিভাবে ওই আদিবাসী বা তথাকথিত রেড ইন্ডিয়ানদের মহাদেশে পেঁাছেছিলেন তার ইতিবৃত্ত এখন আর কারও জানা নেই। অবশ্য কলম্বাসের প্রথম জাহাজ আসে ১৪৯২-তে।

ব্রুকভিল গ্রামে এসে দেখি প্রায় ৪।৫শ' বাগানবাড়ি সারিবদ্ধভাবে রয়েছে একেকটি পথে। বাসিন্দারা অধিকাংশই শ্বেতাঙ্গ। প্রত্যেকের বাড়ির সামনে একখানি বা দুখানি মোটর, সামনে ফুলের ও পিছনে ফল বা সব্জির বাগান। এটিও উপত্যকাময় গ্রামাঞ্চল। উঁচু বা নিচুতে একেকটি বাড়ি যেন শোভায় ও সমৃদ্ধিতে ঝলমল করছে। বহু মূল্যবান গৃহস্থঘরের সামগ্রী বাইরেই পড়ে থাকে, কেউ ফিরেও তাকায় না। চার দিকে এতই প্রাচুর্য যে, কেউ কারও সামগ্রী হাতসাফাই করে না। মোটরের পার্টস, বালতি, রবারের পাইপ, ছোটদের সাইকেল ও খেলনা, বিভিন্ন যন্ত্রাদি প্রভৃতি একপাশে ছড়ানো থাকলেও কেউ ভ্রূক্ষেপ করে না। অন্য সব বাড়ির মতো অরুণের নিজস্ব দোতলা বাড়িটিও আপাদমস্তক কার্পেট মোড়া এবং সর্বাধুনিক ডিজাইনে তৈরি। বাড়িটি আগাগোড়া কাঠের ফ্রেমে আঁটা। কাঠের চালা, কাঠের মেঝে, কাঠের সিঁড়ি, মোটা প্লাইউডের পার্টিসন-দেওয়ালের ভিতরে 'ইন্সুলেট' করা, সমগ্র বাড়িটিতে 'হীটিং ও কুলিং' ব্যবস্থা। আরামের ও স্বাচ্ছন্দ্যের উপকরণে সমগ্র গ্রাম পরিপূর্ণ। নর্দমা, নোংরা, নালা বা দুর্গন্ধ কোথাও নেই। আমেরিকার কোথাও ওগুলি আজও চোখে পড়েনি। একটি গ্রাম রচনার আগে কর্তৃপক্ষ প্রথম নির্মাণ করেন ভূগর্ভ নালা, অফুরন্ত দিবারাত্রি বিশুদ্ধ কলের জল, গ্যাস ও ইলেকট্রিক লাইন, অবশ্যম্ভাবী নিখুঁত টেলিফোন ব্যবস্থা, ডাক ও তার বিভাগ, পুলিসচৌকি, পেট্রল কেন্দ্র, গাড়ি মেরামতি কারখানা, মিস্ত্রীদের আপিস, বাড়ি ঘরের মালমসলার প্রতিষ্ঠান এবং একটি বা দুটি বৃহৎ শপিং সেন্টার। এগুলি কিন্তু গভর্নমেন্টের উদ্যোগে হয় না, শিল্পপতিরাই এগুলি সৃষ্টি করে 'কাউণ্টি কাউন্সিলের' সহায়তায়। শিল্পপতি ও ধনবাদীরা এ দেশে দেশকর্মী, জাতীয়তাবাদী ও সংগঠনকারী এবং এই করেই তারা তাদের ব্যবসায় ফলাও করে।

অরুণ আফিস করে ওয়াশিংটনে। সে স্থানীয় 'নাসা' প্রতিষ্ঠানের (National Aeronotic and Space Administration) ডাইরেক্টর। সে এক নিরভিমান পরিণত বয়স্ক যুবা। তার এই উচ্চপদ প্রাপ্তির মূলে একটি ছোট্ট কাহিনী রয়েছে।

সে গণিত ও পদার্থবিদ্যায় বিশেষ কৃতী একজন পি এইচ ডি। বিজ্ঞান বিষয়ে তার গবেষণা বহুবিশ্রুত। এপলো-১১ নামক রকেটটিকে চাঁদে পাঠাবার আগে জার্মান-আমেরিকানরা একটি বিশেষ অংককষা নিয়ে বিব্রত বোধ করে। সে অংকটিকে তারা বিলাতে পাঠায়, সেখানেও কিছু হয় না। অবশেষে এই অংকটি নির্ভুলভাবে কষে দেয় অরুণ। শুধু বিজ্ঞানে নয়, আমেরিকার জীবন ও তাদের সমাজ, তাদের অর্থ-নীতি ও রাজনীতি, তাদের শ্রমশক্তি ও সংগঠন—এগুলির সম্বন্ধে তার জ্ঞানগর্ভ কথাবার্তা আমাকে অনুপ্রাণিত করেছিল। অরুণের কাহিনীটি শুনেছিলুম লস এঞ্জেলেসে গিয়ে।

ঘরে আছেন অরুণের মা ঊষা দেবী, স্ত্রী শ্রীমতী কাজল, একটি নাবালক পুত্র ও চঞ্চল একটি শিশুকন্যা। শ্রীমতী কাজল এখানকারই একটি নার্সারি স্কুলের শিক্ষয়িত্রী। এঁদের সঙ্গে আমার চিঠিপত্রের যোগাযোগ ছিল। ঊষা দেবীর শান্ত ও নিরভিমান সৌজন্য আমাকে মুগ্ধ করেছিল।

খবর পেয়ে কয়েকজন বাঙালী এসে জড়ো হয়েছিলেন। এখনও দিন দুই ছুটি, সুতরাং, একটা মজলিস বসাবার অসুবিধা ছিল না। প্রফেসার, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, সরকারী কর্মচারী, দুএকটি পি এইচ ডি ছাত্র, উচ্চশিক্ষিতা ও উপার্জনশীলা কয়েক-জন মহিলা—সবাইকে নিয়ে সেদিন সন্ধ্যায় পংকজ বসু মহাশয়ের বাড়িতে একটি বন্ধুসম্মেলন ডাকা হয়েছিল। আমি ছিলুম প্রদর্শনীর 'সামগ্রী'। বসুমহাশয়ের 'বেসমেণ্টের' হলে নেমে এসেছিলুম। এটি আমার পক্ষে নতুন অভিজ্ঞতা। এই প্রকার 'বেসমেণ্ট' নির্মাণ করা হয় বাড়ির নীচে ভূগর্ভে। সুন্দর আসবাবপত্র, কার্পেট প্রভৃতির দ্বারা এই হলটি প্রায় সর্বত্রই সুসজ্জিত থাকে। আলো বাতাস হীটিং-কুলিং কোনটারই অভাব নেই। ডিনার পার্টি, গান বাজনা বা নৃত্যগীত ইত্যাদির জন্য এরূপ বৃহৎ কক্ষ খুবই দরকার। শিকাগোয় এইরূপ একটি প্রশস্ত কক্ষে এক বাঙালী পরিবারের একটি শিশুর অন্নপ্রাশনের সমারোহ হতে দেখেছি।

এঁরা কেবল উচ্চপদস্থ নন, উচ্চবিত্তও বটে। প্রায় প্রত্যেকেরই নিজস্ব ঘরবাড়ি রয়েছে। কোনও বাড়ি ৪০ থেকে ৫০ হাজার ডলারের কম নয়। অনেকের অনুযোগ, ভারতে তাঁরা তাঁদের কর্মযোগ্যতা ও গুণপনার যথার্থ সমাদর পাননি, তাই তাঁরা পৃথিবীর এই অপর প্রান্তে চলে আসতে বাধ্য হয়েছেন। এখানে গুণীর মর্যাদা, কর্মজীবনের স্বাধীনতা ও সাচ্ছল্য, অভাব-অনটন থেকে অব্যাহতি, ভেজালবিহীন খাদ্য সামগ্রীর সুলভ প্রাচুর্য, অর্থনীতিক সুযোগ সুবিধা, ভবিষ্যৎ জীবনের নিরাপত্তা ও উদ্বৃত্ত অর্থ সঞ্চয়—এগুলির আকর্ষণ অপ্রতিরোধ্য। স্বদেশে যে সকল অভাব-গ্রস্ত আত্মীয়পরিজন রয়েছেন, এখান থেকে তাঁদেরকে অর্থসাহায্য দেওয়ার বহুবিধ সুবিধা। ডলার পাঠালে ভারত গভর্নমেণ্টও উপকৃত হন। ওঁদের মধ্যেই দেখছিলুম এক সৌম্যদর্শন যুবা চিকিৎসককে। ইনি অরুণের প্রতিবেশী ডাঃ মদনগোপাল মুখার্জি। ইনিও সস্ত্রীক নিজের বাড়িতে বাস করেন। এঁর ভদ্র ও মিষ্ট ব্যবহার লক্ষ্য করে আমি আনন্দ পাচ্ছিলুম, এবং ইনি আমার পরিদর্শন ও পরিভ্রমণের অনেকটা দায়িত্ব নিয়েছিলেন।

॥ ৪ ॥

ওয়াশিংটন ডি-সি

ব্রুকভিল থেকে রাজধানী ওয়াশিংটনের নাভিকেন্দ্র আধ ঘণ্টার মোটর পথ। এ দেশে মোটর-পথের হিসেবেই সময় নির্ণীত হয়। যদি বলি অমুক জায়গাটিতে পৌঁছতে গেলে ঘণ্টা দেড়েক সময় লাগে, তখনই বুঝতে হবে অন্তত ৭৫ মাইল মোটরপথ। মোটর হল প্রতিদিনের জীবনযাত্রার সর্বপ্রধান অংগ। কালিফর্নিয়ায় ভ্রমণকালে জনৈক শ্বেতাংগ বলেছিলেন, "Every American child knows he is born to drive a car."

আমি যেন এক মায়াকাননের ভিতর দিয়ে রাজধানীর দিকে অগ্রসর হচ্ছিলুম। চারিদিক ঘন বনময়, তাদেরই তলা দিয়ে বন্য নদী 'অটোমাক' বয়ে চলেছে। এই নদী নামছে 'আপ্পালাসিয়ান' পর্বতমালা থেকে, এবং কাছাকাছি আটলাণ্টিক সমুদ্রে গিয়ে পড়ছে। বিচিত্রবর্ণের অনামা পাখির কলকাকলীতে ভরে রয়েছে আরণ্য প্রকৃতি। তাদেরই ভিতর দিয়ে নিঃশব্দে শত শত মোটর আনাগোনা করছিল। ওই পথেরই পাশে উচচ উপত্যকায় দেখতে পাচ্ছিলুম জগৎকুখ্যাত সি-আই-এ (Central Intelligence Agency) প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন অট্টালিকা--এগুলি রাজধানীর কেন্দ্র স্থল থেকে অনেকটা দূরে এবং এদের জটিল ও রহস্যময় প্রশাসন ব্যবস্থা নিজস্ব। এদের আয়ব্যয়ের কোনও হিসাব জানা যায় না। সম্প্রতি এদের কেচ্ছা ও কলঙ্কে আমেরিকার ভদ্রসমাজ এদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াচ্ছে, সংবাদপত্রাদিতে এদের নানাবিধ রাজনীতিক অপরাধের কাহিনী প্রকাশ করা হচ্ছে। প্রেসিডেণ্ট ফোর্ড প্রমুখ নেতারা কথায় কথায় তিরস্কৃত ও লাঞ্ছিত হচ্ছেন। এরা কূটকৌশলের সাহায্যে বিদেশী রাষ্ট্রের পতন ঘটায়, জনপ্রিয় রাষ্ট্রনেতাদেরকে খুন করায়, প্রতি দেশে গিয়ে গোপনে গোপনে স্পষ্টবাদী দেশনেতাদের বিরুদ্ধে সুকৌশল চক্রান্ত করে এবং গৃহবিপ্লব ঘটাবার জন্য উস্কানি দেয়। এরা নাকি বহুদেশে গিয়ে বুদ্ধিজীবীদেরকে ঘুষ খাওয়ায়, কবি শিল্পী লেখক অধ্যাপক জননেতা সাংবাদিক প্রভৃতিকে সংগোপনে কিনে রাখার চেষ্টা পায়, বিভিন্ন 'এইড' বা 'গ্রাণ্ট' বিতরণ করে নানা অছিলায়--এই-রূপ বহুবিধ কাহিনীতে আমেরিকার সংবাদপত্রগুলি এখন মুখর। এ নিয়ে বহু স্বীকৃতি-পুস্তিকাও (Confessional booklet) আমেরিকায় ছাপা হচ্ছে। বলা বাহুল্য, আমেরিকান ডেমোক্রাসী নিজেদের কলঙ্ক কাহিনী কোথাও ঢেকে রাখে না।

রাজধানী ওয়াশিংটনে প্রবেশকালে দেখছিলুম নিগ্রোদের কয়েকটি অপরিচ্ছন্ন পল্লী। ধুলো, জঞ্জাল, ভাংগা বাড়িঘর, শ্রীহীন দোকানপসার, সাম্প্রদায়িক দাংগার ক্ষয়ক্ষতির ও আগুন লাগার চিহ্ন। ওর মধ্যেই দেখতে পাচ্ছিলুম দোকানে ও দেওয়ালে বিভিন্ন ধরনের পোস্টার ও খড়ি বা আলকাতরা দিয়ে লেখা নিগ্রো সম্প্রদায়ের ভাষা, সংস্কৃতি ও শিল্প-সাহিত্যের পক্ষে প্রচারকার্য। আফ্রিকান চিত্রশিল্প রচনা করা রয়েছে বহু বাড়ির দেওয়ালে ও দোকানে। নিগ্রো বা আফ্রিকানরা শ্বেতাংগ প্রভুত্বের হাত থেকে অব্যাহতি ও আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার চায়। তারা চায় নিজেদের স্টেট, নিজেদের প্রশাসন, নিজেদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও নিজেদের কাজকারবার। যুক্তরাষ্ট্রে তাদের জনসংখ্যা শতকরা ১০ জন। ওয়াশিংটনের সর্বময় কর্তা যিনি মেয়র এবং

পুলিস বিভাগের যিনি সর্বোচ্চ অধিপতি—তাঁরা দুজনেই নিগ্রো। রাজধানী ওয়াশিংটন ডি সি'র সামগ্রিক জনসংখ্যার শতকরা ৭৪ ভাগ মানুষ হল নিগ্রো। এদের মধ্যে স্বল্প শিক্ষিত বেকারসংখ্যা অনেক বেশী। এদেরই দেখছিলুম সর্বত্র—ছেঁড়া জুতো, ছেঁড়া পোশাক, অনুন্নত জীবনযাত্রা, বসবাসপল্লীতে আঁস্তাকুড়, ছোট ছোট দলে মেয়েপুরুষ রকে বা সিঁড়িতে বসে ইয়ারকি করছে—সবাই তারা নিগ্রো! ওদের গুণপনা কম বলেই বড় বড় আপিসের দায়িত্বশীল কাজে ওদের জায়গা নেই। ওরা সর্বত্রই শ্রমিক। মাটি কাটে, নালীপথ বানায়, মোটর মেরামত করে, রাস্তাঘাট ঝাঁটায়, বাড়িঘর তৈরিতে মজুর খাটে, বাস বা ট্যাক্সি চালায়, সৈন্য ও পুলিসে কাজ নেয়, বিমানঘাঁটি বা রেল স্টেশনে শ্রমিকের কাজ করে, সাব-ওয়ের স্টেশনে টিকিট বেচে, হাটে-বাজারে কাজ নিয়ে থাকে। ওদের পাড়ার মধ্যেই দেখা যাচ্ছে 'রেড লাইট এরিয়া' অর্থাৎ বেশ্যা পল্লী। সন্ধ্যার পরে ও অঞ্চলে লুট, রাহাজানি, ছিনতাই, খুন—এ সব লেগেই থাকে, যেমনটি দেখে এসেছি নিউ ইয়র্ক নগরের 'হার্লেম' নামক পল্লীতে। ওদের পাড়াতেই নোংরা 'নাইট ক্লাবের' ছড়াছড়ি এবং সচিত্র অশ্লীল বইয়ের দোকান যেখানে-সেখানে। কিন্তু অশ্লীল ছবিগুলির অধিকাংশই শ্বেতাঙ্গ পুরুষ ও রমণীদের। কৃষ্ণাঙ্গী নগ্নার সমাদর কম। নাইট ক্লাব বা 'গো-গো' নাচের রেন্ডেভোগুলিতে শ্বেতাঙ্গ তরুণীদেরই দেখা যায় বেশী। কৃষ্ণাঙ্গীরা সেখানে চাটনির মতো। আমার এক প্রশ্নের উত্তরে শুনেছিলুম, শ্বেতাঙ্গ পুরুষ নানা পরিস্থিতিতে কৃষ্ণাঙ্গী নারীর সঙ্গে সহবাস করার ফলে বহু ক্ষেত্রে নিগ্রোদের গায়ের রঙ একটু ফর্সা হয়ে বর্ণসংকর সৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু শ্বেতাঙ্গ রমণী কখনও নিগ্রো পুরুষের ছায়া মাড়ায় না।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় প্রত্যেক স্টেটের রাজধানীতে যে অট্টালিকায় পার্লামেন্টের সভা বসে তাকে বলা হয় 'ক্যাপিটল'। সর্বাপেক্ষা সুশ্রী যে ক্যাপিটলটি দেখেছিলুম রোড আইল্যাণ্ডের রাজধানী 'প্রভিডেন্স' নামক নগরে, তার শ্বেত-প্রস্তরের ভাস্কর্যশিল্প বোধ করি তাজমহলকেও হার মানায়। এখানকার ক্যাপিলটি অতি বৃহদাকার ও সুউচ্চ। এখানে দুই ভাগে সেনেটের সভা বসে। একদিকে হাউস অব রিপ্রেজেনটিভ, অন্য দিকে কংগ্রেস। গ্যালারির সীটগুলি আরামদায়ক। দুটি হাউসেই বিলাস ও বৈভবের যে সজ্জা, তার বর্ণনা অপেক্ষা রঙীন চিত্রাবলী দেখানই ভালো। আমার অবস্থাটা দিনে-দিনে ঠিক যেন 'Alice in Wonderland হয়ে উঠেছিল। সব দেখাগুলোই যেন স্বপ্নের ঘোরে দেখা মনে হচ্ছিল! হোয়াইট হাউস, ব্লেয়ার্ড হাউস, সেক্রেটারি অব স্টেটের হাউস, ব্যাংক অব আমেরিকা ইত্যাদি প্রায় সবগুলি অট্টালিকা একই পাড়ায়। কিন্তু সবগুলিই বন-বাগান-ময়দানের দ্বারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন। যেটির নাম জাতীয় নথিপত্র রক্ষণশালা (National archives) তার সোপান শ্রেণী ও বিশালতা মনকে অভিভূত করে। কিন্তু তিনশ' বছরের ইতিহাসে থাকবে আর কতটুকু? পাইয়োনিয়ার্সদের কাহিনী, অন্তর্দ্বন্দ্ব, সংগ্রাম, স্বাধীনতা ঘোষণার প্রস্তাব, জর্জ ওয়াশিংটনের আগে ও পরের কাহিনী, অব্রাহাম লিংকনের অপমৃত্যুর ইতিবৃত্ত, বিভিন্ন জাতীয় দলিল, বড় বড় নেতাগণের বিবৃতি—সবই সযত্নে রক্ষিত। আমাদের কাছে আমেরিকা এখনও নতুন। একশ' বছর আগেও ওরা ছিল শুধু ভূগোলের মানচিত্রে, আমরা কেউ তখন ওদের খবর রাখিনি। নিন্দুকদের মুখে শুধু শোনা যেত ইউরোপের ভাগ্যান্বেষী একদল জালছেঁড়া, পলোভাঙ্গা, বিধর্মী, পলাতক,

গুন্ডা ও লম্পট, খুনে-ফাঁসুড়ে, শ্লথচরিত্রা নারী, চোর-ডাকাত—এরা সবাই মিলে আফ্রিকান দেশের ক্রীতদাসের দলকে আড়কাটির দ্বারা ধরে নিয়ে ওই দেশে যেতো। বস্তুত, দক্ষিণ আমেরিকার ব্রিটিশ গায়না বা ফ্রেঞ্চ গায়নার ইতিহাস ত তাই! ওয়েস্ট ইন্ডিজের পর্টোরিকো বা ক্যারিবিয়নের ইতিহাসও ত এই!

এই ন্যাশন্যাল আর্কাইভস-এর বাইরে ডানদিকের স্তম্ভে পাথরে খোদিত রয়েছে সেই পুরনো কথাটি 'Enternal Vigilance is the price of liberty'। এই বাক্যটি এদেশ থেকেই ভারতে রপ্তানি হয়। এর পর একে একে দেখে যাচ্ছিলুম সুবৃহৎ 'লিংকন স্মৃতিসৌধ'। এমন বৃহৎ ও বিশাল স্মৃতিসৌধ পৃথিবীর অন্য কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। স্বদেশের আততায়ীর হাতে দুইজন জগৎ-শ্রদ্ধেয় আমেরিকান প্রেসিডেণ্ট প্রাণ দিয়েছেন—লিংকন ও কেনেডি। কেনেডির স্মৃতিসৌধটি লিংকনের মুখোমুখি পটোমাক নদীর ওপারে আর্লিংটন সিমেট্রির ঠিক মাঝখানে পার্বত্য উপত্যকার উপরে, এবং এটিও আপন বিশালতার জন্য মনে সম্ভ্রম জাগিয়ে তোলে। আর্লিংটন সিমেট্রি ভার্জিনিয়া স্টেটের মধ্যে পড়ে। এখানকার তরঙ্গায়িত উপত্যকায় হাজার হাজার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সমাধি, এবং প্রতি প্রস্তর ফলকে প্রত্যেকের নাম উৎকীর্ণ করা।

ছায়াবীথিকা. উপবন, সরোবর, বড় বড় ময়দান, ঝোপে-বাগানে-উদ্যানে-পুষ্প-শোভায় এবং সৌধশ্রেণীর কোলে-কোলে সুপ্রশস্ত সুন্দর রাজপথগুলিতে পরিভ্রমণ করে বেড়ানো অনেকটা যেন বিলাসের মতো। ময়দানের মাঝখানে ওয়াশিংটন মনুমেণ্টটি যেন শ্বেতবর্ণ কালপ্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে। সেই দূরবিস্তৃত ময়দান পেরিয়ে এক সময় এসে পৌঁছলুম ওয়াশিংটনের প্রখ্যাত জাদুঘর 'স্মিথসোনিয়ন হাউস অব মিউজিয়মে।' আমেরিকার জাদুঘরগুলিতে আমেরিকার নিজস্ব পরিচয় কম। মূর্তি বলো, চিত্র বলো, সংগ্রহশালা বলো,—সবই প্রায় বাইরের থেকে আনা। মিশরীয়, ভারতীয়, চৈনিক, মঙ্গোলিয়, ব্রিটিশ প্রভৃতি সামগ্রী অনকে বেশী। থাকার মধ্যে আছে আমেরিকার চন্দ্রযানের বিভিন্ন মডেল ও ছবি, চাঁদের মাটি ও পাথর, বিভিন্ন দেশের হীরা মুক্তা ও সামুদ্রিক বস্তু এবং বহু দেশের বহুবিধ খনিজ পদার্থ। ওদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ নীলবর্ণ হীরকখণ্ডটির নাম 'হোপ' (Hope) ডায়মণ্ড। এটির ইতিহাস নাকি বেশ ঘোরালো। পৃথিবীর বহু দেশে বহু রাষ্ট্রনেতার হাতে এটি ঘুরেছে, এবং প্রত্যেক রাষ্ট্রের সর্বনাশ ঘটিয়েছে! পরম্পরায় শুনলুম এই 'ব্লুডায়মণ্ড'টি একদা পানজাবকেশরী রাণা রণজিৎ সিংয়ের শিরোপাতেও স্থান পেয়েছিল! এই বিচিত্রবর্ণ ও বিস্ময়কর হীরকটির সম্বন্ধে যে তথ্যটি পাওয়া যায় সেটি এই:

Most notorious gem in history, the flawless Hope Diamond has left behind it a trail of so many ill-fated owners that superstitions persists about a curse.

Legend tells us, it once adorned a statue of Sita. It was stolen by a Brahmin priest, and the curse of Sita has been visited upon owners of the diamond ever since.

Mined in India, the steel-blue stone weighed 112 Carats when it reached France in 1668, with a haunting tale that thieves had

brought a Jinx upon it by plucking it from an idols eye. Gem trader Jean Baptiste Tavernier sold it to Louis XIV, who had it cut into a JX carat heart shape and dubbed it the "Blue Diamond of the Crown".

Louis XVI and Marie Antoinette inherited the Blue. During the French Revolution, Marie, shorn of gems, faced the guillotine.

In an unsolved robbery, the diamond disappeared from Paris in 1792. It re-appeared in London in 1830, in its present 44.5 Carat oval cutting ; banker Henry Hope bought it for dollar 90,000. After his death, his heirs suffered assorted scandals ; one Lord Francis Hope died penniless.

The Hope moved on. An eastern European Prince gave it to an actress of the Folis Bergere and later shot her. A greek owner plunged to his death over a precipice with his family in an auto accident, Turkish Sultan Abdul Hamid II had owned the stone only a few months when a revolt of military officers—the young Turks toppled him in 1909.

The Hope's first American owner Evalyn Walsh McLean had seen the diamond in the Sultan's harem. She purchased it, mounted as a necklace with white diamonds on the instalment plan from French Jeweller Pierre Cartier for dollar 1,80,000. Undettered by legend, she delighted in displaying it. Total accidents claimed two children ; mental illness her husband.

After Mrs. McLean's death in 1947, New York jeweller Harry Winston purchased her jewels, including the Hope. He donated the famed gem to the Smithsonian Institution in 1958. There it glitters in a burglar proof case. It charms some 30,00,000 viewers a year.

মাঝখানে একবার থমকিয়ে দাঁড়িয়েছিলুম এক অট্টালিকাশ্রেণীর সামনে। এটি 'ওয়াটারগেট' কলঙ্ক কাহিনীর কেন্দ্র। একই সারিতে ডেমোক্রাটিক ও রিপাবলিকান পার্টির দুই বৃহৎ অট্টালিকা। এরই ভিতরে ভিতরে অন্যায়, দুষ্কৃতি ও জাতীয় কলঙ্ক সর্পিল সুড়ঙ্গপথে আনাগোনা করেছিল এবং এর জন্য প্রেসিডেন্ট নিকসন গদিচ্যুত হন।

এখন ওয়াশিংটনে প্রখর গ্রীষ্মকাল, হয়ত তাপমাত্রা ৯০-এর কাছাকাছি। ওই রোদ্রের মধ্যেই গিয়ে উঠলুম পৃথিবীপ্রসিদ্ধ 'লাইব্রেরি অব কংগ্রেস'-এর বিশাল অট্টালিকায়। শুনেছি এখানে পৃথিবীর সকল দেশের সাহিত্য ও কাব্যগ্রন্থ নিয়ে ৮ কোটিরও বেশী বই সংগৃহীত রয়েছে। দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার যিনি গ্রন্থাগারিক তাঁর নাম রঞ্জন বরা। তিনি প্রথমেই সোৎসাহে আমাকে ওই গ্রন্থাগারে

নিয়ে গিয়ে আমার অনেকগুলি বই একে একে দেখালেন। অতঃপর একে একে এলেন বঙ্গভাষিণী আমেরিকান তরুণী শ্রীমতী বারবারা পেণ্টার, নিগ্রোদের হাওয়ার্ড ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক শ্যামাপদ ভট্টাচার্য, ভারতীয় সাপ্লাই মিশনের কর্মসচিব পরিতোষ ঘোষ এবং বাংলা দেশের তরুণী সুশ্রী লেখিকা দিলারা হাসেম এবং আরও দু'একজন। মিঃ বরার আপিসঘরে আড্ডা জমে উঠল। কফির পর কফি এল এবং মিঃ বরা জানালেন তিনি সহজে আমাকে ছাড়বেন না। আমাকে নিয়ে তিনি ডিনার পার্টি দেবেন তাঁর বাড়িতে। তাঁর বাড়ি এই কাছেই মাইল পঁচিশেকের মধ্যেই। সে অঞ্চলটি ওয়াশিংটনের শ্রেষ্ঠ নাগরিকদের বসবাস পল্লী, ধনী সমাজের বিলাসী জীবনের অন্যতম কেন্দ্র। যাই হোক, বিদুষী শ্রীমতী বারবারাও ওই পার্টিতে উপস্থিত থাকবেন এটি আমার পক্ষে উৎসাহের কারণ ছিল। আসবার সময়ে ওখানে দেখে এলুম লাইব্রেরি অব কংগ্রেসের এই আদিঅন্তহীন অট্টালিকার মুখোমুখি আরও দুখানা বিশাল অট্টালিকা তাঁরা নিয়েছেন।

শ্রীযুক্ত রঞ্জন বরার পূর্বপুরুষ ছিলেন বিখ্যাত ইতিহাসবিশেষজ্ঞ উপন্যাসিক এবং আই-সি-এস পরলোকগত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়। তাঁরই আত্মীয় গোষ্ঠির একটি শাখা আসামে গিয়ে বসবাস করেন। যাই হোক মিঃ বরার ডিনার পার্টিতে আমি উপস্থিত হয়েছিলুম। সেখানে ছিলেন ভারতবিশেষজ্ঞ আমেরিকান স্কলার ডঃ ডেভিড লকউড ও তাঁর স্ত্রী, ভারতীয় দূতাবাসের প্রাক্তন শিক্ষাসচিব সস্ত্রীক মিঃ হালদার, সস্ত্রীক মিঃ আনন্দ ভাটিয়া ও শ্রীমতী বরা। বলা বাহুল্য, বহু রাত্রি অবধি নৈশভোজটি জমে উঠেছিল। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে বঙ্গভাষিণী শ্রীমতী বারবারা পেণ্টারের সঙ্গে আলাপচারী করে খুশী হয়েছিলুম।

পরিতোষ ঘোষ মহাশয় আমাকে নিয়ে এলেন ভারতীয় দূতাবাসে। এখন এখানকার ভারতীয় রাষ্ট্রদূত হলেন মিঃ টি-এন-কল। এখন তিনি উপস্থিত নেই। কিন্তু দূতাবাসের মধ্যেই যিনি আমার পূর্ব পরিচিত তিনি হলেন মিঃ ইনাম রহমান। ইনি এখানে 'শিক্ষামন্ত্রীর' পদমর্যাদায় নিযুক্ত রয়েছেন। আমার পর্যটন সম্বন্ধে উনি দিল্লী থেকে কিছু নির্দেশ পেয়েছেন এবং উনি আমার খোঁজখবর রাখেন। আমার প্রস্তাবিত এবং বিস্তারিত ভ্রমণসূচী শুনে উনি বোধ করি ঈষৎ হতচকিত হয়ে শুভকামনা করলেন এবং কথা দিলেন যতদূর এবং যেখানেই যাই উনি যোগাযোগ রাখবেন। ওঁর মিষ্ট ব্যবহার উৎসাহজনক ছিল।

দূতাবাসের এই 'পশ' অঞ্চলটি দিল্লীর 'চাণক্যপুরীর' মতো। এখানে অনেক দেশের অনেকগুলি দূতাবাস দেখতে পাচ্ছিলুম। কিন্তু দিল্লীর সেই সুদূর-সম্প্রসারিত চাণক্যপুরীর তুলনায় এ অঞ্চল ক্ষুদ্র। কোনও দূতাবাসের সম্মুখভাগে দিল্লীর মতো পুষ্পবীথিভরা বৃহৎ কোনো প্রাঙ্গণ নেই। ভারতীয় দূতাবাসের বাড়িটি নিজস্ব এবং এদেশের জনসাধারণ অনেকটা নির্বিরোধ বলেই কোনও দূতাবাসে সশস্ত্র মার্কিন পুলিস বা মিলিটারি পাহারা নেই। পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই মাঝেমধ্যে মার্কিন দূতাবাসগুলি জনসাধারণের দ্বারা আক্রান্ত হয়, কিন্তু এই যুক্তরাষ্ট্রে অপর কোনও জাতির দূতাবাস সেই তুলনায় অনেকটা নিরাপদ। মার্কিন জনসাধারণ কতকটা স্বভাবশান্ত, নিয়মবাঁধা, সাতে-পাঁচে না-থাকা এবং সৌজন্যশীল। ওরা কখনও বলে না, America for Americans। ওরা তিনশ' বছর ধরে পৃথিবীকে ডাক দিয়ে বলছে, America for all। ওরা পৃথিবীর সব দেশের প্রতিভাবানদের

ডেকে আনছে টাকার লোভ দেখিয়ে, শ্রমিক সাধারণকে পুষছে পেটভরে সুখাদ্য দিয়ে, যে কোনও দেশের কারিগরীবিদকে এনে জায়গাজমি দিয়ে প্রতিপালন করছে। প্রতি ভারতীয় বা বাঙ্গালীকে ওদের সুখ্যাতিতে মুখর হতে দেখেছি। ওদের ওই 'পেণ্টাগনে' সামরিক বিভাগে অস্ত্রোৎপাদনের কাজে জনৈক বিশিষ্ট কর্মচারী রয়েছেন, তাঁর নাম মিঃ জৈন। তিনি উত্তর প্রদেশের মানুষ।

ভারতীয় দূতাবাস ছাড়াও ভারতের অপর একটি নিজস্ব অট্টালিকা দেখছিলুম। এটির নাম 'সাপ্লাই মিশন' আপিস। এখান থেকে ভারত-মার্কিন আমদানি-রপ্তানির কাজ চলে। আমেরিকা থেকে গম কেনার দায়িত্ব এখন পরিতোষবাবুর হাতে। ওখানে যে কয়জন বাঙ্গালী কর্মচারীকে দেখলুম, তাঁদের মধ্যে একজন হলেন দীপঙ্কর সরকার, ইনি দূতাবাসের অর্থনীতিক পরামর্শদাতা। এঁর পিতা ছিলেন দেশবন্ধুর আমলে বিশিষ্ট এক রাজনীতিক নেতা ও সুভাষচন্দ্রের সহকর্মী স্বর্গত হেমন্তকুমার সরকার। হেমন্তকুমার একদা আমাদের 'আড্ডায়' খুবই পরিহাসরসিক ব্যক্তি ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনি ছিলেন উজ্জ্বল এক রত্ন। দেশবন্ধু নাকি বলতেন, আমার দুখানা হাত! একখানা সুভাষ, অন্যখানা হেমন্ত!

পরিতোষ সস্ত্রীক থাকেন টলেডো প্লেসে একটি অ্যাপার্টমেণ্টে। এটি মেরিল্যাণ্ডের মধ্যে পড়ে। ওঁর সুশিক্ষিতা ও সুন্দরী স্ত্রী শ্রীমতী সবিতার রান্না অতি উপাদেয় এবং ওঁর হাতে প্রস্তুত নিখুঁৎ মিষ্টান্নসম্ভার 'সাপ্লাই মিশন' মারফৎ ভারতে পাঠালে ভারতীয়রা 'খাঁটির' স্বাদ পেতে পারে! সবিতা সুগৃহিণী।

বাঙ্গলাদেশ' দূতাবাসের ফার্স্ট সেক্রেটারি সুদর্শন শ্রীমান জয়চৌধুরী ওরফে 'আনোয়ারুল করিম চৌধুরী আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে উঠেছিলেন। তিনি এসে আমাকে নিয়ে গেলেন বাঙ্গলাদেশের রাষ্ট্রদূত সৌম্যশ্রী মিঃ হোসেন আলির বাসস্থানে। উনি আমার খুবই পরিচিত। বিগত বাঙ্গাদেশের মুক্তি-যুদ্ধের কালে কলকাতায় আমার বাসস্থানের নীচের তলায় 'মুক্তিযোদ্ধাদের' যে একটি 'ঘাঁটি' প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল, হোসেন আলি এটি জানতেন। তিনি তখন বাঙ্গলা-দেশের হাই কমিশনার। তৎকালে তাঁর আপিসে আমার যাতায়াত ছিল। আজ চার বছর পরে আবার দেখা। বলা বাহুল্য, আলি সাহেব ভূরিভোজের ব্যবস্থা করলেন।

নিউ ইয়র্কে যেমন শতসহস্র শততল অট্টালিকা, যাদের নিচে দাঁড়ালে আকাশ বা নক্ষত্র দেখা যায় না,—শুধু দেখা যায় কোটি কোটি বিদ্যুতের আলো আমার দশদিকে অত্যুগ্র তেজে অনির্বাণ জ্বলছে,—ওয়াশিংটনে সেটি হয়নি। আকাশ এখানে অবারিত, এ নগর আত্মসমাহিত এবং সৌন্দর্যের নন্দন কানন। না আছে উগ্রতা, না জনকলরব, না রেডিয়োর চিৎকার, না বা কোনও গাড়ির আওয়াজ। শত শত গাড়ি চলছে প্রতি মিনিটে, কিন্তু না আছে এতটুকু শব্দ, না একটিও হর্নের আওয়াজ। যুক্তরাষ্ট্রে ১১ কোটি ১৫ লক্ষ সংখ্যক শুধু প্রাইভেট কার, এবং পেট্রল পোড়ে প্রতিদিন ১৭ মিলিয়ন গ্যালন। কিন্তু ট্রাফিক নিয়ম পালনের প্রতি যে একান্ত নিষ্ঠা দেখতে পাচ্ছি, এটি অভাবনীয়। একদিন সন্ধ্যায় ওই ট্রাফিকের ভিতর দিয়ে যাচ্ছিলুম ওয়াশিংটনের এক ধনাঢ্য পল্লীতে এক সাহিত্য ও কাব্যসভাকেন্দ্রিক 'ককটেইল' পার্টিতে। যিনি এই সভার আয়োজন করেছিলেন তাঁর প্রাসাদ-অলিন্দে, সেই মহিলা কাব্যরসিকা এবং উৎকৃষ্ট অতিথি-সেবিকা। তাঁরই উৎসাহে দু'তিনটি তরুণী কবি বহুবিধ রুচিকর 'চাট' প্রস্তুত করেছিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই লক্ষ্য করে দেখলুম

সম্মিলিত কবিকুলের হাস্যকলরবটাই প্রধান, কাব্য আলোচনাটা গৌণ। সুতরাং চারিদিকের এই শ্বেতাংগ কবিদলের মাঝখানে বসে মিনিট পনেরোর মধ্যে আমার ভিতরের গাম্ভীর্য ঠেলে এক চঞ্চল তরুণ যুবা বেরিয়ে এল! সে দু'কথায় নস্যাৎ করে দিল ওদের ওই শৌখীন গদ্য কবিতা। সে ওদেরকে বোঝাতে লাগল দুঃখ যন্ত্রণা ও বেদনাবোধ থেকে যে কবিতার জন্ম ঘটেনি, যার মধ্যে হৃৎপিণ্ডের রক্তের দাগ নেই, তাকে স্বতোৎসারিত কবিতা বলতে বাধে। যে কবিতা প্রকৃত অনুপ্রাণনা বহন করে, সে নিজের প্রকাশের ভাষাও সংগে আনে।

সবসুদ্ধ সাত আটজন কবি ঘিরে ধরেছিল। ওদের মধ্যে মেয়েকবি তিনটি। দুটি মেয়ে নিজেদের গাত্রাবরণ সম্বন্ধে সংস্কারমুক্ত। তিনটি যুবক চেয়ার ছেড়ে মেঝের উপর পা ছড়িয়ে বসল। এরা সবাই ধনাঢ্য পরিবারের সন্তান। বোধ হয় আমাকে ওরা মনে করেছিল, আমি মস্ত কাব্য বিচারক। সেইজন্য একজন অন্যজনকে ঠেলাঠেলি করে নিজের নিজের কবিতা পড়তে লাগল। 'নিরংকুশা কবয়ঃ!' সুতরাং সামনের দুটি কবি-মেয়েও পানাদির ফলে ঈষৎ অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল।

আমেরিকান অ্যাকসেণ্ট, স্কচদের ইংরেজি উচ্চারণ, চট্টগ্রামের বাংগলা সংলাপ—এগুলি আমার কাছে যথেষ্ট সুবোধ্য নয়। তবু কয়েকটি কবিতা মন দিয়ে শুনলুম। না, এমন কিছু নয়! ভংগী আছে, কাব্য খুঁজে পাইনে।—আমার কথায় ওদের মধ্যে হাসির রোল উঠল। ওই হট্টগোলের ভিতরেই আমার পকেটে একটি কাগজ গুঁজে দিয়ে একটি মেয়ে-কবি বলল, এ কবিতাটি নিশ্চয় পড়বেন। He's my "honey"।

রাত নটায় ওদের ওখানে গিয়েছিলুম, ব্রুকভিলের বাড়িতে এসে যখন পেঁছিলুম, রাত দুটো বাজে। পকেট থেকে কাগজটি বার করে কবিতাটি পড়তে বসলুম।

"Not an unhappy man/but one who could not stand/in the silence of his mind/the cathedral/emptied of its ritual/and sounding about his ears/like a whirlwind.

"He cradled the child a while/then set her down nearby/and spoke in a tongue of flame/near the Pentagon/where they had no doubt.

"Other people's pain can turn so easily/into a kind of play./ There's beauty/in the accurate trajectory. Death conscripts the mind/ with its mysterious precision."—David Ferguson.

এটি ভিয়েৎনাম যুদ্ধে আমেরিকার শোচনীয় পরাজয়ের পর লেখা। সর্বাধুনিক আমেরিকান লেখকদের মধ্যে এই পরাজয়ের প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। আপাতত এই পর্যন্ত। ইতি--

॥ ৫ ॥

ক্লীভল্যান্ড
(ওহাইয়ো)
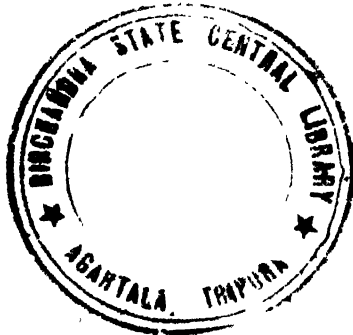
প্রিয়বরেষু,

এক গামলা দুধের ওপর যদি এক মুঠো কালো জিরে ছড়িয়ে দেওয়া যায়, তবে ঠিক সেই চেহারা দাঁড়ায় নিগ্রোপ্রধান ওয়াশিংটনের। রাজধানী ওয়াশিংটনে যেন ওদেরই আধিপত্য বেশি। ওদেরই মেয়র, ওদেরই পুলিস চীফ। ওরা প্রধানত নগরকে কেন্দ্র করে নিজেদের পাড়া রচনা করে। ওদের পাড়ায় সাহেব-মেমরা থাকে না এবং সাহেব পাড়াতেও ওদের ফ্যামিলি খুঁজে পাওয়া যায় না। নিগ্রোদের ধারণা তারা বঞ্চিত, উপেক্ষিত এবং পরোক্ষভাবে তারা শ্বেতাঙ্গদের দ্বারা উৎপীড়িত। এইরূপ পরিস্থিতির প্রতিকার করতে গিয়েছিলেন প্রেসিডেন্ট কেনেডি নিগ্রোদের পক্ষ নিয়ে, --কিন্তু তাঁকে হত্যা করা হয়। এই হত্যাকান্ড নিয়ে আজও কোনও মামলাকে দানা বাঁধতে দেওয়া হয়নি—কারণ, খুনীকে এবং খুনের সাক্ষীকেও খুন করা হয়েছে! আমেরিকান সমাজের বড় একটা অংশের বিশ্বাস কেনেডির অপমৃত্যুর জন্য সি-আই-এ দায়ী। কেননা শ্বেতাঙ্গর দ্বারা পরিচালিত সি-আই-এ নিগ্রোবিরোধী। এতদ্-সত্ত্বেও কেনেডির মৃত্যুর পর 'সিভিল রাইটস্ বিলটি' পাস হয় এবং তার ফলে নিগ্রোরা আমেরিকার পরিপূর্ণ নাগরিক অধিকার লাভ করে। নিগ্রো সমাজের যিনি 'গান্ধী' ছিলেন, সেই মার্টিন লুথার কিংকেও অদৃশ্য আততায়ীর হাতে প্রাণ দিতে হয়েছিল।

আমি ওয়াশিংটনের এখানে-ওখানে পরিভ্রমণ করছিলুম।

তরুণ সুদর্শন চিকিৎসক ডাঃ মদন গোপাল মুখার্জি একদিন আমাকে নিয়ে গিয়ে তুললেন 'হরেকৃষ্ণ' সম্প্রদায়ের একটি কেন্দ্রে। শ্রীমান মদন ভক্তি ভাবনায় তদ্‌গত। এখানে ওঁদের তিনতলা সুন্দর বাড়িটি একটু অপরিসর। তবু মুণ্ডিত-মস্তক, শিখাধারী ও গৈরিকবাস কয়েকজন সৌম্যদর্শন শ্বেতাঙ্গ এই বাড়িটির মধ্যে এমন একটি 'নবদ্বীপধাম' রচনা করেছেন, যেটি দৃশ্যত খুবই শুচিশোভায় সমৃদ্ধ। ধূপ, ধুনো, ফুল, চন্দন, মঙ্গল ঘট, পূজা-অর্চনা, ঘরে ঘরে শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণ রাধা, দশমহাবিদ্যা, মহাদেব-পার্বতী—এঁদের পট ঝুলছে দেওয়ালে-দেওয়ালে। এই পটভূমির মাঝখানে একটি ছোট সিংহাসনে যাঁর ছবি অলঙ্কৃত করে পূজা নিবেদন করা হচ্ছে, তিনি হলেন প্রভুপাদ অভয়চরণ দাস। এটি পট নয়, বর্ণাঢ্য ফটোগ্রাফ। অভয়চরণের মুখচ্ছবি আমাকে যথেষ্ট পরিমাণে অনুপ্রাণিত করেনি। কিন্তু আমেরিকার বিভিন্ন স্টেটে আমেরিকানদের দ্বারায় এমন একটি ভক্তসম্প্রদায় গড়ে তোলার মধ্যে এক বাঙালীর অনন্যসাধারণ শক্তিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। আমার ধারণা, অভয়চরণের হাতে এক আশ্চর্য যাদুদণ্ড আছে। আমেরিকাকে তিনি মোক্ষ-লাভের পথ দেখাচ্ছেন!

ইউরোপের তুলনায় আমেরিকায় উপাসনা মন্দির কমই। যেগুলি আছে সেগুলিতে রবিবারেও ভিড় হয় না। ধর্মযাজকদের উপার্জন, তাঁদের পরিবার পরিচালনা, গির্জা বা সিনাগগের বিভিন্ন খাতের খরচ পত্রাদি—ইদানীং এগুলির সংকুলান হয়

না। একটি বিবাহ দিতে পারলে অন্তত ২৫ ডলার 'ফি' পাওয়া যায়। কিন্তু ছেলে-মেয়েরা আজকাল প্রথামতো বিয়ে না করে, গির্জার খাতায় নাম সই না করে—আগে ভাগেই ঘরকন্না আরম্ভ করে দেয়! ধরো যদি ছ' মাসের মধ্যেই বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে তবে ওই ২৫ ডলারই লোকসান! তাছাড়া আরেক কথা। আমেরিকা আপন শক্তিবলে চন্দ্ররহস্য ভেদ করেছে, এবারে তার বিজ্ঞান ঈশ্বররহস্যও ভেদ করবে সন্দেহ নেই! সুতরাং গির্জায় গিয়ে অত সময় নষ্ট করা কেন? চন্দ্রাভিযানের সাফল্য দেখে পেশাদার পাদ্রীরা যেন ঈষৎ মনঃক্ষুন্নই হয়েছেন। ফিলাডেলফিয়া বা নিউ ইয়র্ক শহরের বাঙালীরা যে গির্জার মধ্যে দুর্গাপূজো করে যাচ্ছেন,—পাদ্রীদের পক্ষে এই 'বিধর্মী পৌত্তলিকতা' মেনে নেওয়ার পিছনে টাকাকড়ির লেনদেন আছে কিনা সেই খোঁজ আমি নিইনি। সে যাই হোক, সমগ্র আমেরিকা ও কানাডা ভ্রমণকালে লক্ষ্য করেছি গির্জা, সিনাগগ, ওল্ড বা নিউ টেস্টামেণ্ট অথবা খৃষ্টধর্ম নিয়ে মাথা ঘামাবার লোক কম। ওদের পুরনো ইতিহাস এই কথা বলে, ইউরোপের প্রটেস্টাণ্ট গির্জার অতিশয় শাসন ও উৎপীড়নে অস্থির হয়ে 'পাইয়োনীয়ার্সের' একটা বড় দল আমেরিকায় পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়। এই প্রসঙ্গে Statue of Liberty-র জাদুঘরে রক্ষিত কবি শ্রীমতী এম্মা ল্যাজারাসের কবিতাটি আমার মনে পড়ে।

এর আগে হোয়াইট হাউসের চারিদিক ঘুরে শ্বেতবর্ণ অট্টালিকাই দূর থেকে দেখে গেছি, এবং ব্লেয়ার্ড হাউসের দিক থেকে ওটাকে অনেকটা একতলা বাড়ি বলেই মনে হয়েছিল। কিন্তু এবার ছাড়পত্র নিয়ে ওর ভিতরে গিয়ে ঢুকলুম। আমি একা নই, দর্শক সংখ্যা অনেক। প্রেসিডেণ্ট ফোর্ড তখন বাড়ির মধ্যেই আছেন। তখন মধ্যাহ্নকাল। সোপানশ্রেণী অতিক্রম করে ভিতরে ঢুকে আমার ভুল ভাঙলো। না, একতলা নয়, কিন্তু কয়তলা—তাও জানিনে। চারিদিকের সোনালী চিত্রকলা, বিচিত্র অলংকরণ, রক্তনীল কার্পেটের ধারে-ধারে স্বর্ণরজ্জুর সীমানা নির্দেশ, মেহগনির অতি প্রাচুর্য—মাঝে মাঝে একটু যেন দিশাহারা হচ্ছিলুম। সর্বত্র বিপুল বৈভবের অন্তহীন সজ্জার সঙ্গে বৈজয়ন্তী শোভা যেন একাকার হয়ে রয়েছে। সর্বাপেক্ষা ধনাঢ্য দেশের সর্বোচ্চ ব্যক্তির বাসস্থান! একতলা থেকে দেড়তলা, সেখান থেকে উঠতে উঠতে এই সুবৃহৎ রাজপ্রাসাদের আড়াইতলা—আমি যেন মুগ্ধ মনে এক স্বপ্নরাজ্যের ভিতরে-ভিতরে বিচরণ করছিলুম। এক সময় থমকিয়ে দেখলুম, এক স্বর্ণরজ্জুর দ্বারা তিনতলার সিঁড়ির পথ আগলানো। ওরই মুখে এক গার্ড দাঁড়িয়েছিল। ভারতীয় ক্ষীণকণ্ঠে তাকে প্রশ্ন করলুম, প্রেসিডেণ্টের সঙ্গে একবারটি দেখা করা যায় না?—লোকটি আমার দিকে আপাদমস্তক একবার তাকালো। পরে প্রসন্ন কণ্ঠেই বলল, তিনি এখন রান্নাঘরের কাজে ব্যস্ত (kitchen business)। এখন লাঞ্চটাইম।

ফিরবার সময় ভিতরের বাগান পেরিয়ে আসছিলুম। হোয়াইট হাউসের কয়েকজন রক্ষী বিশেষ পুলিস পোশাকে বাইরের পথে পাহারা দিচ্ছিল। ওদের মধ্যে একটি যুবক ছিল পরম রূপবান ও সুশ্রী। আমি তার মুখের সামনে এসে হাসিমুখে দাঁড়ালুম। বললুম, তোমাদের প্রেসিডেণ্টের অনেকগুলি ছবি আমি দেখেছি। বিদেশী আমি। আমার ধারণা, তুমি তাঁর চেয়ে অনেক বেশি সুশ্রী।

যুবকটি প্রথমটা হকচকিয়ে গিয়েছিল, পরে খুব হেসে উঠল। বলল, থ্যাঙ্ক ইউ, স্যার।

—তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তোমার শ্বশুর খুব ভাগ্যবান!

শ্বশুর!—হো হো করে যুবকটি আবার হেসে উঠল, —'am not married!

হাসিমুখে আমিও চলে গেলুম। ছেলেটা তখনও হাসছিল আমার পিছন দিকে।

ওয়াশিংটনে বিশেষ-বিশেষ কাজ নিয়ে বহু বাঙ্গালী আছেন। কিন্তু আমেরিকান গভর্নমেণ্টের দপ্তরে কোনও ভারতীয় আছেন কি না খবর পাইনি। থাকলে বিস্মিত হবো না। হাজার হাজার ভারতীয় আছেন যাঁরা পাঁচ বছর একাদিক্রমে কাটিয়ে ওদেশের নাগরিক হয়েছেন এবং ভোটাধিকার পেয়েছেন। তাঁদের নাম আমেরিকান ইণ্ডিয়ান। কানাডিয়ান ইণ্ডিয়ানও অনেক আছেন। 'গ্রীন-কার্ড' সংগ্রহ করে 'রেসিডেন্সিয়াল পারমিট' নিয়ে স্থায়ীভাবে বাস করছেন, এমন বহু সহস্র ভারতীয় বা বাঙ্গালী আছেন। অনেকে 'আমেরিকান সিটিজেনশিপ' ত্যাগ করে পুনরায় 'ভারতীয় নাগরিক' হয়েছেন এমন উদাহরণও প্রচুর। আর্থিক সৌভাগ্য অর্জনের এমন উদার ক্ষেত্র আমেরিকার মতো অন্য কোথাও নেই। ইদানীং বিধিনিষেধের কড়াকড়ির ফলে ভারতীয় প্রমুখ বহু জাতির নরনারী কানাডার খিড়কি দরজা দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করছে সঙ্গোপনে। বহু ছাত্র সুকৌশলে স্বদেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সার্টিফিকেট আদায় করে নিজের খরচে ওদেশে পড়তে যায় এবং বছর তিনেকের মধ্যে নিজেদের সম্প্রদায়ের সহায়তায় পাকা ব্যবসায়ী হয়ে বসে পড়ে। এরা কেউ বাঙ্গালী নয়। বাঙ্গালীরা ওদেশে স্ব-গৌরবে বাস করে।

ব্রুকভিল থেকে প্রায় ৪০ মাইল দূরে বিরাট শিল্পনগরী বল্টিমোরে একদিন গিয়ে উপস্থিত হলুম। এটি বোধ করি লৌহনগরী। ইনজিনিয়ার ও শিল্পপতিদের মস্ত বড় একটি কেন্দ্র। মাকড়সার জালের মতো চারিদিকে ফ্লাইওয়ের সেতু। অসংখ্য কলকারখানা এবং শ্রমিকদের অগণ্য অট্টালিকায় আকীর্ণ। এদেরই একান্তে নগরের অন্য পারে বন-বাগানে ভরা একটি বসবাসপল্লীতে যিনি একটি বন্ধু সম্মেলনের আয়োজন করেছিলেন তাঁর নাম সুব্রত ব্যানার্জি। ওখানে রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়েছিলেন কলকাতার এক অন্ধগায়ক স্বপন গুপ্ত। বল্টিমোরে বিশিষ্ট বাঙ্গালী যাঁরা আছেন, তাঁরা নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। আমার সঙ্গে ছিলেন ডক্টর অরুণ গুহ, পরিতোষ ঘোষ এবং ডাঃ মদনগোপালের স্ত্রী।

অপর একটি ভোজসভার আয়োজন করেছিলেন 'ভয়েস অফ আমেরিকার' কর্মাধ্যক্ষ রমেন পাইন মহাশয়। তিনি ওয়াশিংটনে নানা জায়গায় রবীন্দ্রসঙ্গীত, নাটক ও একাধিক নৃত্যনাট্যের আয়োজন করে থাকেন। আমাকে দিয়ে তিনি একটি ভাষণ টেপরেকর্ড করিয়ে নিলেন—যেমন নিয়েছিলেন ডাঃ রেণুকা বিশ্বাস, অরুণ, পরিতোষ ও সবিতা। বহু স্টেটের বন্ধুরাও এ ব্যাপারে আমাকে মুক্তি দেননি। অনেকে আমার আবৃত্তির কথা আগে থেকে জানতেন।

'তানতেরাওয়ে' এবং ব্রুকভিল গ্রামে শত শত পরিবারের অট্টালিকার মতো বাংলোগুলি দেখছিলুম। কিন্তু কোথাও কোনও নরনারীর উচ্চকণ্ঠ বা কলরব শুনিনি। চারিদিক শান্ত নিশ্চুপ। মাঝে মাঝে রঙীন পাখিদের ডাক, কখনো কখনো মেপল, পাইন, ওক আর বার্চের বনে মিহি মর্মরধ্বনি শোনা যায়। মাঝে মাঝে কালো মেঘে আকাশের এক-এক প্রান্ত ঢাকা পড়ে। এবার আমি মেরিল্যাণ্ড স্টেট ছেড়ে যাব।

এরই মধ্যে একদিন আমার বন্ধু শুভেন্দ্র মিত্র মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী অলকানন্দা পাল তাদের ওখানে নৈশভোজে আমন্ত্রণ করেছিল। এই মেরিল্যাণ্ডের মধ্যেই কয়েক

মাইল দূরে তাদের বাসস্থান। অলকা এবং ওর স্বামী দিলীপ উভয়েই কৃতী ইনজিনিয়ার। যতদূর মনে পড়ছে বাঙগালী মেয়েদের মধ্যে অলকাই প্রথম বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে ইনজিনিয়ারিং পরীক্ষায় পাস করে। অলকার সহোদর শিখীন্দ্র মিত্রও একজন ইনজিনিয়ার। সে থাকে নিউ ইয়র্কে। সেদিন সন্ধ্যা রাত্রে ওদের ঘরোয়া পরিবেশে এবং শ্রীমান দিলীপকুমারের আতিথেয়তায় খুবই আনন্দে কেটেছিল।

ওখানে স্বামী-স্ত্রী যেমন একজোড়া ইনজিনিয়ার, তেমনি একজোড়া স্বামী-স্ত্রী দাঁতের ডাক্তার—এও দেখেছি শিকাগোর সাউথ অ্যাশল্যান্ড বুলেভার্ডে। ওদের নাম ডাঃ মিনতি ও ডাঃ সব্যসাচী মুখার্জি। ওরা দুজনেই কৃতী এবং এক প্রাসাদোপম অট্টালিকার অ্যাপার্টমেণ্টে বাস করে। বলা বাহুল্য, ওদের উপার্জনের পরিমাণ শুনলে ডেণ্টিস্ট ডাক্তাররা কিছু অস্বস্তি বোধ করতে পারেন। আগেই বলেছি চিকিৎসক এবং আমেরিকান আইনজীবী—এই উভয় সম্প্রদায়ের রাজরাজত্ব এদেশে।

অরুণ তার বন্ধুদলকে একদিন আমন্ত্রণ জানালো। এই সুযোগে যে বিশিষ্ট, উচ্চশিক্ষিত ও কৃতী বাঙগালী সমাজের নরনারীকে দেখলুম, তাঁরা এসেছেন দূরদূরান্তর থেকে। অর্থাৎ যে তিনটি স্টেট গায়ে-গায়ে মিশে রয়েছে যথা মেরিল্যান্ড, ওয়াশিংটন ডি-সি ও ভার্জিনিয়া,—এইসব অঞ্চল থেকে পঞ্চাশ, একশ' বা দেড়শ' মাইল পথ পেরিয়ে তাঁরা এসে হাজির হয়েছেন। এই দূরত্বের জন্যই তাঁরা মধ্যাহ্ন ভোজে জড়ো হয়েছিলেন। কিন্তু এই আনন্দভোজের আয়ুষ্কাল ছিল মোট ৮ ঘণ্টা। দুপুর ১২টায় আরম্ভ এবং ওঁরা যখন বিদায় নিলেন তখন সন্ধ্যা ৮টা। ওই ৮ ঘণ্টা অবধি আমাকে একইভাবে বসে থাকতে হয়েছিল বউ-ভাতের বধূ-প্রদর্শনীর মতো। তাঁরা সবাই জন্মভূমি থেকে বহুদিন বিচ্ছিন্ন, অনেকে এদেশের নাগরিক, অনেকের ছেলেমেয়ে ইংরেজি ছাড়া বাংলা জানে না,—তাদের বন্ধুবান্ধব প্রায় সবাই শ্বেতাঙ্গ। অনেকে শুনতে চান ভারতের বর্তমান অবস্থা, ভারতীয় রাজনীতিক নেতৃবর্গের কথা, ভারতীয় সংস্কৃতি ও সাহিত্য, হিমালয়ের আলোচনা, আধুনিক সাহিত্যের ইতিবৃত্ত ইত্যাদি। ভারতীয় সংবাদপত্রাদির সঙ্গে তাঁদের পরিচয়ও কম। ওঁদের মধ্যে মহিলাদের ঔৎসুক্য যেন আরও বেশি। আমি যেন আমার আসন ছেড়ে না উঠি, না পালাই—ওঁরা সেজন্য বার বার আমার মুখের কাছে খাবার এনে ধরছিলেন। বলা বাহুল্য, কেউ কেউ আমার কথাগুলি টেপ-রেকর্ড করেও নিচ্ছিলেন। ৬০।৭০ জন পুরুষ ও মহিলার এই আগ্রহ ও অভ্যর্থনা আমাকে অভিভূত করেছিল। লক্ষ্য করছিলুম সুদূর প্রবাসে থেকেও এঁরা বাঙগলা সাহিত্যকে ভোলেননি।

মেরিল্যান্ড থেকে যেদিন বিদায় নেবো, সেদিন সন্ধ্যার আকাশে দেখি ঘনঘটা। আবহাওয়া আপিস থেকে খবর পাওয়া গেল, পূর্বাকাশের দিক থেকে নাকি ঘূর্ণী-বাত্যা আসন্ন। আমি যাব উত্তর-পশ্চিমে, সুতরাং আমার ভয় কম। ওটি ছিল আমার বৃহত্তর ভ্রমণের প্রথম পর্যায়। ইরি সমুদ্রের বা হ্রদের দক্ষিণ কূলবর্তী ক্লীভল্যান্ড নামক শহর আমার গন্তব্যস্থল। ওটি ওহাইয়ো স্টেটের অন্তর্গত। যাই হোক, সেই ঘন মেঘাকুল রাত্রি নয়টায় অরুণ এবং পরিতোষ আমাকে গাড়িতে তুললেন। বোধ হয় মাইল কুড়ি পথ। আধ ঘণ্টার মধ্যে যখন ওয়াশিংটন জাতীয় বিমানঘাঁটিতে এসে পেঁছলুম তখন চারিদিকের বর্ণাঢ্য ও বৈভব-আকীর্ণ বিশালতা দেখে আমি কিছুক্ষণ হতবুদ্ধি হয়েছিলুম। এই ইন্দ্রপুরীর ভিতরে কোথা দিয়ে কোন্ দিকে নিয়ে গিয়ে অবশেষে ওরা আমাকে বিদায় সম্ভাষণ জানালো, আমি

মনে করতে গেলেও বিভ্রান্ত হই। আমার টিকিট ওরিয়েণ্ট এয়ারওয়েজের এবং বিমানটির নাম 'নর্থ ওয়েস্ট ওরিয়েণ্ট'। যখন দূর আকাশে বিমানটি উঠে গেল, নিচের দিকে চেয়ে দেখি, যেন নানাবর্ণের কোটি কোটি দ্যুতিমান হীরকখণ্ডের বিচ্ছুরিত আভায় পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ রাজধানী দিগদিগন্ত প্রসারিত ওয়াশিংটন দপদপ করে জ্বলছে। আমার জেটবিমানটি এক সময় অন্ধকার শূন্যে মিলিয়ে গেল। এইরূপ অন্তর্দেশীয় বিমানগুলির মালিক হলেন এক-একজন শিল্পপতি—যাঁরা হাজার হাজার কোটি ডলার নিয়ে কারবার করেন এবং যাঁদের কাজে লক্ষ লক্ষ কর্মী নিযুক্ত। প্রকৃতপক্ষে ফেডারাল গভর্নমেণ্টের হাতে এই কারবারে শতকরা ৫ ভাগের বেশি মালিকানা নেই। অন্তর্দেশীয় বিমানের সংখ্যা কত হাজার আমি খোঁজ করিনি। কিন্তু শত শত 'কারগো' বিমান দিবারাত্র অন্তর্দেশীয় রসদ আমদানি ও রপ্তানির কাজে নিযুক্ত থাকে—যারা দুধ মাখন ফল সব্জি মাংস রুটি এবং বিবিধ মনোহারী ও পোশাকপত্র আমেরিকার সকল শহরে সর্বদা জোগান দিতে থাকে। সমুদ্রে, পাহাড়ে, অরণ্যে, মরুভূমিতে, জনবিরল কোনও দুর্গম অঞ্চলে—যেখানেই তুমি থাকো, তোমার হাতের কাছে যে কোনও সামগ্রী পেঁছে যাবে। লাসভেগাসের মতো মরু-অঞ্চলেও তোমার সম্মুখবর্তী সুবৃহৎ শপিং সেণ্টারে তোমার জন্য তাজা সব্জি, দুধ ও মাংস প্রস্তুত রয়েছে। এই বিশাল ভূভাগে শিল্পপতি বা ধনপতিদের এই অত্যাশ্চর্য সরবরাহ পরিচালনা তোমার মনে প্রতিটি পদক্ষেপে একটি বিশ্বাস ও নির্ভরশীলতা জাগিযে তুলবে।

মধ্যরাত্রির একটু পরে উপর থেকে ক্লীভল্যাণ্ড নগরের আলোকমালা দৃষ্টিগোচর হল এবং মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই বিমানখানি নেমে এল। এই প্রথম আমি একা। মধ্যরাত্রে এই অজানা দেশের সর্বব্যাপী অপরিচয়ের মধ্যে যদি সামনে এসে কেউ না দাঁড়ায়, তারই একটা অস্বস্তিকর ভাবনা আমাকে পেয়ে বসেছিল। কিন্তু সে অল্পকাল মাত্র। বাইরের দিকে এসে দাঁড়াতেই যিনি এগিয়ে এলেন তিনি ইঞ্জিনিয়ার এবং ব্যাচিলর রণজিৎ দত্ত। গত বছর উনি কলকাতায় থাকাকালীন আমার বাসস্থানে গিয়ে আমাকে আমন্ত্রণ জানান। মাত্র ঘণ্টাখানেকের সেই পরিচয়।

উনি হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানিয়ে আমাকে গাড়িতে তুললেন। ওঁর সহোদরা এক ভগ্নী গাড়িতে অপেক্ষা করছিলেন। সুতরাং তিনজনে গল্পমুখর হয়ে আমরা হাইওয়ে ধরে প্রায় ৩৫ মাইল পথ অতিক্রম করে তাঁর বাসস্থান 'নেলাক্রেস্টের' দিকে অগ্রসর হলুম। কিন্তু যেখানে আমাকে ওঁরা নিয়ে এলেন সে অঞ্চলের নাম 'ওয়ারেন্সভিল হাইটস', নেলাক্রেস্ট থেকে কিছু দূরে। যে ছোট দোতলা বাড়িটির সামনে এসে দাঁড়ালুম, তারই দরজা খুলে যে তরুণবয়স্ক দম্পতি সহাস্যে আমাব সামনে এসে দাঁড়াল তাদের নাম ডক্টর স্মৃতিময় ও শ্রীমতী নন্দা দত্ত। মেয়েটি তৎক্ষণাৎ হাসিমুখে নিজের পরিচয় দিয়ে বলল, আমি আপনার বন্ধুর মেয়ে! আমার বাবা হলেন ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়।

অর্থাৎ রাত দেড়টার সময় জামাইবাড়ি এসে ঢুকলুম! স্মৃতিময় ওরফে শ্রীমান রাহুল ও নন্দা অতিথি আপ্যায়নে তৎপর হয়ে উঠল। রণজিৎ ও রাহুল—এরা খুল্লতাত সুবাদে দুই ভাই। রাহুলের এখানেই আমি দুটি রাত কাটাবো। রণজিতের ওখানে তাঁর দুই ভগ্নী এসে উঠেছেন।

রাহুল কৃতী ইনজিনিয়ার। ওদের পাঁচ বছরের একটি শিশুকন্যা রয়েছে। নাম

শ্রীমতী রূপা। এখানেই ওরা একটি বাড়ি কিনতে চায়। শ্রীমতী নন্দার মিষ্ট ব্যবহারে ও সৌজন্যে আমি আনন্দ পাচ্ছিলুম। আমাদের সকল কথাবার্তায় ডক্টর নীহাররঞ্জনের ছায়াটাই দাঁড়িয়েছিল।

ক্লীভল্যান্ড নগরের শান্ত ও প্রাকৃতিক শোভাসম্পন্ন পরিবেশটি মনোরম। উত্তর যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম সুবৃহৎ গির্জাটি এখানে দ্রষ্টব্য বস্তু। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাড়া—যেটিকে বলা হয় ক্যামপাস, সেটি বহুদূর অবধি প্রসারিত। একটির পর একটি বিভিন্ন ফ্যাকালটির কলেজ—যেখানে ভারতীয় ছাত্রসংখ্যাও কম নয়। পথে-পথে অট্টালিকাশ্রেণী—যতদূর দৃষ্টি যায়। একটি বিশাল সরোবরের ঠিক সামনে যে বিরাট জাদুঘর—যেটি দেখতে গেলে সোপানশ্রেণী অতিক্রম করে যেতে হয়, তার সম্পদও প্রচুর। এর ভিতরে আমেরিকার নিজস্ব দর্শনীয় বিশেষ কিছু নেই। সবই প্রায় বাইরে থেকে সংগ্রহ করে আনা। মিশর, চীন, ভারত, কিছু পুরনো ব্রিটিশ, কিছু বা মধ্যপ্রাচ্যের—এই সব অঞ্চলের সামগ্রীই বেশি। ভারতীয় বৌদ্ধযুগের বহু ভাস্কর্য এখানে সযত্নে রাখা। আমি ঘুরে ঘুরে নানা কক্ষের সামগ্রী সম্ভার দেখছিলুম।

প্রাকৃতের বিভিন্ন সম্পদ উত্তর আমেরিকাকে পৃথিবীর ধনাঢ্যতম মহাদেশে পরিণত করেছে। হাজার হাজার বছর ধরে যে অনধ্যুষিত ভূভাগের উর্বর মাটিতে কোনও যুগে চাষবাস হয়নি, সেই জমি মাত্র তিনশ' বছর ধরে কর্ষণ করা হচ্ছে। সেই ভূভাগ আজও বহুলাংশে 'ভার্জিন' রয়ে গেছে। এ দেশের মাটির তলায় আরও কোথায় কি সম্পদ আছে, তাও সম্পূর্ণ দেখা হয়নি। বোধ হয় সেই কারণেই আমেরিকার প্রতি আকর্ষণ পৃথিবীর সর্বত্র। এই ক্লীভল্যান্ডের বা ওহাইয়ো স্টেটের প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যের আকর্ষণে এই সেদিনও ইউরোপ ছেড়ে এসেছে হাজার হাজার শরণার্থী। ডাউন-টাউনের ওদিকে গিয়ে দেখতে পাচ্ছি ১৯৫৬ সালের হাঙ্গেরীয় অভ্যুত্থানের কালে কমিউনিস্টবিরোধী একটা বৃহৎ দল এখানে এসে জায়গা নিয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের কালে হিটলারের দুর্দান্ত দানবীয় তাড়নায় পর্যুদস্ত হয়ে ইউরোপের হাজার হাজার পরিবার এখানে এসে নিরাপদ আশ্রয় লাভ করেছে। এসেছে দলে-দলে রাশিয়ান ও পূর্ব ইউরোপের বিভিন্ন দেশের অধিবাসী—যাদের সঙ্গে কমিউনিস্ট ব্যবস্থার মিল ঘটেনি। এখানে এসেছে বিরাট একটা ইহুদী গোষ্ঠী- যারা আমেরিকান অর্থনীতির পথ ধরে ওহাইয়ো স্টেটে নগর বসিয়েছে, বড় বড় শিল্পকেন্দ্র স্থাপনা করেছে, বিরাট আয়তনের শপিং সেণ্টার বানিয়েছে, যানবাহনের দায়িত্ব নিয়েছে, একটির পর একটি পৌর এলাকা নির্মাণ করেছে। এরা এখন হয়ে উঠেছে আমেরিকান। কিন্তু আজও এই রেফুজি সম্প্রদায়ের নরনারী অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছে দিবারাত্র। এরা ভিক্ষা করেনি, পথে পথে কেঁদে বেড়ায়নি, দরখাস্ত নিয়ে আপিসে-আপিসে গিয়ে ধরনা দেয়নি, কিংবা তিনটে নামে এক ব্যক্তি ডোল আদায় করেনি।

আবার অন্য দিকটা দেখো। শিল্পসভ্যতা নিজেই নিজের অভিসম্পাত বহন করে। এই ক্লীভল্যান্ডেই উঠে দাঁড়িয়েছে সমাজবিরোধীর দল। চুরি, ডাকাতি, খুন, ছিনতাই—সবগুলি এখানে প্রবল। যেমন দেখেছি নিউ ইয়র্কে, ওয়াশিংটনে, ডেট্রয়েটে। এখানে আরেক উৎপাত। সন্ধ্যার পর থেকে পথে ঘাটে মেয়েরা যথেষ্ট নিরাপদ বোধ করে না। ক্লীভল্যান্ডের একটা বড় অংশ দুষ্কৃতকারীদের দখলে থাকে—যেমন নিউ ইয়র্কের 'হার্লেম' পল্লী। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার সঙ্গে যতগুলি অপযশের

উদাহরণ পাওয়া যায়, আমেরিকায় সেগুলি প্রচুর পরিমাণে বর্তমান। আমেরিকান সংবাদপত্র, আমেরিকান টেলিভিশনের নাটক, বহু আমেরিকান সিনেমাচিত্র—এরা প্রতিনিয়ত এই সমাজবিরোধী, নীতিবিরোধী ও সংস্কৃতিবিরোধী সংবাদ একদিকে যেমন প্রকাশ করছে, অন্য দিকে তেমনি শিল্পপতিদের স্বার্থে সেই সব ছবি প্রকাশ করে শস্তা রসের দ্বারা টেলিভিশনকে জনপ্রিয় করে তুলছে। জনসংস্কৃতির মানোন্নয়নের চেষ্টা আমেরিকায় কমই। মাঝে মাঝে যে সকল সংস্কৃতিমান বড় বড় মনীষী, পণ্ডিত ও সমাজদার্শনিক মাথা তোলেন, তাঁদের গলার আওয়াজ বরং ইউরোপ, ইংল্যান্ড ও এশিয়াতে শোনা যায়, কিন্তু তাঁদের নিজেদের দেশের প্রবল ডেমোক্রাসির রথচক্রঘর্ঘরধ্বনির তলায় সেই আওয়াজ বহু ক্ষেত্রেই চাপা পড়ে যায়।

এবার আমি প্রথম কানাডার পথে পাড়ি দেব। আপাতত ওহাইয়ো স্টেট ছেড়ে যাচ্ছি বটে, কিন্তু এই মহাদেশ পরিক্রমার শেষের দিকে যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর স্টেটগুলির ভিতর দিয়েই আবার পূর্ব দিকে অগ্রসর হবো। তখন আরেকবার এই স্টেটে প্রবেশ করব। আমার সামনে রয়েছে এখনও বহু দেশদেশান্তর।

শ্রীমতী নন্দা ও শ্রীমান রাহুলের উদ্দীপনার অন্ত নেই। বিদায় নেবার আগে ওরা একটি নৈশভোজের আয়োজন করে বন্ধু-সম্মেলন ডাকল। এলেন অনেকেই। আমার কথা ছাড়ো। ওরা যে কত লোকের প্রিয় সেটি লক্ষ্য করে আনন্দ পাচ্ছিলুম। দেখছিলুম ডঃ নীহারের জামাতা-সৌভাগ্য।

যাই হোক, আমি এবার ক্লীভল্যান্ড ছেড়ে উত্তর-পূর্ব পথে অগ্রসর হচ্ছিলুম।

শহর ছাড়িয়ে ছবির মতো প্রশস্ত পথটি উপত্যকা পেরিয়ে এক সময় মিলে গেছে অতি প্রসারিত হাইওয়েতে। হাইওয়েতে মিলবার পথটির নাম হল 'মার্জ' এবং হাইওয়ে থেকে বেরোবার পথটির নাম 'এক্সিট'। এক 'ফ্রিওয়ে' থেকে অন্য 'ফ্রিওয়েটি' ধরবার যেটি শর্টকাট, সেই ছোট্ট পথটির নাম 'র‍্যাম্প'। যদি তোমার গাড়ি এদেরকে লক্ষ্য না করে দু-পা এগিয়ে যায় তা হলে তোমার দুর্ভাগ্য। কোনও গাড়ি উলটো দিকে ঘোরানো যায় না। ফলে, সামান্য ৫০ গজ রাস্তা ভুল করে ছেড়ে আসার জন্য তোমাকে পরবর্তী এক্সিট দিয়ে বেরিয়ে হাইওয়ে দিয়ে ঘুরে আবার আসতে হবে লক্ষ্যস্থলে। অর্থাৎ আবার প্রায় ১৫ মাইলের হয়রানি। হাইওয়েতে কোন গাড়ি থামানো বা নিয়ম বহির্ভূত স্পীড বাড়ানো—এগুলি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। প্রত্যেকটি হাইওয়ে এবং ফ্রিওয়েতে পুলিসের গাড়ি 'রাডার' যন্ত্রের সাহায্যে প্রতিটি গাড়ির গতি নিরীক্ষণ করে এবং সঠিকভাবে অপরাধীকে ধরে। হয় পুলিস তাকে 'টিকিট' দেয়, নয়ত সেইখানেই ২৫ ডলার জরিমানা আদায় করে। সমগ্র আমেরিকায় ট্রাফিক নিয়ম ভেঙে পালাবার কোনও পথ নেই। পুলিসের নিখুঁত বেড়াজাল তোমাকে ক্ষমা করবে না!

উত্তর যুক্তরাষ্ট্রে এখন বসন্তকাল অর্থাৎ জুন মাসের প্রথম সপ্তাহ। কিন্ত এখানে বসন্তকালের অর্থ গরম পোশাক! আমরা 'ইরি' হ্রদ-সমুদ্রের সীমানাপথ ধরে 'বাফেলো' নামক শিল্পনগরীর পথে অগ্রসর হচ্ছিলুম। গতরাত্রে বৃষ্টি হয়েছে, আজও মেঘলা দিন। আমার সঙ্গে চলেছেন শ্রীমতী কল্যাণী দত্ত এবং শ্রীমতী মুকুল চৌধুরী। এঁরা দুজনেই রণজিৎ দত্তর সহোদরা। সঙ্গে চলেছে মুকুলের দুটি ছেলে-মেয়ে শুভম ও সোমা। আমরা প্রায় তিনশ' মাইল পথ অতিক্রম করব।

প্রতি আমেরিকান গাড়িতে শীততাপ যন্ত্রের ব্যবস্থা থাকে। এ ছাড়া থাকে

সিগারেট ধরাবার জন্য একটি আগুনের বোতাম। বোতামটি টেপো, কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে সেটি রাঙ্গা হয়ে বেরিয়ে আসবে। বেতারযন্ত্রও আছেই। স্টিয়ারিং হুইল থাকে বাঁ দিকে এবং ট্রাফিক নিয়মে বাঁধা থাকে কীপ-টু-দি-রাইট!

বিশাল প্রান্তর ও ফসলের মাঠ পেরিয়ে যাচ্ছিলুম। মাঝে মাঝে অরণ্য, মাঝে মাঝে উচ্চ মালভূমি। চাষীদের দেখা যাচ্ছে না কোথাও, কিন্তু ফসল ফলে রয়েছে মাঠে মাঠে। রণজিৎ দত্ত তাঁর গাড়ি চালাচ্ছিলেন মিনিটে এক মাইল। হাইওয়েতে ট্রাফিক সিগনাল থাকে না, সেই কারণে মোটরে কোথাও ব্রেক কষতে হয় না। পথচারীর পক্ষে হাইওয়েতে হাঁটা নিষিদ্ধ।

পথের মাঝে মাঝে হরিণ বন, এবং সে সব অঞ্চলে 'ডীয়ার পার্ক' লেখা থাকে। বছরে একবার বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে কয়েকদিনের জন্য কর্তৃপক্ষ হরিণ শিকারের অনুমতি দেন। লুকিয়ে লুকিয়ে কখনও কেউ জীবহত্যা বা 'পোচিং' করে না। বুনো হাঁসের পালকে দেখা যায় জনবিরল জলাশয়ের তীরে, কেউ তাদের তাড়া করে না বা গুলি ছোঁড়ে না। সমগ্র আমেরিকার কোনও জঙ্গলের বা পাহাড়গুলিতে দুচারটে ভালুক ছাড়া অপর কোনও হিংস্র জানোয়ার নেই। সেই কারণে আমেরিকায় শিকারীর সন্ধান পাওয়া যায় না। ওরা অন্য দেশে গিয়ে শিকারী হয়ে ওঠে। বেজি, কাঠবিড়ালী, গেছো ইঁদুর—এরা আছে প্রচুর। মশা, মাছি, বিভিন্ন ধরনের পোকা, পতঙ্গ আরসোলা ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে আছে সমগ্র আমেরিকার বিভিন্ন শহরে, বিশেষ করে নিউ ইয়র্ক, শিকাগো, ওয়াশিংটন প্রভৃতি শহরের পুরনো ঘিঞ্জি অঞ্চলে। রান্নাঘরে পোকা ও শিশু-আরসোলার উৎপাত প্রায় সর্বত্র। এই সব কারণে শহরে নগরে গ্রামে দোকান-বাজারে রেস্টুরেণ্ট প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে প্রতিটি জানলায় সূক্ষ্ম জাল দেওয়া থাকে। কোনও বাসস্থান জালছাড়া নেই।

ওহাইয়োর সীমানা পেরিয়ে আমরা পেনসিলভানিয়ার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের ভিতর দিয়ে নিউ ইয়র্ক স্টেটের উত্তরভাগে প্রবেশ করছিলুম। 'বাফেলো' শহর নিউ ইয়র্ক স্টেটের মধ্যে পড়ে। এই পথেরই একস্থলে ফাঁকা ময়দানের ধারে যে বাড়িটিতে আমাদের মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন করা হয়েছিল তার মালিক হলেন প্রীতীন্দ্র চৌধুরী, স্বর্গত অভিনেতা অহীন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের একমাত্র পুত্র। প্রীতীন্দ্র এদেশে কাজ-কারবার করেন এবং তাঁর আর্থিক অবস্থা ভাল। এই পার্বত্য ও বনময় অঞ্চলে তাঁর জমি-জায়গা কম নয়। সামনেই রয়েছে তাঁর দুখানা গাড়ি, খানদুই ট্রাক, কাঠের গোলা, ফুল ও ফলের বাগান এবং সুদৃশ্য একটি বসতবাড়ি। বিশেষ সমাদরের সঙ্গে তিনি আমাদেরকে অভ্যর্থনা করে ভিতরে নিয়ে গেলেন।

প্রীতীন্দ্র পরিণত বয়স্ক। পিতার মতোই তাঁর মুখচ্ছবি। জনৈক আমেরিকান মহিলাকে তিনি বিবাহ করেছেন। এখন তিনি চারটি বালক-বালিকার পিতা। মানুষটি শান্ত ও সৌজন্যশীল। পিতার মৃত্যুসংবাদ পেয়ে তিনি কলকাতায় গিয়ে শ্রাদ্ধাদি সেরে আবার এখানে ফিরে আসেন। পিতৃবিয়োগের সংবাদটি তিনি কলকাতা থেকে প্রথম রণজিৎ দত্তর টেলিগ্রামেই পান।

শ্রীমতী চৌধুরী আমাদের জন্য প্রচুর আহারাদির আয়োজন করেছিলেন। ঘণ্টা দুই পরে বিদায় নেবার কালে প্রীতীন্দ্রর উৎসাহে খানকয়েক ছবি তোলাতুলি হল। তিনি শীঘ্রই এখান থেকে বসবাস তুলে দিয়ে দক্ষিণ রাজ্য জর্জিয়ার অন্তর্গত আটলাণ্টা শহরে আত্মস্থাপনা করবেন। আমি যেন আমার ভ্রমণপথে তাঁর ওখানে

গিয়ে উঠি, এই প্রতিশ্রুতি তাঁকে দিয়ে এলাম। তাঁর অমায়িক ব্যবহার আমার মনে দাগ কেটে রইল। তার বাড়ির কাছাকাছি এক গৌরকবণ হরিণের সাক্ষাৎ পেয়েছিলুম।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে যখন 'বাফেলো' শহরে ডক্টর সমীর মুখার্জির বাড়িতে এসে পৌঁছলুম তখন সবাই শীতে জড়োসড়ো। ভিতরে প্রবেশ করতেই দেখি আসর প্রস্তুত। পূর্বব্যবস্থা অনুযায়ী কয়েকজন বিশিষ্ট বাঙালী পুরুষ ও মহিলা সাদর অভ্যর্থনা জানালেন এবং যিনি গৃহকর্ত্রী, মিসেস ইন্দিরা মুখার্জি—তিনি সহাস্য মুখে এগিয়ে এসে অভিনন্দন জ্ঞাপন করলেন। বুঝতে পারা যায় বন্ধুবর রণজিৎ দত্ত আগে থেকে ক্ষেত্র প্রস্তুত করে রেখেছিলেন। এ যেন সবাই সকলের অতি পরিচিত। ফলে, সঙ্গে সঙ্গেই গল্প-গুজবের আসর বসে গেল। কিন্তু রণজিৎ এক সময় ভগ্নীদের নিয়ে আবার বেরিয়ে পড়লেন, কারণ তাঁকে এই রাত্রেই ক্লীভল্যাণ্ডে ফিরে যেতে হবে।– সেটি এখান থেকে ৫ ঘণ্টার পথ।

ডক্টর সমীর মুখার্জি উত্তর প্রদেশের লোক। দীর্ঘকায়, বলবান, সৌম্যদর্শন ও পরিণত বয়স্ক যুবা। তিনি এই বাফেলো শহরের একটি বৃহৎ শিল্প-প্রতিষ্ঠানের প্রধান কেমিস্ট। এই সর্ববৈভবযুক্ত দ্বিতল ও শৌখীন বাড়িটি তাঁর নিজের। তাঁর দুটি বালিকাকন্যা এখানকার প্রাইমারি স্কুলে পড়ে। শ্রীমতী ইন্দিরা উচ্চশিক্ষিতা, স্বাস্থ্যোজ্জ্বলা ও খুবই সুশ্রী মহিলা। একরাত্রির অতিথির জন্য উনি অপর এক মহিলার সহযোগে বিভিন্ন প্রকার মোগলাই রান্না প্রস্তুত করেছিলেন। ওঁরা দোতলায় পূর্বমুখী শ্রেষ্ঠ ঘরটি আমার রাত্রিবাসের জন্য ছেড়ে দিয়েছিলেন।

আহারাদির পর রাত প্রায় ১০টার সময় আমরা তিনজনে নায়াগারা জলপ্রপাত দেখার জন্য বেরিয়ে পড়লুম। নায়াগারা নাকি পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম জলপ্রপাত এবং আফ্রিকার ভিকটোরিয়া জলপ্রপাত অপেক্ষাও বড়। আমি আসছি জলপ্রপাতের দেশ থেকে। দার্জিলিংয়ে, আসামে, ছোট নাগপুরে, বিহারের উশ্রীতে, উত্তর প্রদেশের বেরা অঞ্চলে, কর্ণাটকে, কোদাইকানালে, হিমালয়ের গৌরীগঙ্গার ধারে ধারে—বড় বড় জলপ্রপাত আমার দেখা আছে। যুক্তরাষ্ট্রের অন্য কোথাও সেই ধরনের জলপ্রপাত একটিও নেই।

নায়াগারা এবং বাফেলোর মাঝখানে একটি ছোট্ট দ্বীপ অতিক্রম করার জন্য দুটি সুবৃহৎ ব্রীজ পার হলুম। নায়াগারা নদী এই অঞ্চলে দ্বিধা বিভক্ত হবার ফলে এখানে এই দ্বীপটি রচনা করেছে। এই দ্বীপের নাম 'গ্রাণ্ড আইল্যাণ্ড।' দ্বিতীয় সেতুটি পার হয়েই আমরা কানাডার চেক পোস্টের সামনে এসে পাসপোর্ট দেখাবার নির্দেশ পেলুম। নায়াগারা জলপ্রপাত এখানে দুই ভাগে বিভক্ত। ছোট ভাগটি পড়েছে যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিক সীমানায়। এই দ্বিধাবিভক্ত নায়াগারা নদীর পশ্চিম পার থেকে কানাডার ভূখণ্ড আরম্ভ হয়েছে। এই নদী সংযুক্ত করেছে উত্তরে ও দক্ষিণে দুই সমুদ্রবৎ জলরাশিকে। তারা হল দক্ষিণে লেক ইরি এবং উত্তরে লেক অণ্টারিয়ো। এই দুই সমুদ্রকেও ভাগ করে নিয়েছে দুই রাষ্ট্র। এই অঞ্চলেব অন্য একটি নাম নায়াগারা 'ফ্রনটিয়ার।' উত্তর আমেরিকার ইতিহাসে বলা হয়েছে এখানকার কয়েকটি দুর্গে ও ময়দানে বহুবার ইংরেজ-আমেরিকান সংঘর্ষ ঘটেছিল।

অত্যুগ্র বর্ণবাহার আলো চারিদিকে ঝলসিত হয়ে সমগ্র নায়াগারা প্রপাতকে ইন্দ্রধনুর এক বর্ণাঢ্য আকার দান করেছে। সেদিকে বিস্ময়াবিষ্ট চক্ষু নিমেষ-নিহত হয়ে থাকে। রাত্রের দিকে ওই ঠাণ্ডায় হাজার হাজার নর-নারীর সমাবেশ ঘটেছে। সম্বিৎ

ফিরলে চেয়ে দেখি কাছে ও দূরে মোট চারটি সুউচ্চ টাওয়ার, —সেইগুলির থেকে নানা বর্ণের রঙগীন আলোক ওই প্রপাতের উপরে 'ফোকাস' করা হচ্ছে। ওদের মধ্যে যে টাওয়ারটি সর্বাপেক্ষা উঁচু, কানাডার অংশে সেই টাওয়ারটির উচ্চতা হল নদীর সমতা থেকে ৭৭৫ ফুট। ওর নিচে হল কুইন ভিকটোরিয়া পার্ক। ওর চূড়ায় রয়েছে একটি ঘূর্ণ্যমান ডাইনিং কক্ষ—যেখানে একসঙ্গে ৩০০ লোক বসে খেতে পারে। এই টাওয়ারটির নাম 'স্কাইলন্'।

সেদিন মধ্যরাত্রির পর বৃষ্টির মধ্যে ফিরে গিয়েছিলুম বটে, কিন্তু পরদিন সকাল ১০টায় আবার রৌদ্রোজ্জ্বল দিনমানে জনতা ও মোটরের ভিড়ের ভিতর দিয়ে এসে নায়াগারা প্রপাতের মুখোমুখি দাঁড়ালুম। জ্যোৎস্নারাত্রে তাজমহল দেখার মধ্যে যেমন এক মোহমদির অবাস্তবতা থাকে এবং দিনমানে দেখলে যেমন নির্ভুল চেহারাটি দেখা যায়—এও তেমনি। কানাডা অংশের নায়াগারা অতি প্রশস্ত এবং অশ্বক্ষুরাকৃতি। প্রতি ৫ মিনিটে দশ লক্ষ টন জল নিচের নদীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে ১৯০ ফুট উঁচু থেকে। আমেরিকা ও কানাডা উভয়ের মধ্যে এই প্রপাত দুই ভাগে বিভক্ত করেছে স্বয়ং প্রকৃতি। দুইয়ের মাঝখানে একটি ছোট দ্বীপ, নাম 'গোট আইল্যান্ড।' এরই স্থলভাগে ধাক্কা খেয়ে একই নদী দুই ভাগে দুপাশে গিয়ে প্রপাতের আকারে নিচে ঝাঁপ দিচ্ছে। যারা প্রপাতের খুব কাছাকাছি যাবার সাহস রাখে তাদের জন্য নদীতে ছোট ছোট জাহাজ রয়েছে। 'অশ্বক্ষুর' প্রপাতটি চওড়ায় ২২০০ ফুট। এই নায়াগারা প্রপাত সম্বন্ধে এক পাদ্রি, ফাদার হেনেপিন, তিনশ' বছর আগে প্রথম পৃথিবীর নিকট এর অস্তিত্বের সংবাদ পাঠান। এই শতাব্দীতে উভয় রাষ্ট্র সম্মিলিতভাবে নায়াগারাকে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ট্যুরিস্ট সেন্টারে পরিণত করার জন্য হাজার হাজার কোটি ডলার খরচ করেন। প্রতি বছর জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে এই প্রপাত তুষার-শিলায় পরিণত হয়ে একশ' ফুট উঁচু হয় এবং নিচের নদী পঞ্চাশ ফুট উঁচু তুষারে আবৃত হয়। সূর্যের আলোয় সেই কালে এই নায়াগারা লক্ষ লক্ষ হীরকদ্যুতিতে ঝলমল করে।

শীতকালে এই 'গোট আইল্যান্ড' বা 'ছাগল দ্বীপটি' বরফের তলায় যখন চাপা পড়ে, তখন একবার বরফ সরিয়ে খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল একটি জীবন্ত ছাগলকে। সেই থেকে ওর নাম হল গোট আইল্যান্ড। গ্রীষ্মকালে এই দ্বীপটি পুষ্পোদ্যানে পরিণত হয় এবং এরই ঝোপঝাড়ের আশেপাশে ছায়াবীথিকার নিরিবিলি মধুকুঞ্জে যারা বনভোজন বা পরিভ্রমণে আসে, সেই সব নতুন কালের তরুণ তরুণীদের গতিবিধি ও ক্রিয়াকলাপের কাহিনী বর্ণনা আপাতত বেমানান হবে। 'গোট আইল্যান্ড' পরিক্রমার জন্য একটি 'টয়-ট্রেন' দিনমানে সব সময়ে মজুত থাকে।

নায়াগারার ছোট শহরটি সর্বাধুনিক দোকান বাজারে ভরা। এটি কানাডার অংশে পড়ে। এ অঞ্চল অনেকটা উপত্যকার মতো। এর কোল ঘেঁষে অন্টারিয়োর প্রশস্ত রাজপথ সুদূর পশ্চিমে চলে গেছে। ছুটির কালে এখানকার বহু আবাসিক 'মটেল' মেয়ে-পুরুষে ভরে যায়। বহু তরুণ তরুণী তাদের বিবাহের আগেই ওই মটেলগুলিতে মধুযামিনী যাপন করতে আসে, এবং সেই সব যামিনীতে বহুসময়েই মধুচন্দ্র থাকে না। ওদের প্রাণশক্তির প্রবল প্রাচুর্য সর্বপ্রকার নৈতিক বাধা নিষেধকে নায়াগারার প্রপাতের মতোই ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

আমার সঙ্গে ছিলেন শ্রীমতী ইন্দিরা, তাঁর দুটি কন্যা ইন্দ্রাণী ও আরেকটি এবং ডক্টর সমীর মুখার্জি। ঘণ্টা তিনেক ধরে নায়াগারার সর্বপ্রকার খুঁটিনাটি দেখতে

দেখতে এক সময় টরণ্টোর দিকে যাত্রা করলুম। এখান থেকে প্রায় একশ' মাইল হাইওয়ের পথ।

অতঃপর এই মহাদেশে আমার পরবর্তী পাঁচ মাস কালের সুদীর্ঘ ভ্রমণের বিবরণগুলি একে একে তোমার হাতে পড়েছে জেনে সুখী হয়েছি।

॥ ৬ ॥

কানাডায় প্রবেশকালে লক্ষ্য করছিলুম উত্তর আমেরিকা এই অঞ্চলে নায়াগারা জলপ্রপাতের উপরে দুই ভূখণ্ডে ভাগ হয়েছে। দক্ষিণে যুক্তরাষ্ট্র। আমার পথের দু-দিকে দুই সমুদ্রবৎ অতি বৃহৎ জলাশয়—যার একটির নাম ইরি হ্রদ, অন্যটির নাম লেক অণ্টারিয়ো। এই দুইয়ের মাঝখান দিয়ে অতি প্রশস্ত 'হাইওয়ে' চলে গেছে বৃহত্তর কানাডার দিকে। সেই পথে আমাদের গাড়ি প্রতি মিনিটে এক মাইল গতিতে ছুটছিল।

কানাডায় ঢুকে প্রথম চোখে পড়ে এই ভূখণ্ডের জনবিরলতা। এখন এই 'নতুন পৃথিবীতে' নেমেছে গ্রীষ্মকাল। বিস্তীর্ণ সবুজ প্রান্তর দিগন্তরেখায় গিয়ে মিশেছে। এপ্রিল পর্যন্ত বরফে চাপা ছিল সমগ্র দেশ। সেই বরফ গলেছে। সমস্ত মাটি রসসিক্ত হওয়ায় চাষ-আবাদ চলছে। লক্ষ-লক্ষ কোটি-কোটি একর 'ভার্জিন' জমি অদ্যাবধি রয়ে গেছে কানাডায়—যার দখলদার আজও কেউ নেই। মানুষকে ওরা ডাকছে নানা সুবিধা দেবার প্রস্তাব জানিয়ে, কিন্তু মেরুলোকের ঠাণ্ডার ভয়ে শীতপ্রধান দেশের মানুষও আসতে চায় না। সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেখে কয়েকটি বিজ্ঞানবিশেষজ্ঞ বাঙালী যুবক কুইবেক অঞ্চলে আসতে পেরেছিল, কিন্তু আবহাওয়ার বিস্তারিত বিবরণ জেনে তারা পিছিয়ে যায়। এদেশে অক্টোবর থেকে বরফ পড়ে এবং ডিসেম্বর-জানুয়ারিতে দোতলা বাড়ির জানলা ছাড়িয়ে বরফ ওঠে। গাড়ির গ্যারাজ খুঁজেই পাওয়া যায় না। বলাই বাহুল্য, নদী-হ্রদ-সমুদ্র—সবই কঠিন বরফে চাপা পড়ে। বন্য রাজহংসরা দক্ষিণ আকাশপথে পালিয়ে যায়, পাখি কোথাও ডাকে না, শুধু রৌদ্র দেখা দিলে দু-চারটি পায়রা উড়তে দেখা যায়। বন্য জন্তু বলে কিছু নেই, কেবল শ্বেতভল্লুকরা বরফে বিচরণ করে। কানাডার সমগ্র উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, যার অপর নাম 'ইউকন্'—সেই বিরাট ভূখণ্ড আজও প্রাণীচিহ্নহীন। সেখানকার আকাশে বিমান ঘুরে আসতে পারে, কিন্তু দাঁড়াবার মতো স্থান সেখানে নেই। কানাডার ভূভাগ যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিগুণেরও বেশি। প্রধান অঙ্গরাজ্যগুলির মধ্যে ব্রিটিশ কলম্বিয়া, আলবার্টা, সাসকাচেওয়ান, মানিটোবা, অণ্টারিয়ো ও কুইবেক—এরা হল প্রধান। এ ছাড়া আরও আছে পাঁচটি। মোট ছয়টি ভারতবর্ষ এক করলে তবে কানাডার ভূ-পরিমাণের আভাস পাওয়া যায়। পৃথিবী এখনও অনেক বড়।

উত্তর আমেরিকায় দ্রুতগতি হল জীবন, শ্লথগতি হল মৃত্যুর মতো। গাড়ির গতির সঙ্গে সম্পদের প্রাচুর্যও এগিয়ে চলে। দেশের বিশালতার তুলনায় কানাডার দক্ষিণ সীমাভাগ কতটুকু? কিন্তু সেই অংশে যে পরিমাণ আতপ শস্য ফলে গ্রীষ্মের কালে, তাতে সমগ্রভাবে এক বছর ধরে ভারতকে খাওয়ানো চলে। ওরা 'সিরিয়াল' খাদ্য কমই খায়। ওদের আঙুর আপেল কলা ও বেরির ফলন দেখলে অবাক লাগে। দুধ মাখন মাংস, গ্রীষ্মের দিনের কপি লেটুস ডিম আলু পেঁয়াজ মাছ—এসব খেয়ে ফুরোয় না। পৃথিবীর বহু দেশের লোক কানাডায় এসে করে খায়। যুক্তরাষ্ট্র এদের

অর্থনীতি ও রাজনীতির মধ্যে কায়েমীভাবে প্রভাব বিস্তার করে রয়েছে। বড় বড় কলকারখানা ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ করে যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি ও জাপান। কানাডা কেবল আয়কর এবং জমিজায়গা, বাড়িঘর, খাদ্যসামগ্রী ও চাষবাস নিয়ন্ত্রণ করে। কানাডা হল উচ্চ-মধ্যবিত্ত, যুক্তরাষ্ট্র হল ধনী। কানাডার স্বকীয়তা ও স্বাধীন বিচারবুদ্ধি সীমাবদ্ধ।

একটির পর একটি শহর পেরিয়ে যাচ্ছিলুম। তাদের মধ্যে বীমস্‌ভিল, হ্যামিলটন, বার্লিংটন, মিমিকো—এরা প্রধান। ছোট ছোট শহর, কিন্তু ঝলমল করছে আপন সম্পদে ও স্বভাবসৌন্দর্যে। আশে পাশে নির্মল জলাশয়, ফলনে সবুজ সজীবতা, এখানে ওখানে অরণ্য ও মালভূমি, হ্রদ সমুদ্রে জাহাজ চলাচল, ছবির মতো গ্রামাঞ্চল, মাঠে-মাঠে ঘোড়া ও গরু, চাষীদের শস্যের বড়-বড় গম্বুজ—চারিদিকে অনন্ত অবকাশ, বাতাসে বসন্তের অসহনীয় রোমাঞ্চ—সর্বত্র প্রাচুর্যে ভরা জীবন। মাঝে মাঝে দূর প্রান্তরে এক শ্রেণীর সুন্দর দেহসৌষ্ঠবযুক্ত যে বৃহদাকার গরুগুলিকে দেখতে পাচ্ছিলুম, সেগুলিকে নাকি ভারত থেকে আনা হয়েছে। তাদের নাম দেওয়া হয়েছে 'ব্রাম্ভিনী কাউ।'

দেখতে দেখতেই একশ' মাইল চলে এলুম। এটি টরণ্টো নগরীর উপান্ত। এখানে কিছু উচ্চশিক্ষিত ও বিজ্ঞানী বাঙ্গালী আছেন। কিন্তু এখানে ছড়িয়ে থাকেন সবাই। এক পরিবারের সঙ্গে অপর পরিবারের দূরত্ব কমপক্ষে পনেরো মাইল। বহু সাহেবী গ্রামের মধ্যে হয়ত একটিমাত্র বাঙ্গালী পরিবার। সুতরাং তিন চারশ' বাঙ্গালী পরিবার হয়ত পাঁচশ' বর্গমাইলের মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে যাদেরকে একসঙ্গে দেখা সম্ভব নয়।

আমি টরণ্টো শহর অঞ্চলে আসব এটি জানাজানি ছিল, দু-একটি কাগজেও হয়ত ছাপা হয়ে থাকবে। কিন্তু সঠিক তারিখ কারও জানা ছিল না। যাই হোক, নগর থেকে বোধ হয় মাইল কুড়ি দূরে এক বাঙ্গালী যুবক শ্রীমান নীলাদ্রি চাকী ও তার স্ত্রী শ্রীমতী রানু বিশেষ তৎপরতার সঙ্গে টরণ্টোর মস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের হলঘরে এক সাহিত্য-সভা ও প্রশ্নোত্তর মীমাংসার মজলিস ডাকল। এখানে ছোট বাঙ্গালী সমাজের অনেকে মিলে দু-একটি বঙ্গসংস্কৃতি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন। তাঁদেরই চেষ্টায় বার্ষিক শারদীয়া পুজোও অনুষ্ঠিত হয়। এই সভাতেই যাঁকে পেয়ে আমি বিশেষ উৎসাহ বোধ করেছিলুম তিনি হলেন ডক্টর অরবিন্দ গুহ। তিনি এই সুবৃহৎ ও প্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ের 'এরিনডেল ক্যামপাসের' পরিচালক ও মাইক্রোবায়লজির ডীন। ইনি অমায়িক, সজ্জন, পণ্ডিত এবং সুদর্শন এক বিশিষ্ট অধ্যাপক। দেশে বিদেশে ওঁর খ্যাতি প্রচুর। এঁর স্ত্রী শ্রীমতী সবিতা খুবই উচ্চশিক্ষিতা এবং বিশিষ্ট এক সমাজকর্মী ছিলেন। এঁদের উভয়ের আপ্যায়ন ও আতিথেয়তা স্মরণীয় হয়ে রয়েছে।

এক গুজরাটি বিবাহ সভার আয়োজন হয়েছিল টরণ্টোয়। সেখানে গুজরাটি 'গর্বা' নাচের মধ্যে শ্রীমতী সবিতাও মেতে উঠলেন। এই সমাজটি বিশেষভাবে ধনবান এবং এঁদের চেহারায়, পোশাকে, অলঙ্কারাদিতে আধুনিক কালের বিত্তশালীদের ছাপ দেখছিলুম। কিন্তু এখন এঁদের নাম 'এশিয়ান', এঁরা প্রাক্তন ব্রিটিশ প্রজা। সম্প্রতি উগাণ্ডার প্রেসিডেণ্ট ইদি আমিন এই সব কোটিপতিদেরকে বিতাড়িত করেছেন উগাণ্ডা থেকে। এঁরা কানাডায় এসে নূতন করে বাণিজ্য বিস্তার করছেন। আনন্দের কথা এই, এঁরা আপন ভাষা ও সংস্কৃতিকে ভোলেননি।

টরণ্টো ও হ্যামিলটন—দুটি শহর কাছাকাছি। বড় বড় অট্টালিকা, প্রশস্ত রাজপথ, টাউন হল, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, বিস্তৃত শপিং সেণ্টার—এদের মধ্যে বিচরণ করছিলুম। অনেককাল পরে আবার ব্রিটিশ ডোমিনিয়নের মধ্যে প্রবেশ করেছি। ইউনিয়ন জ্যাকের সংগে দেখছি মেপলপাতা চিহ্নিত কানাডার পতাকা এবং কথায়-কথায় ইংলণ্ডেশ্বরী রানী এলিজাবেথের ছবি।

রাত্রের দিকে লেক অণ্টারিয়ো থেকে মাইল কয়েক দূরে 'মিসিসওগা' নামক একটি সাহেবী অঞ্চলে ডক্টর গুহর বাড়িতে এসে উঠলুম। বস্তুত, উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন জনপদে, মেরিল্যাণ্ডে, ভার্জিনিয়ায়, নিউ ইয়র্কে, বোস্টনে, রোড আইল্যাণ্ডে, ফিলাডেলফিয়ায়, কালিফোর্নিয়ায় হাজার হাজার ভারতীয় ও বাঙ্গালী বহু বাড়ি ও জমি কথায় কথায় কেনাবেচা করেন। ভাড়াটে মহল, যার নাম এপার্টমেণ্ট, যেগুলি একেকটি বহুতল অট্টালিকা-কমপ্লেক্সের ক্ষুদ্রাংশ মাত্র—সেখানে নগদ ভাড়া গুণে থাকা নানাভাবে অসুবিধাজনক। ৫০ হাজার ডলারে একটি বাগানবাড়ি ধারে কিনলে ৩০ বছরে দেনা শোধ করা যায়। যদি এর মধ্যে দেশে ফিরে যাবার কথা ওঠে তাহলে ৩০ হাজার ডলারের বাড়ি ৪০ হাজারে যে কোনও সময় বিক্রী করা চলে। কিন্তু নিজস্ব বাড়ির কাজ জমে প্রচুর। বাগানের ঘাস কাটো নিজের হাতে, নিজের যন্ত্রে। গাছপালার সেবা করো, দেওয়ালে রং ধরাও, নানাবিধ মেরামতি কাজে হাত লাগাও, ঘর ঝাড়ো, দোতলা-একতলা পরিষ্কার করো, গাড়ি ধোওয়া-মোছায় লাগো—সব নিজেদের হাতে। এ ছাড়া প্রতি সপ্তাহে একদিন আগাগোড়া বাজার করো, পোশাকপত্র কাচো, ইস্তিরি করো, এঁটো বাসন ধোও, কুটনো-বাটনা প্রস্তুত করো, ঘরকন্না গোছাও—সব নিজের হাতে। যে-ব্যক্তি বছরে ৫০ হাজার ডলার উপার্জন করে তারও এই একই কাজ। সারাদিন এবং রাত দশটা পর্যন্ত এ দেশের কোনও নরনারী আলস্যের অবকাশ যাপন করে না। এদেশে উন্নতির প্রথম পন্থা হল কায়িক পরিশ্রম। যত পারো খাও, যত পারো উপার্জন করো, যত পারো খাটো—তবে উন্নতি। একই ব্যক্তিকে বাল্যকাল থেকে সকল কাজের যোগ্য হতে হচ্ছে। সে রাঁধুনি, চাকর, মেথর, ঝাড়ুদার, ছুতোর, কামার, ড্রাইভার, মেকানিক, রাজমিস্ত্রি, ধোবা, নাপিত—সবই। মা-বাপ ছোট বাচ্চাদের চুল কেটে দেয়। বাড়ির ছেলেমেয়ে অল্প বয়স থেকে ধোবার কাজ করে, ঘর ঝাড়ে, বাসন ধোয়, ইস্তিরি করে। আপিসের কর্মচারীরা বছরে মাত্র ১০ দিন ছুটি পায়।

কানাডার যে অংশে আমি ভ্রমণ করতে এসেছি, এটির চারিদিকে বিশাল একেকটি হ্রদ। কিন্তু হ্রদ বলতে এখানে সমুদ্রের চেহারাই দেখা যাচ্ছে। এই অন্তর্দেশীয় সমুদ্রগুলির নাম হাডসন, সুপিরিয়র, হিউরন, মিসিগান, ইরি এবং অণ্টারিয়ো লেক। এগুলির উপর দিয়ে বড় বড় জাহাজ চলে, যাত্রীরা দেশ-দেশান্তরে যাতায়াত করে, এবং মাল আমদানি রপ্তানি হয়। টরণ্টো নগরী লেক অণ্টারিয়োর তীরে দাঁড়িয়ে। এটি খাস ব্রিটিশ নগরী, এবং এই নগরীর উচ্চতল অট্টালিকারা—যেগুলি 'ডাউন টাউনকে' শোভায় সম্পদে ও ঐশ্বর্যে আকর্ষণীয় করে রেখেছে, সেগুলি লণ্ডন নগরী অপেক্ষা অনেক বৃহৎ ও ব্যাপক। কানাডা হল নামেই ব্রিটিশ ডোমিনিয়ন, কিন্তু ইংরেজের সেই বলশালী প্রভুত্ব এখানে অনুপস্থিত।

সন্ধ্যার দিকে ডঃ গুহ নিয়ে গেলেন কয়েক মাইল দূরবর্তী অণ্টারিয়ো প্লেসে। এটি হ্রদ-সমুদ্রের একটি খাঁড়ির উপরে অনেকটা যেন একটি ছোটখাটো অলিম্পিক

নগরীর মতো শোভাসমুজ্জ্বল। বিকালের দিক থেকে রাত্রি পর্যন্ত এখানে হাজার হাজার নরনারী ও বালক বালিকার সমাগম ঘটে। নাচ গান কৌতুক অভিনয় যাদুক্রীড়া খেলাধুলো বক্তৃতা বিভিন্ন প্রকার আমোদ আহ্লাদ সিনেমা থিয়েটার— এগুলি সব মিলে চারিদিক গমগম করে। ওদেরই মধ্যে কয়েকটি বিচিত্র নির্মাণ-কৌশলযুক্ত অট্টালিকা দেখতে পাচ্ছিলুম। তারই একটি ত্রিতল অংশে লক্ষ্য করছিলুম, একটি ইলেকট্রিক পাখা ঘুরছে এবং সেটি দেখার জন্য ভিড় হয়েছে। এই তুষার ও বরফানি ভূখন্ডে কেউ কোথাও ইলেকট্রিক পাখা দেখতে পায় না। সুতরাং ওটি আকর্ষণের বস্তু।

আমরা একটি সিনেমা হলে ঢুকলুম। এটির নাম হল 'সাইনেসফিয়ার' (cinesphere)। দেখানো হচ্ছে লেক সুপিরিয়রের উপরে তোলা একখানি সবাক ছবি। দুর্গম তুষার দেশের অরণ্য পর্বত জন্তু সরীসৃপ প্রাকৃতিক হিংস্রতা অনতিগম্য সেই সব অঞ্চলে বীর অভিযাত্রীদলের অসমসাহসিক ও দুঃসাধ্য অধ্যবসায়—এইগুলি একে একে লক্ষ্য করলে যেন দর্শকদের বক্ষোরক্তের চলাচল দ্রুততর হতে থাকে। এ ধরনের ছবি দেখলে ঘুম আসে না রাত্রে। সেই দুঃসাধ্য জীবনের ভিতর দিয়ে সেই সব তরুণ বয়স্ক নরনারীর শক্তি সাহস ধৈর্য বীরত্ব এবং অনমনীয় মনোবল দেখতে দেখতে আমি অভিভূত হয়েছিলুম।

সমগ্র কানাডা ভূখণ্ড—যেটি ভারতের চেয়ে কমবেশি পাঁচ ছয় গুণ বড়—যার আদি অন্ত কেবল বিমান বিহারের দ্বারাই পরিমাপ করা যায়—তার অধিকাংশে মানববসতি নেই। দক্ষিণ কানাডা বহুলাংশে অরণ্যময়, এবং দিগদিগন্ত জোড়া জনশূন্যতায় যেন খাঁ খাঁ করছে। তেমনি একটি আরণ্য প্রান্তরের ভিতরে ভিতরে আমরা চলে গিয়ে একটি শীর্ণা পার্বত্য নদীর ধারে এসে ফেরিবোটের সাহায্যে পার হয়ে যেখানে এসে পৌঁছলুম, সেই অঞ্চলটির নাম 'ইণ্ডিয়ান রিজার্ভ' (Indian Reserve)। এটি আদিবাসী অঞ্চল। এখানে যারা বাস করে তারা দেশের মূল জীবনধারা (main stream) থেকে বিচ্ছিন্ন। এক কথায়, রাষ্ট্র এদেরকে এইভাবে সমাজচ্যুত করে রেখেছে।

আমাদের গাড়ি ধীরগতিতে নিয়ে চলল যেদিকে আদিবাসীদের ছোট ছোট বসতি। রাস্তা পাকা নয়, ঝোপঝাড়ে আকীর্ণ। আশেপাশে অগোছালো জীবন-যাত্রা, কোন কোনও বস্তিতে স্তূপাকার জঞ্জাল। একটি কাঁচাপাকা ঘরের উঠোনে এসে আমরা দেখতে পেলুম একটি গাউনপরা বর্ষীয়সী স্ত্রীলোক এবং তার একটি তরুণী ফুটফুটে মেয়ে। অদূরে একটি পুরুষ নলকূপ থেকে জল তোলার কাজে লিপ্ত। চারিদিকে দারিদ্র্য এবং অনটনের চেহারা পরিস্ফুট। এমন নিরীহ, স্বভাব-শান্ত ও শান্তিপ্রিয় পরিবার এর আগে আমার চোখে পড়েনি। এদেরই অপর একটি নাম 'রেড ইন্ডিয়ান'।

মেয়েটি হাস্যমুখী, লাজুক এবং স্বল্পভাষী। এদের একটি শাকসব্জির খামার রয়েছে, আর তারই সঙ্গে এরা বানিয়ে তুলেছে একটি কুটীরশিল্পের ছোট্ট কেন্দ্র। সেখানে কাপড়ের পুতুল, মুক্তোর মালা, কাঠের খেলনা, চামড়ার ছোট ছোট সামগ্রী, ইত্যাদি এরা তৈরি করে। মেয়েটি লেখাপড়া শেখার সুবিধা পায়নি।

এদের চেহারার মধ্যে মঙ্গোলীয় ধাঁচ দেখতে পাচ্ছিলুম। বহু সহস্র বছর আগে থেকে অর্থাৎ কমবেশি ১৫ হাজার বছর আগে এরা এশিয়ার বিভিন্ন

অঞ্চল থেকে উষর ও তুষারলোক পেরিয়ে উত্তর এশিয়ার সাইবেরিয়া ভূখণ্ড অতিক্রম করে উত্তর আমেরিকায় এসে পৌঁছয় বেরিং প্রণালী পার হয়ে সুদূর আলাস্কায়। (John Collier : Indians of the Americas). সেখান থেকে ধীরে ধীরে উত্তর পশ্চিম কানাডার ইউকন ভূখণ্ডের ভিতর দিয়ে এরা দলে দলে আসে দক্ষিণে। অতঃপর এরা নিজেদের সমাজ ও সভ্যতা সৃষ্টি করতে থাকে এবং পৃথিবীর প্রাচীনতম শস্য ভুট্টার ফলন ঘটায়। উত্তর আমেরিকা ও মেক্সিকোয় এই ভুট্টার অপর নাম 'কর্ণ্', কিন্তু কেউ 'মেইজ্' বলে না। যাই হোক, এই আদিবাসীদের সেই সব প্রাচীন সমাজ ও সভ্যতা অদ্যাবধি 'আজ্‌টেক্ ও ইন্‌কাস্' নামে উত্তর আমেরিকায় পরিচিত হয়ে রয়েছে। আমার বিস্তীর্ণ ভ্রমণের ফাঁকে ফাঁকে এদের নানা কাহিনী আমার কানে আসে। সাম্প্রতিক কালে, অর্থাৎ কমবেশি তিনশ বছরের মধ্যে এরা এ্যাংলো-স্যাক্‌সন্ জাতির হাতে অমানুষিক উৎপীড়ন সহ্য করে এবং কালক্রমে উত্তর মহাদেশের ভূমি থেকে এদেরকে নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টা দেখা দেয়। ইংরেজ প্রমুখ ইউরোপের বহু জাতি এককালে যাদেরকে বলা হত দখলকারী ও অনুপ্রবেশকারী (settlers and intruders)—তারা বেআইনী সৈন্যদল পাঠিয়ে এদেরকে উচ্ছেদ করার কাজে লাগাত। এই সশস্ত্র সেনাদেরকে বলা হত টাস্ক ফোর্স (task force)।

সভ্যতার সংস্পর্শের বাইরে এ যেন একটা ভিন্ন জগতে ছিটকিয়ে এসে পড়েছি। ভারতের আদিবাসীদের জীবন ব্যবস্থার সঙ্গে আমি পরিচিত। তাদের বীভৎস জীবন দেখে বেড়িয়েছি। দণ্ডকারণ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে এবং ওড়িশ্যার নানা স্থলে। এরা প্রায় তাদেরই আমেরিকান সংস্করণ। কিন্তু ভারতে একালে আদিবাসীদেরকে উন্নত করার বরং একটা উদ্যোগ আছে, কিন্তু এদেশে সেই উদ্যোগ নেই বললেই হয়। ইস্কুল, হাসপাতাল, কর্মসংস্থানকেন্দ্র, বেকারভাতা, বাসস্থান ব্যবস্থা প্রভৃতি কোনটারই দেখা মিলছে না। শুধু জনশ্রুতি শুনলুম, বিশেষ বিশেষ আদিবাসী-কেন্দ্রে নাকি একটা সরকারি গ্রাণ্ট দেওয়া হয়- যেটা মুষ্টিভিক্ষার মতো।

বন-বাগান নয়, চারিদিকে ঝোপজঙ্গল। পরিচ্ছন্নতা রক্ষা ব্যয়সাপেক্ষ, সুতরাং সেটা হয়ে ওঠে না। ওরা ভাঙ্গা-ভাঙ্গা ইংরেজিতে অল্পস্বল্প কথা বলছিল। আমরা ওদের ছোট্ট দোকান থেকে ছোট ছোট দু-তিনটি সামগ্রী কিনলুম। সেদিন ফিরবার পথে খুবই মর্মপীড়া বোধ করেছিলুম। যারা সংগ্রাম করতে জানেনা, অথচ বল-দর্পীর হাতে মার খেয়ে চুপ করে থাকতে বাধ্য হয়,- তাদের জন্য মন বোধহয় কাঁদে।

এইসব কথা নিয়ে যখন তোলাপাড়া করছি সেই সময়ে একদিন হঠাৎ খবর এলো, নিউইয়র্কে পর-পর দুটি সভায় আমার উপস্থিত থাকা দরকার। সুতরাং আপাতত পশ্চিম কানাডার দিকে অগ্রসর হওয়া স্থগিত রেখে আমাকে নিউইয়র্কে আবার ফিরে যেতে হচ্ছিল। ডঃ অরবিন্দ গুহ মহাশয় সপরিবারে আমাকে মাইল কুড়ি দূরে এক বিশাল প্রান্তর অতিক্রম করে নিয়ে চললেন টরণ্টো ইনটারন্যাশনাল এয়ার-ওয়েজের বিমান ঘাঁটির দিকে। সূর্যালোকিত সেই সুন্দর তৃণপ্রান্তরে দেখতে পাচ্ছিলুম ভারত থেকে আমদানি করা বৃহদ. র ব্রাহ্মণী গরুর পাল—যাদের জন্ম হয়েছে হরিয়ানায়।

বিমানে নিউ ইয়র্কের অন্তর্গত 'লা গার্ডিয়া' বিমানঘাঁটিতে এসে নামলুম এক

ঘণ্টায়। বাইরে এসেই দেখি শ্রীমতী জলি ও শ্রীমান আদিত্য হাসিমুখে গাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে। তিন সপ্তাহ আগে ওদেরকে ছেড়েছিলুম রাজধানী ওয়াশিংটনে। ওরা আমাকে নিয়ে চললো আবার শ্রীমতী রেণুকার ওখানে। কানাডায় ছিল স্নিগ্ধ বসন্তকাল, কিন্তু এখন জুনের মাঝামাঝিতে নিউ ইয়র্কে প্রখর গ্রীষ্মকাল। দিন-দুপুরে রৌদ্রের তেজ প্রবল। রাত্রের দিকে একখানা চাদর হলেই যথেষ্ট।

শ্রীমতী রেণুকার ফ্ল্যাটে একটি বন্ধুসম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল। কয়েকজন আমেরিকান ভদ্রলোক ও তাঁদের স্ত্রীরা এই নৈশভোজে উপস্থিত হয়েছিলেন। সবাইকে ধরে প্রায় ৪০ জন বন্ধু ও বান্ধবী। এঁরা অনেকেই 'ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন অফ আমেরিকা' নামক দেশবিশ্রুত প্রতিষ্ঠানের কর্মী, এবং এই প্রতিষ্ঠানেরই সভাপতি ডঃ মনোরঞ্জন দত্ত মহাশয়ের সঙ্গে পরিচয় করে সেদিন আনন্দ পেয়েছিলুম। এঁরাই পরদিন ওঁদেরই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযুক্ত 'টেগোর সোসায়েটির' বাৎসরিক পুরস্কার বিতরণ উপলক্ষে আমাকে আমন্ত্রণ জানালেন। এসব ব্যাপারে ডঃ রেণুকা বিশ্বাস পরিচালনা ও নেতৃত্ব গ্রহণ করে থাকেন।

পরদিনের সেই সুবৃহৎ সভা বসেছিল মস্ত এক হলে। ভারতীয় কনসাল-জেনারল শ্রীযুক্ত অশোক রায়, তাঁর স্ত্রী গায়ত্রী রায়, শ্রীমতী সুন্নু কোচার—যিনি দিল্লীস্থ ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর কালচারাল রিলেশনসের সেক্রেটারী, টেগোর সোসায়েটির প্রেসিডেন্ট ডঃ অম্বুজ মুখার্জি ও তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী স্নিগ্ধা মুখার্জি প্রভৃতি অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। আমাকে প্রধান অতিথি হিসাবে পুরস্কার বিতরণের ভার দেওয়া হয়েছিল। সেদিন সভায় আমাকে পরিচিত করালেন ডঃ মনোরঞ্জন দত্ত এমন ভাষায়—আজও আমি যার যোগ্য হয়ে উঠিনি। সেদিনকার পুরস্কারাদি যাঁরা পেলেন তাঁদের মধ্যে শ্বেতাঙ্গ তরুণ-তরুণীও ছিলেন কয়েকজন। আমার কপালেও কিছু জুটল বৈকি। মিনিট পনেরো সময় নিয়ে আমি একটি বক্তৃতা করেছিলুম এবং 'এসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ানস ইন আমেরিকার' পক্ষ থেকে তার সভাপতি মনোরঞ্জনবাবু যখন সর্বসমক্ষে আমাকে একটি ডলারের পার্স উপহার দিলেন, আমি তখন ক্ষণকালের জন্য হতচকিত হয়েছিলুম। ওঁরা অনেকেই জানেন আমি চিরকালের পরিব্রাজক এবং আমি সমগ্র উত্তর আমেরিকা পর্যটনে বেরিয়েছি একপ্রকার শূন্যহাতে। এখানে উপস্থিত শ্রীমতী কোচার-এর অফিস থেকে আমাকে একদা জানানো হয়েছিল, আমেরিকায় নাকি আমি বহু বন্ধু ও অনুরাগীর দেখা পাবো। কলকাতায় বসে ওঁদের কথা সেদিন আমি বিশ্বাস করিনি।

যাই হোক, পৃথিবীর বৃহত্তম মহানগরী নিউ ইয়র্কের বিভিন্ন অঞ্চল দেখার জন্য আমার সুবিধার পক্ষে একটি ভ্রমণসূচী তৈরি হয়েছিল। তার মধ্যে ছিল টাইম স্কোয়ার, ব্রডওয়ে, সেন্ট্রাল পার্ক, এম্পায়ার বিল্ডিং, আন্তর্জাতিক ব্যবসায় কেন্দ্র, সিনেমা থিয়েটার, নৃত্যকলাকেন্দ্র, ভারতীয় কনসাল জেনারেল আপিস, কলাম্বিয়া ও নিউ ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয় এবং কয়েকটি আমন্ত্রণরক্ষা। এগুলির অধিকাংশই ব্যবস্থা করেছিলেন ডঃ রেণুকা বিশ্বাস। তিনি নিজের হাতে এঁকে নগরের পথঘাটের এককটি নক্সা আমার হাতে দিচ্ছিলেন পাছে আমি পথ হারাই।

কোথায় না যাচ্ছি একে একে? হাডসন নদীর তলা দিয়ে লিঙ্কন টানেলের সুড়ঙ্গপথ পেরিয়ে যাচ্ছি 'ঘুমন্ত নগরী' নিউজার্সিতে—যার শিল্পপ্রধান চেহারা চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। 'অডিরনডক ট্রেইলওয়েজ' যার উপর তলায় ট্রেন, নিচের তলায়

ট্রেন, তারও নিচের তলায় মোটর বাসের পথ—আমার চোখে এসব ভেলকি। কখনও যাচ্ছি ভূগর্ভ রেলপথ ধরে সোজা কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়—দেখছি যেটি সুউচ্চ অট্টালিকাবহুল একটি নিরিবিলি উপশহর—যার একেকটি ফ্যাকালটি নিয়ে এক একটি অট্টালিকা। এখানে ভারতীয় বিভিন্ন ভাষা নিয়ে গবেষণা ও শিক্ষাদান করা হয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব গবেষণা বিভাগে রয়েছেন বিশিষ্ট পণ্ডিত ও মধুরভাষী ডক্টর মণি নাগ। তারপর যাচ্ছি অগণিত সংখ্যক ফ্লাইওয়ে বা উড়ালপথ পেরিয়ে ঘূর্ণ্যমান যানবাহনের দ্রুতগতির তালের সঙ্গে মিলিয়ে কোথা থেকে কোথায়। অভাবনীয় সেই সব গোলকধাঁধার ভিতর দিয়ে সাঁকো পেরিয়ে 'ইস্ট' নদীর তলা দিয়ে সুদীর্ঘ ওয়াশিংটন ব্রিজ অতিক্রম করে একখান থেকে অন্যখানে। কখনও যাচ্ছি মানহাটান, কখনও কুইনস্, কখনও বা ব্রঙ্কস্। আবার এক সময় দেখছি এসে দাঁড়িয়েছি 'ওয়াশিংটন গেটের' সামনে—ফিরে যাব 'গ্রীনউইচ ভিলেজে'। এই গেট্ হল এক বিশাল তোরণ, এর প্রতীক হল সিংহ। এরই সংলগ্ন পার্ক এবং স্মৃতিসৌধ যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম প্রেসিডেন্টের নামাঙ্কিত। আবার ওখান থেকে অদূরে 'চায়না টাউন'। এটি চীনাপল্লী—দোকান, বাজার, হোটেল, রেষ্টুরেণ্ট প্রভৃতির উপরে চীনাভাষার সাইনবোর্ড। এরা প্রাচীনকালের ঔপনিবেশিক চীনা, এরা স্বকীয়তা এবং আত্মস্বাতন্ত্র্যে প্রতিষ্ঠিত। এদের নিজস্ব সংস্কৃতিতে কোনও মিশ্রণ ঘটেনি। আমেরিকার বহু শহরে এদের নিজস্ব পল্লী। ইউরোপীয় জাতিদের বহু আগে থেকে এরা প্রশান্ত মহাসাগর পার হয়ে পশ্চিম উপকূলে এসে পৌঁছয়। ইতিহাস এদের বিরুদ্ধে একটি কথাও বলেনি। এদেরই একটা বড় অংশ আমেরিকার বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিভাগে অধ্যাপনা করে। সাহিত্যে, বিজ্ঞানে, সমাজদর্শনে, ভাষাতত্ত্বে, পূর্তবিষয়ে, নির্মাণকলায়, ব্যবসাবাণিজ্যে এরা প্রথম শ্রেণীর পর্যায়ভুক্ত।

আবার যাচ্ছি ব্রঙ্কস থেকে ব্রুকলিন, সেখান থেকে ষ্টাটেন্ আইল্যান্ড—সব মিলিয়ে পাঁচটি উপশহর নিউ ইয়র্কেরই এক একটি অঙ্গ। প্রত্যেকটির ভিতর দিয়ে পর্যটন করে চলেছি। 'ঘেটো' অঞ্চল এবং 'হার্লেম' পল্লী—যে দুটো সমাজ-বিরোধী এবং দরিদ্রদের পাড়া, কথায়-কথায় সেগুলো পার হয়ে যাচ্ছি। জনৈক গুজরাটি মহিলা চিকিৎসক শ্রীমতী গান্ধী এবং শ্রীমতী স্নিগ্ধা মুখার্জি—এঁরা নিয়ে চললেন ব্রঙ্কস এবং কুইনস-এর ভিতর দিয়ে একটি গুজরাটি বস্ত্র ব্যবসায়ীর দোকানে, নাম 'কল্পনা'। সেই দোকানে বঙ্গভাষী গুজরাটি মেয়েরা সিল্কের শাড়ি কেনাবেচা করে। আবার একদিন ঘুরছি সবজিবাজারে, মাছের দোকানে, ওষুধপত্রের আড়তে, মনোহারি ষ্টলে, বইপত্র বা কাগজের এজেন্সিতে, সিনেমায় 'ডাঃ জিভাগো' নামক ছবিটি দেখতে। একদিন গেলুম 'জলের' বিছানার দোকানে—পুরনো নিউ-ইয়র্কের এক ফুটপাথের নিচের তলায়। সেখানে জলভরা বালিশ আর তাকিয়া, জলভরা গদি আর তোষক। তুমি যদি তাদের ওপর শুয়ে পড়ো তবে ঢেউ খেলবে তার মধ্যে, তোমার সর্বাঙ্গ নাচতে থাকবে। দুপুরের রোদে একদিন গেলুম 'লাণ্ট ফনটানি' থিয়েটারে। সেখানে একটি করুণ গীতিনাট্য অভিনীত হচ্ছে। বিষয়, আমেরিকান নিগ্রো সম্প্রদায়ের দুঃখ, দারিদ্র্য, সামাজিক পীড়ন প্রভৃতি নিয়ে নাট্য রচনা করেছেন একজন নিগ্রো নাট্যকার। দর্শকদলে পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহ এবং তার শতকরা ৯৫ জনই শ্বেতাঙ্গ আমেরিকান। বেদনায় এবং প্রশংসায় উচ্ছসিত হচ্ছে দর্শকগণ কথায়-কথায়। এখানেই প্রথম আলাপ হয়েছিল শ্রীমতী

জেরির সঙ্গে। ইনি সেই বাতব্যাধিগ্রস্ত প্রাক্তন রুশীয় ইহুদী নর্তকী বৃদ্ধা শ্রীমতী অ্যানার কন্যা। ইনি বর্ষীয়সী যুবতী এবং একটি শিশুবালকের জননী। ইনি থাকেন নিউইয়র্কের এক এপার্টমেণ্ট কমপ্লেক্সের এক বহুতল অট্টালিকার ফ্ল্যাটে। এঁর সেই বাসস্থানেই প্রথম পরিচয় হয়েছিল প্রাক্তন পলাতক বিপ্লবী প্রফুল্ল মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে—যিনি এখন ৯১ বছরের বৃদ্ধ। এমন উৎসাহী, কর্মঠ এবং সামাজিক ভদ্রব্যক্তি কমই দেখেছি। ইনি প্রায় ৭০ বছর আগে ভারত থেকে এদেশে পালিয়ে আসেন। এঁর স্ত্রী হলেন প্রাক্তন আমেরিকান নর্তকী শ্রীমতী রোজ। যাই হোক, শ্রীমতী জেরি ও তাঁর স্বামীর আপ্যায়ন ও সমাদর সেদিন ভাল লেগেছিল।

একদিন একা গেলুম বহুদূরের এক ঠিকানায় এক পানজাবি চিত্রশিল্পী মিঃ কাপুরের স্টুডিয়োতে। তাঁর ছবি দেখে মুগ্ধ হয়েছিলুম। তাঁর অংকনপদ্ধতি নতুন ধরনের। একটি পদ্মের প্রত্যেকটি পল্লব একে একে লাবণ্যময়ী নারীতে পরিণত হয়েছে, এটি সুন্দর। এই ললিতকলাবিদ শিল্পী তাঁর ছোট্ট ফ্ল্যাটে ব্রহ্মচারীর জীবন যাপন করেন দেখে এলুম।

নিউইয়র্কের চারিদিকে ছোট ছোট কয়েকটি দ্বীপ পরস্পর সাঁকোর দ্বারা সংযুক্ত। সর্বাপেক্ষা যেটি বৃহৎ, সেটি বুঝি ৬০ মাইল চওড়া এবং প্রায় ২০০ মাইল লম্বা—পূর্ব ও পশ্চিমে। এটির নাম লং আইল্যান্ড। নিউ আর্ক, জার্সিসিটি প্রভৃতি ভ্রমণকালে একদা ডাঃ রঞ্জিত দত্ত আমাকে রাত্রের দিকে নিয়ে চললেন 'পেলহাম ম্যানোর' নামক এক সুন্দর বনময় উপশহরে, অদূরে আটলান্টিক সমুদ্র। ওপাশে লং আইল্যান্ডের সুদূর দৃশ্য। এপারে রাজপথের দিকে সামুদ্রিক মাছের কারবার। বহুসংখ্যক রেস্তরাঁ এখানে দেখা যায়—যাদের সাইনবোর্ডে লেখা, 'সী ফুড'।

পেলহাম ম্যানোরে ডঃ দত্ত ও তাঁর স্ত্রী ডঃ ভক্তি দত্ত—উভয়েই হাসপাতালে কাজ করেন। ঘরে আছে তিন বছরের এক শিশুকন্যা ও তার জন্য একজন 'বেবি-সীটার' শ্রীমতী সুজাতা শর্মা। ইনি এক সম্ভ্রান্ত পানজাবি পরিবারের সুশিক্ষিতা ও সুশ্রী কন্যা, অতি মধুর এবং অমায়িক। এখানে উনি মাসে তিনশ ডলার পারিশ্রমিক পান এবং প্রতি শনি ও রবিবার অন্যত্র আরেকটি কাজে যান। ওঁদের ওখানে আমি দিন চারেক ছিলুম। শ্রীমতী সুজাতার সারাদিনের যত্ন ও মিষ্ট ব্যবহারে আমি আনন্দ পেয়েছিলুম। ওঁরা স্বামী-স্ত্রী—এদেশের সর্বত্র একই নিয়ম অনুযায়ী সকাল সাড়ে ৭টায় কাজে যান এবং বিকাল ৫টায় ফেরেন।

যাই হোক, পেলহাম ম্যানোর ছেড়ে পুনরায় দ্বিতীয়বারের জন্য কানাডার পূর্বদেশ ভ্রমণের উদ্যোগ করি এবং আমার অসমাপ্ত পর্যটন উপলক্ষে ট্রেন, গ্রে-হাউন্ড মোটর বাস, ভূগর্ভ ট্রেন প্রভৃতির সাহায্যে একদিন কানাডার রাজধানী অটোয়ায় গিয়ে পৌঁছুই। সেখানে আমাকে সাদর অভ্যর্থনা জানান একজন কানাডিয়ান নাগরিক ওখানকার প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানী ডক্টর বিশ্বনাথ নন্দী ও তাঁর উচ্চশিক্ষিতা স্ত্রী শ্রীমতী বেণু।

এঁদের এখানে থাকাকালীন ডঃ নন্দী একটি বন্ধুসম্মেলনের আয়োজন করেন। যাঁরা সোৎসাহে এসেছিলেন তাঁরা সকলেই বিশিষ্ট ব্যক্তি। তাঁদের কাছে আমার নামটি সুপরিচিত। তাঁদের কেউ চিকিৎসক, বিজ্ঞানী, পূর্তবিদ, অধ্যাপক, সমাজকর্মী ইত্যাদি। তখন সবেমাত্র ভারতে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছে। আমি নিজে ভারতের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্যক অবহিত। সুতরাং তাঁদের

অমূলক সন্দেহ ও আশঙ্কা আমাকে নিরসন করতে হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে ছিলেন ডঃ দেব, দাশগুপ্ত, নীলমনি চট্টোপাধ্যায়, ডঃ পাল ও মিসেস পাল, মিঃ ও মিসেস কবির, হরি মুখোটি, ভট্টাচার্য, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, শিবদাস গাঙ্গুলী, অতুলেশ নন্দী প্রভৃতি। এঁরা আমাকে আনন্দিত করে তুলেছিলেন।

অটোয়ায় দিন তিনেক বাস করলুম। এখানকার ইণ্ডিয়ান হাই কমিশনের বাড়িটি অপেক্ষাকৃত ছোট। কাজকর্ম সামান্যই। শ্রীউমাশঙ্কর বাজপেয়ী এখন বুঝি এখানকার হাইকমিশনার। প্রয়োজন ছাড়া তিনি বোধ করি আপিসে আসেন না। আমার প্রশ্নের উত্তরে পাবলিক রিলেশনস অফিসার জানালেন, মিঃ বাজপেয়ী ঠিক এখন কোথায়, এটি তাঁকে খোঁজ নিয়ে বলতে হবে।

অটোয়া ছবির মতো সুন্দর নগরী। নদীর এপারে কুইবেক প্রদেশেক সীমা। অটোয়া নদী ভাগ হয়েছে ব্রীজের উপরে উভয়ের মধ্যে। বনবাগানে ভরা এই বৃহৎ শহর। কানাডার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর বাসস্থান হল ওপারে কুইবেক অঞ্চলের পাহাড়ের মধ্যে। তাঁর নাম ছিল ম্যাকেনজি কিং। তিনি ছিলেন অবিবাহিত এবং মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত। তিনি নাকি তাঁর মৃতা জননীর সঙ্গে কথাবার্তা বলতেন এবং অটোয়ার জনসাধারণ সেটি আজও বিশ্বাস করে। পাহাড়ের নিভৃত এক বনময় এলাকায় তাঁর বাড়িটি দেখতে গেলুম। শহর থেকে নদী পেরিয়ে ওপারে প্রায় ৩০ মাইল দূরে তিনি বাস করতেন।

অটোয়া নদী ছাড়াও আরও দুটি নদী—রিডিউ ও গেটেনিউ—ঘিরে রয়েছে এই বৃহৎ রাজধানীকে। ওপারে রকক্লিফ পাহাড়ের আরণ্যভূমি দিগন্ত প্রসারিত। তারই পাশে পাশে সুন্দর ও মসৃণ পথ এঁকেবেঁকে চলে গেছে সেই ফিলিপ হ্রদের তীরে—যেখানে এই গ্রীষ্মকালে প্রায়-নগ্ন নরনারী ও বালক বালিকারা জলের মধ্যে ঝাঁপাঝাঁপি করছে শতে শতে। ডক্টর নন্দী ও তাঁর উচ্চ শিক্ষিতা স্ত্রী শ্রীমতী বেণু এবং তাঁদের শিশু পুত্র ওই হ্রদের ধারে আমাকে নিয়ে সারাদিন কাটিয়েছিলেন।

অটোয়ার ভারতীয় মহলে প্রফেসর ডাঃ হিল খুবই শ্রদ্ধেয়। তিনি ভারতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি তিনি খুবই শ্রদ্ধাবান। তাঁর বয়স ষাটের কাছাকাছি। তাঁর আলাপচারীতে খুবই খুশী হয়েছিলুম। তিনি যেহেতু কোন কোনও কাগজে আমার কথা পড়েছেন সেজন্য 'অটোয়া সিটিজেন' নামক সংবাদ পত্র দলের দুজন প্রতিনিধিকে আমার কাছে পাঠান এবং ভারতের সর্বশেষ রাজনীতিক পরিস্থিতি নিয়ে তাঁরা আমাকে নানান প্রশ্ন করেন। ভারতে তখন সবেমাত্র জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছে এবং শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে মেয়ে-হিটলার বলা হচ্ছে। তাঁরা বোধ করি আমার মুখে কিছু সমালোচনা শুনতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আমি যখন জানালুম, ভারত গভর্ণমেন্ট আমাকে কেবলমাত্র সাংস্কৃতিক পর্যটনে পাঠিয়েছেন এবং রাজনীতিক মন্তব্য করা আমার পক্ষে সঙ্গত কারণেই বেমানান, তখন তাঁরা নিরস্ত হলেন। জানিনে 'অটোয়া সিটিজেন' পত্রিকায় এই সাক্ষাৎকার কিরূপ চেহারায় ছাপা হয়েছিল।

অটোয়ার জাতীয় সংরক্ষণশালায় একটি কাঁচের দেওয়ালে শ্বেতবর্ণে আঁকা রবীন্দ্রনাথের পূর্ণাঙ্গ চিত্র দেখে আনন্দ পেয়েছিলুম। পাশাপাশি মোট ১০টি মূর্তি আঁকা। সক্রেটিস থেকে আরম্ভ। হাজার-হাজার বছর ধরে মানববংশপরম্পরায়

সভ্যতা বিস্তারের কাজে যাঁরা সহায়তা করেছেন, তাঁদেরই একজন হয়ে রবীন্দ্রনাথ যেন হিমালয়ের সর্বোচ্চ গিরিচূড়ার মতো উন্নতশির।

মণ্ট্রিয়াল নগরে পরিভ্রমণকালে মনে হয়েছিল, এটি কানাডার সর্ববৃহৎ নগরী, এর যেন কূলকিনারা নেই। এই নগরের আভিজাত্য ও সম্পদ আমাকে অভিভূত করেছিল। যাই হোক, কানাডা ত্যাগের প্রাক্কালে গোয়েলফ্ নামক একটি জনপদে যাবার জন্য শ্রীমতী বর্ষা কেলী ও অধ্যাপক ডাঃ কেনেথ কেলীর আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলুম। তাঁদের বাড়ি টরণ্টো থেকে মাইল পঞ্চাশেক দূরে। শ্রীমতী বর্ষা ওরফে মঞ্জু কলকাতার মেয়ে। তিনি শুভেন্দ্র মিত্র মহাশয়ের কন্যা, এবং এই মহিলার বাল্যকাল থেকেই ওঁকে চিনি। ভারত থেকে শিল্পী, গায়ক সঙ্গীতজ্ঞ—যাঁরাই আসেন, এঁরা উভয়েই তাঁদেরকে সমাদর ও আপ্যায়ন করেন।

এখানে যেটি আমার বিস্ময়ের উদ্রেক করেছিল, সেটির নাম জেলার্স (Zellars) মার্কেট। হাজার-হাজার 'শপিং সেণ্টার' উত্তর আমেরিকার সর্বত্র ছড়ানো, এবং তাদের প্রতিষ্ঠানগুলিতে শত শত কোটি ডলারের সামগ্রী কেনাবেচা চলে। কিন্তু জেলার্স দেখে অবাক হয়েছিলুম এই কারণে যে, এই অতি বৃহৎ অট্টালিকার ভিতরে অন্তত তিন মাইল নধর মোটা কার্পেটের মেঝের উপর দিয়ে হাঁটলে তবেই সব দোকানগুলি দেখা যায়। হাজার-হাজার ক্রেতা সর্বত্র ঘুরছে, কিন্তু কোথাও টুঁ শব্দ নেই। এটি দোতলা ভবন, এবং একশ একর জমির উপরে এটি নির্মিত। ভিতরে ব্যাঙ্ক, পোস্ট-অফিস, রেস্টুরেণ্ট- সমস্তই বর্তমান।

এখান থেকে বিদায় নেবার কালে কানাডাকে দেখে যাচ্ছি ঘন সবুজ। ফুলে, ফলনে, ফসলে এ যেন এক আশ্চর্য পৃথিবী—শোভা ও সৌন্দর্যের অমরাবতী। কিন্তু সেপ্টেম্বর থেকে যখন ধীরে ধীরে 'ফলস্'-এর কাল আরম্ভ হবে, তখন কানাডার বনে-অরণ্যে-প্রান্তরে-শস্যক্ষেত্রে হলুদবর্ণ ছেয়ে যাবে, অক্টোবরের শেষ দিকে হবে রক্তরঙ্গীন, এবং নবেম্বরের শেষে পাতা ঝরবে। উত্তর আমেরিকায় এই ঝরনের নামই ফল্স্। বিপুল পরিমাণ বরফ পড়তে থাকবে নবেম্বরের শেষ থেকে। পথ ঘাট মাঠ জলাশয়—সমস্ত বরফে অদৃশ্য হবে। প্রত্যেক বাড়ির গ্যারাজ চাপা পড়বে, দোতলার জানালা ছাড়িয়ে প্রায় কুড়ি ফুট বরফ উঁচু হবে। পৌরকর্মীরা পথে-পথে প্রতি ঘণ্টায় বুল-ডোজারের সাহায্যে বরফ সরিয়ে মোটরপথ বার করবে।

যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষুদ্রতম অঙ্গরাজ্য 'রোড আইল্যাণ্ডের' রাজধানী প্রভিডেন্স নামক নগরে একটি দিন বাস করেছিলুম। আমন্ত্রণ করেছিলেন এখানকার এক ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের সিনিয়র কেমিষ্ট অসীমবিকাশ রায় মহাশয়। এই নগরীর শ্বেতপ্রস্তর নির্মিত সরকারী ভবন 'ক্যাপিটল' তার শোভা ও সৌন্দর্যে তাজমহলকেও যেন হার মানায়। এখানকার বেদান্ত আশ্রমের বাঙ্গালী স্বামীজি সকলেরই শ্রদ্ধার পাত্র। এই শহরে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসটি পাঁচ বর্গমাইল জুড়ে রয়েছে। এক গুজরাটি বণিক তাঁর ব্যবসায় পরিচালনা করেন এই দেশে। এই প্রতিষ্ঠানের নাম 'স্পেকট্রাম্ ইণ্ডিয়া'। শুনলুম এই প্রতিষ্ঠানের বহু শাখা যুক্তরাষ্ট্রে ছড়িয়ে রয়েছে।

রোড আইল্যাণ্ডের পাশেই 'মাসাচুসেট্স্' নামক অঙ্গরাজ্য। স্বনামখ্যাত কেনেডি পরিবার এখানকারই মানুষ। এই প্রদেশ পাণ্ডিত্য, প্রতিভা ও মনীষার জন্য পৃথিবী প্রসিদ্ধ এবং যুক্তরাষ্ট্রের সর্বপ্রকার উন্নতির পথে বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের

অবদান অনন্যসাধারণ। এই বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যিনি সংযুক্ত রয়েছেন তিনি বাঙলার এক পলাতক প্রাক্তন বিপ্লবী ননীগোপাল বসু মহাশয়ের পুত্র। বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'কম্পিউটর' নামক যে যন্ত্র চন্দ্রযান 'এপলো' নির্মাণে সহায়তা করে, এরই এক পর্যায়ের নাম 'বসু সাউন্ড সিসটেম।' ননীবাবুর ওই বিশ্ববিশ্রুত ছেলের নাম অমরগোপাল। 'এপলো' রকেটের নির্মাণকাজে যে বাঙালী বৈজ্ঞানিকের কিছু অবদান আছে, এটি শুনে গর্ববোধ করেছিলুম।

বোস্টন শহরের খুব কাছে রানডলফ্ নামক জনপদে যে তরুণ গণিতবিদের বাড়িতে আতিথ্য নিয়েছিলুম তিনি এক সুদর্শন ও আত্মপ্রত্যয়ী যুবক শ্রীমান সোমনাথ মুখার্জী। তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী বাণীর স্বভাব মাধুর্য, সদ্বিবেচনা ও মিষ্ট ব্যবহার আমাকে মুগ্ধ করেছিল। উভয়ে প্রায় সমবয়স্ক। শ্রীমান সোমনাথ কাশীতে মানুষ হয়। চোদ্দ বছর বয়সে হায়ার সেকেন্ডারি পাস করে। উনিশ বছর বয়সে এম এস সি এবং একুশ বছর বয়সে গণিতবিদ্যায় পি এইচ ডি পায়। এখন সে পরিণত যুবা। মাসাচুসেট্স্ ইনসটিটিউট অফ টেকনোলজির মতো জগৎ প্রসিদ্ধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সে গণিতবিদ্যার এক বিশিষ্ট অধ্যাপক। এমন প্রতিভাবান যুবককে চট করে খুঁজে পাওয়া কঠিন। সোমনাথ নিজেই শিক্ষকতা করে শ্রীমতী বাণীকে বি এ পাস করায়।

বোস্টন নগরে মোট ১৩টি বিশ্ববিদ্যালয় দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। প্রত্যেকটিতে হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী। এখানকার বহু অধ্যাপক বিশ্ববিশ্রুত পণ্ডিত ও মনীষী। বিজ্ঞান বিষয়ে গবেষণার জন্য এখানকার বহু বিজ্ঞানী একে একে নোবেল পুরস্কার লাভ করেছেন। ভারতীয় বিজ্ঞানী মিঃ হরগোবিন্দ খোরানা এই বোস্টনে কাজ করেই নোবেল পুরস্কার পান। বলা বাহুল্য, আমেরিকা সমস্ত পৃথিবীর সকল দেশ থেকে প্রতিভাবানদের ডেকে এনে নিজ দেশের উন্নতি ও সমৃদ্ধি সাধন করেছে। এদের মনোভাব এই, পৃথিবী চুলোয় যাক, শুধু আমেরিকার উন্নতি হোক। আমেরিকায় ভ্রমণকালে সর্বত্রই দেখতে পাচ্ছি এখানকার জনসাধারণ অন্যের প্রতি উদাসীন, আত্মকেন্দ্রিক ও স্বার্থসচেতন।

এই অঙ্গরাজ্যে বোস্টন ছাড়া একটির পর একটি জনপদ ভ্রমণ করছিলুম। যেমন নীডহাম, ওয়েস্ট উড, ওয়েলসলি, আর্লিংটন, ক্যামব্রিজ, সোমারভিল, মিলটন, বেলমণ্ট, লেক্সিংটন, কুইনি, ব্রুকলিন, নিউটন প্রভৃতি। বাঙালী সমাজকে একে একে দেখছিলুম। বিজ্ঞান-বিদ্যায় ও পাণ্ডিত্যে যাঁরা মনোহরণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে হিমাংশু ভট্টাচার্য, দেবজিৎ বিশ্বাস, সুনীল দত্ত, শম্বর দত্ত, অনিল ঘোষ, প্রশান্ত মিত্র, সত্য সরকার, সুনীল দাস প্রভৃতি এবং মহিলাদের মধ্যে শ্রীমতী চিত্রা বিশ্বাস, দীপা ভট্টাচার্য এবং আরও অনেকে। এঁদের মধ্যে শতকরা পঁচানব্বুই জন মহিলা ও পুরুষ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যায় পি এইচ ডি। এঁদের কাছেই শুনলুম হার্বার্ড বা আমেরিকার যে কোনও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট করতে গেলে ১৫/১৬টি 'সেমেস্টার' শেষ করতে হয়, তিন থেকে পাঁচ বছর লাগে, দৈনিক ১৪/১৫ ঘণ্টা জন্তুর মতো খাটতে হয়—অন্য কোনও কাজ করা যায় না। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অধ্যাপক ও বিজ্ঞান বিষয়েব গ্রন্থকার অনিল ঘোষ এবং ম্যালেশিয়া-সিঙ্গাপুরের এক তরুণী মহিলা শ্রীমতী হেনা মুখার্জি—যিনি হার্বার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে

ডক্টরেট করতে এসেছেন—তাঁরাও আলাপচারী করলেন। অধ্যাপক ঘোষ বাংলা সাহিত্যের বিশেষ উৎসাহী পাঠক। তিনি 'দেশ' পত্রিকার প্রতি অনুরক্ত।

বোস্টন থেকে ৬০ মাইল দূরে পার্বত্য উপত্যকা, বড় বড় জলাশয়, ছোট ছোট শহর প্রভৃতি ছাড়িয়ে অধ্যাপক ঘোষ আমাকে সন্ধ্যার দিকে নিয়ে যাচ্ছিলেন 'কোহাসেট্' নামক একটি গ্রামীণ শহরে। এটি জনবিরল অঞ্চল। সঙ্গে ছিলেন মিসেস ঘোষ, সিঙ্গাপুরের শ্রীমতী হেনা মুখার্জি ও ঘোষের শিশুকন্যাটি। একটি আঁকাবাঁকা ছায়াপথ ধরে অবশেষে যেখানে এসে পৌঁছলুম সেটি পাহাড়ের এক গর্ভলোক। লোকালয়ের থেকে অনেক দূরে এই গহন অন্ধকার বন মধ্যে পরলোকগত স্বামী পরমানন্দ একটি বেদান্ত আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। এই আশ্রমের যিনি বর্তমান পরিচালিকা, তিনি হলেন শ্রীমতী গায়ত্রী দেবী। গায়ত্রী দেবী পরমানন্দের ভ্রাতুষ্পুত্রী। তরুণ বয়সে তাঁর বৈধব্য ঘটে এবং তিনি তাঁর কাকার সঙ্গে আমেরিকায় এসে কালিফর্ণিয়ায় বাস করেন। এই ধর্মপ্রাণা বেদবতী নারী সম্পূর্ণভাবে সংসারধর্ম পরিত্যাগ করে অধ্যাত্ম তপস্যায় মনোনিবেশ করেছেন। পরমানন্দ ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীরামকৃষ্ণের মন্ত্রসিদ্ধ। কিন্তু মহিলার পক্ষে বেদান্ত আশ্রমের অধিবাসিনী হবার পথে প্রতিষ্ঠানগত বাধা বিপত্তি ছিল। সেই কারণে পরমানন্দ এক পৃথক আশ্রম নির্মাণ করেন এবং সেখানেই গায়ত্রী বসবাস করতে থাকেন। গায়ত্রী অল্প বয়স থেকেই বহু আন্তর্জাতিক সম্মেলন ও সমাবেশে ভারতের নারীসমাজের মুখপাত্রী বলে পরিচিতা হন। এই বিদুষী মহিলার কথা বহুকাল থেকে শুনে এসেছি।

গায়ত্রী সম্বন্ধে আমার কৌতূহলের আরেকটি কারণ ছিল। এঁদের পরিবারের সঙ্গে বহুকাল ধরে আমি ঘনিষ্ঠ। এঁর পিতা স্বর্গত বিভু গুহঠাকুরতার সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। এঁরা বোধহয় আট ভগ্নী ও চার ভাই। গায়ত্রী মেজো. বড় বোন সাবিত্রীকে আজও আমি দিদি বলি। সাবিত্রীর স্বামী ডক্টর সুকুমার দত্ত আমার বন্ধু ও আমার বহু রচনার ইংরেজি অনুবাদক। বড় ভাই প্রভু গুহঠাকুরতা আমার প্রিয় বন্ধু ছিলেন। ভগ্নীদের মধ্যে মৈত্রেয়ী ও আয়েত্রীকে বিশেষভাবে জানি। এঁরই কনিষ্ঠা ভগ্নী অরুন্ধতী আমার 'মহাপ্রস্থানের পথে' ছবিটিতে প্রথম অভিনয় করে খ্যাতিলাভ করেন।

কোহাসেট্-এর এই আশ্রমটি নতুন। বাড়িটি কাঠের। ভিতর থেকে প্রথম যে তরুণীটি এগিয়ে এসে স্বাগত জানালেন তিনিও অধ্যাত্মবাদিনী। তাঁর নাম সোমা চক্রবর্তী। তিনি শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন শিক্ষক ও রবীন্দ্রনাথের প্রথম কাব্যসমালোচক স্বর্গত অজিত চক্রবর্তী মহাশয়ের পৌত্রী। এই সুদর্শনা তরুণীর শান্ত, নম্র ও মিষ্টভাবটি এই 'আনন্দ আশ্রমের' আবহাওয়াকে পবিত্রতরো করে তুলেছিল। এই নিভৃত বনেও খান পঁচিশেক মোটর দাঁড়িয়ে রয়েছে।

স্বল্পালোকিত একটি হলঘরে প্রায় ৫০ জন শ্বেতাঙ্গ আমেরিকান নরনারীর সম্মুখে বসে ব্রহ্মবাদিনী গায়ত্রী দেবী সেদিনের 'সারমন্' দিচ্ছিলেন। পরনে তাঁর গৈরিকবাস, গলায় রুদ্রাক্ষ ও মোতির মালা। নধর ও আয়ত দুই চক্ষু। তাঁর সেই করুণ মধুর কণ্ঠের ভাষণে শোনা যাচ্ছিল যেন যাজ্ঞবল্ক্যের তপোবনের সামগান। সে যেন কোন মুমুক্ষু আত্মার আর্তনাদ। শ্রোতা ও শ্রোত্রীরা নিস্তব্ধ মুগ্ধ চোখে চেয়ে রয়েছে।

রাত প্রায় সাড়ে দশটায় সেই অন্ধকার বিটপীবনলোকের যোগতন্দ্রা ভাঙলো। বাইরের হলটিতে এসে একে একে অনেকেই বসলেন। এই হলের এপাশে ওপাশে পরমহংস, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, আনন্দময়ী, পরমানন্দ, গৌতম বুদ্ধ—অনেকেরই ছবি দেখতে পাচ্ছিলুম। ওইখানেই এসে বসেছি এমন সময় শ্রীমতী সোমা কাছে এসে ডাকলেন।

উঠে গিয়ে সোজা গায়ত্রীর কাছে মুখোমুখি বসলুম। উভয় উভয়কে এই প্রথম দেখলুম বটে, কিন্তু দুজনেই দুজনকে জানি। আমরা খুব হাসছিলুম। এখন আর অধ্যাত্মতত্ত্বের কথা নয়, এখন পারিবারিক কথাবার্তায় উৎসাহিত হলুম। দিদি এসেছিলেন গত বছরে। সুকুমারবাবুর মৃত্যুতে দিল্লীর আসর ভেঙে গেল। বলাই এখন চাকরি করে অমুক প্রতিষ্ঠানে। অরুন্ধতীর ছবি তাঁর খুব ভাল লেগেছিল।

রাত বারোটার পর সেদিন রানডলফ্-এ ফিরেছিলুম।

॥ ৭ ॥

মাসাচুসেট্স্ ভ্রমণের পর এবার দক্ষিণ পথে নেমে আসছিলুম। যাবার সময় বোস্টন থেকে উত্তর পথে নিউ হ্যাম্পসায়ার ও ভারমণ্ট—এই দুটি অঙ্গরাজ্য ভ্রমণ করি। কিন্তু ফেরবার পথে নিউ ইয়র্ক স্টেটের রাজধানী আলবানি না দেখে ফিরবার যো ছিল না। আমাকে আকর্ষণ করেছিল এদের নিত্যকর্মের বাঁধাধরা নিয়মানুবর্তিতা। এতকাল ধরে যুক্তরাষ্ট্র সম্বন্ধে যত নিরুত্তর প্রশ্ন ছিল মনে মনে, তার জবাব পাওয়া আমার দরকার ছিল।

যে কোনও স্টেটেই প্রবেশ করছি, দেখছি প্রতি মানুষের কর্মজীবনের প্রতি আনুগত্য। কর্মস্থলে পৌঁছবার নিয়ম কোথাও সকাল সাতটা, কোথাও বা আটটা। সমগ্র উত্তর আমেরিকার কোনও অংশে এর তিলমাত্র ব্যতিক্রম নেই। স্কুলে, কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে ওই একই নির্দিষ্ট নিয়ম। ছাত্ররা যদি লক্ষ্য করে শিক্ষকের গাফিলতি, তাঁরা যথাস্থানে নালিশ জানিয়ে বলে আমরা পড়তে এসেছি, সারাদিনে আমাদের দরকার মতো কাজ শেষ করা চাই! উনি পারিশ্রমিক নিচ্ছেন, কর্তব্য করবেন না কেন? সুতরাং সব স্কুলেই ছাত্র ও শিক্ষকদের মধ্যে থাকে সুকঠোর নিয়মানুবর্তিতা, সেখানে কোনও পক্ষেরই ফাঁকি দেবার উপায় থাকে না। ব্যতিক্রম ঘটলে বহু স্কুলের বহু শিক্ষককেই অপদস্থ হয়ে কাজ ছেড়ে যেতে হয়। ওদিকে ছাত্ররাও সর্বত্র একটি বিশেষ নীতিতে আবদ্ধ থাকে। এদেশের কোনও ছাত্র বা ছাত্রী বাড়িতে পড়া করে না, পরীক্ষা ইত্যাদির কালেও নয়। স্কুলের বাইরে তাদের একমাত্র কাজ খেলাধুলো, গালগল্প এবং টেলিভিসনে ছবি দেখা। সকাল ৭টা বা ৮টা থেকে স্কুল—ছুটি সেই বেলা চারটে। দুপুরের খাওয়া স্কুলে, টিফিন মাত্র আধঘণ্টা। ছোট থেকে গান শেখা, ছবি আঁকা, সৌজন্যশিক্ষা, বিজ্ঞান বিষয়ে পাঠ নেওয়া, টি-ভির ছবি দেখা, ইতিহাস ও সমাজ বিজ্ঞান জানা, ক্রীড়াজগতের খবর রাখা, মানচিত্র নিয়ে ভূগোলের আলোচনা করা, ব্যাকরণ পড়ে যাওয়া। ছয় থেকে সতেরো বছর বয়স পর্যন্ত শিক্ষকরা বিশেষ শিক্ষণ পদ্ধতি অনুসারে ছাত্রছাত্রীদেরকে টনটনে করে তোলে এবং সেই

পরীক্ষার নাম 'হায়ার সেকেন্ডারী।' একটিও ছাত্র বা ছাত্রী সেই পরীক্ষা বা সমীক্ষায় ফেল করে না। আঠারো বছর বয়সে ওই বিদ্যা নিয়েই তারা রোজগার করতে থাকে। তাদের উপযুক্ত কাজ পাওয়া একেবারেই কঠিন নয় এবং সরকারি নিয়ম অনুসারে সর্বাপেক্ষা কম বেতনও সপ্তাহে প্রায় একশ ডলার। এই কারণে অধিকাংশ আমেরিকান মেয়ে বা পুরুষ উচ্চতর শিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে যায় না। তারা নিজ নিজ শক্তি ও যোগ্যতা অনুযায়ী উপার্জন বাড়াতে থাকে। পথেঘাটে হাটে বাজারে হোটেলে দোকানে সাধারণ আমেরিকান যাদেরকে দেখা যায়, তারা কেউ বিদ্যাদিগগজ নয়—তারা আপিসের বাবু, হোটেলের কর্মী, দোকানের বিক্রেতা, বাস বা ট্রেনের চাকুরে, পথের ঝাড়ুদার প্রভৃতি। একালে তাদের অঙ্ক শিখতে হয় না, কারণ হাতের কাছেই ক্যালকুলেটর মেসিন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা খুবই ব্যয়বহুল, সাধারণত তার খরচ মা-বাপ দেয় না—ছেলেমেয়েরা রোজগার করে শিক্ষার খরচ চালায়। প্রণয়ী বা প্রণয়িণীর উচ্চশিক্ষার জন্য বহু তরুণ-তরুণী উপার্জন করে খরচ চালায়। পিতা-মাতার কাছে হাত পাততে তাদের সম্মানে বাধে। ১৪ বা ১৫ বছর বয়স থেকে বহু মেয়ে জন্মনিরোধক ট্যাবলেট খেতে থাকে নিয়মিত। বিবাহ হোক বা না হোক ১৮ বছর বয়স থেকেই ছেলেমেয়ে নিঃসঙ্কোচে ও নির্ভয়ে একত্র কোথাও গিয়ে রাত্রিবাস করে, মা-বাপ এতে দুঃখিত বা চিন্তিত হয় না। ওরা বলে, উচ্চশিক্ষার সঙ্গে যৌনজীবনের কোনও যোগ নেই। বহু বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে ছাত্রছাত্রী একই ঘরে রাত্রিবাস করতে পারে—এমন ব্যবস্থা আছে। বহু উচ্ছৃঙ্খল ছেলে বা মেয়ে বিজ্ঞান বিষয়ে এম-এস বা পি-এচ-ডি করে মোটা চাকরি পায় যেখানে-সেখানে যে-কোনও স্টেটে। ১৬ বছরের ছেলে বা মেয়ে হোমোসেক্সুয়াল হলে নিন্দা বা কানাকানির ঢেউ ওঠে না। এদেশে ও বিষয়ে বহু সাহিত্যগ্রন্থ লেখা হয়, সংবাদপত্রে এ নিয়ে বহু গবেষণা চলে এবং এটিকে তরুণ জীবনের অঙ্গ বলেই ধরে নেওয়া হয়। স্বাস্থ্য, রূপ এবং উচ্চশিক্ষার বিভিন্ন গুণপণা আছে—এমন লক্ষ লক্ষ ছেলে ও মেয়ে যৌনব্যাধিতে ভুগছে, এটি মেডিক্যাল জার্নাল ওলটালেই দেখতে পাওয়া যায়। এরা খায় বেশি, রোজগার করে তার চেয়েও বেশি—সুতরাং অভাবের চেহারা দেখে না, অন্নসংস্থানের জন্য কেঁদে বেড়ায় না। এরা কথায়-কথায় ঘর বাঁধে, কথায়-কথায় ঘর ভাঙে। এদেশে অভাবগ্রস্ত তারাই, যাদের গাড়ি পুরনো, যাদের ঘরে সোফার সেটটা ছিঁড়ে গেছে, যাদের বাড়িঘর রংচটা, যারা কম দামের পোশাক পরতে বাধ্য হয়।

পেলহাম ম্যানোর ছাড়বার আগে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করছিলুম। তিনি নিজের হাতে তাঁর গাড়ি মেরামত করছিলেন। ভদ্রলোকের নাম মিঃ উইলসন। তাঁকে প্রশ্ন করলুম, আপনার সর্বাপেক্ষা প্রিয়বস্তু কি? তিনি একবারটি আমার দিকে চেয়ে হাসলেন। বললেন, প্রত্যেক আমেরিকানের যা প্রিয়, আমারও তাই। সোমবার থেকে শুক্রবার প্রতিদিন আটঘণ্টা কাজ করি, শনি-রবিবার ছুটি। ওই দুদিন সাপ্তাহিক বাজার, কেনাকাটা, নিজের লনের ঘাস কাটা, ঘরদোর ঝাড়ামোছা, গাড়ি ধোওয়া-মোছা, মেরামতি কাজ কিছু, জঞ্জাল পরিষ্কার। রবিবার আউটিং, বাইরে-বাইরে খাওয়া, বন্ধুবান্ধব বা আত্মীয়দের সঙ্গে দেখাশোনা, এক সঙ্গে ডিনারে বসা, গালগল্প করা। সাধারণ আমেরিকানের প্রিয়বস্তু হল যে কোনও কাজ।

ওঁরই সঙ্গে আলাপ করে আরেকবার জানলুম সমগ্র আমেরিকায় কোনও চাকরির

নিরাপত্তা নেই। কাজে আসতে পাঁচ মিনিট দেরি হলে কৈফিয়ৎ লাগে। সকলেরই কাজ সুনির্দিষ্ট। প্রত্যেকদিনের কাজ নির্ভুলভাবে শেষ করতে হয়, সেখানে ক্ষমা নেই। একদিনের নোটিসে ছোট বড়—যে কোনও কর্মী বা অফিসারের চাকরি চলে যায়। আমার অপর একটি প্রশ্নের উত্তরে উইলসন বললেন, একজন কেন, দশ হাজার লোক ছাঁটাই হলেও ইউনিয়নের কিছু বলবার থাকে না। তারা যুক্তিবাদী। উৎপাদন বন্ধ হচ্ছে বলেই আজকাল লোকে টেকসাসের দিকে যাচ্ছে। সেখানে লোকে কাজ পাচ্ছে প্রচুর। বেকার-ভাতা থাকার জন্য আমেরিকার লোক চাকরি গেলে ভয় পায় না। স্বামী-স্ত্রী এক সঙ্গে বেকার হলে প্রায় দু'শ' ডলার প্রতি সপ্তাহে।

আপনাদের দেশে লেবার ইউনিয়নের কাজকর্ম কি প্রকার? তাদের সঙ্গে রাজনীতির যোগ কতখানি?

উনি বললেন, রাজনীতির সঙ্গে লেবার ইউনিয়নের যোগ নেই। ওদের কাজ হল শ্রমিকদের নিয়মানুগত্য রক্ষা করা, উৎপাদন বাড়ানো, ফন্দিবাজ শিল্পপতিদের মুখোশ খুলে ধরা, শ্রমিকদের মাইনে বাড়ানো। কিন্তু যুক্তিবাদের বাইরে ওরা যায় না। মনে রাখবেন এ দেশের উচ্চপদস্থ কোনও ব্যক্তির চেয়ে একজন দক্ষ মিস্ত্রি অনেক বেশি রোজগার করে। একজন 'হোয়াইট কলার' বাবুর চেয়ে রাস্তার একজন সুইপারের রোজগার বেশি। একজন সুদক্ষ শ্রমিক প্রতি ঘণ্টায় ১৫ ডলারও রোজগার করে। অত বড় শ্রমিক নেতা জর্জ মিনিও একথা জানেন। তিনি বহু ইউনিয়নের অধিনায়ক।

তিনি কি পারিশ্রমিক বাড়াবার কর্তা?

নিশ্চয়ই। উইলসন সেদিন জবাব দিয়েছিলেন, শিল্পপতিদের গলা টিপতে তিনি জানেন। আমি হাসছিলুম, কারণ তাঁর কথায় খুশী হয়েছিলুম। কিন্তু আমার দাঁড়াবার সময় ছিল না।

ফিলাডেলফিয়ায় এসে পৌঁছলুম ৪ জুলাই, সেদিন আমেরিকার স্বাধীনতা দিবস। সেদিন ১৯৯ বছর স্বাধীনতার কাল পূর্ণ হয়ে ২০০ বছরে পা দিচ্ছে। এই নগরই ছিল যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম রাজধানী, এবং এখানকার 'লিবার্টি পার্ক' সংলগ্ন এক সুবৃহৎ অট্টালিকা থেকে ইংরেজ রাজশক্তির বিরুদ্ধে ১৭৭৬ সালের এই তারিখে সম্পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি ঘোষণা করা হয়। এ ব্যাপারে ভারতের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের মিল পাওয়া যায় আগাগোড়া। অতঃপর এই প্রাচীন ও বনেদী শহর থেকেই ১৭৮৭ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর তারিখে যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র ঘোষণা করা হয়েছিল। কিন্তু এর জন্য ১৭৬৫ থেকে এদেরকে অবিশ্রান্ত সংগ্রাম করে যেতে হয়। এরই সঙ্গে ছিল অন্তর্দ্বন্দ্ব, নেতায়-নেতায় বিবাদ, প্রতিক্রিয়াশীলদের আচরণ, পারস্পরিক হানাহানি, ভূমিবণ্টন বিষয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, জবর-দখল এবং ঈর্ষাবিদ্বেষের বন্যা। বলা বাহুল্য, তখনও আফ্রিকান নিগ্রোদের নিয়ে কেনাবেচা চলছে এবং আমেরিকান আদিবাসী—যাদেরকে 'রেড ইণ্ডিয়ান' বলে মিথ্যা নামে ডাকা হত—তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করার কাজ চলছে। একালে 'রেড' শব্দটা বাদ গিয়ে শুধু 'ইণ্ডিয়ান' বলা হচ্ছে—যেটির ভিত্তি আগাগোড়া অলীক। কিন্তু একদিকে এদেশের পুরনো ইতিহাসে দেখতে পাচ্ছি ইণ্ডিয়ান মানেই ছিল সভ্যতালেশহীন একটা জাতি, এবং অন্যদিকে ভারতকেও তখন বলা হত অ-সভ্য ইণ্ডিয়া! আমেরিকানরা ধরে নিত এ দুটোই এক

অর্থাৎ ইণ্ডিয়ান মানেই বর্বর জাতি। তৎকালীন ইংরাজরা এদের সকলের সম্বন্ধেই বলে বেড়াত, White man's burden!

লিবার্টি পার্কের সরকারি ভবনটি এখন যাদুঘর ও পাঠাগারে পরিণত। সেখানে রয়েছে একটি বড় আকারের লৌহঘণ্টা—যেটিতে ফাটল ধরে রয়েছে। স্বাধীনতা ঘোষণাকালে এখান থেকেই ঘণ্টা-রব শোনা গিয়েছিল। অনেকগুলি ছবি টাঙানো দেখতে পাচ্ছিলুম। এঁরা সকলেই ছিলেন বড় বড় সংগ্রামী নেতা, প্রশাসক, সমাজ-সংস্কারক ও রাজনীতিবিদ্।

পেন্সিলভানিয়া নামক অঙ্গরাজ্যের রাজধানী হল এই সুন্দর ও প্রাচীন ফিলাডেলফিয়া নগরী। এখানে বহুতল বাড়ি খুবই কম এবং এটি নিউ ইয়র্কের মতো ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র নয়। এ যেন দেড়শ' বছর আগে থেকে থেমে গেছে এর সৌন্দর্য ও আভিজাত্য নিয়ে। সর্বাধুনিক কালের প্রযুক্তিবিদ্যার বিস্ময়কর প্রগতি যেন আজও এখানে পৌঁছয়নি। এই নগরীকে পূর্বদিকে ঘিরে রয়েছে নিউ জার্সি নামক ক্ষুদ্র স্টেট। ভারতের মতো প্রতি স্টেটের সীমানা নির্দেশ নিয়ে এককালে এদেশে সাম্প্রদায়িক অশান্তি বেধে উঠত। অর্থাৎ জার্মান, ইতালীয়ান, ফরাসী, সুইস, বেলজিয়ান, ড্যানিশ, সুইডিশ, পোলিশ—সেই অশান্তি থেকে কেউ বাদ যেত না। সবাই জানে মধ্য আমেরিকা একদিনে যুক্তরাষ্ট্র হয়ে ওঠেনি। কিছুকাল আগেও ফরাসী উপনিবেশ লুইজিয়ানা, স্পেনীয় উপনিবেশ নিউ মেক্সিকো, রুশ-মঙ্গোলীয় এলাকা আলাস্কা, চীন-জাপানী-পলিনেশীয় দ্বীপ 'হাওয়াই',—এরা ছিল বাইরে এবং তখন ৫০ তারকাযুক্ত মার্কিন পতাকা এমন করে ওড়েনি।

পেন্সিলভানিয়ায় এখনও একটি অতি প্রাচীন সম্প্রদায় বাস করে, তাদের নাম 'আমিস্'। 'আমিসরা' অনেকটা জলপাইগুড়ি জেলার টো-টো গোষ্ঠীর মতো—যারা সভ্যজগৎ থেকে দূরে থাকে। কিন্তু আমিসরা একটু পৃথক ধরনের। এরা ইলেকট্রিক এবং আধুনিক যন্ত্রাদি ব্যবহার করে না। নিজেদের হাতে এরা জমি চাষ করে, সুতো কাটে, কম্বল বোনে, বাসন তৈরি করে, জুতো বানায়, চর্বির আলো জ্বালে, তামাক খায়, নিজেদের বিবাহপ্রথা চালু রাখে এবং মেয়েরা আপাদমস্তক জোব্বা পরে। কল বা পাইপের জল এরা ব্যবহার করে না, কাঠ ও মাটি দিয়ে ঘর বানায় এবং কোনও ধর্মবিশ্বাসকে তারা গ্রাহ্যের মধ্যে আনে না। সর্বাপেক্ষা বিস্ময়, এরা শহর বাজারের ত্রিসীমায় আসে না এবং গাছগাছড়ার রস খেয়ে অসুখ সারায়। বিলাস বৈভব এবং আধুনিক উপকরণে এদের আস্থা নেই। চুরি-ডাকাতি এদের মধ্যে নেই। এরা রাষ্ট্রকে খাজনা দেয় না বা কোনও গভর্নমেণ্টকে স্বীকার করে না। এদের কাছে অস্ত্রশস্ত্রও নেই, এরা আদিবাসীও নয় এবং নিজেদের সমাজেই বিচারব্যবস্থা করে নেয়। এরা নিরামিশাষী।

ফিলাডেলফিয়ায় বাঙ্গালীর সংখ্যা কম নয়। এঁরা প্রতি বছরে দুর্গাপুজো করেন। কৌতুকের বিষয়, গত বছরে এখানকার 'সেভিয়র' নামক একটি খৃষ্টীয় গির্জার ভিতরে দুর্গার প্রতিমা বসিয়ে তিন দিন ধরে বাঙ্গালীরা পুজো করেন। শুধু বৈশিষ্ট্য এই, পুজো-পাবর্ণটি পালন করা হয় সপ্তাহ শেষে, অর্থাৎ শুক্রবারের সন্ধ্যা থেকে রবিবার রাত্রি পর্যন্ত। পাঁজি মিলিয়ে পুজো নয়, ছুটির বারের উৎসব। 'সেভিয়র' গির্জার পাদরিরা প্রতিমা প্রতিষ্ঠায় আপত্তি করেননি। প্রকৃতপক্ষে যুক্ত-রাষ্ট্রের গির্জা ও সিনাগগগুলি এখন অনেকটা অনাদৃত। প্রযুক্তিবিদ্যার প্রবল

অগ্রগতির প্রভাবে ধর্মবিশ্বাস কমে এসেছে। লোকে এখন virtue মানে, religionকে স্বীকার করতে তাদের বাধে। চন্দ্ররহস্য যখন ভেদ করা গেছে, ভগবৎ রহস্যজাল ভেদ করতে আর কত দেরি? এ বিশ্বের মহাকাশ কম্‌পিউটার-এর সাহায্যে এখন করায়ত্ব। এই ত' সেদিন দেখলুম, ওঘরে বসে ছোট্ট এক কম্‌পিউটার-এর বোতাম টিপলো, এ ঘরে টি-ভি বন্ধ হয়ে গেল। ধর্মের কৌলিন্য আমেরিকায় কমে এসেছে।

শহর থেকে কিছু দূরে 'লান্‌ড্রিলো' নামক এক বনবাগানঘেরা অঞ্চলে আমার এক আমন্ত্রণ ছিল। আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন পেন্‌সিলভানিয়া হাসপাতালের প্রসিদ্ধ শারীরবিদ্যাবিশারদ্‌ ডাঃ সুখময় লাহিড়ীর স্ত্রী শ্রীমতী কৃষ্ণা। এ'রা এখানকারই অধিবাসী। আমাদের 'কল্লোল যুগের' বন্ধু ডক্টর গিরিজা মুখোপাধ্যায় তাঁর আকস্মিক মৃত্যুর আগে প্রায় মাস তিনেক ধরে এ'দের তত্বাবধানেই ছিলেন। গিরিজা জার্মানি থেকে সস্ত্রীক আমেরিকায় এসেছিল এদেশের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমন্ত্রণ পেয়ে। গত সালের মার্চের শেষে নিউ ইয়র্কের এক জনসভায় বক্তৃতাকালে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই সে হঠাৎ ভেঙে পড়ে এবং তখনই তার মৃত্যু ঘটে। গিরিজার পাশে বসেছিলেন ভারতের কনসাল জেনারাল অশোক রায় মহাশয়। তিনি এই আকস্মিক ঘটনা দেখে সেইখানেই অজ্ঞান হয়ে পড়েন। ডঃ লাহিড়ী ও শ্রীমতী কৃষ্ণা গিরিজার শেষকৃত্য সম্পন্ন করেন। অবশ্য গিরিজার অষ্ট্রো-জার্মান স্ত্রী শ্রীমতী ফ্রেডা সঙ্গেই ছিলেন। এই ঘটনার কয়েকদিন পরে ডঃ লাহিড়ী ও ফ্রেডা আমাকে দুখানা চিঠি লেখেন। ওঁরা জানতেন গিরিজা আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং জার্মান ভাষায় আমার একখানি গ্রন্থেরও অনুবাদক। হিটলারি আমলে জার্মানিতে গিরিজা ছিল নেতাজী সুভাষচন্দ্রের কর্মসচিব। শ্রীমতী কৃষ্ণা সবিস্তারে গিরিজার শেষ-জীবনের কথা বলছিলেন।

ফিলাডেলফিয়ায় একদল তরুণ বাঙ্গালী যুবককে দেখছিলুম। তাঁরা কেউ বিজ্ঞানী, কেউ বা ইনজিনিয়ার। তাঁদের মধ্যে অশোক চক্রবর্তী, স্বপন বসাক, গুরুপ্রসাদ বসু প্রভৃতি আমার বিশ্রম্ভালাপের সঙ্গী হয়েছিলেন। কিন্তু আমার হাতে সময় ছিল কম। দক্ষিণপথে ফ্লোরিডার দিকে আমি অগ্রসর হচ্ছিলুম।

আকাশপথে প্রায় ১১৫০ মাইল দক্ষিণপথ পেরিয়ে 'ট্যাম্‌পা' নামক এক বৃহৎ জনপদে এসে নামলুম। এক ভদ্রলোককে বলতে গেলুম, আমি ইণ্ডিয়া থেকে এসেছি, তিনি বললেন, ইণ্ডিয়ান? কিন্তু তারা ত সবাই আমেরিকান! অতঃপর আমার আপাদমস্তক তাকিয়ে তিনি বোধ করি আমাকে জনৈক প্রতারক ভেবে শুধু বলে গেলেন, উইশ ইউ গুড লাক!

আমি হাসছিলুম। পৃথিবীর বৃহৎ মানচিত্রে 'ইণ্ডিয়া' যেন কোথায় একটি নোলকের মতো দক্ষিণ এশিয়ায় ঝুলে আছে. সবাই কি তার খবর রাখে? আরেক দিনের ঘটনা মনে পড়ছে। কানাডার অংশে নায়গারা জলপ্রপাতের শোভা দেখ-ছিলুম রেলিংয়ের ধারে দাঁড়িয়ে। পাশে দাঁড়িয়েছিলেন এক স্থূলকায়া কৃষ্ণাঙ্গ মহিলা। তিনি নিগ্রো। তিনি দু-এক কথার পর আমার দিকে চেয়ে বললেন, ইণ্ডিয়া থেকে এসেছেন? কিন্তু আপনাকে ত ভিখারী মনে হচ্ছে না?

তখন প্রায় মধ্যাহ্ন। আমার প্রশ্নের উত্তরে তিনি বললেন. নিশ্চয়ই। আপনারা ত পৃথিবীর সব দেশে ভিক্ষে চেয়ে বেড়ান আর বড় বড় কথা বলেন! এদেশের চোখে আপনারা অশ্রদ্ধেয়। আমরা ক্রীতদাসের বংশ. কিন্তু আমরা ভিক্ষা করিনে।

মহিলাকে দু'চার কথা শুনিয়ে দেবো ভাবলুম, কিন্তু ভয়ে-ভয়ে চুপ করে গিয়েছিলুম। ভারতের বর্তমান চেহারা আমেরিকা খুব ভাল চোখে দেখে না। আশ্চর্য, নিক্সনের কলঙ্ক-কাহিনী ওরা এরই মধ্যে ভুলতে বসেছে। ভিয়েৎনাম থেকে অপমানিত হয়ে ফিরে এল, কিন্তু জাতীয় লজ্জা গায়ে মাখলো না! ২৩ বছর ধরে চীন ওদেরকে বাপান্ত করল, তবু দেখতে পাচ্ছি ওরা এখন চীনের চাটুকার। ইউরোপে, বিশেষ করে ফ্রান্সের কাছে ওদের মানসম্ভ্রম একেবারেই কম, কিন্তু ডলার ও টেকনোলজির কৃপায় ওদের ধনপতিরা সকলের মুখ বন্ধ রেখেছে। আমেরিকার ধনবাদ পৃথিবীর ওপর আধিপত্য চায়। ওদের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকেন্দ্র ১১৪ তলা উঁচু এক অট্টালিকা। ওটার নাম World Trade Centre.

ক্রীতদাস বংশীয়াকে একথাগুলি বুঝিয়ে বলতে পারলে ভাল হ'ত।

মেক্সিকো উপসাগরের একটি খাড়ির কোলে ট্যাম্পা শহর দাঁড়িয়ে। এটি ফ্লোরিডা রাজ্যের অন্তর্গত। এই শহরটি সামুদ্রিক গল্দা চিংড়ির জন্য প্রসিদ্ধ। এখন প্রখর গ্রীষ্মকাল, রোদ্রের তেজ প্রবল। কিন্তু ওই রৌদ্রেই সমুদ্রের বালুবেলায় মেয়ে-পুরুষ একপ্রকার নগ্ন অবস্থায় কুমীরের মতো পড়ে থাকে গায়ের ছাল পুড়িয়ে মিসমিসে করার জন্য। ট্যাম্পার সামনে সমুদ্রের এই অংশটিকে বলা হয় 'বে'। যেমন 'বে' অফ বেঙ্গল, বা বে অফ বিস্কে। এই শহরে আমি দিন তিনেক কাটাবো।

সমুদ্রের ধারে ধারে ট্যাম্পা থেকে একটি হাইওয়ে চলে গেছে অপর একটি শহরে, নাম 'ক্লিয়ার ওয়াটার।' এইখানে চিংড়ি মাছের বড় বড় আড়ৎ রয়েছে। ধনপতিরা এখানে বড় বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠান খাড়া করেছে। সমগ্র ছোট শহরটি সন্ধ্যাকালে আলোকমালায় যেন এক ইন্দ্রধনু সৃষ্টি করেছিল। শহরের পশ্চিম সীমান্তে সংকীর্ণ স্থলপথটি শেষ হয়েছে সমুদ্রসৈকতে। সন্ধ্যা সাড়ে আটটা বেজে গেছে, কিন্তু সমুদ্রের দিগন্তে এখনও রক্তিম-বলয়টি অদৃশ্য হয়নি। টু-পীস বিকিনিপরা স্নানরতা মেয়েগুলিকে নীলসাগরজলে মনে হচ্ছিল প্রস্ফুটিত রক্তগোলাপ।

'বান্বেরিক্রস কোর্ট' নামক একটি নিরিবিলি অঞ্চলে আমি বসবাসের জায়গা পেয়েছিলুম। ফ্লোরিডা বিশ্ববিদ্যালয় এখান থেকে দূরে নয়। শুনেছি ওখানকার প্যাথলজি বিভাগেও একজন ভারতীয় প্রফেসর ডক্টর সি এন মূর্তি নিযুক্ত আছেন। তিনি থাকেন এই স্টেটেরই অপর এক শহর সেন্টপিটার্সবার্গে,--যেটি আমার ভ্রমণ তালিকার অন্তর্ভুক্ত।

ফ্লোরিডা স্টেটে দেখতে পাচ্ছিলুম স্প্যানিশ ও কিউবানরা জনসংখ্যায় বেশি। ফ্লোরিডা থেকে কিউবা কাছেই ঐ জলপথে আন্দাজ দু'শ' মাইল দক্ষিণে গেলে কিউবার রাজধানী হাভানায় পৌঁছনো যায়। এই জলপথটিকে বলা হয় ফ্লোরিডা প্রণালী।

আমি যেন তলিয়ে যাচ্ছিলুম দেশান্তরে। আমার পক্ষে জল ও স্থলজগৎ কোথায় গিয়ে শেষ হবে, এবং দেখতে-দেখতে আমার দেখা কোথায় গিয়ে পৌঁছবে, আমি নিজেও জানিনে।

ফ্লোরিডায় আরেক শ্রেণীর লোক বাস করতে আসে যারা পেন্সনভোগী। যাদের সন্তানসন্ততির সঙ্গে কোনও যোগ নেই, অথবা নিঃসন্তান—তারা আসে এই স্টেটে। ৬৫ বছর বয়স হলে যারা সরকারি মাসোহারা পায়, কিংবা যাদের পুঁজির অভাব নেই—তারাও আসে। উত্তর দেশে তুষারপাত ঘটতে থাকলে ঠাণ্ডায় যারা কষ্ট পায়

তারাও এই দক্ষিণ সমুদ্রতীরের বসন্তের হাওয়ায় এসে জায়গা নেয়। ফ্লোরিডা বিভিন্ন ফলের জন্য প্রসিদ্ধ। আম জাম কাঁঠাল নারকেল তরমুজ কলা—এদিকে অজস্র। আঙ্গুর আনারস যেখানে সেখানে। দুধ মাখন সবজি কত খাবে খাও। চাল ডাল আটা ময়দা তেল ঘি—যত চাও। চালের মধ্যে একটিমাত্র কাকর খুঁজে বার করতে পারলে এক ডলার বকশিস। শ্রেষ্ঠ রান্নার তেল ওয়েসেন্ বা ক্রিস্কো। ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর এই প্রথম আমেরিকায় এসে খাঁটি সরষের তেলের রান্না খেলুম।

ট্যাম্পা থেকে 'অরল্যান্ডো' মোটামুটি একশ' মাইল পথ। চড়া রৌদ্রের ভিতর দিয়ে হাইওয়ে ধরে সেই সুপ্রশস্ত মসৃণ পথ চলে গেছে পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে, অর্থাৎ মেক্সিকো উপসাগরের দিক থেকে আটলাণ্টিক মহাসাগরের দিকে। দুই ধারে বড় বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠান। কোথাও বড় বড় পাহাড়ি ময়দানের মাটি খুঁড়ে ফসফেট্ তোলার কাজ চলছে। মাঝে মাঝে দুইধারে মাইলের পর মাইল ধরে কমলালেবুর বাগান। কোথাও বা ফ্লাইওয়ে পথের এপার থেকে ওপারে চলে যাচ্ছে। শেষের দিকে একটি ফ্লাইওয়ে ধরে আমাদের গাড়ি চললো জগদ্বিখ্যাত জাদু জগতে। এটি সমগ্র পৃথিবীবাসীদের আকর্ষণের ক্ষেত্র।

একদা মিকি-মাউসের অ-বাক ও স-বাক অভিনয়-চিত্র আবিষ্কার করে যিনি মানবসমাজকে চমৎকৃত করেন, সেই ওয়াল্ট ডিজ্নের শেষ জীবনের এটি দ্বিতীয় কীর্তিভূমি। এটি মাত্র চার বছর আগে খোলা হয়েছে এবং এটি শেষ করেই তাঁর জীবনান্ত ঘটে। কালিফর্নিয়ার ডিজ্নে ল্যান্ড এর কাছে ম্লান হয়ে গেছে।

আজ রবিবার, ছুটির দিন। শত-সহস্র নরনারী, বালক-বালিকা ও শিশু বিমান-যোগেও এসে পৌঁছেছে। প্রত্যেক টিকিটের দাম ৮ ডলার ২৫ সেণ্ট। একটি উঁচু জায়গায় উঠে চারিদিকে চেয়ে দেখলুম, তিনটে বৃহৎ ময়দান জুড়ে অন্তত ৪০ থেকে ৫০ হাজার মোটর পার্কিং করা। দূরে দূরে দেখা যাচ্ছে বড় বড় জলাশয়—স্টীমার চলছে দু'তিনটি। এই বিশাল ভূখণ্ডের মধ্যে ডিজ্নেল্যান্ড ভিন্ন আর কোথাও কিছু নেই, চারিদিক বন-বাগান ঘেরা। শুনলুম প্রত্যেক ছুটির দিনে এই জাদুশহরের অর্থভাণ্ডারে কমবেশি দশ লক্ষ ডলার জমা পড়ে। এই নগরে দোকান, হোটেল, মনোহারী, ফটোগ্রাফী, কিউরিয়ো শপ, নৌকা, স্টীমার, ঘোড়ার ট্রাম—এমনকি বাদাম-চানাচুর-কোকাকোলার ছোট ছোট দোকানগুলিও এদের নিজস্ব। উপার্জনের পন্থা সংখ্যাতীত।

প্রথমেই আমাদেরকে নিয়ে চললো একখানা 'মনোরেল' একটি-মাত্র রেখায়িত লাইন ধরে প্রায় মাইল দুই অবধি। এটি নিজের থেকেই চলে ও থামে—সময়টি বাঁধা। অতঃপর আমরা এক মস্ত শহরের এক প্লাটফরমে নামলুম। প্রথম যেখানে গিয়ে ঢুকলুম সেখানে দেওয়ালের ভিতর থেকে এক ভালুক, বড একটা পাহাড়ি হরিণ ও বাইসন—এরা হাসিমুখে মানুষের ভাষায় আমাদেরকে অভ্যর্থনা জানালো। স্টেজের ওপরে একটি বন্য ও অতিকায় জন্তু গান গেয়ে ল্যাজ নেড়ে বনের দিকে চলে গেল। একটি তরুণী নর্তকী (পুতুল!) নাচ দেখাল। এর পর একটি অপেরা নাটক আরম্ভ হল এবং জনৈক সূত্রধার (পুতুল!) সেটি আমাদেরকে বিশেষ অঙ্গ-ভঙ্গীর দ্বারা বোঝাতে লাগল। গায়ক, বাদক, অভিনেতা ও অভিনেত্রী—যে যার কাজ করে চলেছে মঞ্চের উপর। দেওয়ালের মধ্য থেকে গলা বাড়িয়ে বাইসন বলছে,

আমাদের এই অনুষ্ঠানে অনেক ত্রুটি থেকে যাচ্ছে, আপনারা নিজগুণে মার্জনা করবেন। বলা বাহুল্য, এইসব মানুষ ও জন্তু কেউই বাস্তব নয়!

বিস্ময়ের পর বিস্ময়। আমরা হতবাক।

দু'শ বছরের যুক্তরাষ্ট্রে যতজন প্রেসিডেন্ট ও ভাইস-প্রেসিডেন্ট হয়েছে তাঁদের নিয়ে মস্ত সভা বসেছে। জর্জ ওয়াশিংটন বক্তৃতা করছেন। হাততালি পড়ছে সভাস্থলে। অব্রাহাম লিংকন থেকে একালের রুজভেল্ট, ট্রুম্যান, আইজেনহাওয়ার, জন কেনেডি—একে একে সবাই এসে আসন নিচ্ছেন। না, কেউ জীবন্ত পুতুল নয়, যেন সবাই সহজ স্বাভাবিক 'মানুষ!' একে একে সবাই বক্তৃতা করছেন। কেউ কলের পুতুল নয়, পরস্পর কথা বলছেন, গল্প করছেন এবং আমরা শুনছি। উনি কে এসে ঢুকলেন? হ্যাঁ, উনিই ত' নিকসন! কার সঙ্গে যেন হ্যান্ডশেক করলেন। কে একজন এগিয়ে এসে ওঁর বুক পকেটে গোলাপ ফুল গুঁজে দিয়ে কৃতার্থ হলো!—আমরা স্তম্ভিত, অভিভূত।

একটির পর একটি জাদুজগতে প্রবেশ করছিলুম। একটি হ্রদের তলার দিকে নৌকায় উঠলুম। প্রবেশ করলুম এক অন্ধকার রূপলোকে, সেখানে জ্যোৎস্না ও তারকাখচিত আকাশ। চারিদিক থেকে পৃথিবীর সব দেশের সুসজ্জিতা নর্তকীরা এক-এক দলে আমাদের স্বাগত জানাচ্ছে,—ভারতের রাজস্থানী নর্তকীরাও বাদ যায়নি। সেই নৌকা অন্ধকার সমুদ্রের প্রবল তরঙ্গে আহত-প্রতিহত হয়ে ডুবে গেল। সজাগ হয়ে দেখলুম, আমরা জীবিত। ভৌতিক মায়ালোক থেকে যেন বেঁচে ফিরে এলুম!

একটি গৃহস্থের ঘরকন্না দেখছিলুম। উপার্জনশীল বড় ছেলে বাজার খরচের হিসাব নিয়ে বকাবকি করছে। মা রান্নাঘরে কাজে ব্যস্ত। বাড়ির কর্তা পাইপ টানতে-টানতে ওধার থেকে ফোড়ন কাটছেন। এমন সময় কলেজ-পড়া ছোট ছেলের বান্ধবী কলরব করে ঢুকল। ছোট পিসি পশমের সোয়েটার বুনছিলেন। পায়ের কাছে পোষা কুকুরটা একবার মাথা তুলে ল্যাজ নেড়ে আবার শুলো। আবার ঘর গৃহস্থালীর নানাবিধ গল্পগুজব এবং বাজার দর নিয়ে সকলের মধ্যে আলোচনা উঠল। তরুণী মেয়েটা সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে তরুণ যুবকটিকে ইশারায় ডেকে বাইরে নিয়ে গেল।

সমস্তটাই বাস্তব। কিন্তু সমস্তটাই মায়াময়। প্রত্যেকটি দৃশ্য আমাদেরকে নির্বোধ, মূঢ় এবং বিস্ময়াহত করে চলেছে। সারাদিন ধরে এক বিস্ময় থেকে অন্য বিস্ময়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলুম।

পরে শুনেছিলুম সর্বাধুনিক কম্পিউটরের সাহায্যে এগুলি ঘটিয়ে দেওয়া হচ্ছে। একালের পাপেট-শো এর কাছে কিছু নয়। এমন করে নিজেকেও আর কোনওদিন 'অবাস্তব' মনে হয়নি।

পরদিন ৭ জুলাই। ফ্লোরিডার অপর একটি নতুন শহরের দিকে যাচ্ছিলুম—ট্যাম্পা থেকে ৫০ মাইল দূরে। এখানে সমুদ্রের উপর দিয়ে একটি দশ মাইল লম্বা প্রশস্ত রাজপথ নির্মাণ করা হয়েছে মানুষের অভাবনীয় কায়িক কর্মশক্তির দ্বারা। সেই পথ ও মধ্যসমুদ্রের উপর সাঁকো পার হয়ে চললুম ঝকঝকে এক শহরে। অতঃপর সমুদ্রের তীর ধরে যেখানে পেঁছিলুম, সেটি পেঙ্গুইন পাখির দেশ। সমুদ্রের উপরে ঝাঁকে ঝাঁকে পেঙ্গুইনরা উড়ছে এবং দল বেঁধে জলের উপর ভাসছে মাছের লোভে।

এখানে অজস্র মাছ। ট্যাংরা, পার্সে, বাটা, বাগদা,—যার যত ইচ্ছে তীরে বসে ছিপ ফেলে ধরছে। বহুস্থলে ক্যাম্পিং করার ব্যবস্থা, কথায় কথায় রেস্টুরেন্ট। টিনের কৌটো খুলে সব বয়সের মেয়েপুরুষ 'কোক' (কোকাকোলা) গিলছে। মাথার উপরে আতপ্ত রৌদ্র যেন দাউ দাউ করে জ্বলছে। আমরা এবার ফিরলুম।

এক শহর অন্য শহরের অনুকরণ মাত্র। ঐশ্বর্য ও সম্পদ, প্রাকৃতিক শোভা ও সৌন্দর্য, মানুষের সগৌরব কীর্তিকলাপ--সবগুলো মিলে এক সময় যেন মানসিক ক্লান্তি আনে।

দিন তিনেক পরে এসে পেঁছলুম ৩৫০ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে 'মায়ামি' (Miami) শহরে। এটি একেবারে উন্মুক্ত আটলাণ্টিক মহাসাগরের তীরে অবস্থিত। যেমন আমাদের কেরালার দক্ষিণে ভারত মহাসাগরের তীরে 'কোবালম বীচ'। তবে এ অঞ্চল পার্বত্য উপত্যকা নয়। এটি সমতল। মায়ামি এক বিশাল শহর। এটি আবার অন্যদিকে এক প্রতিরক্ষার ঘাঁটিও বটে। অদূরে কিউবা,—সেটি কম্যুনিস্ট দেশ। কে জানে ক্যাস্ট্রো সাহেবের মনে কী আছে! প্রস্তুত থাকা ভালো। সে যাই হোক, আমি মায়ামির বড় বড় হোটেল-অট্টালিকা, বুড়ো-বুড়িদের গল্পের আসর বা বাজার-হাট দেখতে আসিনি। সুতরাং আমার পক্ষে ২৪ ঘণ্টাই যথেষ্ট। আমি মুখ ফিরিয়ে নিলুম।

পরদিন মেক্সিকো সাগরের উত্তর পথ ধরে জর্জিয়া, আলাবামা, লুইজিয়ানা ও টেক্সাসের পথে পাড়ি দিলুম। কানাডা থেকে বেরিয়ে এ পর্যন্ত কমবেশি ৪ হাজার মাইল দক্ষিণে ঘুরে এসেছি। আমার পথ এখনও বহুদূর।

এক অজানা থেকে অন্য অজানায় এগিয়ে যাচ্ছিলুম। ফ্লোরিডা থেকে প্রাক্তন ফরাসী উপনিবেশ লুইজিয়ানা স্টেটে পেঁছবার আগে একবারটি দেখে নিলুম জর্জিয়া স্টেটের রাজধানী আটলাণ্টাকে। এখানে আমার আমন্ত্রণ ছিল স্বর্গত অহীন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের ছেলে প্রীতিন্দ্র চৌধুরীর ওখানে। কিন্তু আমার সময় ছিল কম। সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যেকটি অঙ্গরাজ্য ঘুরে যেতে গেলে বছরখানেক অন্তত সময় লাগে। সুতরাং পুরনো ফরাসী উপনিবেশের রাজধানী নিউ অর্লিয়েন্সের অলিগলি এবং ডাউন-টাউন আপাতত সরিয়ে রেখে আমি সোজা এসে পেঁছলুম টেক্সাসের দক্ষিণ শহর হিউসটনে (Houston)। চন্দ্র বা মঙ্গলগ্রহ অভিযানের যুগে হিউসটন ও পূর্ব ফ্লোরিডার কেপ কেনেডি একালে খুবই খ্যাতি লাভ করেছে।

রাত ১২টা বেজে গেছে। এক ভদ্রলোককে একে একে অনেকগুলি প্রশ্ন করলুম এবং তিনি হাসি মুখে আমার পিঠে হাত রেখে প্রত্যেকটি কথার জবাব দিয়ে গেলেন—যার এক বর্ণও আমি বুঝলুম না। আমেরিকান ইংরেজী এবং তার একসেণ্ট না বুঝলে আমেরিকায় ভ্রমণ করা চলে না। কিছুদিন আগে বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক যিনি ইংরেজী সাহিত্যে উচ্চমানের পি-এইচ-ডি করেছেন, তাঁর গল্পগুজবের কালের ইংরেজী এখনও স্মরণীয়। কোনও এক ব্যক্তির প্রতি উত্তেজিত হয়ে তিনি বলছিলেন, He don't know nothing! পরে শুনলুম আমেরিকান সমাজে কথালাপের মধ্যে এ ধরনের ইংরেজী বহুক্ষেত্রেই চলে। এদেশে এমন হাজার হাজার শব্দ প্রচলিত আছে, যে গুলি চেম্বার্স-অক্সফোর্ড-ওয়েবস্টার কোনও অভিধানেই খুঁজে পাওয়া যায় না। ডলারকে চলতি ভাষায় যে 'বাক্' বলে, কে জানত?

বিমানঘাঁটিতে যিনি আমাকে অত রাত্রে নিতে এসেছিলেন তিনি এক অমায়িক বাঙালী যুবক দীপক ব্যানারজি। তিনি বিবাহিত, কিন্তু তাঁর স্ত্রী ভারত থেকে এখনও এখানে এসে পৌঁছয়নি। উনি আমাকে নিয়ে চললেন ফিনিক্স নামক এক অঞ্চলে ওঁর দোতলার ফ্ল্যাটে—যার সামনে একটি সুইমিং পুলে শ্বেতাঙ্গিনীরা বিকিনি পরে জলে ঝাঁপাঝাঁপি করে—যে দৃশ্য দেখলে পুরুষমাত্রই লজ্জা পায়! দীপক একজন ইঞ্জিনীয়ার, শনি-রবিবার ছাড়া প্রতিদিনই তাকে বেরোতে হয় সকাল সাতটায়, ফিরে আসে বিকাল পাঁচটায়। এ অঞ্চল মেক্সিকো উপসাগরের উত্তর তীর- গ্রীষ্মকাল এখানে প্রবল।

পরদিন আন্দাজ বেলা ১১টায় আমার একটু চমক লেগেছিল সে কথা না বলে পারছিনে। দীপক বলে রেখেছিল এ অঞ্চলে চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, খুন—এ সব লেগেই আছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিগ্রোরাই এ সব করে। তাদের মধ্যে দারিদ্র্য ও বেকারি প্রচুর। লেখাপড়া বা কারিগরি বিদ্যায় তারা অনেক পিছিয়ে। ফ্ল্যাটের ভিতরে লোক থাকা সত্ত্বেও তারা দরজা ভেঙে ভিতরে ঢুকে লুঠপাট করে। সঙ্গে থাকে পিস্তল—যা বাজারে যখন-তখন কেনা যায়—সুতরাং সাক্ষী থাকার ভয়ে তারা আগে খুন করে, পরে লুঠ করে। পুলিস আসে পরে। কিন্তু পুলিসের কর্তা যদি আবার কৃষ্ণাঙ্গ হয় তবে সোনায় সোহাগা! সুতরাং আপনি একটু সতর্ক থাকবেন, দরজা সহজে খুলবেন না। সম্প্রতি অনেকগুলো ঘটনা ঘটে গেছে।

এই অজানা মহাদেশের দক্ষিণ ভাগে এক শহরের ফ্ল্যাটে আমার আশঙ্কার যখন কূলকিনারা পাচ্ছিলুম না তখন হঠাৎ ফ্ল্যাটের দরজার বাইরে থেকে ঘণ্টা বাজলো। এবার নিশ্চয় দরজা ভাঙবে অতএব দরজা না খুলে উপায় নেই। আত্মসমর্পণের জন্য আমি তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত। আতঙ্কে ও প্রাণভয়ে আমি অবশ হয়ে স্থির করে-ছিলুম, এক পাল্লার দরজা খুলে দিয়েই তার পাশে আমি লুকোবো এবং চান্স পাবামাত্রই বেরিয়ে দৌড় মারবো। কিন্তু দরজা খুলতেই দেখি এক তরুণী শ্বেতবর্ণা, অতি সুশ্রী মেমসাহেব। পরণে ট্রাউজার, গায়ে 'টি' শার্ট এবং দুই হাতে বড় বড় দু'তিনটে কাগজের ঠোঙা। ইংরেজী প্রশ্ন করতে গিয়ে যখন থতিয়ে গেলুম, তখন এই অষ্টাদশী পরিষ্কার বাঙলায় বলল, আমার নাম রিনা, দীপককে আমি কাকা বলি। আপনার জন্য আমি রান্নাবান্না করে দেবো। আজ সন্ধ্যায় অনেকে আপনার এখানে আসবেন দেখা করতে।

এতক্ষণে আমার স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়ল।

তোমাকে মেমসাহেব বানালো কারা?

মেয়েটি হেসে উঠে রান্নার আয়োজনে লাগল। বলল, আমাদের বাড়ি লখনৌ, মা-বাবার আমি একই সন্তান। আমি কনভেন্টে পড়াশুনো করেছি। আমার স্বামী রতন, আর দীপক—সবাই আমরা লখনৌর লোক। ওরা কাকা-ভাইপো দূর সম্পর্কে। আমার বিয়ে হয়েছে বছর দেড়েক। এখন উনিশে পড়েছি। রান্নাবান্না কাজকর্ম সব শিখেছি বিয়ের পর। আমি মেমসাহেব নই। কিন্তু শাড়ি পরে রাস্তায় বেরোইনে --লোকের চোখে পড়ে।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে মেয়েটি চারটে গ্যাসের উনুনে একে একে ডাল, ভাত, মাংস, কপির তরকারি, বেগুন ভাজা—সব প্রস্তুত করে বলল, চলুন, আপনাকে শপিং সেন্টার দেখিয়ে আনি। কাকা বলেছেন আপনার যা যা দরকার, কিনে দেবো।

রিনা আমাকে নিয়ে ড্রাইভ করে চললো। স্বামী-স্ত্রীর দুখানা গাড়ি। এ দেশে ভারতীয় কর্মী মেয়েরা শাড়ি পরেনা। আপিসের কর্তারা বলেন, ওতে অন্যের দৃষ্টি আকৃষ্ট হতে থাকলে কাজের ব্যাঘাত ঘটে। সিঁথিতে ও কপালে সিঁদুরের চিহ্ন অন্যের কৌতূহল সৃষ্টি করে। সকলের মধ্যে মিলিয়ে না গেলে সুষ্ঠুভাবে কাজকর্ম হয় না।

টেক্সাস স্টেটে কম-বেশী দু'হাজার ভারতীয়দের মধ্যে প্রায় একশ' বাঙালী আছেন। সকলেই কোনও না কোনও কাজে নিযুক্ত। সাধারণভাবে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে উপার্জন করলে কমবেশি দেড় হাজার ডলার মাসে ঠিকই হয়। এ দেশে ১০ বা ১৫ বছর চাকরি করে অধিকাংশ ভারতীয়ই দেশে ফিরে যেতে চায়। অনেকে আবার থেকেও যায় স্বাচ্ছল্য এবং বিলাস ব্যবস্থার লোভে। কিন্তু এ দেশে যাদের সন্তানাদি প্রতিপালিত হয়, তারা ভারতীয় প্রকৃতি লাভ করে না। বহু ভারতীয় তথা বাঙালী পরিবার দেখেছি, যাদের সন্তানরা প্রায় আমেরিকান বনে গেছে। এক বিশিষ্ট ও সচ্ছল বাঙালী পরিবারে দেখেছি, তাঁদের তরুণ বয়স্ক ছেলেটি উলি-ঝুলি ছেঁড়া-খোঁড়া পোশাক পরে ও মাথায় মেয়েলী চুল রেখে আমেরিকান 'হিপি' বনে গেছে। সে বাঙলা বলতে শেখেনি। আরেক ক্ষেত্রে একটি সুশ্রী মেয়ে—যার পিতামাতাও বাঙালী—সে বি-এ পাস করার পর অন্যান্য বন্ধুবান্ধবের মতো অন্যত্র ঘরভাড়া করে থাকে। প্রকৃতপক্ষে আমেরিকার সামাজিক জীবনে এমন একটি উদার স্বাধীনতার প্রশ্রয় থাকে, যার আস্বাদ বোধ করি পৃথিবীর অন্য কোথাও নেই।

সম্প্রতি এ দেশে মন্দা বাজারের জন্য দলে দলে মেয়েপুরুষ চলে আসছে উত্তর দেশ থেকে টেক্সাসের দিকে। এখানে কয়লা, তুলো, গম, লোহা এবং অন্যান্য খনিজ ও ফসল প্রচুর। এই দক্ষিণ-পশ্চিম ভূভাগে এসে দাঁড়ালে প্রচুর কাজ পাওয়া যায়। শিল্পপতিরা উপযুক্ত কর্মী পেলে মহা খুশী। যাদেরকে কথায় কথায় 'লে অফ' করা হচ্ছে, তাদের ভাত-কাপড়, আশ্রয় ও মোটরের অভাব নেই। একখানের ঘরকন্না তুলে দিয়ে অন্য স্টেটে এসে সংসার পাততে তাদের দেরি লাগে না। 'ইউ-হল' কোম্পানির বড় বড় গাড়ি সর্বদা মাল বহন করতে প্রস্তুত। তারা মালপত্র এনে নতুন সংসার পেতে দিয়ে যায়। আমেরিকানরা আয় করে প্রচুর, ধার করে তার চেয়েও বেশী। গাড়ি, বাড়ি, বাজারহাট, কাপড়-চোপড়, ওষুধপত্র, ঘরের সমস্ত আসবাব, সর্বপ্রকার বিলাসবস্তু সমস্তই ধারে পাওয়া যায়। পেট্রল ধারে কেনা, যে কোনও খাদ্য বা পানীয় সব ধারে। শিল্পপতিরা বা দোকান-বাজারের মালিকরা শুধু দেখে নেয় তোমার 'ক্রেডিট কার্ড' বা তোমার উপার্জনের ক্ষেত্র। তারা দেনা শোধ চায় না, চায় বছরে শতকরা ১৮ ডলার সুদ। সামগ্রীসম্ভার তুমি যতই অপচয় করবে, শিল্পপতিরা ততই খুশী। ওতে উৎপাদনের মাত্রা বাড়ে। উপার্জনের শতকরা ৫০ ভাগ বা ৬০ অংশ খরচ করলে তুমি রাজার হালে থাকতে পারো। বহু ভারতীয় আছেন যাঁরা দুখানা বা তিনখানাও পণ্টিয়াক গাড়ি রাখেন। কৃষ্ণাঙ্গদের মধ্যে যাদের একটু অবস্থা ভালো, তারা প্রথমেই কাডিলাক গাড়ি কেনে। তারা শ্বেতাঙ্গদের টেক্কা দিতে চায় যে কোনও সুযোগে।

হিউসটনে সম্প্রতি রুশ ও মার্কিনীরা যৌথভাবে চন্দ্রযান পাঠাবার আয়োজনে ব্যস্ত রয়েছে। এখানে দেখাশোনা ও বন্দোবস্ত করার জন্য বহু সোভিয়েট বিজ্ঞানী পরিদর্শনের কাজে এসেছেন। উভয় দেশ থেকে একই সঙ্গে একই সময়ে দুটি

রকেট উড়বে আকাশপথে, এবং দূর মহাশূন্যে কোথাও গিয়ে উভয়ের রকেট পরস্পরকে সংযুক্ত করবে এবং পাইলট অদল-বদল করা হবে—এই ছিল সিদ্ধান্ত। রকেট দুটি পাঠানো হবে দিন তিনেকের মধ্যেই।

হিউসটনে একটি 'টেগোর সোসায়েটি' প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। যে সব বাঙালীদের চেষ্টায় এটি হয়েছে তাঁদের মধ্যে রঞ্জিত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় খুবই সচেষ্ট ও সক্রিয়। আমার আসা উপলক্ষে এঁরা একটি বড় রকমের নৈশভোজের আয়োজন করেছিলেন এবং সেখানে স্বাধীন বাঙলাদেশের প্রতিনিধি হিসাবে যাঁরা যোগদান করেছিলেন তাঁদের মধ্যে কোন কোনও মহিলা ও তাঁদের স্বামীর পাণ্ডিত্য ও মিষ্টব্যবহার খুবই স্মরণীয়। আমেরিকায় প্রায় প্রত্যেকটি ভারতীয় আপন আপন কর্মক্ষেত্রে বিশেষ বৈশিষ্ট্য অর্জন করে রয়েছেন। অপর একটি ভারতীয় প্রতিষ্ঠানে কিছু বলবার জন্য আমন্ত্রিত হয়েছিলুম। সেটির নাম 'হিন্দু ওয়ারশিপ সোসায়েটি।' ওটা অনেকটা গির্জার মতো। প্রতি রবিবারে ওখানে শ্রীরাধাকৃষ্ণ তত্ত্বের আলোচনা ও সংগীতাদি নিয়ে এক প্রার্থনা সভা বসে এবং গুজরাটি ও পাঞ্জাবীদের সংগে বহু আমেরিকান নরনারীও কার্পেটের উপর পা মুড়ে বসে অনুষ্ঠানে অংশ নেন। গান-গুলি হয় হিন্দীতে, ভাষণ বা বক্তৃতা হয় ইংরেজীতে। কিন্তু সমস্ত অনুষ্ঠানটি যাঁরা নিয়ন্ত্রিত করেন তাঁদের মধ্যে একজন বাঙালী আছেন, তাঁর নাম অরবিন্দ ঘোষ। তিনি জনসঙ্ঘের নেতা ও অধ্যাপক দেবপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের পুত্র।

এখন জুলাই মাস। দক্ষিণ দেশে প্রবল গ্রীষ্মকাল। ১০৭° ডিগ্রি গরম।

হিউসটন থেকে ২০।২২ মাইল দূরে 'নাসা প্রজেক্ট' (National Aeronautic and Space Administration)-এর সর্বপ্রধান কেন্দ্র। প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট লিন্‌ডন জনসনের নামে এটি উৎসর্গ করা। এই প্রজেক্টটি নিয়ে 'নাসা' নামক একটি শহর গড়ে উঠেছে। এটি একেবারেই নতুন, কিন্তু এটি অন্যতম প্রধান জাতীয় সম্পত্তি। বলা বাহুল্য, এটি নিষিদ্ধ এলাকা। পৃথিবীর সকল দেশের বিজ্ঞানী ও আকাশ-তত্ত্ববিদরা এই নাসার দিকে চেয়ে থাকে। এর ভিতরে যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম যন্ত্র-জটিলতা এবং তার বিচিত্র আণবিক কর্মকুশলতা রয়েছে, তার খবর স্বয়ং পাইলটরাও জানে না, কারণ তারাও যন্ত্র পরিচালিত। শ্রীমান দীপক যখন আমাকে নাসা প্রজেক্টে নিয়ে হাজির করল, তখন সেখানে মার্কিন বৈজ্ঞানিকদের সংগে পাইলটরা প্রশিক্ষণকর্মে ব্যস্ত।

আমরা ঘুরে ঘুরে সেই অতি বৃহৎ এবং সুরক্ষিত বনবাগান দিয়ে ঘেরা অনেক-গুলি বহুতল অট্টালিকা পরিদর্শন করছিলুম। অভ্যাগতদের জন্য কয়েকটি অট্টালিকার কোন কোনও অংশ খোলা ছিল। প্রথম যে আমেরিকান মডিউলটি চাঁদের মাটিতে নামে—যেটির পাগুলি ছিল মাকড়সার পায়ের মতো, সেটি এখানে এনে রাখা হয়েছে—যার ছবি অনেকেই দেখেছে। ভিতরে তিনটি মানুষ কি প্রকারে ছিল, কিভাবে ও কিসের সাহায্যে তারা নামল, কেমন করে হাঁটল, কিভাবে হাঁটতে গিয়ে ভেসে চললো—তার সমস্ত কাহিনী। চাঁদের মাটিতে প্রথম পদার্পণ করে হেড পাইলট নীল আর্মস্ট্রং যে কথাটি এই নাসার গবেষণাগারে বলে পাঠান এবং যেটি কোটি কোটি নরনারী টেলিভিসনের সাহায্যে শোনে, সেটি এই, "That's one small step for a man, one giant leap for mankind." —এটিও সযত্নে রক্ষিত রয়েছে। ওয়াশিংটন মিউজিয়মে যেমনটি দেখে এসেছি,

এখানেও তেমনি চাঁদের মাটি ও পাথর এরা বহু যত্নে প্রদর্শনীর মধ্যে রেখেছে। এ কথা নিশ্চয়ই অনেকে জানেন, হিউসটনের এই বিশ্ববিখ্যাত গবেষণা ও পরীক্ষাগার থেকেই মহাকাশের যে কোনও রকেট, স্যাটিলাইট প্রভৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। কেপ কেনেডি বা প্রাক্তন ক্যানাভেরাল এখান থেকে দেড় হাজার মাইলেরও বেশী দূরে, কিন্তু এই নাসার কোনও এক অট্টালিকা থেকে প্রত্যেক রকেটের উৎক্ষেপ, গতি ও প্রগতি, পরিচালনা, দূরত্ব, তার বিভিন্ন যন্ত্রপাতির ক্রিয়াকলাপ, পাইলটদের জীবনরক্ষণ, বিভিন্ন ধরনের ছবি তোলার ক্যামেরা, রেডিও, টিভি প্রভৃতি—এই অট্টালিকার থেকেই সমস্ত নিয়ন্ত্রিত হয়। এর Remote control থাকে 'computor' মেসিনে। বলা বাহুল্য, রকেট যেস্থল থেকে অগ্নিস্রাবের ভিতর দিয়ে আকাশপথে উৎক্ষিপ্ত হয়, তার দশ মাইলের মধ্যে জনপ্রাণী কেউ থাকে না।

সেদিন সারা দিন ধরে আমরা নানাবিধ বিস্ময়জনক দৃশ্যাদি দেখে ফিরেছিলুম।

দিন চারেক পরে হিউসটন থেকে মোটর বাস ধরেছিলুম উত্তরপথে। রিনা ও তার স্বামী রতন ব্যানারজি, রঞ্জিতবাবু ও তাঁর স্ত্রী ডাঃ মৃদুলা ব্যানারজি, দীপক ওঁরা এসেছিলেন আমাকে তুলে দিতে। রিনা আজ এসেছিল শাড়ি পরে। সিঁথিতে ও কপালে সিঁদুর, হাতে, কানে ও গলায় অলংকার।

এ দেশে মোটর বাস একটু অন্য রকমের। কাঁচের জানলাগুলি ঈষৎ রঙীন, ভিতরটা এয়ার কনডিশনড। প্রত্যেকটি সীটে নরম মোটা গদি। যারা ধূমপান করবে তাদের সীট পিছন অংশে। এককোণে টয়লেট, হাত ধোয়ার বেসিন ও জলের কল, এপাশে খাদ্য ও পানীয়ের ব্যবস্থা। আমাদের পথ মাত্র ২৫০ মাইল দূরে ডালাস শহরে। এর মধ্যে বাস থামবে মাত্র দুবার। প্লেনের মতো প্রত্যেক সীটের সঙ্গে টেবিলযুক্ত। চলাফেরার পথটি মোটা কার্পেট দিয়ে মোড়া। একটি তরুণী মেয়ে ছোট আকারে প্রত্যেককে লাঞ্চ দিল টেবিলে। একটি বানরুটি, মাংসের চপ, সবজি সিদ্ধ, সামান্য ভাতের পোলাও, ছোট এক গেলাস চকোলেট দেওয়া ক্ষীর ও একটি কমলালেবু। সুশ্রী মেয়েটি এক ফাঁকে সহাস্যে জানালো, না, এর জন্য আলাদা দাম দিতে হবে না। আহারাদির পর চা বা কফি বা কোক যত ইচ্ছে খাও। এই বাস-কোম্পানির নাম 'কনটিনেণ্টাল ট্রেলওয়েজ্।'

মোট ৪ ঘণ্টার রাস্তা। কিন্তু হাইওয়ে পথ এত মসৃণ যে, অনেকে ব্যাগ খুলে চিঠিপত্র লিখতে বসলো। গাড়ি কোথাও হোঁচট খায় না। পথ শুধু মসৃণ নয়, কাঁচের মতো পিছল। চারিদিকে বন বাগান-জল-জলাশয় নধর উপত্যকা এবং অনন্ত প্রাকৃতিক শোভায় দূর-দূরান্তর ঝলমল করছে। ডালাসে পৌঁছিয়ে গাড়ি ছেড়ে যাবার আগে মেয়েটি জানিয়ে গেল, সে গ্র্যাজুয়েট স্কুলের ছাত্রী। এ দেশে সহজে কেউ কলেজ বলে না। বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ক্যাম্পাসের মধ্যেই 'স্কুলগুলি' প্রতিষ্ঠিত। কলকাতা থেকে কেউ এখানে পি-এইচ-ডি করতে এলে তাকে এক বছর বা দু বছর গ্র্যাজুয়েট স্কুলে পড়তে হয়।

ডালাস শহরে মার্টেল নামক এক নিরিবিলি পল্লীতে এসে উঠেছিলুম। সাধারণত বড় শহর বা তার ডাউন-টাউন ছাড়া লোকজন পথে ঘাটে হাঁটে না, কারণ গাড়ি ছাড়া কেউ চলে না। ডাউন-টাউন মানে কলকাতার ডালহাউসী স্কোয়ার বা এসপ্লানেড বা চৌরঙ্গী অঞ্চল। মার্টেল মানে বালীগঞ্জ। পথগুলি সুন্দর, প্রতি বাড়ির সঙ্গে একটু বাগান। পল্লী প্রকৃতি নিঃঝুম শান্ত। এখানেও আরেক দীপক

ও তার স্ত্রী শ্রীমতী চিত্রাকে পাওয়া গেল একটি শিশুকন্যা সহ। দীপক ইঞ্জিনিয়ার, চিত্রা শিক্ষয়িত্রী। আমার আসার খবর এরা জানত। সেটি রবিবার। জন পনেরো মহিলা ও পুরুষ ওদের বাড়িতে উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ঢাকা ও কুমিল্লারও জনাতনেক গুণীব্যক্তি উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে ডাঃ আনোয়ার খান ও শ্রীমতী সালিমাকে মনে পড়ছে। অতগুলি মহিলার মধ্যে কেউ শাড়ি পরেনি, অধিকাংশই ট্রাউজার বা সুতী পাজামা পরা। সেই সন্ধ্যার হইচই-এর মধ্যে যে মেয়েটির আলাপচারী সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল মনে হয়েছিল তার নাম জয়শ্রী। পরণে শুধু আলগা পা জামা, গায়ে হাতকাটা ফতুয়া। সে রাজনীতি বিজ্ঞানের পি-এইচ-ডি, এখানে অধ্যাপনা করে। চীন, জাপান, ভারত, মধ্য এশিয়া, ইউরোপ, রাশিয়া, আফ্রিকা ও আমেরিকা—এদের রাজনীতিক তত্ব তার নখদর্পণে। জয়শ্রী অবিশ্বাস-বাদ নিয়ে আলোচনা তুলল। ধর্ম, সমাজ, লোকসংস্কার, জনকল্যাণের প্রয়োগনীতি, চলিতকালের শিক্ষার ধারা, —এগুলির অসারতা নিয়ে সে উচ্চকণ্ঠে আলোচনা চালাচ্ছিল। তার স্বামী ছিল নীরব শ্রোতা। এমন বিদুষী, চিন্তাশীল এবং উগ্রপন্থী মেয়ে চট করে চোখে পড়ে না। আমেরিকার আন্তর্জাতিক রাজনীতির এমন রূঢ় বিশ্লেষণ ও কঠোর সমালোচনা এ যাত্রায় অন্য কোথাও শুনিনি। বাঙালী মেয়ের মুখে এমন অনর্গল ও চমৎকার ইংরেজিও সহসা শোনা যায় না। এখানে দিন তিনেকের জন্য আমি থেকে গেলুম।

ডালাস বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসের মধ্যে ঢুকলুম। এখানে একটি ছোট্ট অ্যাপার্টমেণ্টে থাকে সন্দীপ ও তার স্ত্রী রমা। সন্দীপ বর্ধমান কলেজের অধ্যাপক, এখানে পি-এইচ-ডি করতে এসেছে স্কলারশিপ নিয়ে। ওদের একটি শোবার ঘর, তার সঙ্গে স্নানাগার, রান্নাঘরে যথারীতি কুকিং রেঞ্জ, এবং বিবিধ উপকরণ। শোনা গেল, এই ক্যাম্পাসের ডর্ম-এ অবিবাহিত ছাত্র ও ছাত্রী একই ঘরে থাকতে পারে। এরা বলে, সমাজনীতির সঙ্গে উচ্চশিক্ষাবিধির যোগ নেই। বিশ্ববিদ্যার যোগ্যতা তোমার আছে কিনা, এইটি আগে বিচার্য। তোমার পাণ্ডিত্য, প্রতিভা, মেধা, ধীশক্তি —এরাই আসল। ব্যক্তিগত জীবনে তোমার সংযম বা নীতিবোধ আছে কিনা এটি বিচার্য নয়। তোমার কীর্তিই বড়, যৌনচরিত্রের শুচিতা কতটা তোমার আছে, এ নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় কম। বোস্টনে দেখেছি ১৩টি বিশ্ববিদ্যালয়ের হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী একেকটি উজ্জ্বল রত্নবিশেষ। কিন্তু ক্যাম্পাসের বাইরে এখানে ওখানে তাদের রেণ্ডেভো। সেখানে একটির পর একটি স্বেচ্ছাচারের কেন্দ্র, মদ্য-পানের বার, নাইট ক্লাব ইত্যাদি। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় ছাত্র বা ছাত্রী উভয়েই হোমোসেক্সুয়াল। ছেলে ছেলেকে এবং মেয়ে মেয়েকে বিয়ে করেছে,—আদালতের বিচারে এটি নিষিদ্ধ হয়নি। আর্টিস্টের সামনে উলঙ্গ ছাত্রী মডেল হিসেবে দাঁড়াচ্ছে, স্বল্পালোকিত মদের হোটেলে প্রায়-উলঙ্গ ছাত্রী নানা ভঙ্গীতে নেচে উপার্জন করছে,—এ দৃশ্য যেখানে সেখানে। কোনও বিষয়ে 'ট্যাবু' নেই। গরম কালে বিকিনি পরা ছাত্রী ক্লাসে ঢুকছে, কেউ ভ্রূক্ষেপ করে না।

বনে-বাগানে-ঝোপে-আলোছায়ায় ঘেরা ডালাস শহর ছবির মতো। শহরের উপান্তে সমুদ্রবৎ একটি লেক-এর নাম হোয়াইট রক। এরই চারিদিকে যাঁদের বাগানবাড়ি একটির পর একটি তাঁরা প্রায় সবাই মিলিয়নেয়ার বা বিলিয়নেয়ার। তাঁরাই শুধু তাঁদের বাড়িতে ঝি বা চাকর, দারোয়ান বা সশস্ত্র পাহারা রাখতে পারেন, যাদের

প্রত্যেকের বাৎসরিক বেতন কমপক্ষে ৩০ হাজার ডলার। এই কোটিপতিদের হাতে রয়েছে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান—এবং এঁরা প্রত্যেকে এক একটি শিল্প সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছেন। এঁদের হাতে রয়েছে টেক্সাস স্টেটের তেল, তুলো, খনিজ সামগ্রী, শস্যক্ষেত্র, কাগজ, বনসম্পদ এবং বিভিন্ন খাদ্যসামগ্রী। এঁদেরই উৎপন্ন শস্য পৃথিবীর নানা দেশে রপ্তানি হয়।

টেক্সাসের রাজধানী ডালাস। ১৯ নবেমবর ১৯৬৩ তারিখে এই নগরের সুবিশাল ডাউন-টাউনের একান্তে ঠিক যে স্থলটিতে প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জন কেনেডিকে হত্যা করা হয় সেইখানটিতে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলুম। তিনি নিগ্রো সমাজের প্রতি বেশিমাত্রায় সহানুভূতিশীল ছিলেন, এই ছিল তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ। তাঁকে গুলী করা হয় একটি বহুতল অট্টালিকার উপরতলা থেকে। সেই তলাটি চিহ্নিত রয়েছে। ওরই নিচে চৌমাথা রাস্তার কোণের বাড়িটির নিচেকার মস্ত হলে রয়েছে কেনেডি মিউজিয়ম। ওইটির মধ্যে ঘুরে-ঘুরে দেখছিলুম। চারিদিকের দেওয়ালে পৃথিবীর সকল দেশের সংবাদপত্রের রিপোরটগুলি বড় বড় হেডলাইনে টাঙানো। পণ্ডিত নেহরুর শোকবার্তাও সেখানে প্রাধান্য পেয়েছে, কারণ আমেরিকায় নেহরুর সম্মানার্থে আহূত এক ভোজসভায় কেনেডি তাঁর ভাষণে বলেছিলেন, "রাজনীতি শিক্ষায় হ্যারল্ড ল্যাস্কি ও নেহরু আমার গুরুস্থানীয়"। ফিরবার সময় দেখলুম কেনেডির একটি বাণী দেওয়ালে উৎকীর্ণ করা রয়েছে, "Ask not what the country can do for you, ask what you can do for the country."

সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণববাদের অগণিত সংখ্যক প্রতিষ্ঠান কালক্রমে স্থাপিত হয়েছে। বেলুড় মঠের বর্তমান সেক্রেটারী স্বামী গম্ভীরানন্দ এদেশের ১৩টি শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রমের কর্তৃপক্ষের কাছে আমার হাত দিয়ে চিঠি পাঠান যাতে আমি ওগুলি পরিদর্শন করি। বোস্টনে, রোড আইল্যাণ্ডে, নিউ ইয়র্কে, ফিলাডেলফিয়ায়—আমি ওঁদের খোঁজখবর করেছিলুম। কিন্তু যেমন ওয়াশিংটনে দেখেছি, তেমনি এই ডালাসেও দেখছি শ্রীমৎ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের মস্ত এক বৈষ্ণব-প্রতিষ্ঠান। এখানেও আমেরিকান পুরুষ ও মহিলারা রয়েছেন। তাঁদের জীবন-যাত্রা শুচিশুদ্ধ এবং সকলেই নিরামিষ আহার করেন। এঁদের পরস্পরের সঙ্গে দেখা হলে 'হরে কৃষ্ণ' বলে সম্ভাষণ করেন। মেয়েদের পরণে সাধারণ শাড়ি, মাথায় ঘোমটা, নম্রপদ। পুরুষমাত্রই মুণ্ডিতমস্তক, পরনে গৈরিক বাস এবং শিখাধারী। ওঁদের ওই শ্রীকৃষ্ণ গৌরাঙ্গ মন্দিরপ্রাঙ্গণে গিয়ে ভোগরান্নার আয়োজন দেখছিলুম এবং বীরলক্ষণ নামক এক সেবাইতের সঙ্গে আলোচনায় বসেছিলুম। সেদিন ভক্তি বেদান্তস্বামী উপস্থিত ছিলেন না। এই ভক্তিবাদী ও অন্ধবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের শুচিশুদ্ধ জীবনযাত্রার চেহারা আমার ভাল লেগেছিল। মহিলারা শাড়ি পরেন এবং অষ্টাঙ্গ আবৃত রাখেন,—পাছে যৌনচেতনার উদ্দীপন ঘটে। এখানকার প্রভুপাদ হলেন এক প্রবীন বাঙ্গালী অভয়চরণ দাস। এঁরা সকলেই পুরীধাম, নবদ্বীপ বা মায়াপুরের মন্ত্রসিদ্ধ। বলা বাহুল্য, সকল কালের ইতিহাসেই ভারতীয় অধ্যাত্ম সংস্কৃতি পৃথিবীর বহু দেশকেই অনুপ্রাণিত করে এসেছে। এটি তারই অন্যতম। আসবার সময় বীরলক্ষণ আমাকে জানালেন, আমাদের গুরু প্রভুপাদ একদিন এই তমসাচ্ছন্ন পৃথিবী থেকে সেই চিরন্তন কালের জ্যোতির্ময়লোকে মহাপ্রভুর সমীপে আমাদেরকে পৌঁছিয়ে দেবেন! গুরু আমাদের পথ দেখাবেন! হরে কৃষ্ণ, হরে রাম!

আমার সময় ছিল কম। সেই দিনই অপরাহ্ণে দীপক ও চিত্রা আমাকে তুলে দিয়ে এল ডালাস বিমানঘাঁটিতে। আমি যাচ্ছিলুম কলোরাডো স্টেটের রাজধানী ডেন্‌ভার নামক নগরে।

এখানকার প্রায় প্রত্যেকটি 'এয়ার লাইন' এক এক শিল্পপতির নিজস্ব সম্পত্তি। ডেল্‌টা, ইস্টার্ন, ইউনাইটেড, ওয়েস্টার্ন প্রভৃতি অনেকগুলি। আমার বিমান পথ ছিল মাত্র দু ঘণ্টার। ডেন্‌ভারে যখন এসে পৌঁছলুম তখনও রৌদ্র রয়েছে, কিন্তু প্রায় সাড়ে আটটা বাজে। যিনি এসে তাঁর গাড়িতে আমাকে তুললেন তিনি বাঙালী এক পরিণত যুবা। তিনি যদিও নিউক্লিয়ার ফিজিকসে পি-এইচ-ডি, তবুও তিনি ভারতের সঙ্গে এদেশের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে লিপ্ত। চাকরি করতে তিনি চান না। ১৮ বছর ধরে ইনি কলোরাডোতে আছেন। ইনি নিজেই নিজের পরিচয় দিয়ে বলছিলেন, আমি বাঙলার বাইরে মানুষ, বাঙলা বই আজও পড়িনি। শুধু আপনার নাম শুনেছি আমার মায়ের মুখে। উনিশ বছর বয়সে বাপের অবাধ্য হয়ে এদেশে চলে আসি দিল্লী থেকে। আমি দুজন আমেরিকার মেয়েকে বিয়ে করি পর পর। প্রথম জনের দুটি ছেলেমেয়ে আমার কাছে থাকে বছরে ন' মাস, আর স্কুলের তিন মাসের ছুটিতে থাকে মায়ের কাছে। প্রথম স্ত্রীর সঙ্গে আমার বিচ্ছেদের পর এই ইনি—আমার দ্বিতীয় স্ত্রী! আমার ছেলেমেয়ে দুটির বয়স নয় আর এগারো। ওদের মা আবার বিয়ে করেছে।

ওঁর বাড়িতে আমেরিকান স্ত্রীটি পাশে বসে স্বামীর ইংরেজি গল্প শুনে হাসছিল। মেয়েটির বয়স আন্দাজ বছর পঁচিশেক। আমি ভয় পাচ্ছিলুম দুটি বাঘা বাঘা কুকুর মাঝে মাঝে এসে আমার গা শুঁকছিল। এক একটার আকার বাছুরের মতো। কুকুর আমার পক্ষে আতঙ্কের বস্তু।

শ্রীমতী রোজ্‌ এক সময় উঠে আমার সুটকেশটা নিয়ে একটি ঘরে ঢুকলো, বিছানা ঝাড়লো এবং এক পেয়ালা চা তৈরি করে দিল। ভদ্রলোকটি ততক্ষণে মদ্যপান আরম্ভ করে দিয়েছেন। লোকটি সরল ও স্পষ্টবাদী শুধু নয়, নির্ভুলভাবে অপ্রিয়ভাষী। এ বাড়িটি তাঁর নিজের। বেশি নয়, পঞ্চাশ হাজার ডলারে এ বাড়ি কেনা। রোজ্‌ তার নিজের গাড়ি চালায়। নিজের গাড়ি মানে আমারই। কিছু পোশাকপত্র আর একখানা চার হাজার ডলারের গাড়ি—এ দিয়ে যে কোনও আমেরিকান মেয়েকে কেনা যায়! না, আমি মা বাপ কারোকে পরোয়া করিনে। আমি আমেরিকান। এই ত আপনি আমার বাড়িতে এসেছেন দয়া করে। কিন্তু জানেন, আপনাকে আমি তুড়ি দিয়ে ওড়াতে পারি?

কড়া স্কচ হুইস্কি খেয়ে এই বলিষ্ঠকায় ও পেশীবহুল যুবা ঈষৎ মাত্রা হারিয়েছিলেন। শ্রীমতী রোজ্‌ আমার জন্য খাবার প্রস্তুত করলেন। ওঁর স্বামী শুধু খেলেন বড় এক খণ্ড সিদ্ধ গোমাংস। অনেক রাত্রে ভদ্রলোকের হাত থেকে ছাড়া পেয়ে আমার ঘরে ঢুকলুম। মানুষটি অতিথিপরায়ণ।

কলোরাডো অধিকাংশই পার্বত্য স্টেট। এর ভয়ভীষণা নীলবর্ণা নদী এবং তার বহুমুখী ধারা পৃথিবীর অন্যান্য নদী অপেক্ষা অনেক বেশি গভীর। এই খরস্রোতা নদী পাহাড়ের পর পাহাড় কেটে চলেছে পশ্চিম থেকে পূর্বে আবার দক্ষিণে বেঁকে চলেছে দূর দিগন্তে। দক্ষিণ কলোরাডোর অন্তর্গত পাহাড়ঘেরা 'আস্‌পেন' নামক এক ছোট্ট শহরে আমার পৌঁছবার কথা। সেখানকার 'ক্লাইম্‌বিং' নামক এক সাময়িক

পত্রের সম্পাদক মিঃ মাইকেল কেনেডি আমাকে কলকাতা থাকাকালীন এক আমন্ত্রণ-পত্র দিয়ে রেখেছেন। হিমালয় সম্বন্ধে ওঁদের কৌতূহল প্রচুর।

পরদিন সকাল সাতটা নাগাদ নিচে নেমে এসে দেখি স্বামী-স্ত্রী আলিঙ্গনাবদ্ধ এবং চুম্বিত হয়ে রয়েছেন। অতঃপর রোজ্ হাসিমুখে আমাকে শুভপ্রভাত ও বিদায় জানিয়ে চলে গেলেন গাড়ি নিয়ে। ভদ্রলোক বললেন, আমি বাথরুমে যাচ্ছি, এক্ষুনি বেরোবো। আপনি ততক্ষণ চা করে খান। শুনুন, আমরা দিনের বেলা বাইরে খাই। না, না—ভয় পাবেন না, কুকুর কিছু করবে না,—আপনার যা ইচ্ছে রান্না করে খাবেন। সব রয়েছে রান্নাঘরে। কুকুর দুটোকে আমরা দিনের বেলা খেতে দিইনে।

ক্ষীণ-করুণ কণ্ঠে প্রশ্ন করলুম, ও দুটো কি আপনার সঙ্গে যাবে?

ভদ্রলোক বললেন, না না, আপনি যতক্ষণ আছেন, ওদের পাহারা দিন। দেখবেন যেন বাইরে না যায়। যদি বাইরে গিয়ে কুকুর কারও বাড়ির ধারে যায়, তবে পুলিস এসে এদের গুলী করবে। কুকুর দুটোর রাগ একটু বেশি।

তিনি বেসমেন্টের বাথরুমে গিয়ে ঢুকলেন। কুকুর দুটো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমাকে দেখছিল। আমি মৃত্যুর মুখোমুখি।

ভদ্রলোক বেরিয়ে যাবার পর আমেরিকা ভ্রমণ আমার মাথায় উঠল। শুনেছি যে বাড়িতে চুরি হয় সে-বাড়িতে চোর ঢুকে আগে কুকুরকে মাংস খাইয়ে শান্ত রাখে। ওই দুটি জন্তুকে বশ করার জন্য আমিও রান্নাঘরের বাক্স থেকে দু-তিন রকমের বিস্কুট, খান দশেক রুটির টুকরো, ফ্রিজারের থেকে সিদ্ধ মাংস, দুটোকে দু পেয়ালা দুধ, গোটা চারেক ডিমসিদ্ধ একে একে সব খেতে দিলুম। আমার নিজের খাদ্য-সামগ্রী ছিল প্রচুর।

উত্তপ্ত রৌদ্রে চারদিক জ্বলে পুড়ে যাচ্ছিল। দুপুরে ফিরে এলেন ভদ্রলোক। আমি প্রস্তুত হয়েই ছিলুম। সুটকেসটি নিয়ে যখন বেরোচ্ছি কুকুর দুটো ল্যাজ নেড়ে আমাকে বিদায়-সম্ভাষণ জানালো। ভদ্রলোক আমাকে নিয়ে সেই প্রখর রৌদ্রে ডেন্‌ভার নগরীর শোভা দেখাতে বেরোলেন। আমার মেজাজ মর্জি ভাল ছিল না।

সেই দিনই অপরাহ্ণে ওয়েস্টার্ন লাইন্‌স-এর একটি প্লেন ধরে পশ্চিম দেশের দিকে রওনা হয়ে গেলুম। আমার গন্তব্য ছিল নিউ মেক্সিকো, আরিজোনা, ও লাস ভেগাস হয়ে সুদূর পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগরের তীরবর্তী কালিফর্নিয়ার দিকে। আটলাণ্টিক থেকে প্যাসিফিক—এই দুইয়ের মধ্যবর্তী মহাদেশের প্রত্যেকটি স্টেট দেখে দেখে আমার ভ্রমণ শেষ করব।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় সর্বত্র সাধারণ লোকরা এই কথাটাই শুধু জানে, ভারতবর্ষ হাড়-দরিদ্র এবং ভারতীয়রা পৃথিবীর সকল দেশে অন্ন ভিক্ষা করে বেড়ায়। হতভাগ্য এবং গরীব দেশকে আমেরিকা করুণার চোখে দেখে, এবং অন্ন ও অর্থ দিয়ে তাদের কাছ থেকে বশ্যতা কিনে রাখে। ভিখারীদের মধ্যে কেউ যদি আত্মস্বাতন্ত্র্য, স্বকীয়তা ও স্বাধীন মতবাদের পরিচয় দেয়, আমেরিকা তাকে দাবিয়ে রাখার চেষ্টা পায়। আমেরিকান গভর্নমেণ্ট শক্তের কাছে নরম থাকে।

কিন্তু আমেরিকার নিজের ভূভাগের যে একটা বিশাল অংশ শত শত বছরের দারিদ্র্য, দুর্দশা ও অন্নাভাবে জরোজরো তার কথা একটু না বলে পারছিনে। আমি যখন ষড়ৈশ্বর্যময় টেক্‌সাস স্টেটে ভ্রমণ করছিলুম এবং কোটিপতি ব্যবসায়ীদেরকে হাততালি দিয়ে যাচ্ছিলুম, তখন টেক্‌সাসের পশ্চিমাঞ্চল রায়ো গ্রাণ্ডে-র (Rio Grande) হতভাগ্য অধিবাসীদের দিকে আমার চোখ ছিল। যাঁরা মার্কিন ভূমির

খবর একটু আধটু রাখেন তাঁরাই জানেন, এই ভূখণ্ডের মধ্য-পশ্চিম, দক্ষিণ পশ্চিম, উত্তর পশ্চিম এবং কালিফর্নিয়ার পার্বত্য অঞ্চলের পূর্বভাগ—সব মিলিয়ে লক্ষ লক্ষ বর্গমাইল এলাকা আজও অনুন্নত। যেমন ধরুন, পশ্চিম কলোরাডো, নিউ মেক্সিকো, আরিজোনা, লাস ভেগাস,—এদের মরুভূমি, অনধ্যুষিত উপত্যকা, রুক্ষ পার্বত্য অঞ্চল, অবহেলিত লক্ষ লক্ষ নরনারী ও শিশুদলের জীবনযাত্রা—অদ্যাবধি রাষ্ট্রের আনুকূল্য যথেষ্ট পরিমাণ পায়নি। এর মধ্যে 'রায়ো গ্রান্ডে'র দুর্দশা ও দারিদ্র্য অবর্ণনীয়। এই ভূভাগটুকুর পরিমাণ মাত্র নয়শ মাইল এবং এরই পাশে নিউ মেক্সিকো। এখানে আধুনিক কালের সুবিধা সুযোগ আজও পৌঁছয়নি। এ অঞ্চলে কোথাও ইলেকট্রিক, কলের জল, রোগের ওষুধ, আহার্য সামগ্রীর হাট বাজার—কিছু নেই। মরা নদীর কাদা গোলা জল খেয়ে এরা বাঁচে, মাছধরা নৌকার সাহায্যে বহু-মাইল পথ পেরিয়ে আর্লিংটন নামক ছোট শহরে চিকিৎসককে ডাকতে যায়, অন্তঃসত্বা মেয়েরা দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগে মরে, ছোট ছেলে মেয়েরা খাদ্যসামগ্রীর খোঁজে চারদিকে ছুটো ছুটি করে বেড়ায়, প্রবীণ বয়স্করা ঈশ্বরকে ডাকে এবং রক্ত আমাশয়ে ভোগে। উক্ত নয়শ মাইল অঞ্চলের অধিবাসী প্রায় ২০ লক্ষ লোকের খোঁজখবর নেয় স্বেচ্ছাসেবী ডাক্তাররা বছরে দু'একবার মাত্র। চারিদিকের এই দারিদ্র্য, অন্নাভাব ও অনড় দুর্ভাগ্যের দিকে চেয়ে তারাও আর বিশেষ ও-পথ মাড়ায় না। রোগীরা দলে দলে নদীর ধারে এসে জড়ো হয় কমবেশি ৬০।৭০ মাইল পথ পেরিয়ে। এদের না আছে শিক্ষা, না স্বাস্থ্যরক্ষার উপায়, না বা কোনও প্রকারে বাঁচাবার সুযোগ। এদের মধ্যেই ছড়িয়ে রয়েছে আদিবাসী- যাদের নাম দেওয়া হয় ইন্ডিয়ান, আর রয়েছে পুরাকালের স্প্যানিস এবং বাকি মেক্সিকান। শ্বেতাঙ্গ ঔপনিবেশিকরা এককালে এদেরকেই মারধর করে দূরদূরান্তরে তাড়িয়ে দিয়েছিল। শক্তিমান শাসকদের দিকে চেয়ে এরা আজও তাদের নিরুপায় জীবন যাপন করে। নেভাদা, ইউতাহ্ প্রভৃতি অঙ্গরাজ্যগুলির প্রায় একই অবস্থা।

কলোরাডোর উত্তরভাগ জুড়ে রয়েছে 'ফ্রন্ট রেঞ্জের' বিশাল পর্বতমালা। তারই ভিতর দিয়ে বোধ করি পৃথিবীর মধ্যে গভীরতম নীল নদী কলোরাডো নেমে এসেছে দক্ষিণ পশ্চিমের মরুভূমির পথ ধরে পাহাড় পর্বত ও মরুউপত্যকা পেরিয়ে। যখন এই নদী উত্তর আরিজোনায় ঢুকেছে, তখন সে তার সর্পিল গতিপথে এসে প্রবেশ করেছে 'গ্রান্ড ক্যানিয়ন্' নামক এক বিশ্ববিখ্যাত ফাটলধরা ভূগর্ভে। ভূতত্ত্ববিদরা জানেন, এই জটিল ভূগর্ভের ওই সর্পিলভঙ্গী ফাটল সৃষ্টির কোন্ কাল থেকে এই ভূভাগের বিদারণ ঘটিয়েছিল। এই 'গ্রান্ড ক্যানিয়ন' বহুস্থলে ৫ মাইল অবধি চওড়া এবং এর আঁকাবাকা বৃহৎ ফাটলের এক মাইল নিচে দিয়ে খরস্রোতে বয়ে চলেছে কলোরাডো নদী—বালককাল থেকে যার বিস্ময়কর কাহিনী পড়ে এসেছি বার বার। প্রায় তিনশ মাইল জুড়ে রয়েছে উত্তর আরিজোনায় এই 'গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন্'—যার অপার্থিব এবং বর্ণবাহার দৃশ্য দেখার জন্য পৃথিবীর বহু পর্যটক হাজার মাইল মরুপাহাড় পেরিয়ে দুঃসাধ্য পথ ধরে এসে হাজির হয়।

কিন্তু এই মরু পাহাড়পথ কলোরাডোকে ধরে দক্ষিণে উপসাগরে এসে মিলেছে। পূর্ব কালিফর্নিয়ায় এই মরুভূমির নাম হয়েছে 'সান বার্নাডিনো'। কিন্তু এই উষর, অনুর্বর মরুপ্রান্তর ও রুক্ষ পাহাড়ের চারিদিকে মাঝে মাঝে পাওয়া যায় ওয়েসিস ও খেজুরের বন, মাঝে মাঝে নদী এবং তৃণভূমি। কিন্তু এদের পশ্চিম সীমান্তের মরু-

লোক পেরিয়ে গেলে প্রশান্ত মহাসাগরের তীরবর্তী কালিফর্নিয়ার সুন্দর ও মনোরম প্রাকৃতিক শোভাসৌন্দর্যের মধ্যে পৌঁছনো যায়। আমেরিকানরা বলে, সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে পশ্চিম কালিফর্নিয়াই হল প্রকৃত স্বর্ণভূমি।

একদা এক অপরাহ্নকালে 'লস এঞ্জেলেসে' এসে পৌঁছলুম। মহাসাগরের তীরবর্তী এই মহানগরীর যে অংশটির নাম 'হলিউড' তারই ক্রোড়ভূমির নাম 'বিভার্লি হিল্‌স'—সেটি পার্বত্যভাগ। এই পার্বত্য উপত্যকার বিভিন্ন সুন্দর পথগুলি একে একে নেমে এসে কয়েকটি প্রশস্ত রাজপথের সঙ্গে মিলেছে। যেটি সর্বাপেক্ষা সম্পদশালী ও প্রশস্ত—সেই পথটির নাম উইলশায়ার বুলেভার্ড। এই পথের উপরে একটি বহুতল অট্টালিকায় উঠে বাসা বেঁধেছিলুম।

সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রকে যদি এক সুবিশাল পার্বত্য উপত্যকাভূমি বলে বর্ণনা করি তাহলে বোকুহয় অত্যুক্তি হবে না। এই মহাদেশকে একদিকে আটলাণ্টিকের গ্রাস থেকে রক্ষা করছে প্রায় আড়াই হাজার মাইলব্যাপী উপত্যকাভূমি উত্তর থেকে দক্ষিণে, এবং পশ্চিমের প্রশান্ত মহাসাগরের তরঙ্গক্ষয় থেকে বাঁচিয়ে রেখেছে দুহাজার মাইলেরও বেশি দীর্ঘ তিনটি উপত্যকাময় অংগরাজ্য কালিফর্নিয়া, ওরেগন ও ওয়াশিংটন স্টেট। লস এঞ্জেলেসে এসেও দেখছি এর ব্যতিক্রম হয়নি। তিনদিকের পার্বত্য উপত্যকা দিয়ে এই সুবৃহৎ নগরটি যেন পরম যত্নে আগলিয়ে রাখা হয়েছে। এ নগর যেন সর্বাপেক্ষা সৌন্দর্যময়।

আমাদের সুউচ্চ অট্টালিকায় পিছনে যে দুটি বিভার্লি হিলস্ দেখতে পাচ্ছি ওদুটি জগৎপ্রসিদ্ধ হয়েছে সিনেমা চিত্র প্রযোজকদের কৃপায়। ওখানে দেখতে পাচ্ছি 20th Century Fox, Warner Bros, Metro Goldwin Meyers, Universal প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের ধনকুবের প্রযোজকদের প্রাসাদ ও তাঁদের স্টুডিয়ো। যাঁরা বিশ্ববিশ্রুত অভিনেতা ও অভিনেত্রী—যাঁদের জীবনযাত্রা নিয়ে পৃথিবীর সকল দেশে ও সমাজে বিভিন্ন বিচিত্র গল্প, উপকথা, বাস্তব ও অবাস্তব কাহিনী এবং আজগুবী কল্পনার নানা সংবাদ প্রচলিত, তাঁদের দেখতে পাচ্ছি যখন তখন। কিন্তু হলিউড যেন আগাগোড়া নীরব এবং বৈষয়িক। আমোদ, আহ্লাদ, হইচই, স্বেচ্ছাচার, শিল্পীজনোচিত বেপরোয়া ভাব, নিয়মনীতিজ্ঞানহীনতা—কোনটাই চোখে পড়ছে না, চারিদিক শান্ত এবং নিরুদ্বেগ। ওদের মধ্যে একজন ব্যালেরিনা নর্তকী আমাদের ফ্ল্যাটে আসে, নাম মেরিয়া সুশ্রী ও সুন্দরী,—সে এসে আমোদ আহ্লাদ করে সকলকে সমাদর জানিয়ে হইচই করে চলে যায়। আর আসেন একজন প্রসিদ্ধা অভিনেত্রী—নাম শার্লি ম্যাকলীন। যে-ব্যক্তি শার্লির প্রিয়জন তার নাম শ্রীমান্ বিক্রম চৌধুরী, —বলিষ্ঠকায় এক তরুণ যুবক। বিক্রম হল পরলোকগত বিষ্ণু ঘোষ মহাশয়ের ছাত্র ও শিষ্য। এখনও তার বয়স তিরিশ হয়নি। সে হঠযোগের বহুপ্রকার নিয়মনীতিতে সিদ্ধহস্ত। প্রথম জীবনে সে যৌগিক ব্যায়ামের একটি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে বোম্বাই শহরে। পরে সে জাপানে আসে এবং নিজ উদ্যম ও প্রচেষ্টায় টোকিও শহরে বিরাট এক যোগ-ব্যায়ামের প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে। জাপানের এক কোটিপতি ন্যুব্জদেহা মহিলাকে সে ছয় মাসের মধ্যে যৌগিক ব্যায়ামের দ্বারা সম্পূর্ণ সহজ করে তোলে, তার জন্য বিক্রমের খ্যাতি রটে যায় সর্বত্র। মহিলার নাম মিসেস ওসানো। অতঃপর সে আসে আমেরিকায়। সান ফ্রান্সিসকো এবং লস এঞ্জেলেসে সে মস্ত দুটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করে এবং তাদের নাম হয় 'Yoga College of India।' এখানে এসে দেখছি

জাপানের মতো এখানেও তার শত সহস্র ছাত্র-ছাত্রী। ওদের মধ্যে অধ্যাপক, ডাক্তার, আইনজীবী, শিল্পী, ছাত্র, অভিনেতা-অভিনেত্রী, ব্যবসায়ী, আপিসের কর্মী, শিক্ষক, নর্তকী—সকলেই ওর শিক্ষাকেন্দ্রে আসে যৌগিক ব্যায়াম করার জন্য। শিরা উপশিরা ও পেশীর বিভিন্ন পরিচালনা, শরীরের ওজন কমানো, পেশীকে শক্ত রাখা, দুরারোগ্য ব্যাধি বা বিভিন্ন নামের বাত সারানো,—এই নিয়ে সকলে 'আসন' করছে দেখছিলুম। সুদূর বিদেশে এসে একজন বাঙালী যুবকের এই অনন্য কৃতিত্ব দেখে আমি অভিভূত হয়েছিলুম। হলিউডের বহু অভিনয়শিল্পীরা গুরুর মতো বিক্রমকে মান্য করে। এই কীর্তিমান ব্রাহ্মণ যুবকের এশিয়া ও আমেরিকা জোড়া খ্যাতির চেহারা দেখে ওর নাম রেখেছিলুম 'সম্রাট বিক্রমাদিত্য।' এমন সংযত নিরভিমান ও চরিত্রবান যুবক সহসা চোখে পড়ে না।

লস এঞ্জেলেস শহর ছাড়িয়ে প্রান্তর পেরিয়ে পাহাড়ের ধার ঘেঁষে চলে যাচ্ছিলুম উত্তরের মরুভূমি অঞ্চলে। এই মরুলোক 'মাজাভে' নামে পরিচিত। প্রায় ১৫০ মাইল 'হাইওয়ে' পথে গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন বিক্রমের এক ছাত্রী শ্রীমতী টেরী। সঙ্গে ছিলেন বিক্রমের মা শ্রীমতী নমিতা চৌধুরী, পিতা কালীকিঙ্কর ও ভগিনী শ্রীমতী লুসাই। এ ছাড়া শ্রীমতী জেনেট, অরুণ চৌধুরী ও বিক্রম নিজে। এই টুরিস্ট ভ্যানটি মোট ৮ জনসহ দূর রুক্ষ ও কর্কশ মরুপথে যে ওয়েসিসে গিয়ে দাঁড়াল, সেটি ক্ষুদ্র একটি জনপদ, নাম পামস্প্রিং। দুধারে খেজুরের বনবাগান আর নানা ধরনের আলোক সজ্জা। সেখান থেকে আরও ৩০ মাইল এগিয়ে সন্ধ্যারাত্রে যে রাজকীয় বাংলোয় গিয়ে রাত্রিবাসের জায়গা নিলুম সেটি এক ধনবতী মহিলা শ্রীমতী অ্যানি মেরীর দৌলৎখানা। ইনি বিক্রমের ছাত্রী এবং এঁদের নাকি নিজস্ব অনেকগুলি জেট বিমান আমেরিকার আকাশে ওড়ে। এই বাংলোটি তাঁদের শখের বাগানবাড়ি। এখানে যে শ্বেতাঙ্গ ব্যক্তিটি বাগানবাড়ির তদারকি কাজে লিপ্ত তার সাপ্তাহিক বেতন ২৫০ ডলারের কিছু বেশি। এই বাংলোটি আগাগোড়া 'এয়ার কনডিশন' করা এবং মোটা কার্পেট ছাড়া এর মেঝে কোথাও দেখা যায় না। ভিতরের আসবাবপত্রের বাজার মূল্য ২ লক্ষ ডলার। এর সঙ্গে কাঠের কাজ, চিত্রাঙ্কন, মদের সেলার, বিবিধ অলঙ্করণকার্য। তৈজসাদি, স্নানাগারগুলির নানাপ্রকার খুঁটিনাটি, সুইমিং পুল, শয্যাসমারোহ, আলোকসজ্জা প্রভৃতি ভারতের প্রাক্তন মোগল বাদশাহদেরও ঈর্ষার কারণ ঘটাতে পারত। শুনলাম এ সম্পত্তির দাম নাকি কম বেশি ১০ লক্ষ ডলার। সুদূর মরুলোকে যেখানে সূর্যের খরতাপ ১৩০ ডিগ্রিতে ওঠে, সেইখানে এক বাংলোর মধ্যে সর্বাঙ্গীন মধুর স্নিগ্ধতা যথেষ্ট আরামদায়ক বইকি। মেয়ে ও ছেলেরা পরম আনন্দে সাঁতারের পোশাক পরে 'ওয়াটার পলো' খেলা নিয়ে পরদিন সকাল থেকে ঝাঁপাঝাঁপি আরম্ভ করে দিল।

এই পামস্প্রিং মরুভূমির এক পাহাড়ের সাড়ে ৮ হাজার ফুট উঁচুতে মাত্র ১৪ মিনিটে তুলে দেয় একটি 'রোপওয়ে' যার অপর নাম 'ট্রামওয়ে'। এটি একটি বড় বাক্স —যার মধ্যে অন্তত ৫০ জন মানুষ ধরে। সোজা চূড়ায় উঠে আমরা দেখি মস্ত লাউঞ্জ এবং রেস্তোরাঁ। 'কিউরিয়ো শপ' এখানে ওখানে। ভিতরটি ঠান্ডা। এটি নতুন। শুনলাম দু'বছরে এটি তৈরি হয়েছে। খরচ পড়েছে ৯০ লক্ষ ডলার। চারিদিকে অনন্ত মরুভূমি তখন যেন দাউ দাউ করে জ্বলছিল। আমরা নেমে এসে আবার ফিরে চললুম।

পূর্ণিমার রাত্রে প্রশান্ত মহাসাগরের উচ্চ তীরভূমি থেকে লস এঞ্জেলেসের আলোকমালা এক অপার্থিব দৃশ্যের অবতারণা করে। সমস্ত আকাশ ও পৃথিবী যেন ফুলঝুরির খেলায় মেতে ওঠে সন্ধ্যারাত্রে—যখন কুইন মেরী ও মেরীনা বীচ পেরিয়ে দূর দূরান্তরে চলে যাচ্ছিলুম।

এই নগরের হাজার হাজার প্রাসাদোপম অট্টালিকার মধ্যে যেটি সহজে দৃষ্টি আকর্ষণ করে, সেটি মস্ত এক বাগানবাড়ি, নাম 'অ্যামবাসাডর হোটেল।' এই হোটেল-টির ঠিক বাইরে একদা নেমে আসবার সময় রবার্ট কেনেডিকে হত্যা করে এক লেবানিজ যুবক, নাম সিরহান। রবার্ট কেনেডির অপরাধ, তিনি প্রেসিডেন্ট হতে রাজি হয়ে নির্বাচনে নামবার আয়োজন করছিলেন। তিনজন কেনেডির একে একে অপমৃত্যু ঘটে, এখন বাকি রইলেন এডওয়ার্ড কেনেডি।

পশ্চিম মহাসাগরের তীরে আমেরিকার সর্ববৃহৎ বন্দরগুলি লস এঞ্জেলেসকে ঘিরে দাঁড়িয়ে উঠেছে। এর এক একটি 'বে' কয়েকটি জাহাজ-ঘাটার কেন্দ্র। এই মহা-নগরী আপন সম্পদে, বৈভবে, প্রাকৃতিক শোভা ও সৌন্দর্যে ফলনে ও ফসলে, নাগরিকদের সচ্ছল জীবন ব্যবস্থায়—সমগ্র পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ।

আমেরিকার কয়েকটি রাজ্য—যেমন টেক্সাস, কলোরাডো, নিউ মেক্সিকো, অ্যারিজোনা, উত্তরের ডাকোটা, নেভাদা, ওরেগন, মনটানা প্রভৃতি আজও ক্ষুধার্ত ও অনুন্নত। এদের কান্নাকাটি এখনও রাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষের কানে উঠছে না। কিন্তু সম্প্রতি আদিবাসীদের বিলুপ্ত সভ্যতার পুনরুজ্জীবন ঘটতে আরম্ভ করেছে। তাদের মধ্য থেকে এক বিরাট ও বিক্ষুব্ধ নেতৃত্ব উঠে দাঁড়াচ্ছে। তারা মনে করে বিগত চারশ' বছর ধরে তারা বঞ্চিত, লুন্ঠিত এবং প্রতারিত। ঔপনিবেশিক আমেরিকানরা, যারা শ্বেতাঙ্গ, —যারা আজ রাষ্ট্রের হর্তাকর্তা, যারা শত শত বছর ধরে 'রেড ইন্ডিয়ান্' নাম দিয়ে তাদেরকে মারণাস্ত্র দ্বারা নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টা করে এসেছে, তাদের হিসাব নিকাশের দিন সমাগত। এই সম্পর্কে প্রাক্তন কমিশনার (U. S. Commissioner of Indian Affairs) মিঃ জন কোলিয়ার গভীর বেদনা ও সহানু-ভূতির সঙ্গে আমেরিকার আদিবাসীদের আদি ও বর্তমান ইতিহাস নিয়ে যে প্রসিদ্ধ একখানি গ্রন্থ রচনা করেছেন, সেই বইটির নাম, 'Indians of the Americas।' এই জগৎ প্রসিদ্ধ ব্যক্তি জন কোলিয়ার প্রাচীনতম ইতিহাস উদ্ধার করে জানিয়েছেন, এই আদিবাসীরা হল এশিয়াবাসী মঙ্গোলীয় রক্তজাত। এরাই হল আদি চীনা, জাপানি, বর্মি, সিয়ামি, তিব্বতীয়, মালয়ী, এস্কিমো, ল্যাপ, ফিন, ম্যাগিয়ার, তুর্কি এবং বন্য সম্প্রদায়ের মানুষ। আমেরিকার ভূমি হল তাদেরই যারা বেরিং প্রণালী ডিঙিয়ে আলাস্কার ভিতর দিয়ে দক্ষিণ পথে কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো ও ব্রেজিলের দিকে ছড়িয়ে পড়ে। মিঃ কোলিয়ার ১৫ হাজার বছর আগে সেই প্রস্তর যুগ থেকে অদ্যাবধি ইতিহাস তুলে ধরেছেন।

একদা সমস্ত পৃথিবী হাঁটকিয়ে সকল দেশ থেকে প্রতিভাবানদেরকে ডেকে এনে আমেরিকা তার আপন দেশকে সাজিয়ে গড়ে তুলেছে বিপুল সম্পদে ও বৈভবে। নিত্যনূতন বিস্ময়কর আবিষ্কারে ও বিজ্ঞান প্রগতিতে বিশ্বে তার জুড়ি নেই। নির্মাণ, গঠন, সংরক্ষণ প্রভৃতি বিদ্যায় সে অদ্বিতীয় হয়ে উঠেছে গত একশ' বছরে। এখন সে নতুন-নতুন দিগন্তের দ্বার খোলবার চেষ্টা পাচ্ছে। নব নব প্রয়াস নিয়ে সে যদি আরও এগিয়ে যেতে না পারে, যদি অধিকতর উন্নতির পথে অভিযান না করতে

পারে তবে তার এই অতি-বিলাস ব্যবস্থার মধ্যেই দেখা দেবে শৈথিল্য ও আলস্য। এরই মধ্যে তার বশম্বদ কয়েকটি দেশ তার পোশাক পরিচ্ছদ প্রভৃতি সরবরাহের ভার নিয়েছে, যেমন কোরিয়া, ফিলিপিন, তাইওয়ান, ইন্দোনেশিয়া ইত্যাদি। জাপানী যন্ত্রপাতি ও মোটর 'তয়োতা'য় আমেরিকার বাজার ছেয়ে যাচ্ছে। তবে যদি পৃথিবীর কোথাও আবার বড় রকমের যুদ্ধ বাধে, তবেই আমেরিকার শিল্পপতিরা আরেকবার সক্রিয় হয়ে উঠবে, কেননা তারা জানে তাদের অর্থনীতি হল যুদ্ধকেন্দ্রিক (war based)। ও ব্যাপারে তারা নির্দয় ও নির্মম। তারা 'বরের ঘরে মাসী, কনের ঘরে পিসি।' তখন চোর একদিকে চুরি করবে, গৃহস্থ অন্যদিকে সতর্ক হবে।

লস এঞ্জেলেস থেকে চারশ' মাইল উত্তরে প্রশান্ত মহাসাগরের তীরভূমি ধরে একদা এসে পৌঁছলুম সান ফ্রান্সিসকো শহরে। এটি সম্পূর্ণ পার্বত্য শহর, পাহাড়-গুলির প্রতি দেওয়ালে এবং প্রতিটি বড় বড় উপত্যকায় প্রায় সাড়ে সাত লক্ষ মানুষ বসা বেঁধে রয়েছে। একদা স্প্যানিশ ধর্মযাজক সেন্ট ফ্রান্সিস এখানে এসে ধর্মপ্রচার করেছিলেন, সুতরাং এই শহর তাঁরই নামাঙ্কিত। 'কো' মানে পাহাড়, এটি এশিয়া-বাসীরা জানে। এখানকার সমুদ্রে কয়েকটি ছোট বড় দ্বীপ, ক্রীক, উপদ্বীপ—এগুলি দৃশ্যত সুন্দর। পাহাড়ে সমুদ্রে বনশোভায় এবং নিত্যবসন্তের আবহাওয়ায় এই পার্বত্য নগরী মনোরম ও সমৃদ্ধ। আমার বাসস্থান পেয়েছিলুম এই শহরেরই প্রান্তে 'ডালি সিটি' নামক এক নিরিবিলি অঞ্চলে। এখানে আমার ইঞ্জিনিয়ার বন্ধু রমেন চক্রবর্তী ও তাঁর স্ত্রী অর্চনা নিজস্ব বাড়িতে থাকেন। দুঃখের কথা, আমাদের সুপরিচিত বন্ধু অধ্যাপক ও দার্শনিক হরিদাস চৌধুরী মহাশয় মাত্র ৫ সপ্তাহ আগে হঠাৎ হৃদরোগে মারা গেছেন। তাঁর উচ্চশিক্ষিতা স্ত্রী শ্রীমতী বীণা চৌধুরী সন্তানাদি নিয়ে তাঁদের নিজেদেরই বাড়ি কাম্বারল্যাণ্ডের অন্তর্গত ডলোরেস পাহাড়ের চূড়ায় বাস করেন। আমার পৌঁছবার পরদিনই সন্ধ্যায় তিনি আমাকে আমন্ত্রণ করেন।

দার্শনিক হরিদাসবাবু বোধ করি ২২।২৩ বছর আগে এদেশে আসেন এবং American Academy of Asian Studies নামক প্রতিষ্ঠানে দক্ষিণ এশিয়া বিভাগের চেয়ারম্যান হয়ে ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রে অধ্যাপনা করেন। এখানে তিনি ধীরে ধীরে দুটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। তার একটি হল, 'Cultural Integration Fellowship' এবং অন্যটির নাম 'California Institute of Asian Studies'। শ্রীঅরবিন্দের অধ্যাত্ম দর্শনবাদের প্রবক্তা হিসাবে হরিদাসবাবুর খ্যাতি ও প্রসিদ্ধি ভারতের মতো এদেশেও ছড়িয়ে পড়তে বিলম্ব ঘটেনি। আমেরিকান সমাজের উচ্চ-শ্রেণীর পণ্ডিত মহলে তিনি বহুজনশ্রদ্ধেয় ছিলেন।

প্রকৃতপক্ষে কালিফর্নিয়া স্টেট হল বহুকাল থেকে সকল ধর্ম ও অধ্যাত্মবাদের একটি প্রধান কেন্দ্র। এখানে চীনা সম্প্রদায় একটি বড় অংশ—কিন্তু তারা বহুকালের। তাদের সঙ্গে রক্তিম চীনের যোগাযোগ নেই,- যেমন কলকাতায় দেখা যায়। তারা বৌদ্ধ ও কনফুসিয়াসপন্থী। স্প্যানিস, মেক্সিকান, জাপানীজ, মুসলীম, হিন্দু, শিখ, খৃষ্টান—সকলেই রয়েছে গায়ে গায়ে। বহু বাঙ্গালী আছেন কালিফর্নিয়ায়। একদা স্বামী বিবেকানন্দ এখানকার হ্যামিলটন পাহাড়ের চূড়ায় একটি 'শান্তি আশ্রম' প্রতিষ্ঠা করেন ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে। সেটি এখন নেই। তাঁরই অনুগামী স্বামী যোগানন্দ ও অশীতিপর শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার বাগচী মহাশয় মিলিতভাবে এদেশে

একটি যোগাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। তারপরে আসেন স্বামী পরমানন্দ ও তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রী শ্রীমতী গায়ত্রী দেবী যাঁদের কথা পূর্বপত্রে আলোচনা করেছি। তাঁরা এসে 'আনন্দ আশ্রম' গড়ে তোলেন। শিখ সম্প্রদায়ের গুরুদ্বার 'গধর' পার্টির কর্মকেন্দ্র—এরা একে একে গড়ে উঠেছে বহুকাল থেকে।

পৃথিবীব্যাপী এখন যে 'হিপ্পি' আন্দোলন চলছে—যারা আজ ছড়িয়ে পড়েছে ৫।৬টি মহাদেশে, তাদের প্রথম 'জন্ম' ঘটেছিল সানফ্রান্সিসকো নগরের অ্যাসবেরি অঞ্চলে। সম্পদ ও বৈভবের অতি প্রাচুর্য, পিতৃমাতৃ সমাজের বিবাহবিচ্ছেদ, অবহেলিত সন্তান সম্প্রদায়, শিল্পপতিদের ভয়াবহ ধনলোভ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে মানবসমাজের দিশাহারা জীবন, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নৈতিক বুদ্ধির অবনতি, যুদ্ধের কালে লক্ষ লক্ষ জারজ সন্তানের আবির্ভাব—এদের সম্মিলিত প্রভাবের মধ্যে এই সমাজবিরোধী জাতিধর্মবিরোধী আদর্শবাদবিরোধী এক সম্প্রদায়ের জন্ম ঘটে এই শহরে,—যারা নিজদেরকে সর্বপ্রকার শাসন থেকে বিচ্ছিন্ন করে, বিলাস বিসর্জন দেয়, ধনদৌলতের প্রতি বিরূপ হয় এবং দেশ দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়ে। এরা গৃহ, সমাজ, রাষ্ট্র, রাজনীতি, দেশসেবা—কোনটার প্রতি আসক্ত নয় এবং এরা সর্বসংস্কারমুক্ত এক নতুন জাত। ......এ ছাড়া এরই কাছে-পিঠে রয়েছে হোমোসেক্সুয়ালিটির একাধিক কেন্দ্র—যাদের নাম হল 'গে-বাথ' (Gay bath)—যেগুলি পুরুষে-পুরুষে যৌনক্রিয়ার জন্য প্রসিদ্ধ। এখানকার তরুণ বালকরা একখানা মাত্র তোয়ালেতে নিজেদেরকে জড়িয়ে বহিরাগত পুরুষকে নিয়ে ঘরে ওঠে। এদের সচিত্র কাহিনী স্থানীয় বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় ফলাও করে ছাপা হয়।

আমি চলে যাচ্ছিলুম দূর থেকে দূরে—গোল্ডেন ব্রিজ গেট পেরিয়ে মেরিন কাউন্টি ছাড়িয়ে 'সান আমসেলমো' আর 'সান কুইনটন ও আলকাটরাজ' দ্বীপের ধার দিয়ে অজানা আরণ্যলোকের নির্জনতায়। পাহাড়ের ভিতর দিয়ে ঘুরে ঘুরে এক স্থলে যেখানে এসে থামলুম সেখানে দেখি ভিক্টোরীয় যুগের গম্বুজযুক্ত এক অট্টালিকা—যেটির নাম 'আলী আকবর কলেজ অফ মিউজিক।' এখানে আমার বন্ধু নৃত্যশিক্ষক প্রহ্লাদ দাস মহাশয়ের ছেলে শ্রীমান চিত্রেশ আমেরিকান ছেলেমেয়েদেরকে নাচ শেখায়। দোতলায় উঠে দেখি বিভিন্ন বিভাগে বাদ্যযন্ত্রাদি শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। এটি বাঙ্গালীর গৌরবজনক প্রতিষ্ঠান।

অতঃপর 'ট্রেজার আইল্যান্ডের' পথ ধরেছিলুম। চললুম সাত মাইল লম্বা একটি ব্রিজের উপর দিয়ে—যার নাম 'বে ব্রিজ'। ওখান থেকে পথ গেল ক্যাসস্ট্রো মার্কেটের দিকে। দূরে দেখতে পাচ্ছি নগরের নাভিকেন্দ্র, বহুতল অট্টালিকাশ্রেণী—যার নাম ডাউন টাউন। পার হয়ে গেলুম 'সান রাফেল রিচমন্ড ব্রিজ।' দেখতে দেখতে বহু পথ মাড়িয়ে বহুপথ ঘুরে আবার চললুম একখান থেকে অন্যখানে। কালিফর্নিয়ার রাজধানী 'সাক্রামেন্টো'র দিকে যাবার চেষ্টা ছিল। এ যেন নতুন নতুন আবিষ্কার, নতুন পৃথিবীতে ঘুরে বেড়ানো। আরম্ভ করেছি সেই কোথায় কানাডার পূর্বপ্রান্ত থেকে—তারপর আটলান্টিকের পশ্চিম সীমা ধরে দূর দক্ষিণে দেখতে দেখতে এসে ফ্লোরিডার তলা দিয়ে মেক্সিকো উপসাগর ডিঙিয়ে এসে পড়েছি একটির পর একটি স্টেটের ভিতর দিয়ে। সমস্তটা ভাবলে নিজেই অবাক হই। এখানে প্রশান্ত মহাসাগরের পূর্বতীরে দাঁড়িয়ে ভাবছি, তিন মাসের এই অশ্রান্ত ভ্রমণ কোথা থেকে কোথায় আমাকে নিয়ে এল। এখনও কতদূর যাবো, কোন্-কোন্ স্টেটে একে-একে

থামব, নিজেই তার হিসেব করিনি। দুরারোহ পাহাড়, অন্তহীন অরণ্য, অজানা মরুভূমি, লেক সুপিরিয়রের উত্তরবর্তী তুষার লোক ইউকন, উত্তরমেরু অঞ্চল—এরা সবাই মিলে আমাকে যেন অদৃশ্য নিয়তির মতো আকর্ষণ করে চলেছে একে একে। এই বিরাট মহাদেশ পরিক্রমায় আমার পক্ষে বিশ্রাম নেবার কথা ওঠে না।

সেদিন প্রশান্ত মহাসাগরের পশ্চিমে সূর্যাস্তকাল দেখছিলুম। আমার মনে পড়ছিল কন্যাকুমারীর সেই দক্ষিণবিন্দু যেটি গান্ধী স্মৃতি সৌধ। তারই বারান্দায় প্রভাত ও সন্ধ্যায় গিয়ে দাঁড়ালে দেখা যায়, বাঁ দিকে সমুদ্রের ভিতর থেকে রক্তিম সূর্য উঠছে এবং ডান দিকে সেই রাঙা সূর্য ভারত মহাসাগরের তলায় ডুবছে। এখানে আমি যাচ্ছিলুম তীরভূমি ধরে দক্ষিণ পথে প্রায় একশ' মাইল দূরে। পিছনে ফেলে যাচ্ছি সাগরের কোলে সেই তিনটি ছোট ছোট রক-পাহাড়,—মৈনাকের মতো মাথা উঁচু করা। ওই পাহাড়ে বাসা বেঁধে থাকে সিন্ধুঘোটক, অপঅর্থে যার নাম sea-lion, আর থাকে শিলমাছ—যারা জলের তলায় ঢুকে মাছ ধরে খায়। ওদের কাছ থেকে মাছের ভাগ নিতে আসে Sea gull-রা—তারাও সাদা ও পাঁশুটে রংয়ের সিন্ধু-পাখি বা সিন্ধু শকুন। একদিকে আমার পাশে রয়েছে পশ্চিমসাগরের সূর্যাস্তকাল, অন্য দিকে বিশাল পর্বতশ্রেণীর আঁকাবাঁকা ক্রোড় উপত্যকায় কখনও বেরির বন, কখনও কমলা আপেল আর আঙুরের বন, কখনও বা অন্তহীন হরিৎ বর্ণ সব্জীর ক্ষেত। সেখানে কপি, লেটুস, আলু, টমাটো, শসা, মটর প্রভৃতির চাষ আবাদ। সেই মসৃণ সর্পাকৃতি পথ একসময় ছেড়ে প্রশস্ত হাইওয়ে ধরে সন্ধ্যাকালে এসে ঢুকলুম এক বৃহৎ মেক্সিকান রেস্টুরেন্টে। স্বল্পালোকিত ভিতরটা। সুন্দরী ও প্যান্টপরা রমণীরা হাসিমুখে খাবার দিয়ে যাচ্ছে এবং পাত্রে পাত্রে কড়া মেক্সিকান মদ ঢেলে দিচ্ছে। এই বৃহৎ শহরের নাম 'সান্তা ক্রুজ।' আমি স্প্যানিশ, মেক্সিকান, চাইনীজ, পর্তুগীজ, ব্রেজিলিয়ান প্রভৃতি বিচিত্র খাদ্যবস্তুর অনুরাগী। ভুট্টাকে ওরা শুধু বলে 'কর্ন্।' সেই কর্নের পাঁপর দিয়ে আরম্ভ। মাছের কাই, মাংস বাটা, এদের উপর লাল লংকার ক্রীম, কাদা ডালের সঙ্গে টমাটো সস, দু'-এক চামচ ভাত,—সব মিলিয়ে উপাদেয়। বহু দূর পাহাড় পর্বত থেকে শৌখীন নরনারীরা এই হোটেলে খেতে আসে।

আন্দাজ রাত দশটায় পৌঁছলুম সান্তা ক্রুজ ইউনিভারসিটির এক কৃতী অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার বসু মহাশয়ের বাগানবাড়িতে। এটি উপত্যকা অঞ্চল। পথ উঁচু নিচু। দিলীপকুমারের আদরিণী আমেরিকান স্ত্রী শ্রীমতী ক্যাথরিন ওরফে ক্যাথি সহাস্য অভ্যর্থনায় আমাকে ভিতরে ডেকে নিলেন। অতঃপর দিন চারেকের জন্য এ বাড়িতে আমার বিশ্রামলাভ স্থির হয়ে গেল।

শ্রীমান দিলীপ প্রেসিডেন্সির প্রাক্তন ছাত্র। তিনি বি-এ ও এম-এ তে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হন। ইতিহাস ও অর্থনীতি তাঁর গবেষণার বিষয়। তিনি হার্বার্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে চীনের ইতিহাস ও সাহিত্যের কাজে পি-এচ-ডি করেন। এ ছাড়া বার্কলে বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও তিনি চীনদেশের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ 'অহিফেন সংগ্রাম' (১৮৪০)-এর উপর থেসিসস লিখেও পি-এচ-ডি করেন। এ বিষয়ে ভারতে তিনিই প্রথম! সম্প্রতি ইনি চীন দেশে কাটিয়ে এসেছেন কয়েক মাস। পরিহাসরসে ও গল্পগুজবে তাঁর প্রচুর দক্ষতা। বয়সে তিনি এখনও যুবক। এ বাড়ি ওঁর নিজের।

এই সুন্দর ও ধনীপ্রধান পার্বত্য গ্রামটির নাম 'অ্যাপ্‌টস।' ক্যাথি নিজেও এখানকার এক ধনীকন্যা। মেয়েটির অমায়িক সরলতা ও সদ্ব্যবহার দেখে আমি আনন্দিত হয়েছিলুম। এখন দিলীপের ছুটির দিন, সুতরাং আমরা তিনজনে অবাধ আনন্দ ভ্রমণের সুযোগ পেয়েছিলুম। ওঁরা নিজের হাতে একটি ফুলের বাগান রচনা করেছেন। সেই বাগানে ছোট ছোট 'হামিং বার্ডের' জটলা দেখছি সারাদিন। এই ক্ষুদ্রকায় পাখির আয়তন দেড় ইঞ্চির বেশি নয় এবং ফড়িংয়ের মতো এর পাখার ভঙ্গী। কালিফর্নিয়ার পার্বত্য অঞ্চল ছাড়া এ পাখি অন্য কোথাও দেখা যায় না।

এখানকার পৌরসভার বোর্ডে ক্যাথরিন কাজ করে। সান্‌তা ক্রুজের প্রাকৃতিক শোভা ও শান্তি পাছে বিঘ্নিত হয়, এজন্য ক্যাথি এ অঞ্চলে কলকারখানা বা বড় হোটেল হতে দেয় না। সান্‌তা ক্রুজ এ বাড়ি থেকে প্রায় ১৫ মাইল। দিলীপ রোজ ওকে আপিসে পৌঁছে দেয় এবং ফিরিয়ে আনে। আরেকজন স্কলার সঞ্জয় ঘোষকে দেখলুম এখান থেকে প্রায় ৩৫ মাইল দূরে এক পাহাড়ের চূড়ায় ঘন বনের মধ্যে--যেখানে দিনের আলো ঢোকে কম। তাঁর স্ত্রীও আমেরিকান, নাম 'গেইল।' সঞ্জয় এম এস-সি, বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করে এবং পি এচ-ডি করা নিয়ে ব্যস্ত থাকে। শ্রীমতী গেইল ওই জঙ্গলের মধ্যে মেসিনের সাহায্যে কুমোরের মত মাটির বাসন তৈরি করে সান্‌তা ক্রুজের বাজারে বিক্রির জন্য দিয়ে আসে। ওই গভীর বনমধ্যে ওরা ছবির মতো লাল কাঠের একটি দোতলা বাড়ি বানিয়েছে, যার ৮০ ভাগ মিস্ত্রীর কাজ করেছে ওরা দুজনে। ওদের ওই অঞ্চলটির নাম 'রেড উড এস্‌টেট'। একদিন রাত্রে ওরা ডিনারে ডেকেছিল।

কালিফর্নিয়ার ৯১টি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি হল এই পার্বত্য অঞ্চলে। পাঁচ হাজার একর পরিমাণ এক বনময় ভূখণ্ড নিয়ে পাহাড়ের উপরতলি অঞ্চলে এটি প্রতিষ্ঠিত। এখানে ৪ হাজার ছাত্রছাত্রীর প্রায় সকলেরই গাড়ি আছে। সারা দিন ও রাত ওরা থাকে এই ক্যাম্পাসে সর্বপ্রকার কলরব-কোলাহলের বাইরে। ওদের সকলের জন্য শ্রেষ্ঠ আহার ও সর্বাধুনিক ধরনের বাসস্থান নির্দিষ্ট রয়েছে। ওখানে আরেক ভারতীয় নৃতত্ত্ববিদ্‌ রয়েছেন, তাঁর নাম অধ্যাপক তারকনাথ পান্ডে। ইনি কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এখানে আসেন। ইনি কাশীরই ছেলে এবং এখনও অবিবাহিত, এঁর পরিহাস ও মিষ্ট আলাপ সকলের পক্ষেই আনন্দদায়ক। ইনি আগে থেকেই আমাকে জানতেন।

বিদায় নেবার আগে সাগরতীরের জনস্রোতের মধ্যে একটা সম্পূর্ণ দিনমান কাটল বইকি। সামুদ্রিক মাছের হাটে বাগদা চিংড়ি আর ম্যাক্‌রেল আর 'বাফেলো' মাছ কিনলেন দিলীপকুমার। স্নানের ভিড় ছিল ঘাটে ঘাটে। সেখানে শত সহস্র মেয়ে-পুরুষের আত্মহারা স্নানের উদ্দামতা চোখে পড়লে বিদেশী পর্যটকের পক্ষে চক্ষু-লজ্জার কারণ ঘটে বইকি। আমরা ওই কাছেই একটি বড় চাইনীজ হোটেলে ঢুকে অসংখ্য বিকিনি পরা এবং প্রায়-নগ্না মেয়েদের ভিড়ের মধ্যে ঢুকে লাঞ্চ খেতে বসলুম। শত সহস্র চীনা রেস্টুরেন্ট আমেরিকার প্রায় সর্বত্রই দেখা যায়।

শ্রীমতী ক্যাথি ও দিলীপ সন্ধ্যার পরে এক কাব্যসভার আয়োজন করল। বন্ধু-দলের মধ্যে ছিলেন বাংলাদেশের এক সুশ্রী দম্পতি শ্রীমান হায়দার ও নাদেরা, পর্তুগীজ কবি শ্রীমান টম মাদেরস, শ্রীমতী লীন ম্যালি, শ্রীমতী রবিন হলকম্ব ও

শ্রীমান পান্ডে। সেই রাত্রে ক্যাথির লাউঞ্জে শ্রীমান পান্ডে ও দিলীপের কৃপায় তুমুল হাসির ঝড় উঠছিল কথায় কথায়। ওদের মধ্যে টম ও শ্রীমতী লীন নিজেদের ছোট ছোট কবিতা পড়ে আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করেছিল। শ্রীমতী হলকম্ব একজন বাংলা ভাষার ছাত্রী এবং টমের সঙ্গে একত্র বসবাস করে।

সেদিন মধ্যরাত্রির পরও আহারাদির পর্ব শেষ হতে চায়নি।

অতঃপর প্রশান্ত মহাসাগরের তীরভূমিতে ভ্রমণ করছিলুম। এই ভ্রমণেরও আয়োজন করেছিলেন ডঃ দিলীপ বসুর স্ত্রী শ্রীমতী ক্যাথারিন। ক্যাথির পিত্রালয় হলো 'কারমেল' নামক এক শৌখিন শহরে। এটি সান্তা ক্রুজ থেকে বোধ করি একশ' মাইল দক্ষিণে লস এঞ্জেলেসের দিকে। সাগরতীরবর্তী এই ছোট নিরিবিলি ও ধনাঢ্য শহরটি গড়ে উঠেছে হলিউডের চিত্রতারকাদের কৃপায়। এখানে সাগরতীর অতি দীর্ঘ এবং চক্রাকার। জনতার অতি-সমাদরের যন্ত্রণা এড়াবার জন্য বহুসংখ্যক চিত্রতারকা এখানে অজ্ঞাতে পালিয়ে এসে বাস করে। তাদের নিজেদের আবাস, নিজেদের মোটর-বোট, নিজেদের বিমান ও উদ্যানবাটি, সমুদ্রসৈকতে উলঙ্গ স্নানের সর্বপ্রকার বিধি-ব্যবস্থা, চোখে বড় কালো চশমা ও মাথায় ফেট্টি লাগিয়ে ছদ্মনামে পরিভ্রমণ করা—এই কারমেল শহর ও উপত্যকাপথ এই কারণেই প্রসিদ্ধ। এই সম্পদশালী ও ক্রোড়-পতিদের বিলাসনগরটি এককালে স্প্যানিশদের অধিকারে ছিল। তাদের সেইকালের অভিনব গৃহনির্মাণ পদ্ধতি, উপাসনাস্থান, দুর্গ প্রভৃতি এখনও ওখানে দেখা যাচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে এ্যাংলো-স্যাক্সনদের কালিফর্নিয়ার পশ্চিমাঞ্চল একদা স্প্যানিশ, মেক্সিকান, ফিলিপিন, জাপানী, চীনা—এদেরই উপনিবেশ ছিল। তাদের তৎকালীন সভ্যতাকে বলা হত মেক্সিকান 'আজটেকা'। কিন্তু তখনকার কাল ছিল জবরদখলের যুগ। এই ভূখন্ডের সুনির্দিষ্ট মালিক কেউ না থাকায় যে যেখানে যেমনভাবে পেরেছে, আদি-বাসীদের হাত থেকে সব ছিনিয়ে নিয়ে বসে গেছে। আমেরিকান গভর্নমেন্টের সর্ব-ময় প্রভুত্ব এসেছে বহু যুগ পরে। এই সম্প্রদায়গুলির মধ্যে চীনাদের অবস্থা সর্বা-পেক্ষা উন্নত। তারা আমেরিকান চাইনীজ। বহু অঞ্চলে তারা 'চায়না টাউন' গড়ে তুলেছে। সানফ্রান্সিসকোর 'চায়না টাউন' আপন শোভায় সৌন্দর্যে ও স্বকীয়তায় পরিপূর্ণ। ওদের তুলনায় এক জাপানীরা ছাড়া আর সবাই তলিয়ে রয়েছে।

আমাদের সঙ্গে ছিলেন শ্রীমান সুভাষ সরকার ও তাঁর স্ত্রী রানু। সুভাষ আমার স্বর্গত বন্ধু বর্ধমানের আইনজীবী প্রণবেশ সরকার মহাশয়ের পুত্র। রানু উচ্চ-শিক্ষিতা এবং সুভাষ ইনজিনিয়ার।

কারমেল শহরের অপর একটি বৈশিষ্ট্য হল, এখানে আমেরিকান কবি, চিত্র-শিল্পী, গায়ক ও গায়িকা, সাহিত্যকর্মী, অভিনেতা-অভিনেত্রী, জাদুকর, ক্রীড়াবিদ, চিত্রপ্রযোজক প্রভৃতি বহু শ্রেণীর নরনারীর এক-একখানি অট্টালিকা। কালিফর্নিয়ার পশ্চিম পারে বছরের সকল সময়ে মধুর বসন্তকাল অব্যাহত থাকে। সমুদ্রে পাহাড়ে, অরণ্যে—এই ভূভাগ একাকার।

আমরা একে একে সান হোজে, ক্যাপিটোলা প্রভৃতি নগর পরিক্রমার শেষে উপ-ত্যকাপথের হাইওয়ে ধরে চলে যাচ্ছিলাম। আমাদের ডান দিকে উচ্চ মালভূমির উপরে বহুদূর প্রসারিত সৈন্যাবাস, বাঁ দিকে পর্বতের নিচে মাইলের পর মাইল দীর্ঘ এক নীল হ্রদ। আমরা উত্তর কালিফর্নিয়ার ঐশ্বর্যমন্ডিত একেকটি নগরের পথ অতিক্রম

করছিলুম। কেবলমাত্র কালিফর্নিয়াতেই আমি বাস করেছিলুম প্রায় পাঁচ সপ্তাহ-কাল।

সানফ্রান্সিসকো থেকে বিদায় নেবার আগে ওখানকার Cultural Integration Centre হল-এ আমার একটি সুদীর্ঘ বক্তৃতার আয়োজন করা হয়েছিল। বিষয় ছিল হিমালয়, গাঙ্গেয় সভ্যতা ও ভারতীয় সংস্কৃতি। নিস্তব্ধ সেই হল-এ তিন-ঘণ্টাকাল বক্তৃতা করার পর অনেকেই আমাকে সানন্দে জড়িয়ে ধরেছিলেন।

সম্প্রতি কয়েকদিন থেকে আকস্মিকভাবে 'আরথ্রাইটিস্' রোগের আক্রমণে আমার পা দুখানা পঙ্গু হবার চেষ্টা পাচ্ছিল। কিন্তু আমার থামবার যো ছিলনা। পথের দেবতা আমার সঙ্গে কৌতুকরঙ্গে মেতেছিলেন। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে দেওয়াল ধরে ধরে আমি উত্তর মেরুলোকের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলুম। সানফ্রান্সিসকো থেকে মেরু-পথে যেতে গেলে যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম সমুদ্র তীর ধরে কালিফর্নিয়া, ওরেগন ও শীত-প্রধান স্টেট ওয়াশিংটন পেরিয়ে যেতে হয়। এ ওয়াশিংটন সেই রাজধানী নয়—সেটি এখান থেকে পূর্বপথে তিন হাজার মাইল দূরে। আমার পথ ছিল উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরের তীর ধরে ওয়াশিংটনের রাজধানী সিয়াটল অঞ্চলে পেঁছনো। এখনও ওই পথে বসন্তকাল, সুতরাং ভয়-ভাবনা কম। সিয়াটল থেকে একটি পথ উত্তরে এঁকেবেঁকে পাহাড় পর্বত নদী ও অরণ্যের ভিতর দিয়ে পশ্চিম কানাডার বৃটিশ কলাম্বিয়ায় পড়েছে—যেটি অনুন্নত এবং বিরাট ভূভাগের প্রায় সবটাই একপ্রকার জনবসতিশূন্য। কেবলমাত্র পশ্চিম সমুদ্রের কাছাকাছি পেঁছতে পারলে একদিকে বিশাল দ্বীপ ভ্যানকুভার, তার পাশে উপসাগর এবং উপসাগরের পূর্বতীরে প্রকান্ড নগর ওই একই ভ্যানকুভার। এই ভ্যানকুভারে ঔপনিবেশিক ভারতীয়দের সংখ্যা প্রচুর। পাঞ্জাবী, গুজরাতী বা ভাটিয়া, ফোড়নের মতো কয়েকজন উচ্চশিক্ষিত বাঙ্গালী—যেমন দেখে এসেছি টরন্টোয়—তাঁরা প্রায় সবাই স্থায়ীভাবে রয়ে গেছেন। কানাডার উদারক্ষেত্রে ভারতীয়দের সংখ্যা এখনও সীমায়িত হয়নি। ইঞ্জিনীয়ার ও বিজ্ঞানীদের চাহিদা এখনও রয়েছে। টরন্টো ও অটোয়ার দুজন প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানী ডক্টর অরবিন্দ গুহ এবং বিশ্বনাথ নন্দী—এঁদের মুখে এ-সব আলোচনা শুনেছি।

যখন সিয়াট্‌ল-এ এসে পেঁছলুম, তখন আমি প্রায় পঙ্গু এবং চলৎশক্তিহীন। পল্লীগ্রামের নুব্জদেহা বৃদ্ধা যেমন দড়িবাঁধা ছাগলকে হিঁচড়িয়ে টেনে নিয়ে যায়, আমিও তেমনি একটি নাইলনের দড়ি দিয়ে সুটকেসটি বেঁধে যখন কুঁজো হয়ে টানতে টানতে এগোচ্ছি তখন দুটি আমেরিকান যুবক আমার সাহায্যে এগিয়ে আসে। একজন সুটকেসটি নেয়, অন্যজনের কাঁধে আমি ভর দিয়ে চলি। ওরা কয়েক মিনিটের জন্য আমার পরমাত্মীয় হয়ে ওঠে।

উত্তর মেরুর দিকে পাড়ি দিচ্ছিলুম, সুতরাং ব্যক্তিগত কথা এখন থাক। যুক্ত-রাষ্ট্রের সুদূর উত্তর-পশ্চিমে সর্বাপেক্ষা বড় শহর হল সিয়াটল। কিন্তু শহর বা নগরের কোথাও কোন বৈচিত্র্য নেই। সেই একই ছাঁচ, একই রকম সম্পদশালী। এক শহরের নাম মুছে দিয়ে অন্য শহরের সঙ্গে মিলিয়ে দাও, কেউ চিনবে না। সিয়াটলের পার্বত্য উপত্যকার বাইরে দেখতে পাচ্ছি একটা অন্য জগৎ, সেই পৃথিবী আমার কাছে নতুন। উত্তর প্যাসিফিক সমুদ্রের বহু অংশ ঘন তুষারে জমে রয়েছে, মেঘেরা নেমেছিল সাগরের জলে, কিন্তু আর ওঠেনি, ওখানেই তারা শ্বেতমৃত্যুতে অসাড়

হয়ে রয়েছে। ওই সাগরেরই কোল থেকে উঠে দাঁড়িয়েছে তুষার সমাকীর্ণ এক একটি পর্বত যার উচ্চতা ছয় থেকে দশ হাজার ফুট। এই প্রাণীচিহ্নহীন, অসাড় ও শব্দ-শূন্য এক বিচিত্র মায়ালোক যেন সৃষ্টির আদিকালে উত্তীর্ণ। অসংখ্য শাখা-প্রশাখায় নেমে এসেছে অজানা অনামা বন্য নদীর দল মাকড়সার জালের মতো, ভৌগোলিকদের কাছে যাদের কোনও পরিচয় নেই। মাঝে মাঝে তাদের তীরবর্তী ঘন সবুজ বনভূমি, যাদের তলায় তলায় জলাশয়রা অসাড় হয়ে রয়েছে তুষারে। মাঝে মাঝে অসংখ্য দ্বীপ, বদ্বীপ, উপদ্বীপ, অথবা ক্রীক—সব ছড়ানো রয়েছে সমুদ্রে, এখানে যার নাম দেওয়া হয়েছে আলাস্কা উপসাগর। আমি যাচ্ছিলুম দূর থেকে দূরে- উত্তর মেরু বা আর্কটিক সার্কলের মধ্যে।

বহুকাল আগে কবি অজিতকুমার দত্তর একটি কবিতার দু-তিনটি চরণ মনে পড়ছিল,—"অথবা সেথায় নিয়ে চলো মোরে যেথায় অরোরা বর্ণের প্রলিম্প আঁকে সুদূর বিজন ভীষণ মেরুশিরে—।" সেদিন কি অজিত জানতো, আমার মনে ওই দুটি ছত্র কিরূপ বিবক্রিয়া এনেছিল?

এখন দেখতে পাচ্ছিলুম সামনে-পিছনে ডাইনে-বাঁয়ে প্রশান্ত সাগর জমে শাদা হয়ে রয়েছে এবং উড্ডীন মেঘসম্ভার এই রৌদ্রালোকিত দিনমানকে একপ্রকার অনৈসর্গিক অন্ধকার রহস্যজালে আবৃত করেছে। সেই রহস্যকে ভেদ করে নিচের দিকে নামছে 'ইউকন্' নদী যার বিশাল কায়া দ্বিধাবিভক্ত করেছে উত্তর-পশ্চিম কানাডা আর উত্তর মেরু অঞ্চলকে। এই ইউকনের তীরে তীরে তুষারময় উপত্যকার ধার দিয়ে আবার উত্তর-পশ্চিমের দিকে চলেছে 'আলাস্কান হাইওয়ে'- সে-পথ কানাডার 'এডমন্টন' অঞ্চল থেকে প্রায় এক হাজার মাইল গিয়ে আলাস্কার ভূমিতে মিলেছে। সানফ্রান্সিসকো থেকে মোটর পথে কমবেশি সাড়ে চার হাজার মাইল দুঃসাধ্য এবং অগম্য পথ পেরোতে পারলে তবে মেরুলোকে গিয়ে পৌঁছনো যায়। এই পথে ছড়িয়ে আছে শ্বেত ও কৃষ্ণাঙ্গ ভল্লুক, মাঝে মাঝে নামহারা অতিকায় জন্তু, দূরে-দূরে এস্কিমোদের লাল-কাঠের ঘর—যারা জন্তুর ছাল পরে' থাকে, জন্তুর চামড়া দিয়ে গা ঢেকে বেড়ায়, যারা শক্ত চর্বি চিবিয়ে খায় এবং ভুট্টার সঙ্গে পোড়া সিল মাছ খেয়ে দিন চালায়। ওদের সঙ্গে নিত্য সংগ্রাম লেগে থাকে শ্বেত ভল্লুকের—যারা মেরু জলাশয়ের মধ্যে ঢুকে সিল মাছ ধরে আনে এবং কুকুর-টানা শ্লেজগাড়ির আরোহী এস্কিমোদের বর্শায় প্রাণ হারায়। শ্বেত ভল্লুকের চামড়া ওদের কাছে খুবই মূল্যবান। একস্কিমোরা আদিবাসী এবং অধিকাংশই মঙ্গোলয়েড,—যারা স্মরণাতীত কাল থেকে সাইবেরিয়া ছেড়ে বেরিং প্রণালী পার হয়ে নবাবিষ্কৃত মহাদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। উত্তর মেরুবাসীদের নাম হয় এস্কিমো, এবং যারা দক্ষিণ পথ ধরে নামতে থাকে তাদের নাম দেওয়া হয় রেড-ইণ্ডিয়ান। এই কিছুকাল আগেও এস্কিমোদের কিছু সুনাম ছিল এই, তারা নাকি অতিথিপরায়ণ। তাদের বাসগৃহে হঠাৎ অতিথি সজ্জন এসে পড়লে তারা নাকি স্ত্রী, কন্যা বা ভগ্নিকে অতিথির সঙ্গে একই শয্যায় রাত্রিবাস করতে দিত। উভয় নরনারী আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থায় থাকলে যে উত্তাপের সৃষ্টি হত, সেটি শীতপ্রধান দেশের পক্ষে প্রাণধারণের উপযোগী। কাল-ক্রমে এটি লাম্পট্য ও পতিতাবৃত্তিতে পরিণত হয়। ইদানীং এস্কিমোরা তাদের শিকারের জন্য আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহ করতে আরম্ভ করেছে।

ব্রিটিশ কলম্বিয়া পিছনে পড়ে রইল। ইউকন্ স্টেট রইল ডানদিকে—যার

'ম্যাকেনজি' পর্বতশ্রেণীর তলা দিয়ে ইউকন্ বয়ে চলেছে উত্তর আলাস্কায়। আমি পার হয়ে এলুম 'তানানা' নদ। একপাশে রইল যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্বত ২০,৩০০ ফুট উঁচু ম্যাকিনলের তুষারচূড়া—এ যেন চিরন্তন কাল শাসন করে চলেছে উত্তর মেরুলোক। আমি এসে পৌঁছলুম দক্ষিণ আলাস্কার সুবৃহৎ জনপদ 'আঙ্করেজ' অঞ্চলে। এই জনপদের চারিদিকে পর্বতশ্রেণী যেন এক দুর্গ রচনা করেছে। কাছেই রয়েছে একটি রেলপথ,—এটি সোজা উত্তরে চলে গেছে বন আর পাহাড়ের কোল ঘেঁষে। আলাস্কায় এসে পৌঁছলুম বটে কিন্তু আমার গতিপথ এখানেই শেষ হয়নি। আমি আরও উত্তরে যাবো প্রায় চারশ' মাইল দূরে। আমার পথলব্ধ দুই বন্ধু, ক্লিফোর্ড দম্পতি, এবার বিদায় নিলেন,—তাঁদের ছেলে 'আঙ্করেজে' নির্মাণ কাজে নিযুক্ত, —তার কাছেই ওঁরা চললেন। যাবার সময় শ্রীমতী ক্লিফোর্ড এক প্যাকেট 'ভাইসরয়' সিগারেট উপহার দিয়ে গেলেন। স্বামী ধূমপান করেন না, কিন্তু স্ত্রীর পক্ষে সিগারেট ছাড়া চলে না। যুক্তরাষ্ট্রে সাধারণ এক প্যাকেট সিগারেটের ভারতীয় মূল্য এখন দাঁড়ায় ৫ টাকা ৬০ পয়সা।

আমি যেন সেই আদিম অরণ্যলোকের মধ্যে প্রবেশ করছিলুম। বিশ্বসৃষ্টির প্রথম কাল থেকে যা শুধু ঠাণ্ডা এবং জনচিহ্নহীন থেকে গিয়েছিল। বনে-বনে এবং পাহাড়ে-পাহাড়ে নতুন বসন্তকালের হাওয়া বয়ে চলেছে, কিন্তু সে-মাত্র আর কয়েকটা দিনের জন্য। চারিদিকে প্রুস আর বার্চের ঘন বন—ওদের উপর থেকে বরফ খসে গেছে। মাঝে মাঝে পাইনবনের চূড়া, মাঝে মাঝে 'রেড-উডের' বনময় শোভা, আর সম্মিলিত সুগন্ধ কেমন যেন এক অপার্থিব রহস্যের সংবাদ আনে। একদা যেমন লেনিনগ্রাডের উত্তর আকাশে দেখেছিলুম মেঘসূত্রদল,—এখানেও মেঘের সেই লাইনগুলি চেয়ে দেখছিলুম। এই মহাদেশের সুদূর পশ্চিম সীমান্ত পরিদর্শন এইখানে এসে আমার শেষ হতে চলেছে।

আলাস্কার রাজধানী 'ফেয়ারব্যাঙ্কসে' যখন এসে পৌঁছলুম তখন অপরাহ্নকাল। এখানে এখন সন্ধ্যার আলো জ্বলে রাত প্রায় দশটায়, দু' ঘণ্টা মাত্র সায়াহ্ন,—রাত্রিকাল মাত্র চার ঘণ্টা। অরোরার আলোর চকমকি রঙীন আভা রাত্রিকে ঘন অন্ধকার হতে দেয় না, শুধু সুষুপ্তি আনে। আলাস্কায় সম্পূর্ণ রৌদ্রোজ্জ্বল দিনমান থাকে ২১ জুন ২৪ ঘণ্টাকালব্যাপী, এবং সম্পূর্ণ রাত্রিকাল থাকে ২১ ডিসেম্বর ২৪ ঘণ্টাব্যাপী, তারপর থেকে প্রতিদিন ৬ মিনিট করে রাত্রিকাল বা দিনমান কমা বা বাড়া করতে থাকে।

বনময় পার্বত্য উপত্যকার নিচে ফেয়ারব্যাঙ্কস এখনও তেমন শহর হয়ে ওঠেনি। কিন্ত এই ক্ষুদ্র জনপদের মধ্যেই এখন এক বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছে। যুক্তরাষ্ট্রে গত তিন মাসকাল ভ্রমণের মধ্যে এই প্রথম দেখলুম, মোটর চলে গেলে পিছনে একটু ধুলো ওড়ে। এখন রাজধানীতে পথঘাট, মাঠ-ময়দান, ভূগর্ভ পাইপ লাইন—একে একে তৈরি হচ্ছে। কাজ চলছে প্রতিদিন ১৬।১৮ ঘণ্টা। অল্পকালের মধ্যেই বসে গেছে বড় বড় হাটবাজার আর জনকল্যাণ প্রতিষ্ঠান। শিল্পপতিরা বিমানযোগে এনে ফেলছে পণ্য বিপণি! দেড় হাজার মাইল দূর থেকে আল্‌কান্ (আলাস্কান) হাইওয়ে পেরিয়ে পিপীলিকাশ্রেণীর মতো ট্রাকের দল আসবাবপত্রাদি, যন্ত্রপাতি ও ভারি শিল্পসামগ্রী এনে ফেলছে। সিনেমা শিল্পের প্রযোজকরা এখন কর্মব্যস্ত। সমীক্ষাসূচক রকেট ছোঁড়া হচ্ছে এরই মধ্যে। বসবাসপল্লী বা অ্যাপার্টমেণ্ট কম-

প্লেক্স একটির পর একটি গজিয়ে উঠেছে। প্রতি বাড়িতে আগাগোড়া 'হীটিং'-এর বন্দোবস্ত, —রান্নাঘর ও স্নানাগারে ইলেকট্রিকের আগুন সরবরাহের ব্যবস্থা। অক্টোবর থেকে সমগ্র আলাস্কা বরফ চাপা পড়বে, মেরু বাতাসের ঝড় বইবে, লোমকম্বলের পোশাক পরতে হবে শ্রমিকদের, হাতে চামড়া বেঁধে কাজ করতে হবে। ঠান্ডা জলের সাপ্লাই বন্ধ হয়ে যাবে। তখন যদি কোনও দিন মাত্র দু ঘন্টার জন্য ইলেকট্রিক কারেন্ট বন্ধ হয়, তবে সমগ্র নগর হবে পক্ষাঘাতগ্রস্ত এবং উত্তাপের অভাবে অধিবাসীরা হবে পঙ্গু। সে নাকি অপমৃত্যুর সমান, ওরা বলে।

গত শতাব্দীতে ১৮৯০ সালে রাশিয়ার জারকে অর্থনীতিক কারণে বোধ করি ভুগতে পেয়েছিল। তিনি এই প্রায় পাঁচ লক্ষ বর্গমাইল জোড়া আলাস্কা এলাকাটি মাত্র ৭০ লক্ষ ডলার পেয়ে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে বিক্রি করেন। যুক্তরাষ্ট্র তখন থেকে আলাস্কাকে বহির্বিভাগীয় একটি 'টেরিটরি' হিসাবে গণ্য করেন এবং একজন কমিশনারকে নিযুক্ত করেন দেখাশোনার জন্য। হঠাৎ তার বছর দশেক পরে আলাস্কায় এক সোনার খনি আবিষ্কৃত হয় এবং চারদিকে খবরটি ছড়িয়ে পড়ার ফলে হাজারে হাজারে কাতারে-কাতারে সকল শ্রেণীর লোক আলাস্কা অভিযান করে, এবং মাটি খুঁড়ে সোনা তুলতে থাকে। কিন্তু খাদ্য ও আশ্রয়ের অভাবে হাজার হাজার লোক মারাও যায়। তখন না ছিল বিমানবাহিনী, না ছিল সর্বাধুনিক বিজ্ঞানের প্রগতি। এই বিষয়টি নিয়েই বিশ্ববিশ্রুত হাস্যরসের অভিনেতা ও প্রযোজক চার্লি চ্যাপলিন তাঁর জগৎপ্রসিদ্ধ ছবি 'গোল্ড রাশ' নির্মাণ করেন এবং সমগ্র পৃথিবী হাসিতে মুখর হয়ে ওঠে। আমেরিকা সেই থেকে চ্যাপলিনকে আর ভালো চোখে দেখলো না।

ফেয়ারব্যাঙ্কস-এর একটি বনময় অঞ্চলে এক বাড়িতে আমি আশ্রয় নিয়েছিলুম। তখন আমি কষ্টক্লিষ্টভাবে খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে হাঁটছিলুম। কিন্তু আমি চিরদিন ভ্রাম্যমাণ, আশৈশব ওটা আমার জীবনধর্ম। ইংল্যান্ড থেকে এখন আমি প্রায় ১২ হাজার মাইল দূরে রয়েছি—দিল্লি থেকে কত দূরে হিসেব করিনি। এখন আমার ভাবনার পথে আত্মীয়জনের স্নেহচিন্তার প্রবেশ নিষিদ্ধ। দেওয়াল ধরে-ধরে হাঁটলেও আমি খুবই সুস্থ। ক্লান্ত, অনড়, কিন্তু অসুস্থ নই। শুধু ভাবছি কলকাতায় এখন শুক্রবারের মধ্যরাত, এখানে বৃহস্পতির দুপুর। উলটোটাও হতে পারে।

বছরে মাস পাঁচেক যেখানে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা চলে, সে-দেশে বিশালতর নাগরিক সভ্যতা গড়ে উঠতে পারে কিনা, সেটি কর্তৃপক্ষের বিবেচনাধীন। কিন্তু শুধু সোনা নয়, আলাস্কায় যে পরিমাণ তেল ও কয়লার সন্ধান পাওয়া গেছে, তাতে আগামী একশ বছর অবধি হেসে খেলে যুক্তরাষ্ট্রের চলে যাবে। এ ছাড়া অপরিমেয় তামা, দস্তা, ফসফেট ও অন্যান্য ধাতবসামগ্রী আবিষ্কার করেছেন ভূতত্ত্ববিদরা। এখানে বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে কেবলমাত্র বিজ্ঞানের বিবিধ বিষয় নিয়ে গবেষণার জন্য। পদার্থ, রসায়ন, ধাতব, নৃতত্ত্ব, কৃষি, মৃৎপ্রকৃতি, ভূমির আগ্নেয় প্রকৃতি, বিদ্যুৎপরিকল্পনা, রৌদ্ররশ্মি, অত্যধিক তুষারপাতের ফলে ভূপ্রকৃতির পরিবর্তন, মানবদেহে উত্তর মেরুর আবহ প্রভাব প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শিতা উৎপাদনের জন্য শিল্পপতি ও ধনপতিরা অবাধে ও অকাতরে গ্রান্ট্ দিয়ে চলেছেন। এদেশের শিল্পপতিরা জনবিদ্বেষী নন্। প্রতি স্টেটের ধনকুবের যাঁরা, তারা জনগণের সচ্ছলতা ও স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে প্রথম নজর দেন্। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রে সর্বপ্রকার সামগ্রীর দর যে-হারে বেড়েছে, ঠিক সেই হারেই কর্মীদের উপার্জনের হার। তবে কিনা প্রত্যেকটি

খাদ্যসামগ্রী তেমনিই খাঁটি ও নির্ভেজাল। ফলে, জর্জ মিনির মতো অত বড় শ্রমিক নেতার মুখে কোনও মন্তব্য শোনা যায় না। এরা ২৫ পাউন্ড ওজনের এক বস্তা শ্রেষ্ঠ চাউল বিক্রি করে ১১ ডলারে, এক গ্যালন খাঁটি দুধ বেচে প্রায় দেড় ডলারে। তিনগুণ চারগুণ দাম বাড়ার ফলেও লোকে বলে, খাবার জিনিস সস্তা বইকি। কিন্তু গভর্নমেণ্ট নয়, শিল্পপতিরাই দেশের ভাগ্যনিয়ন্তা। তাদের অসাধুতা তুমি আমি ধরতে পারব না। যেমন ধরো, জলে ক্লোরিন মেশানো। কিন্তু সমগ্র আমেরিকার কোটি কোটি মেয়ে-পুরুষের মাথার চুল এত ওঠে কেন,—এজন্য অনেকে বলে ক্লোরিন ছাড়া বোধ হয় আরেকটা কোনও সূক্ষ্ম পদার্থ জলে মিশানো হয়। যার ফলে এই ওঠা-চুল একদিকে কেনে শিল্পপতিরা, আবার ওই চুল পরচুলা হিসেবে লক্ষ লক্ষ ডলারে বিক্রি হয়। চুলের বৃদ্ধির জন্য শতশত রকমের সুগন্ধী লোশন্ রয়েছে যার একটির দাম গড়পড়তা আট থেকে দশ ডলার। প্রত্যেকটি শহরে ও জনপদে লক্ষ লক্ষ গাড়ি ছোটে কিন্তু মোটর নির্মাণের মধ্যে সূক্ষ্ম কারচুপি থাকে, যার জন্য সেটা স্বল্পায়ু। যত স্বল্পায়ু, ততই শিল্পের উন্নতি। চারিদিকে সর্ব-প্রকার সামগ্রীর যত অপচয় ও বিনষ্টি, তত বেশি উৎপাদন করার অধ্যবসায়। এখন বাড়িঘর তৈরির মালমশলা হিসাবে কাঠ, প্লাইউড, ইন্সুলেসন, পিজবোর্ড, রং—এইগুলি বেশি বিক্রি। লোহা, পাথর, ইঁট, চুন, সিমেণ্ট প্রভৃতির প্রয়োজন যৎকিঞ্চিৎ। শিল্পপতিরা এখন মাঠের পর মাঠ কিনে জনবসতি নির্মাণ করছে। ছোট একতলা বা দোতলা বাড়ি যখন ফিটফাট অবস্থায় বিক্রি হয় তখন তার দাম ধরা হয় ৩০ থেকে ৫০ হাজার ডলার। এদেশের অর্থনীতির চেহারা এমনই যে, জনসাধারণ ভাবছে তারা বহুপ্রকারে লাভবান, শিল্পপতিরা ভাবছে তারাই অধিকতর লাভবান।

আলাস্কার প্রাচীন রুশীয় নাম পাওয়া যাচ্ছে, 'আলিয়েস্কা'। আলিয়েস্কা শব্দটি নিয়ে শিল্পপতিরা কালক্রমে নানা 'কর্পোরেট বডি' প্রতিষ্ঠা করেছে—যাদের প্রধান কাজ হল খনিজ সামগ্রী নিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য। সম্প্রতি উত্তর মেরুসাগরের তীরভূমিতে এত বেশি তেলের সন্ধান পাওয়া গেছে যা বহু যুগ ধরে আমেরিকাকে তৈল-সম্রাট বানিয়ে রাখবে। আমার মাথার উপর দিয়ে সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি জেট বিমান আর হেলিকপ যাচ্ছে রসদ সম্ভার নিয়ে উত্তরের সাগরতীরে—যেটা ফেয়ারব্যাঙকস্ থেকে বেশি দূরে নয়। তেলের পাইপ লাইন টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এখান থেকে সেই কানাডার ইউকন্ প্রদেশে,—সেখান থেকে যাবে দক্ষিণে দ্বীপ-উপদ্বীপ, বন, পাহাড়, ইত্যাদির ভিতর দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে। কয়েকদিন আগে বেরিং সাগরের পশ্চিম পার ধরে উত্তরের মেরুসাগরে রসদের জাহাজ এসেছে,—কিন্তু সেই অতি শক্তিমান ও বিরাট জাহাজটি বরফের পাহাড়গুলির অবরোধ ভাঙতে পারছে না। এর ওপর গতকাল সন্ধ্যায় খবর পাচ্ছিলুম, মেরুলোক থেকে বাতাস নামছে দক্ষিণে—যার ঠাণ্ডার পরিমাপ হল 'বিয়োগ-চিহ্নের' ১৫০ ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেড। সেখানে নিষ্ক্রিয় মানুষ শুধু দাঁড়িয়ে থাকলে নিজের থেকে জমে যায়! শ্রমিক বা কর্মী যারা- যারা এই আবহের মধ্যে কাজ করছে তারা ওখানে কমপক্ষে মাসিক আড়াই হাজার ডলার মাইনে পায়। অফুরন্ত টাকা তাদের পকেটে পকেটে ঘোরে।

সম্প্রতি দলে-দলে আসছে এক শ্রেণীর মেয়েরা—যাদের সংগোপন পতিতাবৃত্তি রোধ করার কোনও উপায় নেই। তারা একরাত্রির বসবাসের জন্য প্রতি শ্রমিকের কাছ থেকে ৫০ ডলার উপার্জন করে। চুরি, ছিনতাই, রাত্রের দিকে অন্যের মোটর নিয়ে

পালানো, মদের হোটেলের দাঙ্গা ও খুন,—এগুলি এই ফেয়ারব্যাঙ্কস-এ এখন বেড়ে উঠছে। মোট প্রায় ৫০ হাজার লোক এখানে বাস করছে, কিন্তু পরিবার নিয়ে এদেশে কম লোকই থাকে। বছরে সাত মাসকাল সমগ্র আলাস্কা বরফে চাপা পড়ে।

আমি বাস করছি বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকায়। সামনেই 'তানানা' নদীর শাখা 'চেনা'। এই 'তানানা' গিয়ে দক্ষিণে বেরিং সাগরে পড়েছে যেটি প্রশান্ত সাগরের উত্তর ভাগ। বেরিং সাগর 'সালমন' মাছের আড্ডা, যার তেল প্রসিদ্ধ। সিন্ধুঘোটক, সিল, বৃহদাকার লোমশ ও শ্বেতবর্ণ ছাগল, শ্বেতভল্লুক, তিমি মাছ, 'মুজ' নামক বহু শাখাযুক্ত হরিণ—যার আকার ঘোড়ার চেয়ে বড়,—এইগুলি শিকারের বস্তু। ঈগল, রঙীন রাজহাঁস, বর্ণাঢ্য অন্যান্য পাখি যেমন গ্রাউজ—এরা আসে সময়কালে। বহু পদযুক্ত একপ্রকার মাছ—যাদের নাম 'স্টার'—তারা বরফ জলের তলা থেকে উঠে এসে ডাঙ্গায় ঘোরাফেরা করে—যদি বড় কোনও জন্তুকে খুঁজে পায়! এই বিশালকায় সামুদ্রিক 'মাছ' চতুষ্পদ কোনও জন্তুকে ধরতে পারলে গিলে খায়। বড় বড় অতিকায় কাঁকড়া—যাদের এক একটার ওজন তিন চার কিলো—তারা এক সঙ্গে অনায়াসে এই 'স্টার' মাছের গ্রাসের মধ্যে প্রবেশ করে। শ্বেত ও কৃষ্ণকায় ভল্লুক ছাড়া সোনালী বর্ণ ভল্লুক আলাস্কায় প্রচুর। এরা নরখাদক বাঘ বা সিংহ অপেক্ষাও হিংস্র। এদের একটাকে দেখলে অন্যান্য ভল্লুকরা পালায়। এসকিমো মেয়েরা যখন তুষার পর্বতের পাথরের ফাটলে-ফাটলে একপ্রকার আহার্য বনালতার সন্ধানে ঘোরে, তখন এই সোনালী ভল্লুকের নখের আঁচড়ে তাদের দেহ ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। এই জাতের ভল্লুককে ধরা অথবা বধ করা নিষিদ্ধ নয়। সমগ্র আলাস্কার ৩৪ হাজার মাইল দীর্ঘ সমুদ্রতীর ঘনহীন বটে, কিন্ত প্রাণীহীন নয়।

আলাস্কার উত্তরভাগ সমস্ত বছরই কঠিন ও নরম তুষারে ঢাকা থাকে। রৌদ্রের তাপেও তারা গলে না। দক্ষিণ পশ্চিম ভাগে এই 'নরম' তুষার-অঞ্চলের নাম 'Permafrost'। কিন্তু এই Permafrost বা চিরস্থায়ী তুষার-কঠিন অঞ্চলেরই ফাঁকে-ফাঁকে মাটি ও ঘাসের জমি মাঝে মাঝে খুঁজে পাওয়া যায়—যেখানে চাষ-আবাদ করা সম্ভব। এই সব টুকরো জমিগুলিতে পৃথিবীর আদিমতম শস্য ভুট্টা জন্মায়। সম্প্রতি এখানে কোথাও-কোথাও যব ফলনের চেষ্টাও চলছে। এদেশে গরু নেই। বাইরে থেকে গরু এনে তাকে বিশেষ আবহের মধ্যে রেখে তবে দুধ পাওয়া যায়। মাংস, মাখন, তেল, রুটি, সবজি, ফল-ফলাদি সব আসে বাইরে থেকে। শিল্পপতিরা এই আমদানির সুবিধা পেয়ে সর্বপ্রকার সামগ্রীর দর বাড়িয়েছে। কিন্তু তারা কখনও কৃত্রিম দুষ্প্রাপ্যতা সৃষ্টি করে না। আলাস্কায় আছে কেবল কাঠশিল্প। শামুকের বিচিত্রবর্ণ খোলা দিয়েও শিল্প নির্মাণ করা চলে।

ঘন অন্ধকার রাত্রির আকাশে যদি ঘন ঘোরালো মেঘ না থাকে, স্বল্পায়ু চন্দ্রাভায় আকাশ যদি মোহমদির মায়ালোক সৃজন করে চলে তবে ওই উত্তর মেরুর প্রান্ত দিগন্তে মাঝে মাঝে দেখতে পাওয়া যায় সেই অপার্থিব অরোরার বহুবর্ণচ্ছটা,—শ্বেত, নীল, পীত, রক্তিম, রক্তনীল, হরিৎ—পরকলা কাঁচের মধ্যে যেমন একে একে দ্যুতির চকিত-চমক লাগে।

আমি এখন বাস করছি পৃথিবীর উত্তরতম লোকে।

এখানে একজন বাঙ্গালী আছেন ভূতত্ত্ব বিষয়ের সুপণ্ডিত অধ্যাপক ডক্টর নীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস। পৃথিবীর এই সুদূর উত্তর প্রান্তে এক অরণ্যময় পার্বত্য

ভূভাগে এই সুবৃহৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ, এর গবেষণার কাজ, অন্যান্য কর্মপদ্ধতি এবং সুবিস্তৃত ক্যাম্পাস--এগুলি দেখে চমৎকৃত হতে হয়।

এখন এই স্টেটের সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় স্থান হল 'পয়েণ্ট ব্যারো' নামক একটি ক্ষুদ্র বস্তি (hibitat)---যেখানে থাকে একদল এসকিমো। এই সেদিন পর্যন্ত উত্তর মেরুসাগরের তীরবর্তী এই 'পয়েণ্ট ব্যারো' ছিল সভ্য জগতের কাছে অপরিচিত। ওখানে এসকিমোরা কেবল মাছ ধরতো সমুদ্রে এবং জন্তুর ছাল দিয়ে সর্বাঙ্গ ঢেকে ওই তুষারলোকে প্রাণ ধারণ করতো। ওদের মধ্যে বিবাহ প্রথা, সমাজ বন্ধন বা জৈব-নীতিক শাসনাদি তেমন কিছু ছিল না। এই উপজাতীয় জনসমষ্টি কেবলমাত্র জননীকেই স্বীকার করে নিত। এখন এই তীরভূমির হাওয়া বদলিয়েছে। 'পয়েণ্ট ব্যারো' এখন তৈলপ্রধান অঞ্চল। এসকিমো গোষ্ঠী এখন আমেরিকান শিল্পপতিদের কৃপায় কতকটা আধুনিকতা লাভ করেছে। পোশাক, আচার-ব্যবহার, বসবাস ব্যবস্থা, খাদ্যবৈচিত্র্য প্রভৃতিতে ওদের অনেকটা উন্নতি ঘটেছে এবং অর্থ উপার্জনের দিকে মন দিয়েছে। ফেয়ারব্যাংকস-এর ইস্কুলে ওদের ছেলেমেয়েরা অনেকে পড়াশুনো করছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে ওদের সুশ্রী তরুণ-তরুণীরা আধুনিক সজ্জায় এসে যখন ঢোকে তখন ওদেরকে চেনবার জো থাকে না। ওরা সবাই জাতিতে মঙ্গোলয়েড এবং আপাতত খৃষ্টান ধর্মনীতির অন্তর্ভুক্ত। ওরা স্বভাবশান্ত এবং অনেকটাই যেন অহিংসাবাদী।

১৯ শতাব্দীর শেষভাগে 'গোল্ডরাশের' কালে এই 'ফেয়ারব্যাংকস' প্রথম আমেরিকানদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং এখানে বনময় অঞ্চলে পাথর খোঁড়া হতে থাকে। খনিগুলি এখনও রয়েছে এবং সেগুলি গত দুদিন ধরে আমি দেখে বেড়াচ্ছিলুম। এখন আর কেউ বিশেষ সোনা চাইছে না, কারণ ওই ধাতুটি তুলতে গেলে এখন খরচ অনেক। কিন্তু সোনার বাজার পৃথিবীতে যেভাবে চড়ছে, তাতে এরা আর বেশিদিন চুপ করেও থাকবে না এমন প্রমাণও পাওয়া যাচ্ছে। যাই হোক, সেদিনকার সেই 'গোল্ডরাশের' ফলে আলাস্কার ভূ-প্রকৃতি উন্মেষণে পরীক্ষা করার জন্যই ১৯১৮ সালে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্ম ঘটে এবং ১৯৫৮ সালে আলাস্কাকে যুক্তরাষ্ট্রের ৪৯তম স্টেট হিসাবে গণ্য করা হয়। ১৯০২ সালে ফেলিক্স পেড্রো নামক জনৈক আমেরিকান যখন ফেয়ারব্যাংকস-এর জঙ্গলে ভূগর্ভে প্রথম সোনা আবিষ্কার করেন, তখন এ অঞ্চলের জনসংখ্যা ছিল মাত্র শ'তিনেক।

তুষার সমাকীর্ণ আলাস্কায় অনেকগুলি বিশিষ্ট জাতের ঘন লোমযুক্ত কুকুর দেখায় যারা চামড়ার দড়িবাঁধা 'শ্লেজগাড়ি' টেনে নিয়ে যায়। সেই কুকুরের নাম হ'ল 'হাস্কি।' তারা ওই তুষারের মধ্যেই বাঁচে। এসকিমোরা তাদের কাজ চালাবার জন্য কয়েক রকমের নৌকা তৈরি করে, তার একটির নাম 'কায়াক'-- সম্পূর্ণ জন্তুর চামড়ায় তৈরি। শুধু উপর দিকে মধ্যস্থলে একটি গোলাকার বড় ছিদ্র। এটি তুষার ঝাপ্টা থেকে মানুষকে বাঁচিয়ে নিয়ে চলে।

একদা তিব্বতে, নেপালে বা সিকিমে যেমনটি দেখেছিলুম, তেমনি এই উত্তর-মেরুলোকে এসকিমোদের মধ্যেও একটি সংস্কার লক্ষ্য করে যাচ্ছি। এরা মনুমেণ্টের মতো উঁচু এক-একটি কাঠের খাড়াই 'পোল' এখানে-ওখানে পুঁতে দেয়। তার গায়ে-গায়ে রঙ্গীন ও ভৌতিক মূর্তি খোদাই করে। এগুলি ভূত-প্রেত-পিশাচ ও পাপের বিরুদ্ধে এক-একটি ধ্বজা। এটি তাদের শিল্পকর্ম হিসাবে পবিত্র। এটিকে বলা হয় 'টটেমপোল।'

সেদিন এখানকার ঘন-জঙ্গলের মধ্যে এক সিংহলী অধ্যাপক মিঃ জয়বীরা ও তাঁর ফিনিশ স্ত্রী শ্রীমতী ইর্মা কফির আসরে আমন্ত্রণ করেছিলেন। সন্ধ্যার প্রবল বৃষ্টিপাতের মধ্যেও সেখানে আমাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। বাড়িটি সম্পূর্ণ কাঠের গুঁড়ি দিয়ে তৈরি। এই নিবিড় জঙ্গলের ভিতরে কাঠের বিচিত্র গন্ধেভরা ভিতরের লাউঞ্জ সর্বাধুনিক আসবাব-সজ্জায় সুসজ্জিত। ওখানে এসেছেন এক আমেরিকান নাবিক মিঃ পীটার। তাঁর একটি রসদবাহী জাহাজ 'পয়েন্ট ব্যারোতে' বরফের রাশির মধ্যে গত কয়েকদিন থেকে আটকিয়ে রয়েছে। তিনি তাই তাঁর অবকাশের মধ্যে এখানে ঘুরে যাচ্ছেন। আমরা যখন মেরুসাগরের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করছিলুম এবং আমার অপরিসীম কৌতূহলের জবাব পাচ্ছিলুম, তখন হঠাৎ টেলিভিশনে খবর এল বাঙলাদেশের! বাঙলাদেশের সৈন্যবাহিনী আজ প্রভাতে প্রেসিডেণ্ট মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করে রাষ্ট্র শাসন ব্যবস্থা দখল করেছেন।

খবরটি শুনে কিছুক্ষণ অভিভূত ছিলুম বইকি। আয়ুব খান, ইয়াহিয়া খান, জুলফিকর আলি ভুট্টো যাঁর কেশাগ্র স্পর্শ করতে সাহস পাননি, তাঁর অপমৃত্যু ঘটলো তাঁরই দেশবাসীর হাতে, এটি ভারতবাসীর পক্ষে অভাবনীয় ছিল।

শেখ মুজিব আমার বন্ধুস্থানীয় ছিলেন। তাঁর সঙ্গে প্রথম পরিচয় ঘটে ১৯৫৪ সালে, এবং তাঁর সঙ্গে একটি সম্পূর্ণ রাত্রি কাটিয়েছিলুম ১৯৫৭ সালে কাগমারি (মৈমনসিংহ) সাংস্কৃতিক সম্মেলন উপলক্ষ্যে। বাঙলাদেশের স্বাধীনতালাভের পরেই ফেব্রুয়ারী মাসে মুজিবের সহকারীরা আমাকে প্রথম ব্যাচেই ঢাকায় নিয়ে যান। অতঃপর ডিসেম্বরে আবার গিয়ে তার বঙ্গভবনে বসে তাঁর সঙ্গে প্রচুর গল্পগুজব ক'রে এসেছিলুম। তাঁর এই অপমৃত্যু মর্মান্তিক।

॥ ৮ ॥

সপ্তাহখানেক পরে আলাস্কা যখন ত্যাগ করছিলুম, ঘন মেঘে উত্তর মেরুর আকাশ আচ্ছন্ন ছিল। গতকাল ফিকাবর্ণের চাঁদ দেখেছিলুম, শুক্ল পক্ষের চাঁদ—কিন্তু মেরুলোকে পাঁচ মিনিটের মধ্যে যেমন বার তিনেক সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত হয়ে যায়—চাঁদের বেলাতেও তেমনি। এই আছে, এই আবার অদৃশ্য হয়েছে!

ফেয়ারব্যাংকস যখন ছাড়লুম, রাত তখন ১টা। মেঘেরা নামছে নিচের দিকে, সুতরাং অন্ধকার কিছু গভীর বইকি। আলাস্কার বনে-বনে এরই মধ্যে প্রতি গাছ-পালার বর্ণ হলুদ হতে আরম্ভ হয়েছে—হয়তো বা আর দিন পনেরো—তারপরেই হলুদ থেকে হবে রক্তিম। দেখতে-দেখতে সেই রক্তরঙীন বন-বনান্তর নিঃস্ব হবে পাতাঝরায়—তার নামই হবে 'ফল' (Fall)। আমেরিকায় সর্বত্র সকলের মুখে ওই একটা শব্দই যখন-তখন শোনা যায়, যার নাম ফল্। ফল্ হল একটা ঋতুর নাম, অর্থাৎ সেপ্টেম্বর-অক্টোবর। আলাস্কায় একটু আগেই ফল্ আরম্ভ হয়, এবং ওই পাতাঝরার সঙ্গে সঙ্গেই তুষারপাত ঘটতে থাকে।

ফেয়ারব্যাংকস-এর ক্ষুদ্র শহরটি ছাড়ালেই উত্তর ভূভাগ সমস্তটাই তুষারভূমি। অনাদিকাল থেকে তুষারপাতের ফলে ভূমির তলদেশ থেকে বরফ হয়ে উঠেছে পাথরের মতো কঠিন, তাই ওটার নাম দেওয়া হয়েছে ছোট আকারে 'PERMAFROST'

(Permanently frosted area)। ওই বিশাল ভূখণ্ডে তুষার পতনের কালে শ্বেত ও কপিশবর্ণ ভালুকরা যখন প্রাণীশূন্য প্রান্তরে ঘোলাটে আরোরার আলোয় দাঁড়িয়ে ডাক দেয়, তখন শ্লেজগাড়ির 'হাস্কি' কুকুরদেরও হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হয় ; তারা আর ভয়ে এগোতে চায় না। একটি কপিশবর্ণ 'মেরু-ভল্লুক' যখন তার হিংস্র দাঁতের পাটি খুলে দুই পায়ে দাঁড়িয়ে আক্রমণশীল হয়, তখন তার দেহের উচ্চতা কম-বেশি বারো ফুট এবং তার কালোবর্ণ এক-একটি নখ ৫ ইঞ্চির কম নয়। সর্বাপেক্ষা ভয়াবহ হল তুষারাচ্ছন্ন ইউকন্ নদের দুই পার—যে নদী উত্তর-পশ্চিম কানাডায় জন্ম নিয়ে আলাস্কার ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে পশ্চিমে বেরিং সাগরে গিয়ে মিলেছে। বেরিং সাগরের উত্তরে বেরিং প্রণালী—যেখানে সোভিয়েট ইউনিয়ন ও আমেরিকা পরস্পরকে চুম্বন করার জন্য যেন উদ্যত হয়ে রয়েছে!

প্রশান্ত মহাসাগরের উত্তরভাগে আলাস্কার দক্ষিণাংশের উপদ্বীপ ও আলুসিয়ান দ্বীপপুঞ্জ মহাসাগরকে দুই ভাগে ভাগ করেছে—তার একটির নাম আলাস্কা উপসাগর, অন্যটি বেরিং সমুদ্র। আমি উভয়ের মধ্যাঞ্চল ধরে দক্ষিণে নামছিলুম।

ঘন অন্ধকারে কোনটাই দেখা যায় না। কিন্তু চন্দ্র-সূর্য-তারা—এরা দৃশ্যমান না থাকলেও একটা অনৈসর্গিক আলোকের আভা যেন তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে থাকে ব্যোমলোকে, সেইটির সাহায্যে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে একটা চেতনাহীন অস্তিত্ববিহীন ধূসর ব্রহ্মলোক—আদি সৃষ্টির কাল যেন এখনও আরম্ভ হয়নি। এই বিশ্বলোকের যে অংশটায় সাগর উপসাগর ও মহাসাগর তুষারশিলায় পরিণত হয়ে কল্পে ও কল্পান্তে স্থির হয়ে রয়েছে—আমি তারই ভিতর দিয়ে একটি চিতবিন্দুর মতো ভেসে যাচ্ছিলুম। ওই চরাচরব্যাপী একাকার অন্ধকারে জীবলোক যখন নিদ্রায় নিবিড়, আমি তখন সাড়ে ৫ হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যলোকের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলুম। আমি যাচ্ছিলুম আমার বহুকালের স্বপ্ন-দ্বীপপুঞ্জ পলিনেশিয়া অঞ্চলে। বাইরে প্রাকৃতের চেহারায় এবার যেন ধীরে ধীরে প্রাণস্পন্দন অনুভব করছি। তুষার-মৃত্যুর থেকে হরিৎবর্ণ আবার দেখা যাচ্ছিল।

সুদূর উত্তর-পশ্চিম যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম দুটি অঙ্গরাজ্য ওয়াশিংটন ও ওরেগন-এর দুটি রাজধানী সিয়াটল ও পোর্টল্যান্ড হয়ে যখন পলিনেশিয়ান হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের সীমানার মধ্যে এসে পৌঁছলুম তখন মধ্যাহ্নকাল উত্তীর্ণ। মহাসাগরের এই খন্ডের উপর দিয়ে এখন মধুর বসন্ত বাতাস বয়ে চলেছে! দোলায়মান নারিকেলকুঞ্জের ভিতরে ভিতরে আরক্তিম পুষ্পচ্ছটা যেন আনন্দলোকের আমন্ত্রণ জানাচ্ছিল। মাত্র ১২ ঘন্টার মধ্যে কোথায় হারিয়ে গেল কোন্ দিগন্তে সেই শীতার্ত রাত্রির ভয়াবহ এবং আলৌকিক অন্ধকার, কোথায়ই বা গেল সেই তুষারলোকের আরোরার আলোয় শ্বেত ও কপিশ ভল্লুকের ডাক! আমি হনলুলু শহরের মাঝখানে এসে পৌঁছলুম।

স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ইস্ট-ওয়েস্ট সেন্টারের' অন্যতম কর্তা পরিণতবয়স্ক রিচার্ড সাহেব যথাস্থলে এসে হাসিমুখে করমর্দন করলেন এবং আমার সুটকেসটি নিজেরই হাতে নিয়ে গাড়িতে গিয়ে তুললেন। আমি তাঁর অতিথি। গাড়িতে উঠে দেখি এক জাপানী মহিলা ও তাঁর তরুণবয়স্ক ছেলে এবং গাড়িটি চালিয়ে চলল ১৩।১৪ বছর বয়সের একটি ইন্দোনেশিয়ান বালিকা। আমি বসলুম তারই পাশে। এক অজানা থেকে অন্য অজানায় এসে পৌঁছলুম।

চারিদিকে যেন বসন্তকালের দক্ষিণ বাংলার ছবি। জবা, গোলাপ, কণকচাঁপা, বেল-জুঁই, আম, জাম, কলা, আনারস, প্রভৃতির অন্তহীন সমারোহ। গাছে গাছে কোকিল শালিক চড়ুই এবং অনেক অজানা ছোট ছোট রঙ্গীন পাখি। এসে দাঁড়িয়েছি যেন এক বর্ণাঢ্য জগতে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস ছোটখাটো একটি শহর। বন-বাগান-পাহাড়-পুষ্পো-দ্যান প্রান্তর এদের সঙ্গে ৫০।৬০ খানা সুবৃহৎ অট্টালিকা নিয়ে শহরের এই অংশের থৈ পাওয়া কঠিন। এখানেই প্রাচ্য-প্রতীচ্য বিদ্যার কেন্দ্রে আমার আতিথ্য নির্দিষ্ট ছিল। এরই সংলগ্ন একটি বহুতল অট্টালিকার ছয়তলার একটি ঘরে এসে ঢুকলুম। এই অট্টালিকার নাম 'হালে-মানোয়া'। রিচার্ড অন্যান্য বন্দোবস্ত করে তখনকার মতো বিদায় নেবার কালে বলে গেলেন, আমার নিজের চিরজীবন কাটলো আমেরিকায়। কিন্তু আপনার মতো এমন মহাদেশজোড়া ভ্রমণ আমার কল্পনার অতীত।

হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে সর্বাপেক্ষা যে দ্বীপটি উন্নত ও আধুনিককালের সঙ্গে মানানসই, সেটির নাম ওয়াহু (OAHU)। এখানেই হাওয়াইয়ের রাজধানী হনলুলু। অন্য দ্বীপগুলির নাম কৌয়াই, নিহাই, লেহুয়া, মলোকাই, লানাই, কাহু-লাওয়ে, মউয়ি এবং হিলো। সব মিলিয়েই হাওয়াই! পলিনেশিয়া সামগ্রিকভাবে সূর্যোত্তাপের এলাকা, কিন্তু একদা এই দ্বীপপুঞ্জের দখলকারী ইংরেজ সর্বাপেক্ষা সুবিধাজনক ওয়াহু দ্বীপটি বেছে নিয়েছিল তার ঔপনিবেশিক শাসনকর্মের কেন্দ্র হিসাবে। ওয়াহু হল উঁচু পাহাড়ঘেরা এক বিশাল উপত্যকা যেখানে সুস্নিগ্ধ বসন্ত ঋতু চিরস্থায়ী। একদা ইতিহাসের অবিস্মরণীয় ব্রিটিশ নাবিক ক্যাপ্টেন কুক এই দ্বীপপুঞ্জটি আবিষ্কার করেন। পরবর্তীকালে ইংরেজ নৌবাহিনী এসে এখান-কার আদিবাসী রাজগোষ্ঠীর কাছ থেকে তার পুরনো অভ্যাস মতো দেওয়ানী আদায় করে জাঁকিয়ে বসে যায়। আমেরিকায় তৎকালে বৃটিশ প্রতিপত্তি ছিল প্রবল। সান ফ্রান্সিসকো, পোর্টল্যান্ড, লস এঞ্জেলেস, ভ্যানকুভার প্রভৃতি অঞ্চলে ছিল বড় বড় ব্রিটিশ নৌঘাঁটি। অন্যদিকে দক্ষিণ এশিয়া, মালয়, সিঙ্গাপুর, বোর্নিয়ো, পূর্ব চীন —এগুলিতে ইংরেজের একচেটিয়া অধিকার ছিল। ওরা বলে বেড়াতো বৃটিশ সাম্রাজ্যে কখনো সূর্যাস্ত ঘটে না।

'হালে মানোয়া'য় আমার দিন কাটছিল। আমার জানলার সামনে বিরাট পর্বত-শ্রেণী—যেটা সোজা গিয়ে নেমেছে প্রশান্ত সাগরের তীরে,—যেখানে অসংখ্য ক্রীকের ধারে ধারে টুরিস্টরা এসে জায়গা নিয়েছে। উত্তরে এই পর্বতশ্রেণী আমাকে কথায় কথায় হিমালয়কে মনে করিয়ে দিচ্ছে। পাশের ঘরে থাইল্যান্ডের একটি যুবক সারা দিনরাত পড়াশুনো করে। সে ডক্টরেট করতে এসেছে। সমগ্র হনলুলুতে দুজন মাত্র বাঙ্গালী রয়েছেন। তাঁদের একজন হলেন ডক্টর পৃথ্বীশ নিয়োগী, তিনি এখানে প্রাচীন ভারতীয় শিল্প ও প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগে কাজ করেন। অন্যজন শ্রীমান সত্যাংশু কুন্ডু, তিনি কৃষি ও পূর্ত বিষয়ে ডক্টরেট করার জন্য স্কলারশিপ নিয়ে এসেছেন। এঁর মিষ্ট ব্যবহারে আমি খুবই আনন্দ পাচ্ছিলুম। এখানে ক্যাম্পাসের মধ্যেই ৬।৭ জন ভারতীয় ছাত্র রয়েছেন, যাঁরা একটি সংস্থা তৈরি করে নামকরণ করেছেন 'ইন্ডিয়ান স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন'। কয়েকজন গুজরাটি ভাটিয়া ব্যবসায়ীও এখানে খুবই প্রতিপত্তিশালী। ওয়াটুমল পরিবার হনলুলুতে বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ।

প্রাচীন রাজগোষ্ঠীর সর্বশেষ রাজা যিনি কিছুকাল আগে মারা গেছেন তাঁর

নাম ছিল রাজা 'কামেহামেহা'। তিনি ছিলেন 'পেগান'। তাঁর স্ত্রীকে সম্প্রতি স্থানচ্যুত করা হয়েছে। কিন্তু রাজা কামেহামেহার স্মৃতি এখানে শ্রদ্ধালাভ করে রয়েছে। তাঁর নামে একটি 'হাইওয়ে'ও চোখে পড়ছে। বিগত বিশ্বযুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ সাম্রাজ্য যখন পৃথিবীময় ছিন্নভিন্ন হয়ে ভাঙতে থাকে তখন আমেরিকা সম্পূর্ণভাবে হাওয়াইয়ের উপর দখল নেয়। এই দখলিকারের ফলস্বরূপ বিগত ১৯৫৮ সালে এই দ্বীপপুঞ্জ যুক্তরাষ্ট্রের ৫০তম স্টেট হিসাবে গণ্য হয়। ইংরেজের সঙ্গে চুক্তি রইল এই যে, এই স্টেটের প্রত্যেকটি সরকারী প্রতিষ্ঠানে ও সকল রকমের রাষ্ট্রীয় পার্বণ উৎযাপনে বৃটেনের ইউনিয়ন জ্যাক পতাকাটি উড্ডীন করা হবে। আমার চোখের সামনেই দেখছি, টমাস জেফারসন মেমোরিয়াল হলের উপরে ইংরেজ ও মার্কিন পতাকা একই সঙ্গে উড়ছে। একদা চার্চিল সাহেব বলতেন, আমেরিকা হল আমার মামার বাড়ি।

হাওয়াইতে এসে প্রথম চোখে পড়ে এর নারকেল বনের অফুরন্ত বিস্তার। গায়ে গায়ে তার আম-জাম-আনারস-কমলা-খেজুর-কলা প্রভৃতি বহু রকমের ফলের গাছ— যার সীমা-সংখ্যা নেই। ওই সঙ্গে চলেছে জবা আর কাঠচাঁপার বন। শাদা, লাল, গোলাপী, হলুদ—প্রভৃতি বিভিন্ন বর্ণের জবাফুলে পথঘাট বনবাগান ছেয়ে রয়েছে। এখন এটি আমেরিকান স্টেট, সুতরাং সকল রকমের প্রাচুর্য এসে পৌঁছেছে। প্রতি ঘণ্টায় শিল্পপতিরা অজস্র সামগ্রীসম্ভার পাঠাচ্ছে বিমানযোগে। জাহাজ ভর্তি রসদ আসছে কথায়-কথায়। অট্টালিকাশ্রেণী আর গগনচুম্বী বহুতল অ্যাপার্টমেন্ট কমপ্লেক্স যেখানে-সেখানে সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থায় দাঁড়িয়ে উঠছে। ইংরেজ ছিল কৃপণস্বভাব, নিজের প্রয়োজনের বাইরে সে বৃহত্তর দেশের অধিবাসীর স্বার্থের দিকে চোখ ফেরাতো না। যুক্তরাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষ আর শিল্পপতিরা সর্বপ্রকার প্রাচুর্যের প্লাবনে দেশকে ভাসিয়ে দেয় নিজেদেরই স্বার্থে ও প্রয়োজনে। বিত্তহীন বেকার কেউ নেই, দরিদ্র বলতে আমরা যাদেরকে দেখতে পাই তাদের অস্তিত্বই এখানে নেই। চারিদিক ঘিরে কর্মযন্ত্র চলছে, কারখানা গড়ছে কথায় কথায়, রাস্তাঘাট তৈরি হচ্ছে একটির পর একটি, মাঠ-ময়দান জুড়ে ক্যাটারপিলার মাটি কাটছে, বড় বড় শপিং সেন্টার তৈরি হচ্ছে এখানে ওখানে। গত ১৫ বছরে কর্মীদের উপার্জন বেড়েছে চার গুণ এবং গত বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে ৩০ গুণ উৎপাদন বেড়েছে এবং বেড়েই চলেছে। পাহাড়ে পাহাড়ে জনবসতি গড়ে উঠছে প্রতিদিন উৎপাদনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে।

সুদূর প্রাচ্য থেকে একদা বহু জাতি একে একে পলিনেশিয়ান হাওয়াই ও ফরাসী অধিকৃত তাহিতি দ্বীপগুলিতে জায়গা নিয়েছিল। পলিনেশিয়া চিরদিন শান্ত, অমায়িক অতিথিবৎসল। যারা এসেছে তাদের মধ্যে চীনা, জাপানী, কোরিয়ান, মালয়ী, থাই, ইন্দোনেশিয়, বর্মী প্রভৃতি অনেক। এ ছাড়া খৃষ্টান, বৌদ্ধ, মুসলমান —কে নয়? বহির্ভারতীয় হিন্দু এসেছে প্রচুর। কিন্তু তারা আর ফেরেনি। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, গোষ্ঠী, সম্প্রদায়—সমস্ত একাকার করে দিয়ে তারা বিবাহবিনিময় করে এদেশেই থেকে গেছে। একই পরিবারে চীনা জাপানী থাই মালয়ী প্রভৃতি বিভিন্ন গোষ্ঠী বিবাহ ও সন্তানসূত্রে আবদ্ধ। বিশ্ববিদ্যালয়ে হাজার হাজার ছেলেমেয়েদের মধ্যে কারও জাতি-ধর্মের সুস্পষ্ট পরিচয় নেই। জননীর জাত নিয়ে কোথাও কথা ওঠে না, শুধু পিতার নামেই সন্তান পরিচিত। চীনা জাপানী ও ফিলিপিন ভাষা অবাধে চলে।

পলিনেশিয়ার আদিবাসী যারা তাদের পরিচয় একটু অন্য রকমের। ইতিহাসের আদিপর্বে উপমহাদেশ ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চল থেকে একটা বড় সম্প্রদায় কালক্রমে পলিনেশিয়ান হাওয়াই এবং তাহিতি দ্বীপ অঞ্চলে গিয়ে বসবাস করতে থাকে। এখানকার সমুদ্রতীরে, বন-অরণ্যে, ছোট ছোট জনপদে এবং টুরিষ্ট সেণ্টারগুলির আশেপাশে এই আদিবাসীরা বিভিন্ন কাজ নিয়ে থাকে। নৌকা চালনায়, মৎসশিকারে, কুটীর নির্মাণে, বিভিন্ন প্রকার ফলনের কাজে এরা সিদ্ধহস্ত। এদের মেয়েরা সুশ্যাম-বর্ণা এবং সুশ্রী। এদের সঙ্গে বাঙলার সাঁওতালদের যথেষ্ট মিল দেখতে পাচ্ছিলুম। পলিনেশীয় সুন্দরী বললে যাদেরকে বোঝায়, তাদের সঙ্গে ভারতীয় রমণীর সাদৃশ্য দেখলে চমকিয়ে উঠতে হয়। এদের নৃত্যকলার সঙ্গে ভারতের মিল রয়েছে প্রচুর এবং এদের সঙ্গীতের সুর, তাল বা লয়ের দিকে কান পেতে থাকলে অপরিচিত মনে হয়না। লক্ষ্য করেছিলুম এদের সঙ্গে অদ্যাবধি মঙ্গোলয়েডদের মিশ্রণ ঘটেনি। পলিনেশীয় মেয়েদের নৃত্যভঙ্গী এবং তাদের দেহের লাস্যলীলা,—টুরিষ্টদের পক্ষে এক মস্ত আকর্ষণ। ওদের মধ্যে কয়েক ঘন্টা কাটিয়ে আমি খুবই আনন্দ পেয়ে-ছিলুম। ওদের সম্প্রদায়ের অনেকে আজও বিশ্বাস করে তারা মূলত ভারতীয়। রাজা কামেহামেহা নাকি ওদেরই বংশসম্ভূত ছিলেন।

একা এই হনলুলু শহরে আমার পক্ষে ভ্রমণের অসুবিধা ছিল না। পথ হারাবার ভয় নেই। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা সর্বজনপরিচিত। জনসাধারণের অধিকাংশের ভাষা ইংরেজি। বহুতল অট্টালিকাশ্রেণীর একত্র সমাবেশ দেখলেই এখন চিনতে পারি, ওটা নগরের নাভিকেন্দ্র অর্থাৎ ডাউন টাউন। সুতরাং নতুন শহরে এসে ডাউন টাউন খুঁজে নিতে দেরি হয় না। তা ছাড়া পথ হারালে একটা সুবিধে এই, অনেক পথের অনেক ছবি দেখে-দেখে যাওয়া চলে। আর এক সুবিধে, যেদিকেই যাব, সামনে সমুদ্র।

আমি তয়ে-তয়ে যাচ্ছিলুম আধুনিক ইতিহাসপ্রসিদ্ধ পার্লহারবারের দিকে। বিগত বিশ্বযুদ্ধের কালে অক্ষশক্তির তৃতীয়জন অর্থাৎ জাপান হঠাৎ বলা নেই, কওয়া নেই—৬ ডিসেম্বর ১৯৪১ তারিখে যুক্তরাষ্ট্রের নৌঘাঁটি পার্লহারবারের উপর বোমা-বর্ষণ করে এবং নৌঘাঁটি বিধ্বস্ত হয়। ওইদিন থেকেই জাপানের সঙ্গে মিত্রশক্তির সংঘর্ষ আরম্ভ। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র জাপানকে ক্ষমা করেনি। পরবর্তীকালে বিশ্বযুদ্ধের শেষ সময়ে ৬ আগস্ট ১৯৪৫ তারিখে যুক্তরাষ্ট্র প্রথম আণবিক বোমা নিক্ষেপ করে হিরোসিমা শহরে, দ্বিতীয় বোমা পড়ে নাগাসাকিতে। সেই সর্বব্যাপী মৃত্যু ও ধ্বংসের মধ্যে ১৪ আগস্ট মধ্যরাত্রের মধ্যে জাপান আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। ওখানেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ। কিন্তু এই প্রসঙ্গে একটি কথা না বলে পারছিনে। এই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালে (১৯৪২) শ্রীঅরবিন্দের একটি বাণী আমার হাতে আসে। তাতে লেখা ছিল, "Within two years after the cessation of hostilities Britain will drop India like a hot potato".

সেদিন শ্রীঅরবিন্দের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করা কঠিন ছিল। কিন্তু দু'বছর পরে ১৪ আগস্ট ১৯৪৭-এর মধ্যরাত্রে কলিকাতা বেতার কেন্দ্রের কর্তৃপক্ষ আমার ওপর ভার দিয়েছিলেন স্বাধীনতার সংবাদ প্রথম ঘোষণা করার। শ্রীঅরবিন্দের প্রথম জাতীয় জন্মতিথি উৎসব (১৫ আগস্ট ১৯৪৭) উপলক্ষে অনুষ্ঠানসূচীর পরি-চালনাও আমার হাতে দেওয়া হয়েছিল।

না, ধান ভানতে শিবের গীত নয়। আমি যাচ্ছিলুম পার্লহারবারের দিকে। আমার বাসস্থান থেকে ওটা মাইল ১১ দূরে। বড় রাস্তাটার নাম ছিল 'নিমিজ হাইওয়ে'—অর্থাৎ বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম সমর-নায়ক এডমিরাল নিমিজ-এর নামাঙ্কিত।

পার্লহারবার নিষিদ্ধ এলাকা। ওটার মধ্যে যেতে গেলে 'পাস' লাগে কিন্তু আমার সঙ্গে তখন না আছে ভারতীয় পাসপোর্ট, না আছে কোনপ্রকার পরিচয়পত্র। আমার পকেট শূন্য, শুধু আছে বাসের টিকিট। কিন্তু আমার কপালে ছিল ঘাম এবং চোখে মুখে ক্লান্তি। এক মহিলা বসেছিলেন কাউন্টারে এবং পাশেই দাঁড়িয়েছিল জনৈক নিগ্রো সৈন্য। আমাকে প্রশ্ন করা হল, কোথাকার লোক, কে আমি, পরিচয় কি, এখানে কেন? জবাব দিলাম, আমি ভারতীয়, অন্য পরিচয় নেই, অমুক জায়গায় থাকি এবং আমার ৩৪ বছরের কৌতূহল আমাকে এখানে এনেছে।

আমার কপালের ঘাম বোধ হয় কাজ দিয়েছিল। মহিলা একটি পাস আমার হাতে দিয়ে কেবল আমার নাম-ধাম লিখে নিলেন। প্রহরা বেষ্টনীর ভিতর দিয়ে এবার অগ্রসর হলুম। 'নিমিজ হাইওয়ে' আমার পাশ দিয়ে দূরদূরান্তরে চলে গেছে। হাঁটতে হাঁটতে কতকটা দূরে এগিয়ে গেলুম। মাথার উপরে টা টা করছে রোদ। দেখতে পাওয়া যাচ্ছে বন্দরের এপার ওপার দুদিকের পাহাড় বেশ উঁচু। উভয়ের মধ্যস্থলে সমুদ্রের একটা খাঁড়ি অনেকটা ভিতরে ঢুকে এসেছে। এর চেয়ে অনেক বড় এবং অনেক ক্ষমতাসম্পন্ন নৌঘাঁটি একটির পর একটি দেখে এলুম লস এঞ্জেলেস এবং সানফ্রান্সিসকোর 'বে'গুলিতে। অমন যে সুবৃহৎ সপ্তম নৌবাহিনী এবং 'এনটারপ্রাইজ' নামক বিরাট জাহাজ তাও আলামেডা ও ওকল্যান্ডের আশেপাশে মিলিয়ে রয়েছে। কিন্তু এখানে প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যলোকে এই পার্লহারবার চারিদিকে প্রহরার কাজ করে—এইটিই এর প্রকৃত মূল্য। আমার কৌতূহলের অবসান ঘটতে বিলম্ব হল না।

পাহাড়ের প্রাকার বেষ্টিত এই বন্দর অনেকটা যেন আত্মগোপনশীল। শত্রু কোথাও নেই, কোনদিক থেকেই কেউ আক্রমণের কথা ভাবছে না, আমেরিকার মতো রাষ্ট্রকে আক্রমণ করার সাহসই বা কার? সুতরাং এই বিরাট নৌশক্তি বেকার অবস্থায় বসে রয়েছে অকারণে। এই বন্দরের জন্য কোটি কোটি ডলার অনিশ্চিতকালের গহ্বরে প্রবেশ করছে নিরন্তর।

বন্দরের কোলের একটি বাগানে এক গাছতলায় এসে বসেছিলুম। বাগানের মালী রবারের পাইপের সাহায্যে নধর সবুজ ঘাসের চারিদিকে জল ছিটোচ্ছে। শালিক আর ঘুঘুরা নেমেছে বাগানে। বুলবুলিরা ঘুরছে এ ডালে ও ডালে। অসংখ্য নারকেল গাছ স্নিগ্ধ বসন্তের বাতাসে মর্মরিত হচ্ছিল। জবা আর কলকে ফুলে সীমানার গাছগুলি বর্ণচ্ছটা বিস্তার করছে চারিদিকে। রৌদ্র ঝিলমিল করছিল গাছে গাছে। আমি যেন বাংলার স্বাদ পাচ্ছিলুম।

কিন্ত কোথায় রয়েছি আমি? পৃথিবীর কোন প্রান্তে এখন সেই বাংলা? আমাকে ফিরে যেতে হবে সানফ্রান্সিসকোয়। তারপর একটি সম্পূর্ণ মহাদেশ অল্পে অল্পে শেষ করতে হবে এবার যুক্তরাষ্ট্রের উত্তরাঞ্চল দিয়ে। কোথায় নিউইয়র্ক? সে এখনও সাড়ে ৫ হাজার মাইল দূরে! আমি বসে আছি এখন প্রশান্ত মহাসাগরের মাঝখানে এক দ্বীপান্তরে। আমার ডাইনে-বাঁয়ে কেউ কোথাও নেই। আমার পক্ষে আমেরিকার আদ্যোপান্ত ভ্রমণ এবার শেষ হতে চলেছে।

বেলা পড়ে আসছিল। গাছে গাছে পাখির কলকণ্ঠে, কূজনে আর গুঞ্জনে, নিত্য বসন্তের সমীরণ সঞ্চালনে আমার ক্লান্তি দূর হচ্ছিল বটে, কিন্তু অবসাদ আমাকে ঘিরে ধরলে এখন চলবে না। সুতরাং এক সময় সোজা হয়ে দাঁড়াতে হল। আর কিছু না হোক, এখনও আমাকে ২ হাজার একশ' মাইল সমুদ্র পার হয়ে যেতে হবে।

বেশি নয়, দিন চারেক অবধি আমি এই সুদূর পলিনেশিয়ান হাওয়াইতে বাস করে যাচ্ছিলুম। কিন্তু ইস্ট-ওয়েস্ট সেণ্টারের কাছ থেকে ছাড়া পেয়ে যখন সন্ধ্যার প্রাক্কালে বিমানে উঠলুম, তখন মনেও হয়নি আজ ভরা পূর্ণিমা সমগ্র প্রশান্ত সমুদ্রকে বিগলিত রৌপ্যালোকে পরিণত করবে। ঝুলন পূর্ণিমার সেই চন্দ্রালোক আকাশ ও সমুদ্রকে একাকার করে মায়ামদির রহস্যজাল সৃষ্টি করেছিল।

সেদিন মধ্যরাত্রের দিকে এক সময় আবার এসে সানফ্রান্সিসকোয় নামলুম।

॥ ৯ ॥

উপমহাদেশ ভারত ভূখণ্ডের আকারটিকে তিন দিয়ে গুণ করলে যে পরিমাণ আয়তন হয়, এই মধ্যমহাদেশ যুক্তরাষ্ট্র তারই অনুরূপ। সুতরাং এই বিশাল ভূভাগকে কিছু খুঁটিয়ে দেখতে গেলে অন্তত বছর তিনেক লাগে। কিন্তু আমার মতো যারা মাত্র পাঁচ মাসের মধ্যে এই ভূমণ্ডলকে গিলে খেতে চায়, তাদের গতির দ্রুততা সহজেই অনুমেয়। এখন পর্যন্ত মাত্র মাস চারেক হল এদেশে পদার্পণ করেছি। এই চার মাসকাল আমার দৌড়বাজির চেহারাটা এবং ইতিহাসটি ভাবলে নিজেই আমি এখন অবাক হই। মনে হচ্ছে এ যেন আমি নয়, আর কেউ--যে-ব্যক্তি দেখতে দেখতে যায়, জানতে জানতে গতি লাভ করে। সর্বাপেক্ষা আনন্দদায়ক এই, একদিনের জন্যও এই দেশকে ঠিক বিদেশ এবং ভিন্ন রাষ্ট্র মনে হয়নি। যা খুশি করো, যেখানে খুশি যাও, যে কোনও প্রতিষ্ঠানে ঢোকো, যে কোনও ধরনের পোশাক পরো--এমন কি ধুতি, পানজাবি, গেঞ্জি পা-জামা বা চটি পায়ে দিয়ে হাঁটো বা বড় শহরে ঘোরো, খালি গায়ে পথে ঘাটে বা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যামপাসে ঘুরে বেড়াও--কেউ দেখবেও না, গ্রাহ্যও করবে না। ইউরোপ বা ইংল্যাণ্ডে এই দৃশ্য কোথাও দেখা যায় না। ধরো, পায়ে মোজা নেই, গলায় নেকটাই নেই, বুশশার্টের তিনটে বোতাম খোলা--বাবু এসে ঢুকলেন সকাল আটটায় আপিসে--এমন দৃশ্য হাজার হাজার! মানুষের এই সচ্ছল অবারিত স্বাধীনতা, সর্বপ্রকার নৈতিক সামাজিক ও রাষ্ট্রিক শাসন থেকে মানুষের এই মুক্তিচেতনা--পৃথিবীর অন্য কোথাও আছে কিনা আমার জানা নেই। বোধ হয় এই কারণেই উত্তর আমেরিকাকে 'ফ্রি ওয়ার্ল্ড' বলা হয়ে থাকে।

এদেশে একবার এসে ঢুকলে কেউ কারও খোঁজ রাখে না। না গভর্নমেণ্ট, না পুলিস, না বা গোয়েন্দা বিভাগ। 'কনডাকটেড' পর্যটন বলে এদেশে বিশেষ কিছু নেই। হাতে যদি পয়সা থাকে তবে যেখানে খুশি যাও, প্রশ্ন করবে না কেউ। পথ হারালে অসুবিধা নেই, যে কোন মেয়ে বা পুরুষ তোমাকে সাহায্য করবে বন্ধুর মতো। এদেশের কর্তৃপক্ষ তোমাকে দিয়ে সুখ্যাতি লিখিয়ে নিতে চায় না, নিন্দা

বা প্রশংসা গ্রাহ্যও করে না। তুমি গিয়ে পুলিস আপিসে ঢোকো, গোয়েন্দা আপিসে গিয়ে খোঁজখবর করো, সামরিক বিভাগে ঢুকে তোমার কৌতূহলের জবাব নাও, রেকর্ড বা ফাইল ওল্টাও, কয়েদীদের সঙ্গে আলাপ করো—কেউ কিছু মনে করবে না। সর্বত্র ঢিলেঢালা, তোড়জোড় আলগা—কেউ কারও পরোয়া করে না। কংগ্রেসের সভ্য, প্রতিনিধি সভার সভ্য—এঁদের পিছনে পিছনে স্তবকের দল ছোটে না, প্রতিপত্তিশালী পার্টির লোককে কেউ 'দাদা' বলে হাত কচলায় না, বাড়ির দেওয়ালে-দেওয়ালে হাতে-লেখা কাগজ লটকিয়ে কেউ কারো সম্বন্ধে বলে না, যুগ-যুগ জিয়ো! এদেশে কর্মীবিক্ষোভ রয়েছে, কিন্তু শ্রমিক আন্দোলন বলতে যা বুঝি তার চিহ্নও চোখে পড়েনি। এরা মজুরি বা মাইনে বাড়াবার ফিকির খোঁজে, কিন্তু তার সঙ্গে রাজনীতিক ক্ষমতা গ্রাসের কৌশল আঁটে না। সরকারী আইন অনুসারে এখন প্রতি ঘণ্টায় মজুরির হার হল ২ ডলার ২৫ সেণ্ট। কিন্তু কোনও শ্রমিক কর্মস্থলে পেঁছবার জন্য পায়ে হেঁটে আসে না, তাদের জন্য সর্বত্র গাড়ির বরাদ্দ থাকে। এদেশের গভর্নমেণ্ট তখনই ভেঙে পড়বে যদি কোন সংবাদপত্র একটিমাত্র খবর ছাপে, অমুক ব্যক্তি না খেয়ে মরেছে অথবা অমুক ব্যক্তিকে ভিক্ষাবৃত্তি করতে দেখা গেছে। এখন এদেশে চলছে রিসেসন, মূল্যবৃদ্ধি, ছাঁটাই, মুদ্রাস্ফীতি এবং বহু কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠানের গণেশ ওলটানো—কিন্তু জনজীবনে এর উগ্র প্রতিক্রিয়া তেমন কিছু চোখে পড়ে না। যদি কারও চাকরি যায় তবে সে এক বছর চার মাস ধরে প্রতি সপ্তাহে প্রায় একশ' ডলার 'বেকার ভাতা' পায়। প্রতি সপ্তাহে তার খাই-খরচা পড়ে ২০ থেকে ২৫ ডলার। এদেশে এক কোম্পানি ফেল পড়ছে, অন্য কোম্পানি গজিয়ে উঠছে। এক চাকরি যাচ্ছে—অন্য চাকরি পাচ্ছে। কেউ বসে নেই। চাকরি বা উপার্জন এদেশের পথে ঘাটে ছড়ানো। ১৬ বা ১৮ বছরের ছেলেমেয়েও এখানে ৮ ঘণ্টা খাটলে ১৮ বা ২০ ডলার রোজগার করে। মজুর, সাধারণ কর্মী, মিস্ত্রি, ইনজিনিয়ার, মেসিনম্যান, বিজ্ঞানী- এরা এদেশে রাজা! একজন সুদক্ষ মিস্ত্রি মাসে ৩ হাজার ডলার রোজগার করলে কেউ বিস্মিত হয় না। একজন ভাল ডাক্তার—তার মধ্যে ভারতীয়রাও আছেন—বছরে ১ লক্ষ ডলার অনায়াসে উপার্জন করেন। একজন বিজ্ঞানী - তার মধ্যে বহু বাঙালীও আছেন—তাঁর মাসিক উপার্জন অনেক সময় ৫ হাজার ডলারও ছাড়িয়ে যায়। ভারত গর্ভনমেণ্ট এঁদের খবরও রাখেন এবং এঁরা যখন দেশে ডলার পাঠান তখন ভারত গভর্নমেণ্ট খুশী হন। এঁদের মধ্যে এমন বহু ব্যক্তি আছেন যাঁরা দেশে ফিরে গিয়ে বিজ্ঞান বিষয়ে কাজ করতে চান, কিন্তু ভারত থেকে কোনও সাড়া আসে না।

সানফ্রান্সিসকো থেকে বিদায় নেবার আগে ছোট ছোট কয়েকটি পার্বত্য শহর দেখে যাচ্ছিলুম। আলামেদা, ওকল্যান্ড, ডেলি সিটি এবং সবশেষে বার্কলে। এ শহরটি পার্বত্য এক উপত্যকা এবং এর নিচেই সমুদ্র। বার্কলে বিশ্ববিদ্যালয় জগৎপ্রসিদ্ধ। যেমন বোস্টন, যেমন নিউ ইয়র্কের কলাম্বিয়া, যেমন শিকাগোর বিশ্ববিদ্যালয়। কালিফোর্নিয়ার ১১টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে বার্কলে অন্যতম। পৃথিবীবাসীর অনেকেই জানে, এই বার্কলের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে প্রথম আণবিক বোমার ফরমুলা তৈরি হয় এবং শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে তার জন্ম ঘটে। এই বোমাই নিক্ষেপ করা হয় হিরোসিমা ও নাগাসাকিতে ১৯৪৫ সালে। এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই প্রথম ছাত্রছাত্রীরা ভিয়েৎনাম যুদ্ধের প্রতিবাদ তোলে এবং এদের সঙ্গেই

সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের মোট ৪ হাজার ইউনির্ভাসিটির ২ কোটি ছাত্রছাত্রী চারিদিক থেকে মিছিল বার করে রাজধানী ওয়াশিংটনের দিকে অভিযান করে। বার্কলে বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শনকালে লক্ষ্য করছিলুম, এখানে মার্কসিয় সাহিত্য ও দর্শন, কম্যুনিজম, আধুনিক সোভিয়েট ও চীন সাহিত্য এবং মাও-সে-তুংয়ের প্রত্যেকখানি বই সযত্নে পড়ানো হয়। দেখতে পাচ্ছিলুম প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠাগারে, হাটেবাজারে-ফুটপাথের দোকানে—সর্বত্র কম্যুনিস্ট সাহিত্যের সর্বশ্রেণীর বই অবাধে ছেলেমেয়েরা পড়ছে এবং কিনছে। কোথাও কোনও বই নিষিদ্ধ নয়। ধনবান শিল্পপতিদের এই দেশে এমন একটি বৈজ্ঞানিক অর্থনীতি এবং 'সমাজতন্ত্রবাদ' প্রচলিত যেখানে জনজীবনের সামান্যতম বিক্ষোভও সাগরতরঙ্গের মতো মাথা তুলেও আবার জন-সমুদ্রে মিলিয়ে যায়। সেই কারণে এখানে কম্যুনিজম কোথাও দল বেঁধে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না।

সানফ্রান্সিসকোয় 'চায়না টাউন' একটি দ্রষ্টব্য পল্লী। এরা আমেরিকান চীনা। যেমন আমেরিকান-ভারতীয়, আমেরিকান-জার্মান, আমেরিকান-ইহুদী, আমেরিকান-ইতালীয় বা ফরাসী বা স্প্যানিস বা কিউবান প্রভৃতি। আমেরিকায় যাদের স্থায়ী বসবাস, তারাই আমেরিকান। জাত নিয়ে যদি কথা ওঠে, তখন সবাই পৃথক। চায়না টাউনে গিয়ে ঢুকলে মনে হয় এটি ইংরেজিভাষী আমেরিকা নয়। এর বাড়ি-ঘরের বর্ণবৈচিত্র্য, মঙ্গোলীয় গঠনশিল্প, দোকান বাজারে চীনা শিল্পসামগ্রী ও তাদের সৌন্দর্যশিল্প-সৃষ্টি, আসবাবপত্রের কারুকার্য—এ যেন এক রূপলাবণ্যের জগৎ। এদেশে চীনারা এসেছে শত শত বছর আগে বোধ হয় ইউরোপীয়ানদেরও আসবার আগে। তাদের নিজেদের সংস্কৃতি, ভাষা, লোকাচার, সমাজব্যবস্থা, শিল্পদক্ষতা—সমস্তই অক্ষুণ্ণ রেখে চলেছে। হাজার হাজার চীনা রেস্টুরেণ্ট খুলে তারা সমগ্র আমেরিকায় রুচিকর আহার যুগিয়ে এসেছে। সেইজন্য চীনা হোটেল আমেরিকায় সর্বাপেক্ষা প্রিয়। একটি উঁচুদরের চীনা হোটেলে পার্টি দেওয়া আভিজাত্যের পরিচয় দেয়। এটি বলা দরকার, এরা কেউই সর্বাধুনিক কালের চীন দেশ থেকে আসেনি।

কালিফোর্নিয়ার প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য প্রথমেই মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তার সমুদ্রতীরবর্তী পার্বত্য অঞ্চল ধনে, সম্পদে, শোভায়, সমৃদ্ধিতে যেন নিত্যদিন ঝলমল করছে। কিন্তু এগুলি সব পশ্চিম প্রান্তে। পাহাড়গুলির ওপারে পূর্ব-দিকে এর সম্পূর্ণ বিপরীত। ওদিকে লক্ষ লক্ষ বর্গমাইলব্যাপী ঊষর ধূষর মরুভূমি। এক একটি স্টেট যেমন আরিজোনা, নিউ মেক্সিকো, ইউতা, নেভাদা, ইদাহো প্রভৃতি জ্বলে-পুড়ে মরছে অজন্মায়। এমন এমন স্টেট রয়েছে যেখানে ছেলেমেয়েদের গায়ের জামা পায়ের জুতো উপযুক্ত আহার বা বসবাসব্যবস্থা জোটে না। কিন্তু শিল্পপতিরা ব্যবসায়ের লোভে সেই সব দুর্গত অঞ্চলেও সরবরাহ পাঠিয়ে নিজেদের লভ্যাংশ আদায় করে।

বার্কলে ছাড়বার আগে ওই শহরের 'টেলিগ্রাফ এভেন্যু'র কথাটা ভুলতে পারছি না। ওই পথটায় 'হিপ্পি' নরনারীদের আড্ডা। ওরা আদিম নরনারীর অপরিচ্ছন্ন ও ছিন্নভিন্ন চেহারাটায় আনন্দ পায়। পুরুষের গায়ে জামা নেই, মেয়েদের লজ্জা নিবারণের দায় নেই। পথে বসে উভয়ে তামাক, গাঁজা, চরস খাচ্ছে, দোকান দিচ্ছে,

ছবি আঁকছে, ভাগ্যগণনা করছে, বই পড়ছে, পুঁতির মালা বেচছে, পথের উপরে কাগজ পেতে খাবার খাচ্ছে, ফুটপাথের ধারে শুয়ে ঘুমোচ্ছে, কেউ নেশায় বুঁদ হয়ে ঝিমোচ্ছে। পুলিস ওদেরকে ভয় করে, রাষ্ট্র ওদেরকে এড়িয়ে চলে। ওরা কিছুকাল আগে এ পাড়ায় এক বহুতল অট্টালিকা নির্মাণে বাধা দিয়েছিল, বুক পেতে দিয়েছিল পুলিসের গুলির সামনে—গভর্নমেণ্ট সেক্ষেত্রে পরাজয় স্বীকার করেছিল। ওরা সেটার নাম দিয়েছে 'পার্ক প্লেস' আন্দোলন। ওদের মধ্যেই রয়েছে শ্রেষ্ঠ ছাত্র, অধ্যাপক, দার্শনিক, বিজ্ঞানী, সমাজ সংস্কারক। এই একা বার্কলে বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই মোট ১৬ জন বিজ্ঞানী নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। অনেকেই জানে এই বিশ্ববিদ্যালয় ক্যানসার রোগ গবেষণার জগৎপ্রসিদ্ধ কেন্দ্র এবং এই বিভাগের বর্তমান চেয়ারম্যান হলেন একজন বাঙালী বিজ্ঞানী, তাঁর নাম ডাঃ সত্যব্রত নন্দী।

পশ্চিম যুক্তরাষ্ট্র শেষ করে এবার পূর্ব পথ ধরেছি। সানফ্রান্সিসকো থেকে প্রায় আটশ' মাইল অতিক্রম করে এসে পেলুম বিশাল এক লবণহ্রদ ; তারই ধারে এক মরুপার্বত্য শহর 'সল্ট লেক সিটি'তে এসে দাঁড়ালুম। দূর-দূরান্তব্যাপী পাহাড় এবং ঊষর উপত্যকা। এই স্টেটের নাম 'ইউতা'। কিন্তু দিগন্তজোড়া মরুভূমির ভিতরে-ভিতরে নগর নির্মাণ করতে এদের বাধে না। তিনটি প্রধান বস্তু যুক্তরাষ্ট্রের চমকপ্রদ বৈশিষ্ট্য। কোটি কোটি মেগাওয়াট বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন, বহু কোটি টেলিফোন যন্ত্র-ব্যবস্থার দ্বারা সমগ্র দেশ নিখুঁতভাবে বাঁধা এবং ৫০ হাজার মাইল-ব্যাপী কয়েকটি সুদীর্ঘ 'হাইওয়ে'। এদেশে একটি বাক্য সর্বত্র প্রচলিত—"এ মাইল এ মিলিয়ন" অর্থাৎ প্রতি এক মাইল পথ নির্মাণ করা হয়েছে দশ লক্ষ ডলার খরচ করে। হাইওয়ে ছাড়া ফ্রি-ওয়ে নির্মাণ করা হয়েছে কত হাজার মাইল, তার সংখ্যা আমার হাতের কাছে নেই। উভয়ের মধ্যে তফাত, কে কতটা চওড়া! যেগুলি 'ইণ্টার স্টেট হাইওয়ে', সেগুলি অধিকাংশই ২৫০ ফুট প্রশস্ত বলে শুনেছি, সেগুলিতে পথচারীদের হাঁটা আইনবিরুদ্ধ। এই হাইওয়েগুলি পূর্ব-উপকূল থেকে পশ্চিম উপকূল অবধি বিস্তৃত অর্থাৎ আটলাণ্টিক থেকে প্যাসিফিক অবধি। ফ্রি-ওয়েগুলিও তাই, এগুলি থাকে প্রতি নগরের গায়ে গায়ে। হাইওয়েতে রোড-সিগনালের শাসন নেই, ফ্রি-ওয়েতে আছে। প্রত্যেক হাইওয়ে তিন থেকে চার হাজার মাইল লম্বা—এ-কূল থেকে ও-কূল পর্যন্ত। যে কোনও বিদেশী, যাদের কাছে এদেশ অজানা, যারা পথ-হারাবার ভয়ে আড়ষ্ট, তাদের পক্ষে আমেরিকা পরম রমণীয়। এই দেশজোড়া হাইওয়ে বা ফ্রি-ওয়েতে প্রতি ১০ মাইলের মধ্যে অজস্র পেট্রল ওরফে গ্যাস, শ্রেষ্ঠ খাদ্যসামগ্রী, মনোরম বাসস্থান, প্রতি পদক্ষেপে টেলিফোন ব্যবস্থা, কিছু-দূরে হাসপাতাল এবং শপিং সেন্টার। জাতি হিসাবে আমেরিকানরা নিত্য বিচরণ-শীল। কোথাও বংশানুক্রমে স্থায়ীভাবে বসবাস করা এদের ধাতে নেই। এই শহর ভাল লাগছে না তবে অমুক শহরে বাস করবে চলো। অমুক থেকে আবার অমুক। দু ঘন্টার মধ্যে এরা এক সংসার তুলে অন্য সংসার বাঁধে। এক চাকরি ছেড়ে অন্য কোথাও চাকরি নেওয়া যায় যখন তখন। টেকনিক্যাল কাজ কিছু জানলে সোনায় সোহাগা, হাতের কাজ জানলে তো বরপুত্র! ছয়, সাত বা আটশ ডলার মাইনে যেখানে সেখানে। ওভারটাইম যদি খাটো তবে ঘণ্টায় তিন ডলার যে কোনও আপিসে। তোমার যোগ্যতার বিচার হবে তোমার কাজের ফলাফলে। বিশ্ববিদ্যালয়ের যতগুলো ডিগ্রিই তোমার থাক না কেন, আসলে তুমি কাজের উপযুক্ত কি না এইটি প্রথম বিচার্য। তুমি

পি-এইচ-ডি করা বড় ইঞ্জিনিয়ার, তোমার সঙ্গে কাজ করছে এক অর্ধশিক্ষিত সুদক্ষ কারিগর—তার উপার্জন তোমার চেয়ে অনেক বেশি।

সল্ট লেক সিটি হয়ে কানাসাস সিটি পেঁছিলুম কমবেশি দু হাজার মাইল বিমানপথ পেরিয়ে। ওই বিমানের মধ্যেই এক বয়স্ক আমেরিকান দম্পতি কথায়-কথায় বলছিলেন, এদেশের সবই ভাল। কাজ বলুন, কীর্তি বলুন, আবিষ্কার বলুন, উৎপাদনশক্তি বলুন—পৃথিবীতে আমেরিকার জুড়ি কেউ নেই। কিন্তু এসব কি হচ্ছে? শতকরা ৪০ থেকে ৫০টা বিয়ে টিঁকছে না কেন? আজকের ভালবাসা, কালকের ঘৃণা? বিয়ের পর দু-তিন মাসের মধ্যেই বিচ্ছেদ! দেশের যত উন্নতি, সমাজের ততই কি অবনতি? ভালবাসার মধ্যে শ্রদ্ধা নেই, বিয়ের সঙ্গে বিশ্বাস নেই! না, এতটা কিন্তু আমাদের কালে ছিল না!

আমি হাসছিলুম। ভদ্রলোক বললেন, আবার দেখুন নতুন উৎপাত! একটি মেয়ে 'ঘুমোচ্ছে' দুটি ছেলের সঙ্গে, দুটি ছেলে 'ঘুমোচ্ছে' একটি মেয়েকে নিয়ে। এ যেন একটু বাড়াবাড়ি হচ্ছে না? এই তো আমরা তিন দিনের জন্য গিয়েছিলুম 'লাস ভেগাসের' মরু-শহরে। ওখানে পুলিসের শাসন কম। কি দেখলুম শুনবেন--?

থাক থাক—মহিলা বাধা দিলেন।

না, বলবো না কেন? পরশু রাত্রে 'গো-গো' নাচে দেখলুম অন্তত ২০টা ছেলে-মেয়ে একসঙ্গে সম্পূর্ণ 'নিউড' হয়ে নাচছে! কী তাদের অঙ্গভঙ্গী! এরা কিন্তু সবাই ভদ্রঘরের!

কানসাস সিটিতে এসে ডকটর সুধাংশুকুমার দে-র বাড়িতে উঠেছিলুম। ইনি এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন পি-এইচ-ডি, বিশিষ্ট বিজ্ঞানী এবং স্ত্রীগর্ভ ও জননরহস্য নিয়ে মৌলিক গবেষণার কাজে নিযুক্ত। এঁর এক একটি আবিষ্কারের উপর অনেকগুলি রিপোর্ট ছাপা হয়েছে আমেরিকার বিভিন্ন মেডিক্যাল জার্নালে। এঁর সৌজন্য এবং অমায়িক ব্যবহার খুবই আনন্দদায়ক হয়েছিল।

এ অঞ্চল আমেরিকার মধ্যদেশ। এই মধ্যদেশ চারটি বড় বড় স্টেটে বিভক্ত এবং তারা হল নেব্রাস্কা, আইওয়া, কানসাস ও মিজোরি। এদেরই পশ্চিমে কলোরাডো স্টেটটি পাঁচ সপ্তাহ আগে ভ্রমণ করে আমি কালিফোর্নিয়ার দিকে অগ্রসর হয়েছিলুম। যাই হোক, এই চারটি স্টেটকে নিয়ে বলা হয় সমগ্র আমেরিকার শস্য-ভান্ডার। যে পরিমাণ গম, ভুট্টা, ধান, জোয়ার প্রভৃতি এই ভূভাগে ফলে তাই দিয়ে সমস্ত পৃথিবীবাসীকে সম্পূর্ণ এক বছর ধরে খাওয়ানো চলে। এইটিই এদের গর্ব। এর মধ্যে নেব্রাস্কা ছিল মরুলোক। কিন্তু আমেরিকার ভূ-বিজ্ঞান গবেষণার সহায়তায় এই মরুভূমিকে একালে সুজলা সুফলা ও শস্যশ্যামলা করা হয়েছে। এদেরই ভিতর দিয়ে বয়ে চলেছে মিজোরী, মিসিসিপি, সালিন প্রভৃতি নদ ও নদী।

সুধাংশু দেশে চলে যাবে কারণ এদেশ তার প্রিয় নয়। এখানে আমেরিকান পরিবেশে সন্তানদের পক্ষে 'মানুষ' হওয়া অসম্ভব। ইংরেজি ছাড়া শিক্ষা নেই, শুয়োর-গরু-মুরগি ছাড়া খাদ্য নেই। মাকে মাম্মি, বাপকে ড্যাডি, কথায়-কথায় 'ও-কে', আচ্ছার বদলে 'ইয়া'—এসব সহ্য করা তার পক্ষে অসম্ভব। হ্যাঁ, আর দু'বছর থাকব

এদেশে। আরও কিছু টাকা জমিয়ে নেবো। দেখতে পাচ্ছি ইউনিভার্সিটি আমাকে কিছুতেই ছাড়তে চায় না, কিন্তু আমি ছাড়বই। আমার দেশে ফিরে আমার বিদ্যে অনুযায়ী দেশের কাজ করব। কী হবে আমেরিকার বিজ্ঞানের উন্নতি করে? আমি নিজের হাতে গবেষণা করে একটির পর একটি আবিষ্কার করছি আর নাম হচ্ছে আমার সিনিয়র প্রফেসরের। কে থাকবে মশাই এদেশে? আপনি জানেন, বার্কলে আর বোস্টন ইউনির্ভাসিটির পাঁচ-ছয়জন বাঙালী বিজ্ঞানীর পক্ষে নোবেল প্রাইজ পাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু এদেশের কৌশলবাজি তা পেতে দেয়নি? আপনি জানেন, এরা যে চাঁদে পাড়ি দিল—তার শতকরা তিরিশ ভাগ বাঙালী বিজ্ঞানীর কৃতিত্ব? এরা সেসব স্বীকার করতে নারাজ। না মশাই, থাকব না এদেশে। বাচ্চা ছেলেটার চার বছর বয়স হলেই আমি দেশে পালাবো। আমার বাবা মা ভাই বোন—সকলের মাঝখানে গিয়ে থাকব। আধপেটা যদি খেয়ে থাকি সেও ভালো।

এই নিয়ে বহু বাঙালী ও ভারতীয়র মুখে প্রায় একই ধরনের কথা শুনে যাচ্ছিলুম। শতকরা ৭০।৮০ জনের ইচ্ছা, দশ বা পনেরো বছর এদেশে কাজ করে তাঁরা দেশে পাড়ি দেবেন। কিন্তু সমস্যা দেখা দিয়েছে অন্যক্ষেত্রে। যাঁদের ছেলেমেয়ে আমেরিকান স্কুলে পড়াশুনো করছে, আমেরিকান ছেলে মেয়েদের মাঝখানে মানুষ হচ্ছে, মাতৃভাষা ভুলতে বসেছে,—তারা অদূরে বা সুদূরে ভবিষ্যতের সঙ্গে যোগ হারাবে এবং ভারতকেই বিদেশ মনে করবে। ঠাকুমা দিদিমা খুড়ো জ্যাঠা মাসি পিসি - এরা হয়ে উঠবে 'বিদেশী'। সুধাংশুর ভয় হল সেইখানে। এই ভয় দেখে এসেছি বহু ভারতীয় মহলে।

দিন তিনেক পরে একরাত্রে ডাঃ দীপক চৌধুরী এসে তাঁর নিজের বাড়িতে আমাকে নিয়ে গেলেন। দীপক স্থানীয় হাসপাতালের এক বিশিষ্ট চিকিৎসক এবং তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী শ্রাবণী ওরফে বুলা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি নিয়ে বিজ্ঞান গবেষণা করে। মেয়েটির বয়স অল্প। এরই মধ্যে সে এম-এসসি করে পি-এচ-ডির দিকে চলেছে। ওরা দুটিতে থাকে বেশ সচ্ছল পরিবেশের মধ্যে। দুজনের দুখানা গাড়ি ছাড়া চলে না। এই অঞ্চলটিকে মিজৌরী স্টেটের ধনাঢ্য অংশ বলা হয়, এবং এই বনবাগান ও পুষ্পশোভায় ভরা গ্রামটির নাম 'ইন্‌ডিপেন্‌ডেনস।' এ বাড়িটি ওরা অল্পদামেই তৈরি করিয়েছে অর্থাৎ ৭০ হাজার ডলারের মতো পড়েছে। দীপকেরও বয়স কম। এখনও বোধ হয় ৩০।৩২ হয়নি। সে সকালে ৭৷৷টার মধ্যে বেরোয়, ফেরে সন্ধ্যা ছয়টার পর। শ্রীমতী বুলা আমাকে প্রথম দেখায় সেই বিশ্বশ্রুত 'জেরক্স' (xerox) মেসিন যার মধ্যে ছাপা কাগজ ঢুকিয়ে দিলে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই তার নকল কপি বেরিয়ে আসে।

এই নিয়ে অনেকগুলি গ্রাম দেখতে-দেখতে যাচ্ছিলুম। প্রতিটি গ্রাম বিদ্যুৎ-শক্তিতে ভরা। প্রতি গ্রামের আশেপাশে একেকটি 'ওভারহেড ট্যাঙ্ক'—যার উচ্চতা ১৫০ ফুটের কম নয়। প্রতি বাড়িতে ইলেকট্রিকের কুকিং রেঞ্জ, একটা বা দুটো টেলিভিশন, দুটো বা তিনটে টেলিফোন। বুলাদের বাড়ির গ্যারাজে রয়েছে ইলেক-ট্রনিক্ কমপিউটার। অর্থাৎ রাস্তা থেকে গাড়ি নিয়ে গ্যারাজে ঢোকাবার আগে নিজের থেকেই গ্যারাজের দরজা 'মন্ত্রবলে' খুলে যায়। তবে কিনা জামার পকেটে একটি দেশালাইর বাক্সর মতো ছোট্ট যন্ত্র শুধু টিপতে হয়। এটি প্রথম দেখি লস

এঞ্জেলেস থেকে দেড়শ’ মাইল দূরে পামস্প্রিং মরুভূমিতে শ্রীমতী অ্যানি মেরীর সেই বাগান বাড়িতে।

‘ইন্‌ডিপেনডেন্‌স’-কে যদি গ্রাম বলি, তবে কলকাতার চৌরঙ্গী-পার্ক স্ট্রীট-ক্যামাক স্ট্রীট অঞ্চলকে স্বল্পোন্নত গ্রামাঞ্চল বলতে বাধে না। যদি বলি এদের যে কোনও গ্রামের পুষ্পলতাশোভিত মসৃণ ও চিক্কন প্রশস্ত পথগুলিতে এক ইঞ্চি পরিমাণও খানা খোন্দল, ধূলিকণা, কাগজের কুটি, সিগারেটের শেষাংশ, ফলের খোসা —কিছুই দেখা যায় না, এবং প্রতি চিত্রবৎ বাংলোবাড়ির লন্‌গুলিতে সবুজ ঘাসের গালিচা পাতা—তাহলে আমার কথায় অতিশয়োক্তি পাওয়া যাবে না। আমেরিকার নাগরিক জীবনের সুখ্যাতি করার কালে আমি ঠিকই জানি, ওরা আমার মনকে ঘুষ খাওয়াচ্ছে না অথবা আমার মতো নিরাসক্ত পর্যটককে দিয়ে নিজের দেশের সুখ্যাতি লিখিয়ে নিচ্ছে না। ওদের কাছে আমার কোনও কৃতজ্ঞতা, ঋণ, বাধ্যবাধকতা বা সাহায্যের আশ্বাস তিলমাত্র নেই। বাইরের জগতের কাছে ওরা কিছু লুকোয় না. নিজের দেশের শাসক দলের লোককে কঠোর ভাষায় সমালোচনা করতে ওদের বাধে না, নিজেদের কলঙ্ক কাহিনী জনসমক্ষে তুলে ধরতে ওরা এতটুকু ভয় পায় না, ওদের হাত দিয়ে পৃথিবীর কোথাও কোনও অবিচার ঘটলে ওরা সেটিকে প্রকাশ করতেও দ্বিধা করে না। সি-আই-এর কলঙ্ক এদেশে সর্বত্র বিদিত।

কানসাস ও মিজৌরি ছেড়ে সোজা উত্তরপথে উইসকন্‌সিন্‌ স্টেটের ম্যাডিসন শহরে এসে পৌঁছলুম। বিজ্ঞানবিদ বিভূতিরঞ্জন দাশগুপ্ত সামনেই দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু উভয়ে উভয়ের কাছে ব্যক্তিগতভাবে সম্পূর্ণ অপরিচিত হলেও বিভূতিরঞ্জন পরম পরিচিতের মতো আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। উদ্দীপ্ত উৎসাহে বললেন, একুশ বছর ধরে যে পরিব্রাজকের কথা প্রতিদিন ভেবেছি এবং যিনি আমাকে অদৃশ্য ইশারায় হিমালয়ে পাঠিয়েছিলেন, তাঁকে আজ দু-হাতের মধ্যে পাবো কখনই ভাবিনি। আসুন আসুন—

বিভূতির স্ত্রী শ্রীমতী বিজয়া উচ্চপর্যায়ের ডাক্তারি পড়ছেন এখন বোস্টনে—ম্যাডিসন থেকে বহু দূরে। ঘরে রয়েছেন বিজয়ার মা ও বাবা—শ্রীমতী বীণা চৌধুরী ও তাঁর স্বামী। চৌধুরী মহাশয় একজন প্রাক্তন দেশকর্মী এবং ইংরেজ আমলে দীর্ঘকাল অবধি কারাবাস করেছেন। বিভূতির ছোট ভাই শ্রীমান দীপঙ্করও ওখানে রয়েছে—সে এক উচ্চশিক্ষিত বিদ্যুৎবিদ্‌। শীঘ্রই সে চাকরি নিয়ে চলে যাচ্ছে দক্ষিণ মেরুতে অর্থাৎ আন্টার্কটিকার তুষার জগতে। বাঙ্গালী যুবক এই প্রথম যাবে দক্ষিণ মেরুলোকে—এটি গৌরবের কথা। বাঙ্গালী এখন অস্ট্রেলিয়ায়, নিউজিল্যান্ডে, দক্ষিণ আমেরিকায়, আলাস্কায়—নিঃসঙ্কোচে চলে যাচ্ছে। এতে ‘ঘর-কুনো’ বাঙ্গালীর অপবাদ ঘুচে যাবে সন্দেহ নেই। দীপঙ্করকে আমি অভিনন্দন জানালুম।

ম্যাডিসন অপেক্ষাকৃত ছোট শহর, কিন্তু এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ও পৃথিবী প্রসিদ্ধ। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে বহুদিন অবধি গবেষণার ফলে পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম বেতার যন্ত্র প্রস্তুত করেন অধ্যাপক আর্লএম-টেরী ও তাঁর ছাত্ররা ১৯১৭ সালে এবং সেটিকে পরীক্ষার দ্বারা সাফল্যমন্ডিত করা হয় আমেরিকান্‌ নৌবাহি-নীর কাজে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে—এই ম্যাডিসনের আশে-পাশে সমুদ্রবৎ কয়েকটি হ্রদের

উপর থেকে। বোধহয় এই কারণটির জন্যই ম্যাডিসন বিশ্ববিদ্যালয় তাঁদের নিজেদের খরচে ও তত্ত্বাবধানে এখানে অতি বৃহৎ এক বেতার এবং টেলিভিশন কেন্দ্র স্থাপন করেন। এই কেন্দ্রের এক মহিলা কর্মী আমার কাছ থেকে একটি সাক্ষাৎকার রেকর্ড করে নেন্।

আগেই বলেছি ভারত থেকে যাঁরা পর্যায়ক্রমে এদেশে এসেছেন তাঁরা আপন আপন বিদ্যা ও শিক্ষার ক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্য অর্জন করেই এখানে এসে কাজে লেগেছেন। তাঁরা কেউই সামান্য বা নগণ্য নন্। মহিলারাও তাই। অধিকাংশই বিশ্ববিদ্যালয় বা বিজ্ঞান কলেজের কৃতী ছাত্রী। এ ছাড়া ইতিহাস, অর্থনীতি, জীববিজ্ঞান, পদার্থ ও রসায়ন—কোন বিষয়েই মেয়েরা কম যায় না। 'অন্তঃপুরের সাধারণ মেয়ে', এদেশে কেবল স্বামীর পরিচর্যা ও সন্তান পালনের দায়িত্ব নিয়ে আসে না। এদেশের বিরাট কর্মযজ্ঞে তারাও এসে অংশ নেয়। ভারতীয় কর্মী মেয়ে যাঁরা—যাঁদের দু-একটি শিশুসন্তান রয়েছে, তাঁরা ওই শিশুকে রেখে যান্ 'বেবি-সিটার'-এর কাছে প্রতি ঘন্টায় এক ডলার পারিশ্রমিকের বিনিময়ে। এমন-এমন বয়স্কা মহিলাও আছেন যিনি ঘরে বসেই এইভাবে কমবেশি এক হাজার ডলার উপার্জন করেন। মেয়েই বলো, পুরুষই বলো, উপার্জন ছাড়া আমেরিকায় বসবাস দুঃসাধ্য, কেননা প্রতি পদে নিজকে অতিশয় নিরুপায় মনে হয়।

আমেরিকান সমাজ সম্বন্ধে আমার কিছু কিছু প্রশ্ন ছিল। সেই কারণে সেদিন এক আমেরিকান দম্পতির সঙ্গে আলাপ করতে বসেছিলুম। এঁরা উভয়েই ম্যাডিসন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মী। স্বামীর বয়স আন্দাজ পঁয়ত্রিশ, এবং স্ত্রীর বয়সও ওই কাছাকাছি। স্বামী কাজ করেন স্ট্যাটিসটিকস নিয়ে এবং স্ত্রী রয়েছেন সমাজ বিজ্ঞানে। ওঁদের নাম মিস্টার ও মিসেস ওয়েস্টনার। উভয়ের চেহারাই সুশ্রী,—স্বামী দাড়ি রেখেছেন এতখানি। এ বাড়ি ওঁদের নিজের।

ওঁরা বললেন, আপনি যতটা শুনেছেন সব সত্যি নয়। শতকরা ৫০টা বিয়ে এদেশে ভেঙে যায়, এটি অতিশয়োক্তি। অন্যায় বা দুষ্কৃতি সব দেশের মতো এখানেও আছে। ছেলে মেয়েরা অনেক সময় উচ্চশিক্ষাকে এড়িয়ে চলে, বহু ছেলেমেয়ে নষ্ট হয়, বখাটে হয়ে যায়। কিন্তু একটা সময় আসে যখন তারা রোজগার করতে বাধ্য হয়। মা-বাপ সর্বপ্রকারে সাহায্য করে বৈকি। কেউই চায় না তাদের সন্তানরা যা খুশি তাই করুকগে। আমেরিকায় শিল্প ও বিজ্ঞানের উন্নতি করছে এরাই। কারও ঘরেই শান্তি নেই, এ অনুমান ভুল। চারদিকে লক্ষ লক্ষ পরিবার শান্তি ও স্বচ্ছলতার মধ্যে রয়েছে। যে কোনও গৃহস্থ পল্লীতে বেড়িয়ে আসুন, টুঁ শব্দটি কোথাও পাবেন না। অবিবাহিত মেয়ে পুরুষের একত্র বসবাস, কথায় কথায় বিবাহবিচ্ছেদ, অতিশয় উচ্ছৃঙখলতার ফলে যৌনব্যাধি,—এগুলি বিশেষ বয়সে ঘটে বৈকি। কিন্তু ওগুলোকে ছাড়িয়ে ওঠে আমেরিকান ছেলেমেয়েরা। তারা দিনে দিনে জানতে পারে, কঠোর পরিশ্রম ছাড়া এদেশে বাঁচবার উপায় নেই। এদেশে যত পরিশ্রম, তত উপার্জন। চুরি ডাকাতি, রাহাজানি, মাগিং (ছিনতাই), খুনখারাপি—প্রচুর হচ্ছে এদেশে। মেয়ে চুরি, রেপিং, কিডন্যাপিং—কোনটাই কম নয়। কিন্তু ওইটিই সব নয়। শিল্প ও বিজ্ঞানকে নিয়ে আমেরিকান সভ্যতা যতই এগিয়েছে, তত বেশি সামাজিক জঞ্জালের স্তূপও বেড়েছে। এদেশে বিজ্ঞানচিন্তা আবিষ্কার, নির্মাণ কৌশল, দিগ্বিজয়ী কর্মধারা, অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলার আশ্চর্য সাফল্য, সমাজ জীবনে সাচ্ছল্য

সৃষ্টির শত শত পরিকল্পনা,—এই সব নিয়েই আমেরিকার 'মেটিরিয়ল্' সভ্যতা। কিন্তু যেসব কাজে কোনও আদায় নেই ('নন-প্রফিটেবল্'), যা ফলপ্রসূ নয়, সেদিকে আমেরিকান সভ্যতার উৎসাহ অপেক্ষাকৃত কম। যেমন ধরুন উচ্চাঙ্গের সাহিত্য, চারু শিল্প, ললিতকলা, মহত্তর সংস্কৃতি, অধ্যাত্ম দর্শন, কাব্যচিন্তা—এরা সব পিছিয়ে পড়েছে। এরা আছে বহু জায়গায়, কিন্তু কতকটা স্তিমিত। একথা আপনি জেনে রাখুন, জ্ঞানলাভের ক্ষুধা আমাদের অপরিসীম। পৃথিবীর অন্তত একশটি দেশে এই নিয়ে আমেরিকা এক একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে। রকেফেলার ট্রাস্ট, ফোর্ড ফাউণ্ডেশন, ফুলব্রাইট স্কলারশিপ ইত্যাদির নাম সবাই জানে।

ক্যাপিটালিস্ট কারা?

ক্যাপিটালিস্ট নয়, বলুন ইন্‌ডাসট্রিয়ালিস্ট। ওরা শুধু পুঁজিবাদী হলে মরে যেতো! ফেডারাল বা স্টেট গভর্ণমেন্টের ট্যাক্স যোগাতে গিয়ে ওরা সর্বস্বান্ত হতো। কিন্তু ওরা টাকা রোল করাতে জানে। ওদের 'চেইন' ইনডাস্ট্রিতে কোটি কোটি লোক খাটে। ওরা হাজার হাজার কোটি ডলার প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রাণ্ট দেয়। সর্ব-প্রকার বিজ্ঞানের উন্নতি ঘটেছে ওদের ওই টাকায়। ওরা ওই বিজ্ঞানলব্ধ জ্ঞানকে প্রয়োগ করে শিল্পোন্নতির কাজে। খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয়, বিলাস-সামগ্রী, যানবাহন, ঔষধপত্র, সব রকমের কল-কারখানা, বিমানবহর, সর্বপ্রকার উৎপাদন ব্যবস্থা আগা-গোড়া সব শিল্পপতিদের হাতে। ওরাই গভর্নমেন্টের হর্তাকর্তা, ওরাই কংগ্রেস, ওরাই টেলিভিশনের মালিক, ওদের হাতেই বেতারকেন্দ্র। দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি ওরাই ঘটিয়েছে। রাষ্ট্রের কর্তারা ওদের হাতের পুতুল।

এদেশে কম্যুনিজম কি আসবে কোনদিন?

ওঁরা হেসে উঠলেন। বললেন, কেমন করে আসবে? এদেশে সর্বাপেক্ষা যারা গরীব, তাদেরও আছে সোস্যাল সিকিউরিটি। যারা চুরি-ডাকাতি খুনখারাপি করে তারা লোভী, কিন্তু নিরন্ন নয়। এদেশে এখন শতকরা ১০ জন বেকার, কিন্তু তারা মাসোহারা পায় চারশ' ডলার। তা'রা কুকুরের খাবার (Dog food) খেয়েও টাকা জমায়। কুকুর এদেশে শ্রেষ্ঠ খাদ্য খায়, সেই খাদ্য উপাদেয় এবং 'টিনপ্যাকে' সর্বত্র মেলে।

ঘন্টা তিনেক আলোচনার পর সেদিন বিদায় নিয়েছিলুম।

বিভূতিরঞ্জন এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে বায়ো-কেমিস্ট্রি বিভাগে গবেষণা করেন এবং তিনি এক বিশিষ্ট স্কলার ও পি-এচ-ডি। কিন্তু বাঙ্গালা সাহিত্য, সঙ্গীত প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর অনুরাগ প্রচুর। সেই অনুরাগ ও আলোচনায় যোগদান করেন তাঁর উচ্চশিক্ষিতা শাশুড়ী বীণা চৌধুরী ও শ্বশুর মিঃ চৌধুরী। শ্রীমতী বীণা মারাঠা সাহিত্যে বিশেষ পারদর্শিনী। এ'রা উভয়ে মিলে একদিন আমাকে নিয়ে এক প্রীতি সম্মেলনের আয়োজন করেছিলেন। ওরই মধ্যে একদিন শ্রীমান দীপঙ্কর আমাকে পথ দেখিয়ে নগর ভ্রমণে গিয়েছিল। তার সহায়তায় বহু দ্রষ্টব্য স্থান—এমন কি পুলিস বিভাগের প্রধান কেন্দ্রটির ভিতরে গিয়ে আগাগোড়া পরিদর্শন করে-ছিলুম। সেইদিনই প্রথম জানলুম, যুক্তরাষ্ট্রে রাজনীতিক বন্দী একজনও নেই। সাধারণ কয়েদীদের গায়ে কেউ হাত তোলেনা, তাদের খাদ্যে ভেজাল দেওয়া হয়না, তাদের বসবাস ব্যবস্থা খুবই ভালো। বিশেষ এক যন্ত্রের বৈদ্যুতিক আলোর সাহায্যে

অপরাধীর মনের কথার ছবি তোলা যায় ইত্যাদি। আমেরিকান পুলিসের কর্তারা সেদিন আমার সকল প্রশ্নের জবাব দিয়ে আমাকে সাহায্য করেছিলেন। আমি দু'-একটি রিভলভার কিনে আমার দেশে নিয়ে গেলে কেমন হয়—আমার এই প্রস্তাবে বড়-সাহেব বললেন, বেশ ত, যতগুলো ইচ্ছে নিয়ে যান। ভাল একটা রিভলভার ২০ ডলারেই পাবেন।

আমার সময় এবার কমে এসেছে এবং যুক্তরাষ্ট্র পরিক্রমা প্রায় শেষ হতে চলেছে। এবার আমি একটু একটু করে এগিয়ে যাচ্ছিলুম আবার পূর্বপথে। আমার এই ভ্রমণ শেষ হতে আর মাত্র মাসখানেক বাকি। এতদিন ধরে সর্বত্র মন দেয়া-নেয়া করে যাচ্ছিলুম। এবার সব ছেড়ে যাবার সময় আসছে। স্নেহ মোহবন্ধন ভ্রাম্যমান জীবনের বৈরী।

একদা অপরাহ্নকালে বিভূতির শাশুড়ী, দীপঙ্কর ও বিভূতিরঞ্জন নিজে আমাকে নিয়ে শিকাগো যাত্রা করলেন তাঁদের গাড়িতে। আমরা উইসকনসিন্ স্টেটের রাজধানী 'মিলওকি' হয়ে যাবো সোজা দক্ষিণ হাইওয়ে ধরে। আমাদের বাঁদিকে থাকবে সমুদ্রবৎ মিসিগান লেক।

॥ ১০ ॥

চিঠি লিখতে এবার একটু দেরি হয়ে গেল নানা কারণে। একে একে যে সব স্টেট দেখে চলেছি, তাদের সঙ্গে অন্তরঙ্গতার যোগাযোগ নিয়ে অনেক সময় ব্যস্ত থাকতে হচ্ছে। অনেক সময় ঠিক কোথায় এবং কার কাছে গিয়ে উঠে কিছু স্বাচ্ছন্দ্য ও বিশ্রাম লাভ করব, সে প্রশ্নও মনে মনে থাকে। আমি কেবল ঘুরে বেড়াচ্ছি তাই নয়, উড়ে উড়েও বেড়াচ্ছিলুম। পায়ের সঙ্গে মনও পথ পেরিয়ে চলে। কিন্তু লিখতে গেলে অবকাশ চাই।

শিকাগো পৌঁছবার আগে বনপথের ধার দিয়ে যাচ্ছিলুম। এই মহাদেশে কথায় কথায় অরণ্যানী ও পার্বত্যলোক চোখে পড়ে। মাঝে মাঝে তারই ভিতর দিয়ে যখন পার হতে থাকি, তখন প্রায়ই চোখে পড়ে ঘন বন ও ফসলের ক্ষেতের ধারে লেখা 'ডিয়ার পার্ক' অর্থাৎ হরিণের বন। শিকাগোর মতো সুবৃহৎ নগরের এত কাছে এই মৃগদাব কিছু বিস্ময় আনে। যাই হোক, শিকাগোর প্রতি আমার আকর্ষণ অনেক কালের এবং সেটি এক ঐতিহাসিক কারণে। এই নগরেরই একখানে দাঁড়িয়ে ১৮৯৩ সালে ভারতীয় এক যোগতপস্বী মাত্র ৬ মিনিটের এক ভাষণে পৃথিবীবাসীকে অভিভূত করেছিলেন। সুতরাং আমি যাচ্ছিলুম অনেকটা যেন তীর্থ পরিক্রমায়। নইলে নিউ ইয়র্ক, ওয়াশিংটন, শিকাগো আমার কাছে একই কথা।

দূর থেকে দেখতে পাচ্ছিলুম 'সিয়ার্স টাওয়ার' যেটি আজ পৃথিবীর মধ্যে সর্বোচ্চ বহুতল অট্টালিকা—যার উচ্চতা ১৪৬৫ ফুট, এবং ১২০ তলা। এটি নির্মাণ করেছেন একজন বিশিষ্ট বাঙালী, যিনি শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে পাস করে এদেশে এসেছিলেন। তাঁর নাম ফজলুর রহমান। তাঁর আদি বাড়ি ঢাকায়। তাঁর ডিজাইনে অপর একটি ওই প্রকারই অতি বৃহৎ বহুতল অট্টালিকাও নির্মাণ করা

হয়েছে, সেটির নাম 'জন হ্যানকক্' বিল্ডিং। সেটি শিকাগোর ডাউন টাউনের বৃহত্তম ল্যান্ড মার্ক। শিকাগো শহরে যখন বর্ষার মেঘ নামে তখন এ দুটি অট্টালিকার শীর্ষলোক মেঘে ঢাকা পড়ে।

শিকাগো হল যুক্তরাষ্ট্রের তৃতীয় বৃহত্তম নগরী। প্রথম নিউ ইয়র্ক, দ্বিতীয় লস এঞ্জেলেস—যেখানে মাস দেড়েক আগে কয়েক দিনের জন্য বাস করেছিলুম। শিকাগোর উত্তর ও পূর্ব অংশ হল মিসিগান সমুদ্র—যেটি দিবা রাত্র পুরীর সমুদ্রের মতো তরঙ্গসংকুল এবং যেটি চওড়ায় দুশ' মাইল ও উত্তর-দক্ষিণে লম্বায় পাঁচশ মাইলেরও বেশি। বস্তুত, এই মিসিগান 'লেকই মিসিগান স্টেটকে উত্তর দিকে দ্বিধাবিভক্ত করেছে,—যার উত্তর দিকে কানাডার 'লেক ইরি'। এই কয়েকটি বৃহৎ ও সমুদ্রবৎ জলরাশির পরিবেশের আশে পাশে রয়েছে কয়েকটি স্টেট—যেমন মিন্নেসোটা, উইসকনসিন্, মিসিগান, ইল্লিনয়েস এবং কানাডার অন্তর্গত টরণ্টোর উপদ্বীপ অঞ্চল। এই সমগ্র ভূখন্ডের চারিদিক দেখার জন্য কিছুকাল থেকে আমি ঘোরাঘুরি করছিলুম।

ইল্লিনয়েস বা 'ইলিনয়' স্টেটের উত্তর-পূর্বে মিসিগান লেকের তীরে শিকাগো শহর। এই শহরের সর্বাপেক্ষা প্রশস্ত হাইওয়ের নাম দেওয়া হয়েছে 'লেক শোর রোড'। একশ বছর আগে তদানীন্তন শিকাগো নগরীর অধিকাংশ আগুন লেগে ছারখার হয় যে কারণে, সেটি হল এক গরুর গোয়ালে খড়ের গাদায় গরুর পায়ের চাট লেগে কেরোসিনের প্রদীপ ও পাত্র উলটিয়ে আগুন ধরে যায়। নিকটবর্তী সমদ্রের প্রবল বাতাসে সেই আগুন ক্রমে বহুদূর অবধি ছড়িয়ে পড়ে। তখন যুক্তরাষ্ট্রে দমকল জন্মায়নি এবং বিদ্যুৎ বা মোটরগাড়ির প্রসার হয়নি। এটি ১৮৭৪-এর ঘটনা। দিবারাত্রির এই প্রবল বায়ু বেগের জন্য শিকাগোকে বলা হয় 'উইন্‌ডি সিটি'। এই 'উইন্‌ডি' সিটির সমুদ্র তটের কাছাকাছি যাঁর বাড়িতে আমি আশ্রয় নিয়েছিলুম, তাঁরা হলেন এই স্টেটে আতিথেয়তা ও স্নেহময়তার জন্য সুপ্রসিদ্ধ দুই সহোদর ভাই—গিরীন রায় এবং গিরীশ রায় ও তাঁদের দুই পত্নী গৌরী ও প্রদীপ্তা। এই দুই নারীর সদাজাগ্রত অতিথি বাৎসল্য, আপ্যায়ন এবং মধুর ব্যবহার আমার বসবাস ব্যবস্থাকে আনন্দ মুখরিত করে রেখেছিল। এঁরা সকলেই উচ্চশিক্ষিত। গিরীনবাবু এখানকার দুর্গাপুজো ইত্যাদির অন্যতম অধিকর্তা।

শিকাগোয় যিনি ভারতের বর্তমান কনসাল জেনারেল, তিনি হলেন অলকচন্দ্র বাগচী। তাঁর বাড়ি নবদ্বীপে। তিনি একাধারে ভারতীয় পর্যটন বিভাগেরও ডাইরেক্টর। একদিন সন্ধ্যায় তিনি আমাকে নিয়ে এক বন্ধু সম্মেলন আহ্বান করেছিলেন। এই নগরে কম বেশি চারশ বিশিষ্ট বাঙালী রয়েছেন এবং তাঁদের অধিকাংশই বিজ্ঞানী, ইঞ্জিনীয়ার, অধ্যাপক, চিকিৎসক এবং বিজ্ঞান গবেষক। লক্ষ্য করেছি সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রে বা কানাডায় দিবা ভাগে কোনও বন্ধুর দেখা পাওয়া যায় না, তাঁরা প্রভাতকাল থেকেই নিজেদের কর্মকেন্দ্রে কাজে ব্যস্ত—সেই ব্যস্ততার মধ্যে কোনও ফাঁক বা ফাঁকি নেই, বাড়ির খাওয়া তাঁদের কপালে জোটে না। তাঁরা একবার মাত্র সন্ধ্যাকালে পেট ভরে খান এবং তখন থেকে সর্বপ্রকার সামাজিক জীবন শুরু হয়। সমস্ত কাজকর্ম পড়ে থাকে শনি ও রবিবারের জন্য। ওই দুটি দিন ছুটি। অন্য দিন স্বামীরা কর্মস্থলে বেরিয়ে গেলে স্ত্রীরা হয়ে ওঠেন ঝি, ধোবানি, পাচিকা, ঝাড়ুদারনি বা জমাদারনি। আর্থিক সচ্ছলতা যতই থাক—বছরে সাধারণভাবে কমপক্ষে ১০ হাজার

ডলার, বরং বহুলোকের অনেক বেশি—কিন্তু গৃহকর্মের সাহায্যকারী এদেশে কেউই নেই। সুতরাং কঠোর কায়িক পরিশ্রম ছাড়া মেয়ে বা পুরুষের পক্ষে এদেশে বাঁচার উপায় নেই। এমন বহু দেশে ঘটেছে—যেমন নিউ ইয়র্কে, দক্ষিণ দেশ টেকসাস-এ, কলোরাডোয়, সানফ্রান্সিসকোয়, সান্টাক্রুজে—যেখানে স্বামী-স্ত্রী উভয়েই ভোর সাতটায় কাজে বেরিয়ে যান—সেখানে আমাকে রান্না, বাসন ধোওয়া প্রভৃতি কাজ করে নিতে হত। স্বামীরা অনেক সময়ে আপিস থেকে ফিরে রান্না ও বাসন মাজা নিয়ে ব্যস্ত হন।

এখন থেকে ৮২ বছর আগে স্বামী বিবেকানন্দ যে সুবৃহৎ অট্টালিকার হলে আন্তর্জাতিক ধর্মসভার বিশ্বশ্রুত সম্মেলনে যে অবিস্মরণীয় ভাষণটি দিয়েছিলেন, সেই অট্টালিকার এখন নাম হয়েছে আর্ট ইনস্টিটিউট অফ শিকাগো। এটি ডাউন টাউনের কাছে এক সুপ্রশস্ত রাজপথের ঠিক মধ্যস্থলে অবস্থিত। রাজপ্রাসাদের মতো এর সুবিস্তৃত সোপান শ্রেণী—তারই দুই দিকে দুই বৃহদাকার কেশরী সিংহের মূর্তি—ওরা যেন পূর্ব প্রাচ্যের দিকে চেয়ে রয়েছে যে পথ ধরে একদা ভারতের সেই বীরকেশরী চলে গিয়েছেন নিজের পথ দিয়ে। এই প্রাসাদপুরীর ভিতরে একালে বিভিন্ন কক্ষে পৃথিবীর বহু দেশের চিত্রকলা শোভা পাচ্ছে। ভিতরে বিশাল অঙ্গন, সেখানে বহুবিধ শিল্প সামগ্রীর সমাবেশ দেখা যায়। আমি বাইরে এসে ওই পাথরের সোপান শ্রেণীর এক পাশে অনেকক্ষণ একা বসে রইলাম। ঠিক অমন করে কেউ বসে না, সেজন্য বিদেশী পথচারীরা যখন দেখে-দেখে চলে যাচ্ছিল, তখন স্বামীজির পদ-চিহ্নের কথা ভেবে মনে-মনে আমি মহাকবির একটি 'চরণ' আওড়াচ্ছিলুম, 'তোমার ধূলায় ধূলায় ধূলায় আমি ধূসর হবো--।' আমার দুই চোখ বোধ হয় শুষ্ক ছিল না।

৮২ বছর আগে যে তারিখে স্বামীজি এখানে ভাষণ দিয়েছিলেন, ঠিক সেই দিনটিতে অর্থাৎ ১১ সেপটেমবরে আমি প্রবেশ করেছিলুম 'বিবেকানন্দ বেদান্ত আশ্রম' নামক এক অট্টালিকায়। এটি আশ্রমের প্রধান কেন্দ্র, কিন্তু আরও তিনটি কেন্দ্র এই শিকাগো শহরেই বর্তমান। এই আশ্রমটি এবং অন্য তিনটি কেন্দ্রের পরিচালনার বার্ষিক ব্যয়ের পরিমাণ হল ১ লক্ষ ২০ হাজার ডলার। এই অর্থ যুগিয়ে দেন স্বামীজির সংখ্যাতীত অনুরাগীমন্ডলী—যাঁদের প্রায় সকলেই আমেরিকান্। এই বাড়িটির মধ্যেই একটি উপাসনা মন্দির দেখতে পাচ্ছিলুম যেখানে শ্রীরামকৃষ্ণ, সারদাদেবী, বিবেকানন্দ, বুদ্ধ ও খৃষ্টের ছবি পাশাপাশি সাজানো রয়েছে। ভিতরে এক একটি কক্ষে বিভিন্ন ভাষায় অধ্যাত্মবাদের গ্রন্থাদি, বিবেকানন্দ রচিত বিভিন্ন বই ও গ্রন্থাবলী দুটি পাঠাগারে রক্ষিত রয়েছে। দু-চারটি শ্বেতাঙ্গ নর-নারী এগুলি দেখাশোনা করছিলেন।

স্বামী ভাষ্যানন্দ ওরফে বসন্ত মহারাজ এখন এই আশ্রমের পরিচালক। তিনি কর্ণাটকের মানুষ, কিন্তু আমার সঙ্গে বাংলায় কথা বলছিলেন। তিনি কিছুদিন আগেও কলকাতায় ছিলেন। কথা প্রসঙ্গে তিনি বললেন, পরলোকগত বরোদার মহা-রাজার প্রস্তাব ও অনুরোধের ফলে মিসিগান স্টেটের গভর্নর একদা একটি স্থানীয় জনপদের নামকরণ করেন 'সিটি অফ গ্যান্জেস' ওরফে 'গঙ্গানগর'। এই গঙ্গানগরে এখন যে বেদান্ত আশ্রমটি প্রতিষ্ঠিত রয়েছে সেখানে আপাতত ১৯ জন আমেরিকান

ব্রহ্মচারী তপশ্চর্যা করছেন এবং তাঁরা কিছুকালের মধ্যেই সন্ন্যাস নেবার জন্য বেলুড় মঠে যাবেন। প্রসঙ্গক্রমে ভাষ্যানন্দ বললেন, যুক্তরাষ্ট্রে আরও তিনটি ভারতীয় নামের জনপদ রয়েছে, সেগুলির নাম কলিকাতা, দিল্লী ও মাদ্রাজ। অপর একটির নাম বরোদাও রাখা হয়েছে। স্বামীজির বসবার ঘরের দেওয়ালে বিবেকানন্দের একটি বড় ছবি টাঙ্গানো রয়েছে। এটি ৮২ বছর আগেকার ছবি এবং ছবির নিচে বিবেকানন্দের স্বহস্তে নাম সই করা। পরবর্তীকালে বিবেকানন্দের সাক্ষাৎ শিষ্য স্বামী পরমানন্দ এসেছিলেন আমেরিকায়। তিনি কালিফোর্নিয়ায় সানফ্রান্সিসকো নগরে একটি বেদান্ত আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। সেটি আমি আমার ভ্রমণকালে দেখে এসেছি, বলাই বাহুল্য। সেই আশ্রমটি ছিল পরমানন্দর নিজস্ব সম্পত্তি। তাঁর মৃত্যুর আগে সেটি তিনি তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রী তপস্বিনী শ্রীমতী গায়ত্রী দেবীর নামে লিখে দিয়ে যান। গায়ত্রী দেবীর কথা এর আগে আমি লিখেছি। গায়ত্রী তাঁর নামাঙ্কিত বেদান্ত আশ্রমটি এখন 'বিবেকানন্দ বেদান্ত সোসায়েটি'কে দান করতে চান।

শিকাগো শহরের আরেক স্থলে 'হরে কৃষ্ণ' সম্প্রদায়ের একটি প্রধান কেন্দ্র দেখছিলুম। এঁদের অবস্থা খুবই সচ্ছল এবং এঁরা পৃথিবীর বহু দেশে ইতিমধ্যেই অসংখ্য নামকীর্তন সম্প্রদায় সৃষ্টি করে চলেছেন। এটি এখন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান। আমি এঁদেরকে দেখে আসছি নিউ ইয়র্ক, ওয়াশিংটন, ডালাস, লসএঞ্জেলস, সানফ্রান্সিসকো প্রভৃতি বহু শহরে। এ বছরে এঁরা শিকাগোয় জগন্নাথদেবের রথযাত্রা উদ্‌যাপন করেছিলেন এবং হাজার হাজার আমেরিকান নর-নারী সে দৃশ্য দেখেছেন। এঁদের পুরুষরা মুণ্ডিতমস্তক ও শিখাধারী, এবং মহিলারা বাঙ্গালী ধরনে শাড়ি, সিঁদুর ও চুড়ি পরেন। এঁরা মেঝের উপরে বসে থালা পেতে 'প্রসাদ' খান এবং সকাল, দুপুর ও সন্ধ্যায় হরিসংকীর্তন করেন। এঁদের যিনি 'প্রভুপাদ' এবং যাঁর কৃপায় এঁদের মোক্ষলাভ ঘটবে, তিনি জনৈক বাঙ্গালী বৈষ্ণব, নাম অভয়চরণ দাস ভক্তিবেদান্তস্বামী। ইনি প্রবীণ বয়স্ক ব্যক্তি এবং এঁর অসামান্য কৃতিত্ব সর্বত্র সমাদৃত। এঁর যাঁরা অনুরাগী তাঁরা সকলেই 'অন্ধ' ভক্তিতে নিত্য ভাসমান। এঁরই কোনও এক রচনায় প্রকাশ, শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ নাকি বেদান্তের ভুল ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর এই ধরনের কথাগুলি আমার কানে ঠেকেছিল। সম্ভবত আমি ভক্তিভাসমান নই বলেই তাঁর মন্তব্যের প্রতি আমার ঔদাসীন্য ছিল। এদেশে একে একে বহু অধ্যাত্মবাদী ও যোগবাদী সম্প্রদায় এসে জায়গা নিয়েছেন, কারণ আমেরিকায় বাধা-নিষেধের বেড়াজাল কোথাও নেই। পৃথিবীর সকল জাতি ও সম্প্রদায়ের মানুষ এদেশে এসে অবাধ ও নিরবচ্ছিন্ন ব্যক্তিস্বাধীনতা ভোগ করে। এদেশে বহু বহু কম্যুনিস্ট মনোভাব সম্পন্ন নর-নারী বাস করে সন্দেহ নেই। কোন কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ে মাও-সে-তুঙের বাণী ঝোলানও দেখে এসেছি। কিন্তু রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যতক্ষণ পর্যন্ত তারা প্রকাশ্যে বা গোপনে চক্রান্ত না করে ততক্ষণ পর্যন্ত তারা সম্পূর্ণ নিরাপদ। হিংসাবাদী নর-নারী বহু আছে কিন্তু তারা আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার না করা পর্যন্ত পুলিস তাদেরকে কিছু বলে না—এ কথাটি আমাকে জানিয়ে ছিলেন ম্যাডিসনে পুলিস বিভাগের কর্তৃপক্ষ। জনৈক পুলিস অফিসার আমার হাতে একটি দামী রিভলভার দিয়েছিলেন পরীক্ষা করে দেখার জন্য। এগুলি এদেশের যে কোনও দোকানে মাত্র ২০ ডলারে কিনতে পাওয়া যায়, কোনও নিষেধ নেই। খুনী আসামী ধরা পড়লে খুনের বিচার হয়, কিন্তু আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের বিচার হয় না। পুলিসের

অন্যতম কর্তা আমাকে বলেছিলেন, আপনি ভিজিটর হিসাবে দু'চারটে আগ্নেয়াস্ত্র এদেশ থেকে অনায়াসে কিনে নিয়ে যেতে পারেন, কেউ বাধা দেবে না। শুধু বিমান-ভ্রমণকালে আপনার পকেটে গুলিভরা রিভলভার না থাকলেই হ'ল!

এদেশে কোথাও কোথাও মহেশ যোগীর নামডাক আছে। তাঁর আদর্শ হল যৌগিক অতীন্দ্রিয়বাদ। ওটার একটা অসুবিধা এই, চর্মচক্ষে কিছু দেখা যায় না। আমেরিকার সামাজিক জীবনে অতি-সচ্ছলতার ফলে একপ্রকার মানসিক অরুচি দেখা দেয়, তার ফলে জীবনযাত্রা একঘেয়ে মনে হয় এবং বিষয়-বিরাগ আসে। সুতরাং নতুন কিছুর দিকে কেউ যদি দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তার খদ্দের জুটতে বিলম্ব ঘটে না। অর্থ উপার্জন, চাঁদা আদায়, ডোনেশন, সম্পত্তি কেনা, প্রতিষ্ঠান স্থাপনা, নতুন হুজুগে মাতিয়ে তোলা—এগুলি সুসাধ্য। এদেশের সংবাদপত্রাদিতে ভারতীয়দের ক্রিয়া কীর্তিকলাপ কিছু কিছু ছাপিয়ে নিতে পারলে ভারতবর্ষে তার খাতির ও কদর বাড়ে। সেগুলি আবার একত্র করে যদি এদেশে পুস্তিকা ছাপা হয় তবে ত' কথাই নেই।

শিকাগো শহরের 'উইলমেট্' নামক অঞ্চলে 'বাহাই' মন্দিরটি দেখে প্রকৃত আনন্দ পেয়েছিলুম। এটি মিসিগান হ্রদের ধারে একটি উচ্চ মালভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত। এর শোভা-সৌন্দর্য, কারুকার্য, গঠন-শিল্প, অকাতর অর্থব্যয়- বোধ করি তাজ-মহলকেও হার মানায়। এই মন্দির নির্মাণের পিছনে যাঁর ধর্মাদর্শবাদ কাজ করেছে তিনি এক মহৎপ্রাণ ইরানী, নাম বাহাউল্লা। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে বাহাউল্লা তাঁর যৌবন-কালে এক নতুন বিশ্বমানবধর্ম প্রচার করেন যার মূল কথা হ'ল পৃথিবীর সকল ধর্মের একই পথ, যার অপর নাম ঈশ্বরলাভ! মহাপুরুষগণ বিভিন্ন নামে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ধর্মবাদ প্রচার করে ওই একই কথা বলতে চেয়েছেন। বাহাউল্লার পূর্ব-পুরুষরা ছিলেন আর্যজাতিসম্ভূত। কিন্তু এই বিশ্ব-ধর্মবাদ পারস্য দেশের মুসলমান সমাজ বরদাস্ত করেন নি। তাঁর ওই মতবাদ প্রচারের ফলে ইরান সরকার ও ইসলামের নেতৃবৃন্দ তাঁকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেন, কিন্তু তাঁর পরিবর্তে তাঁর ২০ হাজার শিষ্যকে হত্যা করা হয়! অতঃপর তাঁকে স্বদেশ থেকে বাগদাদে পরে তুরস্ক দেশে এবং তারপর প্যালেস্টাইনে নির্বাসন দেওয়া হয়। ১৮৯২ সালে কারা-জীবনে তাঁর মৃত্যু ঘটে।

উইলমেটের নয়টি স্তম্ভে বাহাউল্লার যে কথাগুলি উৎকীর্ণ দেখতে পাচ্ছিলুম তার কয়েকটি এখানে উদ্ধৃত করি ঃ "All the prophets of God proclaim the same faith Religion is a radiant light and an impregnable stronghold. Ye are the fruits of one tree, and the leaves of one branch. So power-ful is unity's light that it can illumine the whole earth. Consort with the followers of all religions with friendliness. O Son of Being! Thou art my lamp and my light is in thee. O Son Being! Walk in my statu-tes for love of me. Thy paradise is my love; thy heavenly home is reunion with me. The light of a good character surpasseth the light of the sun."

বাহাউল্লাকে বলা হত তিনি ইসলামের শত্রু এবং তাঁর জন্য ইসলাম বিপন্ন। তাঁর

জীবৎকাল অবধি তিনি পারস্য দেশে ঘৃণার পাত্র ছিলেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর থেকে অদ্যাবধি পৃথিবীর বহু দেশে হাজার হাজার কোটি ডলার ব্যয়ে বহু মন্দির নির্মাণ করা হয়। কোনও 'বাহাই' মন্দিরে আনুষ্ঠানিক কোনও প্রকার ক্রিয়াকলাপ নেই। শুধু চুপ করে কিছুক্ষণ বসে থাকা মাত্র।

শিকাগোর সিয়ার্স টাওয়ারের উপরে উঠবার লোভ সামলাতে পারি নি। দেড় ডলার মূল্যের টিকিট লাগে উপরে উঠতে। ছুটির দিনে প্রায় ৮।১০ হাজার লোক উপরে ওঠে। লিফ্ট ওরফে এলিভেটর তুলে নিয়ে যায় এক মিনিটে। ১৩৫৩ ফুট উঁচু পর্যন্ত তুলে নামিয়ে দেয় 'স্কাই ডেক' নামক এক বিশাল চতুষ্কোণ হলে। উপর থেকে দেখে নাও বিশাল শিকাগো এবং মিসিগান লেক। কিন্তু স্কাই-ডেকের উপরের তলাগুলিতে ওঠবার হুকুম নেই। এই অতিকায় অট্টালিকা নির্মাণে ৭৫ হাজার টন শুধু ইস্পাত-লোহা লেগেছে, এবং এই অট্টালিকার মধ্যে কেবলমাত্র টেলিফোন ব্যবস্থার জন্য যে পরিমাণ তার খরচ করা হয়েছে, সেগুলি পরস্পর লম্বায় যোগ করলে দাঁড়ায় প্রায় ৫০ হাজার মাইল অর্থাৎ বার দুই পৃথিবী পরিক্রমার মতো দূরত্ব। নিউ ইয়র্কে এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং ১২শ ফুট, ওয়ার্লড ট্রেড সেন্টার যেন ১৩শ কত এবং এই সিয়ার্স টাওয়ার ১৪৬৫ ফুট উঁচু। সিয়ার্স হল এদেশের মস্ত শিল্পপতি,—যারা বিলিয়নের হিসাবে ডলারের পরিমাণ গোণে। কিন্তু আমি এদেশে এখন 'আদার' ব্যাপারী, সব 'জাহাজের' খবর রাখতে পারছিনে।

সম্প্রতি শিকাগোতে শিক্ষক ধর্মঘট চলছিল। তাঁদের ইউনিয়ন খুবই শক্তিশালী। দেখতে পাচ্ছিলুম হাজারে হাজারে শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী বেতনবৃদ্ধির আন্দোলনে যোগ দিয়ে পথে পথে মিছিল বার করছিলেন। ৭।৮ দিন এইভাবে চলছিল। এমন সময়ে নগরের যিনি সর্বোচ্চ কর্তা, যাঁকে মেয়র বলা হয়, তিনি এক বিবৃতি প্রচার করে বললেন, আমার হাতে এমন উদ্বৃত্ত অর্থ নেই যা দিয়ে শিক্ষকদের মাইনে বাড়ানো চলে। সুতরাং ধর্মঘট শেষ ক'রে দাও।

আশ্চর্য, তাঁর ওই একটি কথায় ধর্মঘট প্রত্যাহার করা হল! রাজভক্ত প্রজারা শান্ত মনে যে যার কাজে চলে গেল।

প্রত্যেক স্টেটের গভর্নরের নিচেই হলেন মেয়র। মেয়রই সর্বেসর্বা। এদেশে না আছে মুখ্যমন্ত্রী না শিক্ষামন্ত্রী, না বা উপমন্ত্রীর দল। জনসাধারণ অত্যন্ত শান্ত ভাবে সব রকমের আইন ও নিয়ম শৃঙখলা মেনে চলে। বলা বাহুল্য, প্রত্যেক শিক্ষকের নিজস্ব গাড়ি আছে। সর্বাপেক্ষা কম বেতনের শিক্ষকও বছরে ১০ হাজার ডলার উপার্জন করেন। প্রতি শিক্ষক বছরে এক হাজার গ্যালন গ্যাস বা পেট্রল খরচ করেন এবং তার মূল্য বছরে পড়ে ছয়শো ডলার বা একটু কম। এ ছাড়া ঘরখরচ, সন্তানপালন, ফ্ল্যাট ভাড়া, ইনকাম ট্যাক্স, সোস্যাল সিকিউরিটি ট্যাক্স, হাত-খরচ, সামাজিকতা—কী নেই? সুতরাং ৮।৯ শ' ডলারে এই মূল্যবৃদ্ধির কালে গৃহস্থের পক্ষে চলবে কেমন করে? এইসব কারণে স্বামী-স্ত্রী উভয়কেই কাজ নিতে হয়। কাজ পেয়েও যায় সহজে।

শিকাগোর 'ইনডাসট্রিয়াল' যাদুঘর দেখলে হাসি পায়। দু'শ তিনশ' বছর আগে যখন বিজ্ঞান ও টেক্‌নোলজি আঁতুড়ে অবস্থায় ছিল তখন এরা কি-কি যন্ত্রপাতি ব্যবহার করত, তারই যাদুঘর। যেমন ধরো ছুতোর মিস্তিরির করাত, বাটালি, র‍্যাদা,

ছেনি, তুরপুন—এরা এখন সেই সব সুপ্রাচীনকালের যন্ত্রাদি দেখে কৌতুক বোধ করে। এদের ঠাঁই হল এখন যাদুঘরে। ভারতীয় ছুতোর যে কাজ সাতদিনে করে, এরা ইলেকট্রিক যন্ত্রে সেকাজ সাত মিনিটে করে! রাজধানী ওয়াশিংটনের এক ময়দানে দেখেছিলুম, একটি সুবিশাল গাছের গুঁড়ি কেটে নামাতে এদের এক মিনিটও লাগল না।

এদেশে আসার পর থেকে আমি বহু গ্রামে ভ্রমণ করেছি। এক একটা বড় শহরের আশে পাশে একশ' মাইলের মধ্যে মাঝে মাঝে গ্রাম গড়ে উঠেছে। সেই গ্রাম যেন এক-একখানি পটে আঁকা ছবি। প্রতিটি বাড়ি আগাগোড়া কার্পেট মোড়া, প্রতি বাড়িতে টেলিফোন, একটা বা দুটো টি ভি সেট, এক বা দুখানা মোটর, সামনে ও পিছনে ফুল ও ফলের বাগান, প্রতি বাড়িতে ফ্রিজার,ইলেকট্রিক কুকিং রেঞ্জ, বাসন মাজা ও ধোওয়া-মোছার মেসিন, বাথরুমে গরম ও ঠান্ডা জলের শাওয়ার এবং প্রতি বাড়িতে হিটিং ও কুলিংয়ের ব্যবস্থা, দিবারাত্রি কলের জলের বন্দোবস্ত। শুধু বোতাম টেপো, কাঁটা ঘোরাও—সব কিছু নিখুঁত ভাবে অনায়াসে পাবে। প্রত্যেক বাড়ির লনের সামনে একটি স্ট্যান্ডে দুটি করে বাক্স লট্‌কানো—একটি চিঠির বাক্স, অন্যটিতে দিয়ে যাবে সংবাদপত্র। মোটরে আসবে ডাক-পিওন আর নিউজ বয়। চিঠি লিখে তোমাকে নিজের হাতে ডাকে ফেলতে হবে না। বাক্সর সংগে লট্‌কিয়ে রাখো, ওরাই নিয়ে যাবে। প্রত্যেক গ্রামে মাকড়সার জালের মতো একেকটি সুন্দর ও মসৃণ পাকা সড়ক এখান ওখান ঘুরে হাইওয়েতে মিলবে। প্রত্যেক গ্রাম সজীব কিন্তু শান্ত। শপিং সেণ্টার, স্কুল, হাসপাতাল, পুলিস, চৌকি, ডাকঘর, গলফ ক্লাব, লাইব্রেরি—সমস্তই হাতের কাছে। যদি তুমি প্রশ্ন করো বাজার বা হাসপাতাল এ গ্রাম থেকে কত দূরে মশাই? কেউ একজন জবাব দেবে, এই ত কাছেই, মিনিট দশেকের পথ। তুমি তখনই বুঝে নেবে ওটা দশ মাইল মোটরের পথ। যদি কেউ বলে, ওয়ার্কিং ডিসটেন্স, তখন বুঝবে এক মাইলের মধ্যেই। সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রে বিগত চার মাসের মধ্যে কোনও ব্যক্তিকে কোনও কাজের জন্য দু' মাইল অবধি হাঁটতে দেখিনি।

বড় বড় শস্য প্রান্তরের আশে পাশে চাষীদের বসবাস দেখছিলুম। প্রত্যেক চাষীর দু' তিনখানা মোটর, নিজস্ব বৃহৎ বাগানবাড়ি, চার পাঁচখানা যন্ত্রযান, বিরাট এক একটা বার্ন বা শস্যভাণ্ডার, জন্তুদের 'ফডার' রাখার একটি সুউচ্চ গম্বুজের মতো একই ধরনের গোলা, প্রত্যেকের বাড়িতে রেডিয়ো বা টি-ভি সেট, প্রতি ঘরে কার্পেটের মেঝে, রান্নাঘরের একই ধরন—এবং প্রতি বাড়িতে ইলেকট্রিক ও শীততাপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা। একশ' একর জমি চাষ করে একজন মাত্র ব্যক্তি একদিনে। যন্ত্র-যানের সাহায্যে রাসায়নিক সার দেয়। ওই পরিমাণ জমিতে মাত্র একদিনে বীজ বপন করে, নিড়েন দেয়। দেড় থেকে দু' মাসের মধ্যে ফলন শেষ হয় এবং যন্ত্রযানের সাহায্যে ফসল কেটে ওই যানের মধ্যেই পুঁজি করে ভাণ্ডারে তুলে আনে। কোনও ফসলের ক্ষেতে খোলা আকাশের নিচে কোনও চাষীকে কাজ করতে দেখা যায় না। ঘরে বসে ইলেকট্রিকের সাহায্যে ক্ষেত খামারে বিশেষ পাইপের দ্বারা জলসেচন করা হয়। কোন কোনও স্টেটে বিশ, তিরিশ বা পঞ্চাশ বর্গমাইল-ব্যাপী জমি এক একজন চাষী পরিবারের অধিকারে রয়ে গেছে। স্বয়ং গভর্নমেণ্ট চাষীদেরকে সমীহ করে চলেন।

নিত্যসেবাব্রতী গিরীন ও গিরীশ রায়ের পরিবার ছিলেন আমার গাইড। তাঁদের সঙ্গে কখনও যাচ্ছি ডাউন টাউনের আপিস পাড়ায়, কখনও মিসিগান সমুদ্রতীরে, কখনও বা দূরপাল্লার 'হায়াৎ রিজেন্সি' হোটেলের দিকে—যার সাততলার উপরে 'পোলারিস' নামক একটি ঘূর্ণ্যমান রেস্টুরেন্ট—যেটির বিরাট আয়তন অবিশ্রান্তভাবে ঘুরে ঘুরে সমগ্র দিগন্তজোড়া শিকাগোকে দৃশ্যমান করে তুলছে। তখন খাবার টেবিলে বসে তুমি সব দেখে নিতে পারো। ওখানেই দেখা যায় একটি কাঁচের এলিভেটর—যেটি অলঙ্কৃত এবং আলোকমাল্যে সুসজ্জিত। এখান থেকে কাছেই বিশ্ববিখ্যাত বিমানঘাঁটি ও-হেয়ার—যেখানে ইলেকট্রনিক-কমপিউটারের সাহায্যে প্রতি আধ মিনিটে একখানি বিমান ওঠে ও নামে। অর্থাৎ প্রতি ২৪ ঘণ্টায় আড়াই হাজার বিমান ওঠানামা করে। এই বিমানঘাঁটিতে যাত্রী ছাড়া কোনও অপারেটরকে দেখা যায় না,—শুধু কমপিউটর যন্ত্রের সাহায্যে সমস্তই নিয়ন্ত্রণ করা যায় এক অদৃশ্য সঙ্কেতে।

প্রতি শহরে নগরে বা গ্রামের উপকণ্ঠে একটি দুটি বা চারটি বিশ্ববিদ্যালয়। শিকাগোয় সব মিলিয়ে মোট ছয়টি। প্রধানতম হল শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়—যেটি বন-বাগানঘেরা একটি স্বতন্ত্র নগর। কমবেশি একশখানা বিশাল অট্টালিকা নিয়ে এর ক্যাম্‌পাস—যেখানে অন্ততপক্ষে ৫০ হাজার ছেলেমেয়ে, শিক্ষক, অধ্যাপক, রিসার্চ স্কলারের দল নিয়ত কাজ করে চলেছে। কিন্তু চারিদিক দিবারাত্র নিঃঝুম নিস্তব্ধ। পথঘাট জনবিরল, শান্ত, নিরুদাসীন, বন্ধুহীন—দেখলে যেন গা রোমাঞ্চ হয়। বনবাগানে গাছপালার মর্মরশব্দ ও পাখির ডাক ছাড়া আর কিছু শোনা যায় না। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসিদ্ধ 'ফস্টার' হলে কিছু বলবার জন্য যখন আমার ডাক পড়েছিল, সেই রাত্রে আমার মনে একটু কাঁপন ধরেছিল বইকি। ঘণ্টাতিনেক ধরে আমার সাহিত্য ও ভ্রাম্যমাণ জীবন সম্বন্ধে কি-কি বলেছিলুম, এখন আর একটুও মনে নেই। বিগত চার মাসে প্রায় ৪০ দফায় আমাকে নানা স্টেটের নানা শহরের জনসমক্ষে ও বন্ধুসম্মেলনে দাঁড়াতে হয়েছিল। এখনও কয়েকটি বাকি।

শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগের দুইজন অধ্যাপক ক্লিন্‌টন সীলি ও রালফ্‌ নিকলাসের সঙ্গে একদিন নৈশভোজে মিলিত হয়েছিলুম।

আমার আমেরিকা ভ্রমণ শেষ হতে এখনও প্রায় মাসখানেক বাকি। এখন সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি, এদেশে শরৎকাল। মাঝে মাঝে বেশ বৃষ্টি হচ্ছে। রাত্রে কম্বল জড়াতে হয়। কিন্তু এখনই বনে জঙ্গলে পাহাড়ে মাঠ-ময়দানে গাছপালার রং বদলাতে আরম্ভ করেছে। দেখতে দেখতে গাছগুলো হয়ে উঠছে রক্তরাঙা, কোথাও বা ঘন হলুদবর্ণ। আর এক মাসের মধ্যে কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্র বর্ণচ্ছটার বন্যায় প্লাবিত হবে। তারপর থেকে পাতা ঝরতে আরম্ভ করবে। সেই ঋতুর নাম 'ফল্‌'। আমি এই ফল্‌-এর আগে ইউরোপের দিকে যাব।

আমার এই ভ্রমণকালে মাঝে মাঝে মহামায়ার মায়া আমাকে ঘিরে ধরছিল। স্নেহ-মোহবন্ধন ভ্রাম্যমাণ জীবনের পক্ষে বাধাস্বরূপ। কানাডার নীলাদ্রি ও রান্নু, গুয়েলফ্‌-এর মঞ্জু ও কেনেথ কেলি, অরবিন্দ ও সবিতা, বিশ্বনাথ ও বেণু, নিউ ইয়র্কের মনোরঞ্জন দত্ত, রেণুকা বিশ্বাস, নিউ পাল্টৎসের ভবানী সরকার আর মঞ্জুশ্রী, হিউসটনের দীপক, রিনা, রতন ও রণজিৎ ব্যানার্জি, বোস্টনের সোমনাথ ও বাণী,

ডালাসের শান্তি ও দীপক—এরা নিতান্ত আপন হয়ে রইল। সানফ্রান্সিসকোর রমেন্দ্র আর অর্চনা, আলাস্কার নীরেন্দ্র বিশ্বাস, হনলুলুর সত্যাংশু, বার্কলের তুষারকুমার, কান্সাস মিজৌরির সুধাংশু, অঞ্জনা, দীপক ও শ্রাবণী, ম্যাডিসনের বিভূতিরঞ্জন ও বীণা চৌধুরী—এঁদেরকে ভুলবার আর উপায় রইল না। শিকাগোর গৌরী বউমাকেও ভুলতে পারব না।

একদিন এঁদেরই বাঁধন কেটে ডেট্রয়েটের দিকে রওনা হলুম।

॥ ১১ ॥

শিকাগো থেকে ডেট্রয়েট যাব বলে ট্রেনে উঠেছিলুম। এর আগে ছোটখাটো যাত্রায় কয়েকবারই রেলগাড়িতে উঠেছি। ভূগর্ভ রেলেও বহুবার এদেশে ঘুরে বেড়িয়েছি। কিন্তু দূরপাল্লার ট্রেনে এই প্রথম। এই রেলওয়েটির নাম 'অ্যামট্র্যাক'। 'অ্যামট্র্যাকের' রেলগাড়ির কিছু আভিজাত্য আছে। দিল্লি-হাওড়ার 'রাজধানী' একসপ্রেস এখানে হয়ে উঠেছে যেন অনেকটা রাজবাড়ি। বসবার স্বাচ্ছন্দ্য, শীততাপ নিয়ন্ত্রণ, কার্পেটপাতা প্যাসেজে চলাফেরার সুবিধা, নিজের থেকে পার্টিসানের দরজা খুলে যাওয়া এবং বন্ধ হওয়া, প্রতি সীট নরম কার্পেটে মোড়া, পরিচ্ছন্ন সর্বাধুনিক বাথরুম,--অর্থাৎ সর্বপ্রকার সুযোগ সুবিধা। কিন্তু দুটি আকর্ষণ খুবই মনোজ্ঞ। প্রতি কামরার সঙ্গে একটি সুদৃশ্য রেস্টুরেণ্ট--যা খুশি কিনে খেতে পারো। ট্রে করে খাবার আনো, সীট সংলগ্ন ছোট ডাইনিং টেবলটি টেনে পেতে নাও,—যেমন থাকে সব দেশের প্রত্যেকটি বিমানে,—হাতলের মুখে অ্যাশ-ট্রে, সিগারেট খাবার সুবিধা। এ ছাড়া একটি করে কাগজের গেলাস, একটি প্লাসটিকের চামচ, একখানা হাতমোছা কাগজ। খেয়ে দেয়ে সীটটার কল টিপে রেক্লাইন করো, আরামে ঘুমোবে। প্রতি আধঘণ্টা অন্তর কনডাকটর সাহেব এসে প্রশ্ন করে যাচ্ছে, কোনও অসুবিধা হচ্ছে কিনা, ছোট একটা বালিশ বা কম্বল চাই কিনা, পছন্দসই খাবার পেয়েছেন কিনা ইত্যাদি।

এত অভ্যর্থনার কারণ আমি জানতুম। 'অ্যামট্র্যাক' ট্রেনে প্যাসেঞ্জার জোটে না। তিন চারশ' মাইল পথ লোকে নিজের মোটরেই চলে যায়। সুতরাং 'অ্যামট্র্যাক' প্রাইভেট কোম্পানি মার খাচ্ছে বইকি। আমার কম্পার্টমেণ্টে অন্তত ৪০টা সীট রয়েছে, কিন্তু যাচ্ছে মাত্র ৯ জন। এদেশে যাত্রীগাড়ি অপেক্ষা মালগাড়ির চলন বেশি।

নিগ্রো বা 'কালো'রা কেন সমাজবিরোধী, গুণ্ডা বা দুষ্কৃতকারী হয়ে ওঠে, কেন তারা চুরি ডাকাতি ছিনতাই, ছিঁচকে চোর বা খুনীতে পরিণত হতে থাকে, তার প্রমাণ রয়েছে রেল লাইনের আশেপাশে। ওরা এদিকটায় বস্তিবাসী। ভাঙ্গা বাড়ি, ছাদ দিয়ে জল পড়ে, স্তূপাকার জঞ্জাল এখানে ওখানে, ছেলেমেয়েরা ছুটোছুটি করছে নোংরার মধ্যে, এদিকে পচা ডোবা, ওদিকে পুরনো ঘর থেকে ছেঁড়া পর্দা ঝুলছে এবং চারিদিকের ময়লা মেয়েপুরুষ গলিঘুঁজির মধ্যে কিলবিল করছে। এইসব দেখতে দেখতে যাচ্ছিলুম। ট্রেন চলছে দ্রুতগতিতে।

কালোরাও কাজ করে শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে। কিন্তু সাধারণত ওদের ভাগে পড়ে

নিম্নশ্রেণীর কাজ। যেমন ধরো ঝাড়ুদার, ময়লাগাড়ির ড্রাইভার, স্টেশন বা বিমান-ঘাঁটির ঠেলাওয়ালা, অনেক স্থলে পোর্টার—যারা সেলাম ঠুকে বকশিস নেয়। বাস ড্রাইভার, পাহারাওয়ালা, হোটেল বয়, টিকিটবাবু, ছোট ছোট দোকানদার, মুচি বা নাপিত, ঘরবাড়ি তৈরির মজুর, রাস্তাকাটা ও ভূগর্ভ ড্রেন পরিষ্কারের শ্রমিক,—এদের অনেকাংশই 'কালো'। এরা যেসব পল্লীতে বাস করে তাদের ধারে কাছে শ্বেতাঙ্গরা থাকে না। শান্তিপ্রিয় শ্বেতাঙ্গরা এদেরকে সর্বদাই এড়িয়ে চলে। যেসব অঞ্চলে কালোরা বসবাস করে শ্বেতাঙ্গরা সেসব স্থলের বাড়িঘর বেচে অন্যত্র চলে যায়। বড় বড় আফিসে, বড় বড় শপিং সেণ্টারে—যেখানে নগদ টাকা-পয়সার লেন-দেন—সেখানে কালোরা বিশেষ কাজ পায় না। কিন্তু ওরা দুর্বল নয়। ওদের কায়িক শক্তি অপরিসীম। যখন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধে- যেমনটি দেখেছিলুম রাজধানী ওয়াশিংটনে—যেখানে শতকরা ৭৪ জন কালো—সেখানে ওরা ঘরবাড়ি জ্বালায়, বাড়ি ও দোকান লুট করে, হত্যা-হননে মেতে ওঠে, শ্বেতাঙ্গ নারীর উপরে বলাৎকার করে ইত্যাদি। ওয়াশিংটনের সেই সব পল্লী দেখে মনে হয়, আমেরিকান সভ্যতা অদ্যাবধি এই জাতীয় সমস্যার প্রতিকার করতে পারেনি। এই সমস্যার সমাধান করতে গিয়েছিলেন প্রেসিডেণ্ট কেনেডি—কিন্তু তাঁকে অতর্কিতে হত্যা করা হয়। তাঁর মৃত্যুর দু'বছর পরে নিগ্রোদের স্বপক্ষে 'সিভিল রাইটস' বিল পাস হয় বটে, কিন্তু উভয়পক্ষের মনোভাবের তেমন কিছু পরিবর্তন ঘটেনি। নিগ্রোদের জন্য সব স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি এখন খোলা, কিন্তু তবু ওয়াশিংটনের হাওয়ার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে নিগ্রোদের সংখ্যাই প্রায় সব। সেখানে এক বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ অধ্যাপককে নিগ্রো ছাত্রছাত্রীরা খুবই সম্মান করে চলে। আমি নিগ্রোদের মধ্যে বহু ভদ্র নরনারীর সঙ্গে কথাবার্তা বলে আনন্দ পেয়েছি।

'অ্যামট্র্যাকের' রেলপথের স্টেশনগুলি যথেষ্ট উন্নত নয়। খোলা প্লাটফর্ম, বরফ এবং বৃষ্টিতে মাথাগোঁজার ঠাঁই কম, গাড়ি থেকে প্লাটফর্মে নামতে গেলে একখানা টুল এগিয়ে দেন কনডাকটর এবং বিদায় নেবার আগে তিনি অনুরোধ জানান, আবার এই গাড়িতেই আসবেন। তিনি সকলেরই হাত ধরে সাবধানে নামিয়ে দেন। আমাদের কামরার হোটেল-কীপার ছিলেন এক অতি ভদ্র নিগ্রো যুবক। তিনি আমার মুখের দিকে চেয়ে এক গেলাস কফির দাম পঁচিশ সেণ্টের বদলে কুড়ি সেণ্ট নিলেন। যাঁরা বিদেশী পর্যটক, তাঁরা ট্রেনে, বাসে এবং কোন কোনও ক্ষেত্রে বিমানযাত্রায় কিছু কিছু আর্থিক কনসেশন পেয়ে থাকেন। কিন্তু সেই কনসেশন আমি পাইনি, কারণ আমি দীর্ঘতর কালের 'ভিজিটর'।

যে অন্ধকার স্টেশনটিতে টুল পেতে নামলুম তার নাম 'অ্যান আরবর'। এটি ডেট্রয়েট স্টেশন থেকে ৪০ মাইল দূরে একটি গ্রাম্য শহর। কিছুক্ষণ আগে এদিকে বৃষ্টি হয়ে গেছে। যিনি আমাকে এই অন্ধকারে ঠিক দরজাটির কাছ থেকে লুফে নিলেন তিনি অধ্যাপক প্রাণতোষ নাগ। এখান থেকে উল্টো দিকে মাইল তিরিশেক দূরে 'নর্থভিল' নামক এক গ্রামে তাঁর নিজস্ব বাড়ি। সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় প্রত্যেকটি স্টেটে বাঙ্গালীর সম্পত্তি প্রচুর সংখ্যক এবং প্রায় সকলেই যথেষ্ট সাচ্ছল্যের মধ্যে বাস করেন। তাঁরা ৩০।৩৫ হাজার ডলার থেকে আরম্ভ করে ৭০।৮০।১ লক্ষ ডলার মূল্যে এক একটি বাড়ি কেনেন বা তৈরি করান দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ পরিশোধের চুক্তিতে। প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী চিকিৎসকরা ১ লক্ষ ডলারেরও বেশি বছরে উপার্জন

করে থাকেন। এঁরা অনেকেই দেশে ডলার পাঠান এবং ভারত গভর্নমেণ্ট সেই ডলারগুলি অনায়াসে পেয়ে যান।

প্রাণতোষ আমার অপরিচিত ছিলেন, কিন্তু তাঁর তরুণী স্ত্রী শ্রীমতী মীনাক্ষীর সঙ্গে কলকাতায় আমার পরিচয় ঘটে। মীনাক্ষী এখন কলকাতায় তার শিশুকন্যাকে নিয়ে রয়েছে। প্রাণতোষ আমাকে গাড়িতে তুলে সোৎসাহে প্রথমেই তাঁর পায়ে-হেঁটে কলকাতা থেকে বোম্বাই যাত্রার গল্পটি বলতে লাগলেন। রামকৃষ্ণ মিশনের শ্রীলোকেশ্বরানন্দজী ওরফে কানাই মহারাজ তাঁর বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র এবং এই কর্মবীর সন্ন্যাসীর প্রতি প্রাণতোষ অপরিসীম ভক্তি ও ভালোবাসা পোষণ করেন। তিনি যখন শুনলেন কানাই মহারাজ আমারও সুপরিচিত, তখন আমি তাঁর নিকটাত্মীয় হয়ে উঠলুম। প্রাণতোষের মতো এমন শুদ্ধচিত্ত ও সংযতস্বভাব ব্যক্তি এদেশের বাঙালী সমাজে কমই দেখেছি।

মেঘ কেটে গিয়ে কোমল জ্যোৎস্নায় দু-দিকের বনময় প্রান্তর স্বপ্নলোকের মতো মনে হচ্ছিল। নর্থভিল গ্রামের বাড়িতে যখন এসে পৌঁছলুম তখন আমার ঘড়িতে প্রায় ১১টা, কিন্তু প্রাণতোষের ঘড়িতে ১০টা বাজে। আমেরিকার টাইম সর্বত্র সমান নয়। দক্ষিণে পশ্চিমে মধ্যদেশে পূর্বে—বিভিন্ন টাইম। ওদের 'ডে-লাইট সেভিং পরিকল্পনা চালু থাকার জন্য প্রভাতে যেতে হয় কর্মস্থলে—ব্রেকফাস্টের আগেই—এবং ছুটি হয়ে যায় চারটে বা সাড়ে চারটেয়। ওদের কোনও কর্মস্থলে কাজের ফাঁকে-ফাঁকে বিশ্রাম, বিশ্রম্ভালাপ, আড্ডা, খোসগল্প, পরচর্চা, রাজনীতিক কণ্ডূয়ন, গভর্নমেণ্টের সমালোচনা, লেবার ইউনিয়নের কচকচি প্রভৃতি তিলমাত্র নেই। আমাদের দেশের তিনজনের কাজ ওরা একজনে করে। সম্পূর্ণ আট ঘণ্টা কাজ করেও ওদের একজনের কাজ ফুরোয় না। বিনা নোটিসে পাঁচ বছরের চাকরিও ওদের একদিনে চলে যায়। আমেরিকায় কোনও চাকরির কোনও নিরাপত্তা নেই। তোমার যোগ্যতা, মনোযোগ, ক্লান্তিহীন কর্মব্যস্ততা, অমানুষিক পরিশ্রম—এরাই হল তোমার আসল পরিচয়পত্র। আফিসের যিনি 'বস্', তিনি প্রতি কর্মীর কাজের হিসাব জানেন। পর পর তিন দিন আফিসে আসতে ৪।৫ মিনিট দেরি হলে বিনা নোটিসে চাকরি খতম হয়। কিন্তু ওরা ওটাকে বলে, অমুক ব্যক্তি 'রিজাইন' করেছেন! কোনও কর্মী যদি অসাধুতা, জালিয়াতি, ঔদ্ধত্য, অবাধ্যতা ইত্যাদির পরিচয় দেয়, তবে ভাল সার্টিফিকেটের অভাবে অন্য কোনও আফিসে তার ঠাঁই হয় না। এদেশের সাধারণ আফিসে ঢুকতে গেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও ডিগ্রির দরকার হয় না। আফিসের কেরানির যোগ্যতাই হল তার কাজের মাপকাঠি।

প্রাণতোষের বাড়িতে অপর একটি মধুর প্রকৃতির দম্পতিকে পাওয়া গেল। ছেলেটি ইঞ্জিনিয়ার শ্রীমান সত্যেন বসু ও তার উচ্চশিক্ষিতা স্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা। ইন্দিরা সোৎসাহ হাসিমুখে আমার জন্য সর্বপ্রকার বিধিব্যবস্থা নিজের হাতে তুলে নিল। ওদের সকলের অমায়িক সৌজন্য ও মিষ্ট ব্যবহারে আমার ৩।৪টি দিন কোথা দিয়ে কাটল বুঝিনি।

কিন্তু ওরই মধ্যে প্রচুর ভ্রমণ করলুম ডেট্রয়েট অঞ্চলে। এটি শিল্পনগরী, পৃথিবী-প্রসিদ্ধ ফোর্ড কোম্পানির মোটর কারখানা এখানে। হাজারে হাজারে লাখে-লাখে মোটর মেকানিক, ইলেকট্রিকাল ও মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ার এখানে। এটি

মিস্ত্রিদের দেশ। এখানে চুরি ডাকাতি 'মাগিং' খুন—এসব লেগেই আছে। প্রচুর কালোদের বাস এখানে, প্রচুর সংখ্যক বস্তি—শহরের বহু অঞ্চল নোংরা এবং জঞ্জাল সরাবার চেষ্টা কম। এমন বহু পাড়া-পল্লী রয়েছে যাদের তুলনায় আমাদের 'গন্ধা শহর' কলকাতাও ভাল।

ডেট্রয়েটের বিশাল ডাউন টাউনের ধারেই ডেট্রয়েট নদী। নদীর উপরে 'অ্যামবাসাডর' নামক সুদীর্ঘ পুল। পুলের ওপারে কানাডার মস্ত শহর 'উইন্ডসর'। এইবার নিয়ে তিনবার কানাডায় ঢুকলুম। পাসপোর্টে তিনবার কানাডার ছাপ পড়ল। উইন্ডসরে যেখানে বছরে হয়ত ৪।৫টি খুনখারাপি হয়, ডেট্রয়েটে সেক্ষেত্রে সাত আটশ'। উইন্ডসরে এসে ঢুকবামাত্র পরিবেশের বদল ঘটে। শান্ত ভদ্র জনতা, সুসজ্জিত দোকান বাজার, দূর-দূরান্তর পর্যন্ত প্রাকৃতিক শোভা, চমৎকার শোভনসজ্জা চতুর্দিকে। যেমন কানাডার টরন্টো, অটোয়া, মন্ট্রিয়াল, কুইবেক প্রভৃতি অঞ্চলে দেখেছি, এই উইন্ডসরেও তেমনি যুক্তরাষ্ট্রের শিল্পপতি ও ধনপতিরা এখানকার অর্থনীতি ও শিল্পবাণিজ্যের উপরে প্রভুত্ব করে। কিন্তু উভয় দেশের নাম পৃথক হলে কি হবে? জাতি বর্ণ গোষ্ঠী শিক্ষা ভাষা ও জীবনযাত্রার ধরন যা তুমি দেখবে যুক্তরাষ্ট্রে, তাই দেখবে কানাডায়। এরা সহোদর। কানাডার পররাষ্ট্র নীতি যুক্তরাষ্ট্রের মুখাপেক্ষী। এ নিয়ে আমি আগেই আলোচনা করেছি।

মাইল পঁয়ত্রিশ দূরে অপর একটি গ্রামীণ শহরে প্রভাসচন্দ্র ভট্টাচার্য ও তাঁর কাশ্মীরী স্ত্রী শ্রীমতী কৃষ্ণি দেবী একটি বন্ধু-সম্মেলনের আয়োজন করেছিলেন। সেখানে জন তিরিশেক বাঙ্গালী মহিলা ও পুরুষের কাছে আমার আমেরিকার অভিজ্ঞতা ও আমার সাহিত্যজীবনের বর্ণনা করতে হয়েছিল। সেদিন গল্পের আসর থেকে ছাড়া পেলুম রাত দেড়টায়। পরদিন আর একটি ভোজসভার আয়োজন করেছিলেন ডক্টর চিত্ত দত্ত ও তাঁর স্ত্রী তাঁদের বাড়িতে—সেও প্রায় চল্লিশ মাইল দূরে। পঞ্চাশ ষাট সত্তর মাইল পথ—দূরত্ব হিসাবে এদেশে এমন কিছুই নয়। টেলিফোন ও মোটর—এ দুটি বস্তু আমেরিকার প্রাত্যহিক জীবনের সর্বপ্রধান অঙ্গ। হাজার-হাজার মাইল দূরের মানুষের সঙ্গে যে কোনও সময়ে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে কথা বলা চলে।

নর্থভিল গ্রামের ইউনিভারসিটি ও হাসপাতাল—এ দুটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠান। কিন্তু এইখানেই এক ধনপতি মিঃ স্কুলক্র্যাফট-এর নামাঙ্কিত যে কলেজটি প্রতিষ্ঠা করা হয়, তারই অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক হলেন প্রাণতোষ নাগ। তিনি এই বিভাগের প্রশাসনিক কাজকর্মের সঙ্গেও যুক্ত। এই প্রথম একজন বাঙালীকে দেখলুম যিনি আমেরিকার দুটি বড় শপিং সেন্টারে তাঁর দুটি বড় দোকান খুলেছেন। সজ্জন এবং সাধুব্যক্তির পক্ষে আমেরিকায় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা যায় কি না, এ প্রশ্ন প্রাণতোষকে করিনি, কিন্তু তাঁর উদ্দীপনা ও অধ্যবসায় লক্ষ্য করে আমি বাঙ্গালী হিসাবে গর্ববোধ করেছিলুম। যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার বহু শহরে এক শ্রেণীর ভারতীয় গুজরাটীদের বহু ব্যবসায় ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান রয়েছে। কিন্তু তাঁদের যথেষ্ট সুনাম নেই। তাঁদের অনেকে এদেশের বহু ভারতীয়ের কাছ থেকে ডলার নেন এবং তার বিনিময়ে অনেক বেশি হারে ভারতীয় টাকা লেন-দেন করেন - এই ধরনের কথা শোনা যায়। ডেট্রয়েটে, শিকাগো, নিউ ইয়র্ক, রোড আইল্যান্ড,

লস এঞ্জেলেস, সানফ্রান্সিসকো, ভ্যানকুভার, টরন্টো ইত্যাদি নগরে ভ্রমণকালে বহু গুজরাটি ভাটিয়ার ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান দেখেছি। বহু বাঙ্গালীর ধারণা, এঁদের অনেকে ভারতীয় মসলাপাতি ও খাদ্যসামগ্রীতে অনেক সময় ভেজাল মিশিয়ে দেন। উগাণ্ডা থেকে এশিয়ান বলে যাঁরা বিতাড়িত হয়েছেন তাঁরা অধিকাংশই গুজরাটি— তাঁদের মস্ত এক দল এসেছেন আমেরিকায়।

প্রাণতোষ আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন এক বনময় গ্রামে। সেই গহন গ্রামটির নাম হল 'ডিক্সবোরো'। সেই বনমধ্যে নিজের বাগানবাড়িতে যে অশীতিপর বৃদ্ধ তাঁর আমেরিকান স্ত্রীকে নিয়ে বাস করেন তাঁর নাম শ্রীযুক্ত বসুকুমার বাগচী। তিনি নদীয়া জেলার শান্তিপুরে কাশ্যপ পাড়ার বাগচী পরিবারের লোক। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে স্বামী যোগানন্দর সঙ্গে এদেশে চলে আসেন এবং তিনিও সন্ন্যাস নেন। তাঁর নামকরণ করা হয় স্বামী ধীরানন্দ। এঁরা উভয়েই ছিলেন পরস্পরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। কিন্তু কালক্রমে আদর্শবাদী ধীরানন্দ লক্ষ্য করতে থাকেন, যোগানন্দর প্রকৃতি-গত দুর্বলতা। অন্যান্য ব্যাপারেও তিনি ক্ষুণ্ণ ও ক্ষুব্ধ হতে থাকেন। সুতরাং এক সময়ে উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে এবং বাগচী মহাশয় 'স্বামী ধীরানন্দ' নামটি প্রত্যাহার করেন।

কিন্তু শ্রীযুক্ত বাগচীর পরিচয় অন্যরূপ। তিনি একজন বড় দার্শনিক এবং ভারতীয় অধ্যাত্মতত্ত্বের একজন বিশিষ্ট ভাষ্যকার। এ ছাড়া মানুষের মন, মস্তিষ্ক এবং শারীরতত্ত্বের সঙ্গে যে বৈদ্যুতিক সংযোগ রয়েছে এবং তাদের ক্রিয়া-প্রক্রিয়া যে বিদ্যুৎ সঞ্চালনের সঙ্গে প্রতিনিয়ত নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে ('ইলেকট্রোড') তার প্রথম ব্যাখ্যা ও ভাষ্য তিনি আমেরিকার কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রকাশ করতে সমর্থ হন। (Consciousness, its aberations, and the electrical rhythm of the brain) এ ব্যাপারটিতে তিনিই প্রথম পথিকৃৎ হিসাবে এদেশের বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্মান পদবী লাভ করেন এবং একাধিক গবেষণাগারে তাঁর এই মস্তিষ্ক বিজ্ঞান ও তার বৈদ্যুতিক প্রবাহ নিয়ে অনেক প্রামাণ্য সত্য উদ্ঘাটিত হয়। মিসিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের নিউরোসাইকিয়াট্রিক ইনসটিটিউট ইলেকট্রোয়েনসেফালোগ্রাফি বিভাগের (Section of Electroencephalography) প্রধান অধিনায়ক হিসাবে তিনি অধ্যাপনা করেন। বলা বাহুল্য, এই বৃদ্ধ দার্শনিক মস্তিষ্কপ্রবাহ বিজ্ঞানে পাশ্চাত্ত্য জগতে এক নতুন দিগন্তের দ্বার খুলে দেন। এই মিষ্ট প্রকৃতি ও শান্তস্বভাবের মানুষটি আমার মতো সামান্য ব্যক্তিকে আগে থেকে চিনতেন এবং তাঁর 'অভ্যাসবহির্ভূত' একটি ভোজের আসরে আমার সঙ্গে কয়েক ঘণ্টা অতিবাহিত করেন। তাঁর স্ত্রী শ্রীযুক্তা ইভা গ্ল্যাডিস ভারতীয় নামে পরিচিত। তাঁর নাম তারা। ভোজের আয়োজন করেছিলেন রবীন্দ্র সঙ্গীতের এক বিশিষ্ট গায়িকা ও ইংরেজী সাহিত্যের তরুণী অধ্যাপিকা শ্রীমতী সুমিতা চৌধুরী ও তাঁর পাঞ্জাবী সঙ্গীতরসিক স্বামী—যাঁর নামটি এখন মনে পড়ছে না। মিঃ চৌধুরী একজন প্রথম শ্রেণীর চিত্রশিল্পী হিসাবেও এদেশে পরিচিত। শ্রীমতী সুমিতা রবীন্দ্রনাথের উপর থেসিস লিখে পি-এইচ-ডি করেছেন। পি-এইচ-ডি ছাড়া আমেরিকায় দাঁড়াবার উপায় নেই।

প্রাণতোষ একদিন সকালে বৃষ্টির মধ্যে আমাকে নিয়ে চললেন তাঁর কলেজে। সেখানে একটি মস্ত হলে প্রায় একশজন আমেরিকান ছাত্রছাত্রী জড়ো হয়েছিলেন

আমার মুখ থেকে হিমালয় ও গঙ্গার মাহাত্ম্য বর্ণনা শোনার জন্য। ৫০ মিনিটকাল ধরে আমার ভাষণ ছিল এবং ১০ মিনিট ধরে দু-একটি প্রশ্নের জবাব দিতে হয়েছিল। দুটি ছাত্র ও ছাত্রী পৃথকভাবে অন্য ঘরে গিয়ে আমার সঙ্গে বহুক্ষণ আলাপচারী করেছিল।

ওই কলেজটি চারিদিকের বিশাল প্রান্তরের মধ্যে একটি ছোটখাটো নগরের মতো। তার ভিন্ন ভিন্ন ফ্যাকালটির জন্য ভিন্ন ভিন্ন অট্টালিকা। ছাত্র ও অধ্যাপক মিলিয়ে প্রতিদিন ৪।৫ হাজার মোটরগাড়ি এসে দাঁড়ায়। মোটর ড্রাইভিং জানে না এমন কোনও ছাত্রছাত্রী আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজে নেই। ওটা আমেরিকা-বাসীর প্রাথমিক শিক্ষারই অঙ্গ। ছাত্রছাত্রী নিজের উপার্জনেই মোটর কেনে।

আমার সময় সংক্ষিপ্ত। চারিদিকের প্রাকৃত সম্পদের এই শোভা, এই মনোমোহিনী রূপকে ছেড়ে যাবার সময় আসন্ন। আমেরিকা ভ্রমণের সর্বশ্রেষ্ঠ ঋতুকাল আমি দেখে যাচ্ছি। প্রচণ্ড সূর্যাতপ, প্রবল বর্ষা, মধুর বসন্ত এবং তুষারলোকের কঠিন ঠাণ্ডার ভিতর দিয়ে চলে এসেছি। দেখে যাচ্ছি মানুষের তৈরি বিস্ময়কর ডিমোক্রাসী, ২৩ কোটি মানুষের অবাধ ও অন্তহীন স্বাধীনতা, দেখে যাচ্ছি মহাদেশব্যাপী প্রতি মানুষের প্রত্যহের কর্মযজ্ঞ—যারা প্রতিদিন নতুন থেকে নতুনের উদ্ভাবন নিয়ে থাকে। কোথাও যাদের শৃঙ্খলা নেই, তারাই এনেছে মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ শৃঙ্খলা। আবার অন্যদিকে দেখে যাচ্ছি জাতীয়তাবাদী ও দেশব্রতী ধনকুবের ও শিল্পপতির দলকে—যারা দেশ ও জাতির সম্পদকে শত-সহস্র গুণ বাড়িয়ে তুলে নির্বিরোধ জনসাধারণকে সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য ও সাচ্ছল্যের মধ্যে আনন্দে রেখেছে। এ দেশেই দেখে যাচ্ছি কার্নেগি ও মেলনের অবিনশ্বর কীর্তি, ফোর্ড-ফুলব্রাইট ও রকেফেলারের বিশ্বজয়ী অবদান—যাঁরা পৃথিবীর সকল দেশ ও মহাদেশের জ্ঞানপিপাসুদেরকে ডাক দিয়ে গেছেন এ দেশের কর্মময় জীবন থেকে বিদ্যা ও জ্ঞান আহরণের জন্য। আর একদিকে দেখে যাচ্ছি এই ক্যাপিট্যালিস্ট সমাজের যারা শীর্ষস্থানীয় তারা মিলিয়ন, বিলিয়ন ও ট্রিলিয়ন পরিমাণ ডলার খরচ করে সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর হবার চেষ্টা পায়। এরা ডলার দিয়ে পৃথিবীর সকল দেশের বিবেক ও মনুষ্যত্বকে কিনতে চায়, ভিয়েৎনামের মতো নিরীহ ক্ষুদ্র দেশে ২১ বছর ধরে যুদ্ধ জাগিয়ে রেখে নিজের দেশের শিল্পোৎপাদনকে সমৃদ্ধ করতে কুণ্ঠিত হয় না। পৃথিবীর নিঃশব্দ ধিক্কারকেও এরা গ্রাহ্য করে না। জানে, খাদ্যের প্রয়োজনে, ক্যাপিটাল গুডস-এর প্রলোভনে, অস্ত্রসম্ভার সংগ্রহণে—ওই ধিক্কারবাদীরাই গোপন পথ ধরে ওদের দরজায় ঠিকই হানা দেবে। এই জাতির যারা চাটুকার এবং যাদের সংখ্যা কম নয়—তারা এদের কুকীর্তির সমালোচনা করে না বলেই রাতারাতি তাদের অবস্থা ফিরিয়ে নেয়! নিরাসক্ত, নির্লিপ্ত ও নিরভিমান মন নিয়েই আমি এদেরকে দেখে-দেখে যাচ্ছি। আমার দেখা এবারের মতো শেষ হতে চলেছে। নিউ ইয়র্কের দিকে আবার আমি এগিয়ে চলেছি।

বিমানযোগে একদিন ডেটন শহরে এসে নামলুম। এই শতাব্দীতে ডেটন হল আমেরিকার প্রথম বিমানঘাঁটি। ওখানে দাঁড়িয়েছিলেন এলাহাবাদের তরুণ হাস্য-মুখ ইঞ্জিনিয়ার শ্রীমান সমর চট্টোপাধ্যায়—যিনি প্রায় তিন মাস আগে আমাকে

টেলিফোনযোগে 'বুক' করে রেখেছিলেন। এবার সমাদরের সঙ্গে উনি আমাকে গাড়িতে তুলে নিলেন। এটি ওহাইয়ো স্টেট এবং একদা নায়াগারা জলপ্রপাত দেখতে যাবার আগে এই ওহাইয়ো স্টেটেরই উত্তরভাগে ক্লীভল্যাণ্ড শহরে বিমানযোগে এসে নেমেছিলুম এক মধ্যরাত্রে। তখন সমস্ত দেশই ছিল আমার কাছে অজানা, এখন সমগ্র যুক্তরাষ্ট্র আমার একপ্রকার জানা জগৎ হয়ে উঠেছে। শ্রীমান সমর আমাকে কলাম্বাস শহরে নিয়ে যাচ্ছিলেন —এখান থেকে ৭০ মাইল দূরে তাঁর নিজের বাড়িতে। তিনি উচ্চশিক্ষিত ও সুরুচিসম্পন্ন যুবক। সমর এদেশের রাজনীতির গল্প নিয়ে কৌতুক হাস্যে মুখর হয়ে উঠেছিলেন।

এদেশের রাজনীতি বহুলাংশে ডলারের খেলায় নিয়ন্ত্রিত হয়। কে কাকে দাবিয়ে রাখবে, কে কার সাহায্যে কোন্ ব্যক্তিকে 'ফায়ার' করবে, কোন্ ধনপতি কংগ্রেসম্যানকে ভোটে হারাবার জন্য কি কি উপায়ে 'লবিয়িং' করার কৌশলজাল বিস্তার করা হবে— তারই নানা বিচিত্র কাহিনী শুনতে শুনতে যাচ্ছিলুম। আদর্শবাদী 'গরীব' দেশকর্মীর পক্ষে এদেশে নির্বাচন জয় করা সম্ভব নয়। সেই কারণে এই দেশের নির্বাচন রণরঙ্গে যারা মেতে ওঠে তারা বহু-বহু মিলিয়ন ডলারের খেলা দেখায় অভ্যস্ত। যুক্তরাষ্ট্রের সেনেট বা কংগ্রেস-এর একটা অংশ ক্যাপিটালিস্টদের দোসর হিসাবে কাজ করে। এখানকার বহু ধনকুবের হলেন 'চাষী'। হাজার হাজার একর জমি শত শত ফলের বাগান, বড় বড় কারখানা, বহু সংখ্যক শপিং সেণ্টার—এসব তাঁদের নিজের। বহু ব্যক্তির নিজস্ব দু-চারখানা বিমান, কয়েকখানা জাহাজ, বিভিন্ন প্রকার শিল্প উৎপাদনের কেন্দ্র —এগুলি যেখানে সেখানে চোখে পড়ে। একজন অপরকে ব্ল্যাকমেইল করবার সুবিধা পেলে ছাড়ে না। একজনের কলঙ্ক অন্যজন অতি যত্নে রেকর্ড করে রাখে ঠিক সুযোগটির অপেক্ষায়। যথাসময়ে সেটি প্রকাশ করে প্রতিপক্ষ বা প্রতিযোগীকে 'ফায়ার' করে দেয়। সংবাদপত্ররা এখন আমেরিকার প্রেসিডেণ্টেরও তোয়াক্কা রাখে না।

কলাম্বাসের শহরতলীতে সমরের নিজস্ব বাড়ি। দরজার সামনে নামতেই তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী মায়া এগিয়ে এসে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। বাড়িটি চমৎকার, কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর পক্ষে অফিস যাবার সুবিধার জন্য ওঁরা এ বাড়িটি ছেড়ে বছর দেড়েকের জন্য ডেটন অঞ্চলে ভাড়া বাড়িতে যাচ্ছেন। শ্রীমান সমর পূর্বাহ্নে একটি বন্ধুসম্মেলনের ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন, সেজন্য আধ ঘণ্টার মধ্যেই ওঁরা দুজনে আমাকে নিয়ে কয়েক মাইল দূরে ডঃ সঞ্জীব ঘোষ মহাশয়ের বাড়িতে গিয়ে তুললেন। আমি একটু হকচকিয়ে গিয়েছিলুম।

ওটা ছিল শুক্রবার সন্ধ্যা। আমেরিকার কর্মজীবনে এটি সপ্তাহান্তিক অবসর যাপনের প্রথম দিন। শনি ও রবিবার সারাদিন ছুটি। সুতরাং শুক্রবারের নিশ্চিন্ত সন্ধ্যায় রসালাপের অবকাশটি সকলের পক্ষেই মধুর। ফলে দূর-দূরান্তর থেকে বাঙালী মহিলা ও ভদ্রলোকরা একপ্রকার দল বেঁধে এসে ডঃ ঘোষ ও শ্রীমতী তপতী ওরফে ডলীর বাড়িটি ভরে তুলেছিলেন। আমি হয়ে উঠলুম প্রদর্শনীর এক বিচিত্র দর্শনীয় বস্তু। অনেকে বললেন, আপনাকে স্বচক্ষে দেখব কল্পনাও করিনি।

এর পরই কথা উঠল, আমেরিকা কেমন দেখলেন? ভ্রমণকাহিনী লিখবেন কি না। বাঙলা সাহিত্য এখন কোন্ ধারায় চলছে। নতুন লেখকদের মধ্যে কারা

আপনার প্রিয়। সাহিত্যের আদর্শপথে নতুন ভাবনা কিছু দেখা যাচ্ছে কি না। কলকাতার অবস্থা এখন কিরূপ। ভারতীয় মেয়েরা ইদানীং কিভাবে এগোচ্ছে। শিল্প ও চিত্রকলার নতুন খবর কি। ভারতবর্ষের সর্বশেষ সংবাদ এখন কেমন—ইত্যাদি ইত্যাদি। ওঁরা যেন সবাই আমার মধ্য দিয়ে কিছুক্ষণের জন্য ভারতের ছবি দেখতে পাচ্ছিলেন। ওঁদের প্রবাসী মন স্বদেশের জন্য আকুল হয়ে উঠেছিল। আপন দেশের জন্য ওঁদের ওই বিরহকাতর মন ঘণ্টা চারেকের জন্য আমাকে অভিভূত করেছিল। এখানে বসে আরেকবার আমার মনে হচ্ছিল, ওঁদের অনেকে সুযোগ পেলে এবং উপযুক্ত অন্নসংস্থানের ক্ষেত্র প্রস্তুত থাকলে—অনেকেই এখানকার সর্বপ্রকার সাচ্ছল্য ও বিলাসব্যবস্থা ছেড়ে দেশে ফিরে যেতে চান। ওঁদের মন উপবাসী এবং ওঁদের হৃদয়ের অনেকটা অংশ স্বদেশের সঙ্গে সর্বক্ষণ জড়িয়ে থাকে।

পরদিন ডঃ ঘোষ ও শ্রীমতী ডলী আমাকে নিয়ে বহুদূর পথভ্রমণে বেরোলেন। কলাম্বাসের সমৃদ্ধি, তার বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণাগারের কয়েকটি অট্টালিকা, তার বনময় প্রান্তর, তার পার্বত্য উপত্যকা, এবং নগরের বিভিন্ন ঐশ্বর্য, পথ-ঘাট-সাঁকো প্রভৃতি দেখতে দেখতে গিয়ে পৌঁছলুম এক অরণ্যময় পাহাড়তলীতে—যেটাকে সহজেই বনময় বটানিক্যাল গার্ডেনস বলা চলে। এটির নাম 'দয়েস আরবোরেটাম'। এখানে জনৈক জাপানি একটি পুষ্পশোভা সমাকীর্ণ হ্রদ নির্মাণ করে তার উপরে হাঁসের দলকে ছেড়ে রেখেছেন। এই বাগানে নানা গাছের মধ্যে একটি ফলের নাম 'বাক-আই' অর্থাৎ হরিণ-চোখ। এই গাছের সংখ্যা এই স্টেটে এত বেশি যে, অনেকে ওহাইয়ো স্টেটকে 'বাক-আই' স্টেট বলে থাকে। এর ফলের চেহারা অনেকটা গিলা বিচির মতো, এবং এটি ভক্ষ্য নয়।

ডঃ ঘোষ এদেশে একজন বিশিষ্ট সার্ভেয়ার। তিনি বিমানের উপর থেকে বিভিন্ন অঞ্চলের ছবি তুলে সেগুলি নিয়ে গবেষণাগারে কাজ করেন। এমন হতে পারে তিনি অদূর ভবিষ্যতে সার্ভেয়ার জেনারেল অফ ইণ্ডিয়ার পদ গ্রহণ করে ভারতে ফিরে যেতে পারেন। এ বিষয়ে তাঁর পাণ্ডিত্য ভারতে সুখ্যাত।

কলাম্বাস ছাড়ার আগের দিন আরও দুজন তরুণ ইঞ্জিনিয়ারের আতিথ্য নিয়েছিলুম। তাঁরা হলেন শ্রীমান শান্তনু দাশ ও সুজন দাশগুপ্ত। এমন পরিহাস-রসিক ও ভদ্রস্বভাবের দুটি যুবকের সান্নিধ্যলাভ করে একটি দিন বড় আনন্দে কেটেছিল।

কলাম্বাস থেকে পিট্সবার্গ ২৪০ মাইল। আবার অনেকদিন পরে 'গ্রে হাউণ্ড' বাসে উঠলুম এবং আবার সেই ঘণ্টায় ৫৫ মাইল দৌড়। বেলা ১২টা বাজে। আকাশে ঘন বর্ষার কালো মেঘ ঘনিয়ে এসেছে। ৪।৫ ঘণ্টার পথ। হাইওয়ে ধরে বাস ছুটছিল। প্রায় সাড়ে তিন মাস আগে এই পেন্সিলভানিয়া ত্যাগ করে দক্ষিণপথে চলে গিয়েছিলুম, সমস্ত মহাদেশ পরিক্রমা করে আবার উত্তরভাগ দিয়ে প্রবেশ করছি সেই স্টেটে। দুই ধারের সুদূর প্রান্তর এবারে শরৎকালে ধারণ করেছে পীত রক্তিমবর্ণ, সবুজের শোভা তার সঙ্গে মিলে বর্ণাঢ্য হয়ে উঠেছে। পৃথিবী সেই আদিম, কিন্তু এখন আর মনে হচ্ছে না এ হল বিদেশী আকাশ, অজানা দিগন্ত। দূর পার্বত্য অঞ্চলের অপার সৌন্দর্য দেখে এখন আর মনে হচ্ছে না হিমালয়ের সঙ্গে এর কোনও পার্থক্য আছে। সেই চিড় আর পাইন আর পপলারের বন, কাশ্মীরের সেই ওক আর ওয়ালনাট আর উইপিং উইলোর আরণ্যসমাবেশ। কিন্তু

চমক ভাঙেগ যখন দেখি পশ্চিম ভার্জিনিয়ার একাংশে 'হুইলিং' শহরে এসে দাঁড়িয়েছি। ভার্জিনিয়ার সেই 'আর্লিংটন' সমাধিক্ষেত্র—যেখানে কেনেডির দেহ শায়িত—সেটি আজও ভুলিনি। ওইভাবেই বনপ্রান্তর পেরিয়ে আর একটি শহর 'ওয়াশিংটনে' এসে গাড়ি দাঁড়াল। এটি রাজধানী ওয়াশিংটন ডি-সি নয়, এটি একটি অতি সুন্দর উপত্যকা নগরী, চতুর্দিকব্যাপী সম্পদ ও অট্টালিকার সমারোহ—যাদের দৃশ্য ক্রমশ আমার চোখে ক্লান্তি আনছে। এদেশে মানুষের জীবনযাত্রার সংগ্রাম যেন সর্বত্রই স্থির হয়ে গেছে। দারিদ্র্য বা অন্নাভাবের বিরুদ্ধে কোথাও কঠোর রণক্ষেত্র দেখতে পাচ্ছিনে। দেখতে পাচ্ছি সবটাই সাজানো গোছানো, কোথাও অশান্ত জনতার বিক্ষোভ চোখে পড়ছে না—এ যেন জনকৃতিত্বের সগৌরব পরিশেষ নিয়ে এখন সকলেই সুখী।

অবশেষে এল একে একে তিনটি নদী—মননগোহেলা, আলিঘেনি ও ওহাইয়ো নদী,—যাদের উপরে অসংখ্য সেতুর বেড়াজাল আর ফ্লাইওয়ের সমষ্টি, তারই সঙ্গে প্রবেশ করলুম এক সুদীর্ঘ ভূগর্ভ পথে—এক সময় যার মুখগহ্বর থেকে বেরিয়ে এক সুবিশাল পার্বত্য নগর পিটসবার্গে এসে পৌঁছলুম। এটি লৌহ ও ইস্পাত শহর। এই শহর আমি দিন দুই ধরে পরিক্রমা করে যাব।

'গ্রে হাউণ্ডের' মস্ত ডিপোয় গাড়ি এসে থামল। সামনেই ছিলেন ডঃ কৃষ্ণদাস ব্যানার্জি। তিনি হাসিমুখে এগিয়ে এসে আমাকে তাঁর গাড়িতে তুললেন। আমরা চললুম 'র‍্যাভেনক্রেস্ট' নামক এক পল্লীতে। র‍্যাভেনক্রেস্ট হল পিট্সবার্গের অন্যতম 'পশ' এলাকা। এখানে কৃষ্ণদাসের নিজস্ব সুন্দর বাগানবাড়ি। তিনি ও তাঁর স্ত্রী রমা একই হাসপাতালে কাজ করেন। সেই সুবৃহৎ হাসপাতালে কৃষ্ণদাস রেডিয়ো-বায়োলজির অধ্যাপক এবং তাঁর স্ত্রী ওই হাসপাতালেরই এক বিশেষ বিভাগের সেক্রেটারি। রমা উচ্চশিক্ষিতা এবং সুগায়িকা। ওঁরা এদেশে আছেন প্রায় পনেরো বছর। ঘরে একটিমাত্র শিশু-কন্যা। ওঁরা আমার সর্বপ্রকার স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন।

এই বৃহৎ পার্বত্য নগরীর সকল দিক খুঁটিয়ে দেখার অবকাশ আমার হয়নি, কিন্ত এর মনোরম আরণ্য সৌন্দর্যকে রাত্রির জ্যোৎস্না যেন মায়াকাননে পরিণত করেছিল। তৃতীয় দিন মধ্যাহ্নকালে আমি যখন আবার 'গ্রে হাউন্ড' বাস ধরলুম তখন নিবিড় কালো মেঘে আরেকবার বর্ষা ঘনিয়ে এসেছে। আমার সামনে তিনশ' মাইল পথ। আমি যাব ফিলাডেলফিয়ায়—আমেরিকার যে প্রাচীন রাজধানী বিগত জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে ছেড়ে গিয়েছিলুম। এই আনন্দদায়ক ভ্রমণটি ছিল বন-জঙ্গল, নদী, গ্রাম ও পাহাড়ের তলার অসংখ্য ভূগর্ভের ভিতর দিয়ে। প্রকৃতপক্ষে পেন্সিলভানিয়া স্টেটের প্রাকৃত রূপ কথায়-কথায় মনকে যেন মোহমদির করে তোলে। আমাদের নীলগিরি এখানে এসে নাম পেয়েছে ব্লু-মাউনটেন। আমাদের পার্বতী নদী সরযূ এখানে হয়ে উঠেছে 'সাস্‌কোহানা' এবং আমাদেরই হোসিয়ারপুরের সেই ইউক্যালিপটসের সারিপথ এখানে নাম নিয়েছে হ্যারিসবার্গ—আমি তারই গা ঘেঁষে যাচ্ছিলুম।

প্রবল বৃষ্টির মধ্য দিয়ে এসে নামলুম ফিলাডেলফিয়ার বাস ডিপোয়। সেই সন্ধ্যাকালের বৃষ্টির মধ্যে গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছিল অসময়ের দুই তরুণ বন্ধু—অশোক চক্রবর্তী আর স্বপন বসাক। এই দুই উচ্চশিক্ষিত যুবক আমাকে নিয়ে

চলল তাদের ওখানে। আড়াই মাস আগে ওদের দুজনের স্ত্রী শ্রীমতী সুজাতা ও রিতা ওরফে টুনার আতিথেয়তা আমার পক্ষে স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। আজও ওরা সেই আতিথেয়তার তিলমাত্র ত্রুটি রাখল না।

আকাশভাংগা বৃষ্টির মধ্যে ফিলাডেলফিয়ায় পৌঁছবার কালে কল্পনাও করিনি পেন্‌সিলভানিয়ার পাহাড় থেকে প্রবল বিক্রমে নামছে জলরাশি এবং সাস্‌কোহানা নদীর অগভীর তলদেশ দেখতে দেখতে ফুলে উঠছে তিরিশ ফুটের ওপর। এই স্টেটের রাজধানী হ্যারিসবার্গের চতুঃসীমানায় মাঠ ঘাট রাজপথ গ্রামকে-গ্রাম কল-কারখানা বড় বড় অসংখ্য বাগানবাড়ি, দোকান বাজার—সমস্ত ডুবিয়ে বৃহৎ বন্যা তার করাল গ্রাসে কয়েক ব্যক্তিকে তাদের গাড়িসুদ্ধ শোচনীয় মৃত্যুর মধ্যে টেনে নিয়ে গেল। কিন্তু সরকারী রিলিফ ছয় ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে গেলেও সর্বনাশের হাত থেকে কিছুই রক্ষা করা গেল না! সব ডুবলো!

এটি ভাগ্যের বিদ্রূপ। মাঝে মাঝে আমেরিকা জানুক বন্যা কাকে বলে, কাকে বলে অনাবৃষ্টি, প্রাকৃতের তাড়নায় মানুষের হাহাকার কি প্রকার চেহারা পায়--আমেরিকার জ্ঞানচক্ষুলাভের পক্ষে সেই অভিজ্ঞতা দরকার! বিধাতার অভিশাপ নামতে থাকলে ওদের মধ্যে দয়া করুণা মমতা ও সমবেদনার উদ্বোধন ঘটবে!

ওই বন্যা ও বৃষ্টির মধ্যেই আমি পরদিন অশোকের বাড়ি ছেড়ে মাইল পঁচিশেক দূরে পেন্‌সিল্‌ভানিয়া হাসপাতালের অধ্যাপক ডক্টর সুখময় ও শ্রীমতী কৃষ্ণা লাহিড়ীর নিজস্ব বাগানবাড়িতে এসে উঠেছিলুম। তখনও প্রবল ও মুষলধারে বৃষ্টি চলছিল।

॥ ১২ ॥

এর আগে লিখেছি যুক্তরাষ্ট্রে অনুন্নত অঞ্চল আছে প্রচুর। নিউইয়র্ক প্রমুখ পূর্ব দেশগুলির নাম সকলের মুখে-মুখে ঘোরে, বড়জোর ক্যালিফর্নিয়া স্টেটের নামটাও। কিন্তু পশ্চিম ও মধ্য পশ্চিমের দিকে চেয়ে দেখো,--শুধু অনুন্নত নয়, অনধ্যুষিত, অনুর্বরও বটে। এসব অঞ্চলে দেখা যায় বঞ্চিত প্রতারিত সর্বহারা আদিবাসী, নয়ত তারা পুরনো আমলের স্প্যানিশ বা মেক্সিকান, নয়ত পোর্টোরিকান, --নয়ত যারা জাতিবর্ণগোত্রবিহীন,—তারা খায় আধপেটা, মাটি দেখতে পেলে নিজের হাতে চাষ করে, রোগভোগে না আছে ওষুধ, না বা হাসপাতাল। তারাও আমেরিকান, কিন্তু জাতীয় অর্থনীতির মূলধারা (main-stream) থেকে সেই ক্ষুধাতুর রোগাতুর সমাজটি বিচ্ছিন্ন। এমন অনেক সম্প্রদায় রয়েছে চারিদিকে ছড়িয়ে, যারা রাজস্ব যোগাতে পারে না,--এবং সেই কারণেই তারা না পায় সরকারি আনুকূল্য, না পায় সমাজ কল্যাণ দপ্তরের সহায়তা। কিন্তু দেখা গেছে ওদের ওই 'পাণ্ডব বর্জিত' ভূভাগে ধনপতি গিয়ে জমি দখল করেছে এবং শিল্পপতিরা গিয়ে সেই জমিতে ব্যবসায় ফেঁদেছে। উদ্দেশ্য, দরিদ্র মানবগোষ্ঠিদেরকে সর্বপ্রকারে দোহন করা এবং নামমাত্র মজুরি দিয়ে তাদেরকে দিয়ে খাটিয়ে নেওয়া। পূর্ব দেশগুলিতে যেখানে নিম্নতম মজুরির হার প্রতি ঘণ্টায় সওয়া দুই ডলার, সেখানে তাদেরকে সকাল-সন্ধ্যা খাটিয়ে মাত্র দুই ডলার—যাতে একজনের পক্ষে দুবেলা পেটই ভরে না। ধনবান

আমেরিকা ও দরিদ্র আমেরিকা পরস্পর গায়ে-গায়ে লেগে রয়েছে। ওদেশে যে কোনও শ্বেতাঙ্গ সর্বপ্রকার সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী হয়। অধিকতরো যোগ্যতা-সম্পন্ন বাইরের লোককে ডিঙিয়ে (superseding) শ্বেতাঙ্গরাই বেশি সুবিধে পেয়ে যায়।

তবু বলব, এদেশের তুলনা পৃথিবীতে বোধহয় কোথাও নেই। নিজেদের দেশকে বড় করার জন্য পৃথিবীর সব দেশ থেকে এরা প্রতিভাকে খুঁজে এনেছে। এই ত' মাত্র সেদিন—আমি তখন শিকাগোয় ঘুরছি,—জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানি সৃষ্টি করলেন একটি 'সুপার মাইক্রোব'। ময়লা তেলের ভিতর থেকে বার করলেন প্রাণীবীজ (bacteria) যেটি প্রাকৃত, —পেট্রোলিয়মের প্রধান অঙ্গ যেটি হাইড্রোকার্বন,—সেই পদার্থ খেয়ে এই প্রাণীবীজ বাঁচে। এই নতুন আবিষ্কার যিনি করলেন তিনি ইল্লিনয়েসের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম প্রধান রিসার্চ স্কলার আনন্দমোহন চক্রবর্তী। তাঁর খ্যাতি সম্প্রতি ছড়িয়ে পড়েছে সমস্ত আমেরিকায়। তাঁর এই আবিষ্কারের ফলে পেট্রোলিয়ম থেকে মানুষের ও জন্তুর খাদ্য সৃষ্টি করা যাবে, এবং পুরনো তেলের খনি—যেগুলি ক্রমশ শুকিয়ে আসছে ভিতর থেকে, সেগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করা চলবে।

আনন্দমোহন চক্রবর্তী মহাশয়ের সম্বন্ধে 'ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ ম্যাগাজিন' পত্রিকায় বলা হয়েছে, তিনি সর্বপ্রধান বৈজ্ঞানিক এবং শিকাগো নগরীতে শীঘ্রই তাঁকে যথাযোগ্য সম্মাননায় ভূষিত করা হবে।

পৃথিবীতে এই একমাত্র দেশ,- যে দেশে এই শতাব্দীতে সর্বজাতির সমন্বয় ঘটেছে। এদের এই গণতন্ত্রে অনেক ত্রুটি, অনেক মিথ্যা ও ফাঁকি, অনেক দুর্নীতি ও অপরাধ—যে কোনও পর্যটকেরই চোখে পড়বে সন্দেহ নেই। কিন্তু ডিমোক্রাসির এমন শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি আর কোথায় আছে তাও আমার জানা নেই। একজন নগণ্য সাধারণ মানুষ কেবলমাত্র অধ্যবসায় ও বুদ্ধির জোরে কেমন করে বিরাট এক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে সমর্থ হয়,—আমেরিকার পথে ঘাটে তার ভূরি-ভূরি প্রমাণ খুঁজে পাওয়া যায়। রাষ্ট্রের কাছে কেউ ধর্না দেয় না, ভিক্ষার দরখাস্ত কোথাও পেশ করে না, কথায় কথায় নালিশ জানায় না, আপিসে-আপিসে ঘোরে না, ব্যাঙ্ক থেকে টাকা ধার নিয়ে গা ঢাকা দেয় না, কিংবা ভুয়ো কো-অপারেটিভ সোসায়েটি বানিয়ে পরস্বাপহরণ করে না। এরা আপন-আপন কাজের দ্বারা শুধু নিজেরই ভাগ্য জয় করে না, পৃথিবীকেও জয় করে। রেভলন নামক একটি বেকার যুবা তার মাসোহারা থেকে পয়সা বাঁচিয়ে এক এক প্রকার কসমেটিক তৈরি করতে থাকে নিজের হাতে। এখন সে আমেরিকার কসমেটিক সম্রাট। কত কোটি ডলারের কারবার সে করে তার অঙ্কটা শুনলে রাত্রে ঘুম হবে না।

গুজরাটি, পাঞ্জাবী, ভাটিয়া, পাকিস্তানী, ইরাণি, আরবীয়, লেবাননী, ইস্রায়েলী, চীনা, জাপানী,—সবাই এদেশে ব্যবসা করে,—ছোট বড় মাঝারি সব রকমের কারবার। এখানে কেউ সঙ্গে টাকা আনে না, এদেশে বা কানাডায় ঢুকে তারা অর্থ অর্জন করে মাত্র। সেই টাকায় একদিন এরা ব্যবসা করতে বসে। ভারতীয় ডিজাইনে মাটির হাঁড়ি, কলসী, থালা-বাটি বিক্রি হচ্ছে কালিফর্নিয়ায়—স্বচক্ষে দেখে এলুম। যারা নিজের পায়ে দাঁড়ায়, তারাই দাঁড়িয়ে থাকে।

এবার আমার পথে পা বাড়াচ্ছি।

ওহাইয়ো আর পেন্‌সিলভানিয়ার ভিতর দিয়ে পূর্বদিকে অগ্রসর হচ্ছি। পিছনে পড়ে থাকছে এই বিরাট উপমহাদেশ—যা মাড়াতে-মাড়াতে এসেছি। ফিলাডেলফিয়াও ছেড়ে যাচ্ছি—যার 'বালাকিনউইড' অঞ্চলে ডক্টর সুখময় ও শ্রীমতী কৃষ্ণা লাহিড়ীর ওখানে কয়েকদিন কাটিয়েছি। একদিন তাঁদের কাছ থেকেও বিদায় নিয়ে ট্রেনে চড়ে বসলুম।

ফিলাডেলফিয়া থেকে রেলপথে নিউইয়র্ক মাত্র ৯০ মাইল। কিন্তু দুই দিকের এই ১৮০ মাইল জুড়ে যে কলকারখানা এবং বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে, —সে যেন অফুরন্ত প্রাচুর্যের ঘন সমাবেশ। চারিদিকে যাদের দেখছি তারা যে আমেরিকান—সন্দেহ নেই। কিন্তু একটু খুঁটিয়ে খোঁজ নাও, দেখবে সবাই এসেছে বাইরের থেকে। বিজ্ঞান প্রতিভার প্রতি অনুরাগ বোধহয় এদেশের মতো এমন কোথাও নেই। তুমি যে দেশেরই হও, যে কোনও জাতি-পরিচয় তোমার থাক না কেন,—আমেরিকায় এলে তোমার সার্বিক স্বাধীনতা। যা নতুন, যা বিচিত্র, যার ভিতরে কিছু বৈপ্লবিক পরিবর্তনের আভাস আছে, যা মৌলিক চিন্তার খোরাক যোগায়,—তার প্রতি এদের উদ্দীপনার অন্ত নেই। যেমন ধরো আজকের টেলিভিসন বা হেলিকপটার। যাঁরা টেলিভিসন আবিষ্কার করেন তাঁদের একজন হলেন রুশীয় আমেরিকান, নাম রোমানভ। হেলিকপটারও যাঁর আবিষ্কার, তিনিও এদেশের একজন রুশ। চাঁদে পৌঁছবার এপলো-১১-র সাউণ্ড সিস্‌টেম যিনি আবিষ্কার করেছেন তিনিও একজন আমেরিকান—নাম অমরগোপাল বসু। আরও অনেক আছে, শত সহস্র—তাঁরা এদেশের অবারিত স্বাধীনতার মধ্যে কাজ করে চলেছেন, কোথাও তাঁদের বাধা নিষেধ নেই। গবেষণা কাজের জন্য যে যা চায়, যে কোনও যন্ত্রপাতি, যে কোনও পরিমাণ অর্থ ও সুযোগ সুবিধা সেখানে সরবরাহের কৃপণতা এদেশে কোথাও নেই।

নিউ ইয়র্কে আবার এসে পৌঁছলুম বহুদিন পরে—এই বৃহত্তম নগরী ছেড়ে চলে গিয়েছিলুম মে মাসের চতুর্থ সপ্তাহে,—এখন সেপ্টেম্বর শেষ হচ্ছিল। 'ফল্' আরম্ভ হয়েছে, দিবারাত্র সমগ্র উত্তর আমেরিকায় গাছের পাতা ঝরছে! এই ঝরণ চলবে আরও এক মাস। বন-বনান্তর কোথাও রাঙ্গা, কোথাও হলুদ, কোথাও রক্তনীল, কোথাও বা ময়ূরপঙ্খী বর্ণ ধারণ করেছে। ঝরবার আগে সব যেন রাঙিয়ে দিয়ে যাচ্ছে! আমারও এবার যাবার সময় হয়ে এল। বন্ধুরা অনেকে ধরেছেন, নিউ ইয়র্কে দুর্গাপুজো দেখে যান।

যেখানে আমি বাসা বেঁধেছি, সেই গ্রামটির নাম 'স্কার্সডেল'। এটি নিউ ইয়র্কের কাছেই—মাইল তিরিশেকের মধ্যে। আমার বাসার পাশেই একটি অরণ্যময় ছোট নদী—যেটি এখানকারই হাডসন নদীর একটি ছোট জলপ্রপাত থেকে ধারা বহন করে চলেছে। এই গ্রাম হল ওয়েস্টচেস্টার মহকুমার (County) অন্তর্গত। এই মহকুমায় এ গ্রামটি সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ। এখানে বহু কোটিপতির বাস। এদেশে অর্থশালীরা থাকে গ্রামাঞ্চলে। সেজন্য গ্রাম মাত্রই ধনী। আমি যাঁর নিজস্ব বাড়িটিতে আছি তিনি নিউ ইয়র্ক সিটি ইউনিভার্সিটির পদার্থবিদ্যা বিভাগের অধিকর্তা—যিনি একদা ডঃ মেঘনাদ সাহা ও এচ-জে-ভাবার দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন। তাঁর নাম ডক্টর অম্বুজ মুখার্জি। তিনি নিউ ইয়র্কের টেগোর সোসায়েটির প্রেসিডেন্টও বটে। মিঃ মুখার্জি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বৈজ্ঞানিক—ফিজিক্স-এর

বিভিন্ন মৌলিক গবেষণায় তিনি সিদ্ধহস্ত। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক দক্ষতার জন্য তিনি বহু সুনাম অর্জন করেছেন। ইউরোপের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি নানা সম্মানে ভূষিত। তাঁর উচ্চশিক্ষিতা ও গৃহকর্মনিপুণা স্ত্রী শ্রীমতী স্নিগ্ধা নিউ ইয়র্কের সর্বসমাজে সুপরিচিতা। তিনি বিভিন্ন সমিতি, সংঘ, ক্লাব প্রভৃতির সঙ্গে জড়িত। এঁর মধুর প্রকৃতি, মিষ্ট আলাপ ও আচরণ সর্বত্র সমাদৃত। এঁদের উভয়ের আতিথেয়তার মধ্যে এমন আন্তরিকতা ও মাদকতা ছিল—যার জন্য ১১দিন আমি ওঁদের ওখানে নিকটাত্মীয়ের মতো থেকে গিয়েছিলুম।

নিউ ইয়র্কের আর্থিক অবস্থা ইদানীং ভাল যাচেছ না। রিসেসন, মূল্যবৃদ্ধি, বেকার সংখ্যা প্রভৃতির জন্য মেয়রের মাথা খারাপ হতে চলেছে। তাঁর হাতে রয়েছে সিটি ইউনিভার্সিটি, স্কুল-কলেজ, পথঘাট, বহু সংখ্যক হাসপাতাল, অ্যাম্বুলেন্স কোর, পুলিস বিভাগ, জঞ্জাল ও ড্রেন পরিষ্কার, নদীনালার অনেকগুলি সাঁকো, আলোর ব্যবস্থা, কয়েকটি বন্দর, মৃতের সৎকার এবং মেট্রোপলিটান নিউ ইয়র্কের সর্বপ্রকার মেরামতি কাজ। এইগুলি সমাধা করতে তাঁর মাসিক খরচ পড়ে এক-হাজার কোটি ডলার। নিউ ইয়র্কের নিজস্ব জনসংখ্যা ৮০ লক্ষ। কিন্তু ওই সঙ্গে হাডসন নদীর ওপারে জার্সিকে যদি ধরা যায়—যেমন কলকাতা ও হাওড়া—তাহলে জনসংখ্যা দাঁড়ায় দুই কোটি। জার্সি থেকে প্রতিদিন লক্ষ-লক্ষ নরনারী নিউ ইয়র্কে কাজ করতে আসে। এই সুবৃহৎ নগরের মেয়র প্রতি বছরে কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্টকে কুড়ি হাজার কোটি ডলার দেন তাঁর ইনকাম ট্যাক্স সংগ্রহ ভাণ্ডার থেকে। পৃথিবীর সকল জাতির মুখে-মুখে যখন মিলিয়ন শব্দটা ঘোরাফেরা করে, তখন আমেরিকা এবং মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকজন তৈলরাজ বিলিয়ন শব্দটি নিয়ে লোফালুফি করতে থাকে।

এর মধ্যে একদিন রাত্রে নিউ ইয়র্কের কুখ্যাত অঞ্চল হারলেম পরিদর্শন করতে গিয়েছিলুম। এটি গরীব কৃষ্ণাঙ্গদের একটি সুবৃহৎ পল্লী। এ অঞ্চল অনেকটা যেন সাধারণের পক্ষে নিষিদ্ধ। এখানে চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই (mugging), খুন, রাহাজানি, ধর্ষণ, বলাৎকার, কিডন্যাপিং প্রভৃতি নানাবিধ সামাজিক অপরাধ লেগেই থাকে। দিবারাত্র দেখা যায়, নেশাখোর, গুলিখোর, বেশ্যা, পিম্প, টাউট ইত্যাদিরা পথের ধারে বসে ঝিমোচ্ছে। ওরা অনেকের গাড়ি থামিয়ে ছিনতাই করে এবং কারও পকেটে ডলার খুঁজে না পেলে তাকে পিস্তল দিয়ে গুলী করতে দ্বিধা করে না। কিন্তু সেই রাত্রে আমাদের সুবিধা ছিল এই, একটু আগেই একপশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। পথগুলি জনবিরল। মাঝে মাঝে কোন কোনও দরজায় কৃষ্ণাঙ্গ নরনারীর গালগল্প ও হাসিতামাশা চলেছে। শুনলুম স্ত্রী, কন্যা, ভগ্নী, এমন কি জননীরাও পতিতাবৃত্তিতে নিযুক্ত হলে পুরুষরা তেমন আপত্তি তোলে না এবং পুরুষের ক্রিয়াকলাপ লক্ষ্য করে মেয়েরাও সেদিকে বিশেষ ভ্রূক্ষেপ করে না।

আরেকদিন অপর একটি গ্রামীণ শহরে গিয়েছিলুম স্কার্সডেল থেকে ৭৫ মাইল দূরে। শহরের নামটি বিচিত্র অর্থাৎ 'পৌকিপ্সি' (POUKEEPSIE)। এ নামটি এদেশের আদিবাসীদের আমলের। আদিবাসী মানেই 'রেড ইণ্ডিয়ান'—যাদেরকে সুশৃঙ্খলভাবে বিগত তিন শতাব্দী ধরে আমেরিকানরা নিশ্চিহ্ন করেছে। তাদের বংশকেও বাড়তে দেওয়া হয়নি। একদা তারা সংখ্যায় ছিল তিন কোটি, এখন বুঝি দাঁড়িয়েছে কুড়ি লক্ষে (কানাডা সমেত)। ঠিক এই হারেই কয়েক হাজার আমেরিকান নিজেদের জনসংখ্যা তিন শ' বছরে দাঁড় করিয়েছে ২৩ কোটিতে। আমেরিকার

পুরনো কাহিনী যথেষ্ট গৌরবের পরিচয় দেয় না।

পোকিপ্সির রমণীয় পার্বত্য বনপথ ও গ্রামাঞ্চল আমার পক্ষে স্মরণীয়। যারা পাঠানকোট ছাড়িয়ে চলে গেছে জম্মুর উধমপুরের দিকে, রামনগর দিয়ে যারা গেছে কুমায়ুনের কর্বেট পার্কের দিকে, ছোটনাগপুরের কোয়েল নদীর ধারে ধারে যারা ঘুরেছে, যারা গিয়েছে আসামের জিয়াভরলি নদীর ধার দিয়ে 'ভালুকপঙের' দিকে—তারাই বুঝবে এও আরেক অমরাবতীর পথ। কিন্তু পোকিপ্সির পথের বৈশিষ্ট্য এই, সমস্ত পার্বত্য পথ এই পাতা ঝরার ঋতুতে বহু বর্ণের সমাবেশে যেন প্রাকৃতের অফুরন্ত শোভার এক বন্যা বইয়ে দিচ্ছে। ঘণ্টা দেড়েক ধরে আমাকে যেন অভিভূত করে রেখেছিল।

আমরা গিয়ে কিংজর্জ রোডে যাঁর বাড়িতে উঠলুম তিনি এখানকারই প্রসিদ্ধ কারবারী। নাম—শ্রীমান হিতেন ঘোষ। অতি সদাশয় ও অমায়িক যুবা। এঁরই তন্বী ও সুদর্শনা স্ত্রী শ্রীমতী মঞ্জুলিকা সকলের জন্য যে পরিমাণ রুচিকর আহারাদির আয়োজন করেছিলেন, সেটি কলকাতার পার্ক হোটেলেই মানায়। ওই ভূরিভোজের আসরে ছিলেন কলকাতার দীপক বাগচী ও তাঁর তরুণী আমেরিকান স্ত্রী—যিনি অনর্গল বাংলা বলেন। আর ছিলেন ডক্টর অমিতাভ গাঙ্গুলী ও তাঁর স্ত্রী ডক্টর শ্রীলতা, পি-এইচ-ডি। এঁদের কাছে আমি অপরিচিত নই, সুতরাং সেদিনকার আসর আনন্দে ও উচ্ছ্বাসে মেতে উঠেছিল।

নিউ ইয়র্কে এসেছিলেন ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীযুক্ত চবন। তিনি এসেছিলেন মিঃ কিসিনজারের সঙ্গে বৈঠকে বসতে এবং রাষ্ট্রসঙ্ঘের বৈঠকে ভাষণ দিতে। শ্রীমতী মায়া রায়, এম-পি, 'নারীবর্ষ' পালন উপলক্ষেও এসেছিলেন নিউ ইয়র্কে। শ্রীযুক্ত চবনের জন্য আহূত দুটি সভাতেই আমাকে ডাকা হয়েছিল। ভারতের বর্তমান পরিস্থিতি এবং নিরর্থক জরুরী অবস্থা ঘোষণার মূল কারণটি কি, এ সম্বন্ধে নিউ ইয়র্কের ভারতীয় মহলে নানা প্রকার ঔৎসুক্য ও জিজ্ঞাস্য ছিল। ভারতে তখন 'এমারজেন্সি' চলছে এবং সকল বিরোধীদলের নেতৃবৃন্দসহ হাজার হাজার মানুষ কারারুদ্ধ হয়েছেন। শ্রীযুক্ত চবন তাঁদের প্রত্যেকটি প্রশ্নের জবাব দিচ্ছিলেন বটে, তবে কিছু ক্ষীণকণ্ঠে।

রাষ্ট্রসঙ্ঘের কার্যাবলী সম্বন্ধে আমার কৌতূহল আজকের নয়। সেই ১৯৪৫ সালের ২৪ অক্টোবর তারিখে এর প্রথম উদ্বোধনকালে বহু বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত তৎকালের পরাধীন ভারতের মুখপাত্রী হয়ে এসে এর প্রকাশ্য অধিবেশনে যোগদান করেছিলেন। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের বহু প্রকার বৈরীতা অগ্রাহ্য করে তিনি মোটরবাসে চড়ে এখানে আসতে বাধ্য হন এবং সেদিনকার জগৎসভায় তাঁর ভাষণ অদ্যাবধি স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। তখন সবেমাত্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়েছে। জার্মানি, জাপান ও ইতালির পতন ঘটেছে, ভারতের স্বাধীনতা লাভের কথা উঠেছে এবং চার্চিল দলের মধ্যে নাভিশ্বাস দেখা দিয়েছে। সেদিনকার সেই আসরে বিজয়লক্ষ্মী বহু জাতির দ্বারা অভিনন্দিত হয়েছিলেন। যাই হোক, সেই রাষ্ট্রসঙ্ঘের একটি অধিবেশন দেখাবার জন্য শ্রীমতী স্নিগ্ধা আমাকে 'বেডফোর্ড পার্ক' স্টেশন থেকে ট্রেনে তুলে সোজা নিউ ইয়র্কের হৃৎকেন্দ্রে 'গ্রাণ্ড সেন্ট্রাল' স্টেশনে এনে নামালেন। এখান থেকে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সেই বিশাল সৌধ নিকটেই। পাঁচ মাস পরে আবার এসে পৌঁছলুম এই নদীতীরবর্তী জাতিসঙ্ঘের সদর দপ্তরে।

যে তিন চারজন বাঙ্গালী কর্মচারী বিশেষ পদমর্যাদার সঙ্গে এই বিশ্বজোড়া প্রতিষ্ঠানের মধ্যে নিযুক্ত আছেন তাঁদের মধ্যে ডক্টর সুভাষ ধর অন্যতম। তিনি সেক্রেটারি জেনারেল ডাঃ ডাল্ডহাইমের পরামর্শ-পরিষদের একজন প্রধান সভ্য। তাঁকে আগে ভাগে বলে রাখার জন্য আমাদের প্রবেশপথে কোনও বাধা ছিল না। সমগ্র হলটি বিরাট এবং ভিতরের চারিদিকে দেওয়াল ও সিলিং বিভিন্ন কারুকার্য ও চিত্রণে অলঙ্কৃত। এই অতি বৃহৎ প্রেক্ষাগৃহের পিছনপ্রান্তে দোতলায় বসলে দূর থেকে বক্তা ও সভাপতিকে ক্ষুদ্রাকারে দেখা যায়। সেদিন বলিভিয়ার প্রেসিডেন্ট ও বর্মার পররাষ্ট্রসচিব তাঁদের দেশ সম্বন্ধে নিজ নিজ ভাষায় ভাষণ দিচ্ছিলেন। শ্রোতারা সকল দেশ ও জাতির লোক। এখন সভ্য সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৪১টি জাতি। তাঁদের প্রায় সকলেরই মুখপাত্র সেদিন উপস্থিত। একজনে শাড়িপরা মহিলার পিছন দিক দেখা যাচ্ছিল, তিনি শ্রীমতী মায়া রায় কিনা, এ নিয়ে স্নিগ্ধা দেবী আলোচনা করছিলেন। আমরা হেড-ফোন কানে লাগিয়ে নিজ নিজ আসনে বসে বক্তৃতা শুনছিলুম।

এই বিশাল ও আদিঅন্তহীন অট্টালিকাটি বহুতল। এর মধ্যে শত শত হল, অসংখ্য দপ্তর, হাজার হাজার কর্মরত নরনারী—এমন কি ভূগর্ভলোকেও বহু দেশের বিপণি-বেসাতি চলছে। ভারতীয় খেলনা, দামি শাড়ি, বিভিন্ন অলঙ্কার, কুটীর শিল্পজাত নানা সামগ্রী—কোনটারই অভাব নেই। এপাশে চীন ওপাশে আরব, গায়ে-গায়ে [illegible], ওখানে [illegible] পথ [illegible] পর [illegible]! লাউঞ্জে যেখানে চা ও জলযোগের পাট চলছে, সেখানে দেখি সারা পৃথিবী যেন টুকরো টুকরো হয়ে বসে নিজেদের মধ্যে মজলিশ জমিয়ে তুলেছে। ইন্দোনেশিয়া আর ফিলিপিন, পারস্য আর জর্ডন, অস্ট্রেলিয়া আর চিলি, আমেরিকা আর মিশর—এরা গল্পগুজবে মশগুল। সুভাষবাবু ওর মধ্যে আমাদেরকে নিয়েও খেতে বসে গেলেন। পাছে কারও পায়ের শব্দ হয় এ জন্য এই বৃহৎ হলে রক্তিম মখমলের কার্পেট পাতা। বস্তুত সমগ্র আমেরিকা কার্পেট মোড়া। দোকান বাজার, ব্যাঙ্ক, পোস্ট অফিস, ট্রেন, বাস, মোটর, স্টেশনের আনাগোনার পথ, সিনেমা পার্টি, স্কুল-কলেজ ইউনিভার্সিটি প্রতিটি দপ্তর, প্রতি প্রতিষ্ঠান, প্রত্যেকটি হোটেল ও রেস্টুরেন্ট—সব কার্পেট মোড়া। সুদূর গহন পল্লীগ্রামে যাও, সেখানকার প্রত্যেক গৃহস্থ ও ধনীর বাড়ি আগাগোড়া কার্পেট। সাধারণ গৃহস্থদের রান্নাঘর ও বাথরুমেও কার্পেট। স্নানাগারে কমোডের ঢাকাও কার্পেট মোড়া। এয়ার কুলিং আর সেন্ট্রাল হিটিং ছাড়া আমেরিকার কোথাও কোনও বসতবাড়ি হয় না। নিউ ইয়র্ক শহরের একটি বড় অংশের নাম 'কুইনস'। এখানে বহু ধনাঢ্য পরিবারের বাস। এঁদের মধ্যে অবস্থাপন্ন প্রচুর সংখ্যক বাঙ্গালীও আছেন। তাঁদের জীবনযাত্রার ধারা, ঘরকন্নার শ্রী ও সাচ্ছল্য, তাঁদের নিজস্ব বাগান-বাড়ি ও সুরুচিসম্পন্ন বিভিন্ন বিলাসের উপকরণ দেখে অনেক সময় প্রচুর আনন্দ পাওয়া যায়। কিন্ত এই আনন্দের পিছনে তাঁদের দিবারাত্রির অক্লান্ত পরিশ্রমও চোখ এড়ায় না। আমার এই সুদীর্ঘকাল ধরে আমেরিকা ভ্রমণের পর্বে-পর্বে, প্রায় প্রতি স্টেটে ও প্রত্যেক শহরে-নগরে যে সকল বাঙ্গালীকে দেখে যাচ্ছি, তাঁরা তাঁদের বিদ্যায়, গুণপনায়, পাণ্ডিত্যে ও জ্ঞানে শীর্ষস্থানীয় হবার যোগ্য। শুধু 'কুইনস' নয়, 'ম্যানহাটান, ব্রুকলিন, ব্রঙ্কস, জার্সি—সর্বত্রই বাঙ্গালী মহলের গৌরব দেখে যাচ্ছি।

আমি এসেছি সেই খররৌদ্র বৈশাখের শেষে, এখন আশ্বিন শেষ হতে চলেছে। যখন ভ্রমণ করছিলুম আলাস্কা ও হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে, যখন মেক্সিকো সাগর পেরিয়ে প্রশান্ত মহাসাগরের নানা স্থলে পাড়ি দিয়ে কালিফর্নিয়ার অঙ্গদেশে ঘুরছিলুম, তখন স্বপ্নেও ভাবিনি, আরও ১০।১২টি স্টেট পেরিয়ে একদা আবার নিউ ইয়র্কে পৌঁছে ওখানকার দুর্গাপুজো দেখে যাব! আমার ভ্রমণসূচীতে এখনও রয়েছে সমগ্র ইউরোপ,—সেখানে দিনে দিনে এবার শীতকাল নেমে আসছে শুনতে পাচ্ছিলুম।

কিন্তু নিউ ইয়র্কের দুর্গাপুজোর আকর্ষণও কম নয়। বাঙ্গালীরা শনিবারের বদলে দু'দিন পিছিয়ে নিয়ে বৃহস্পতিবারে প্রকৃতই 'অকাল বোধনের' সপ্তমীপুজো আরম্ভ করেছেন। উদ্দেশ্য এই, শনি ও রবিবার—এ দুটি ছুটির দিনে তাঁরা 'বিজয়া দশমী' পালন করবেন। তিথি বড় নয়, বড় হল পুজো। একটি গির্জা সংলগ্ন মস্ত হলে সুন্দর একটি শোলার মূর্তি পুজো করা হচ্ছে। ভোগ রাঁধছেন শ্রীমতী স্নিগ্ধা—তিনি রন্ধনপটীয়সী। সেদিনকার পুজোর আসরে শ্রীমতী স্নিগ্ধা যে খিচুড়ি ও পায়েস প্রস্তুত করেছিলেন তার তুলনা কম।

এবারে কিন্তু যাবার সময় হল বিহঙ্গের। ১৫২ দিন পর্যন্ত বহু স্টেটে বহু বন্ধু জুটেছিল। তাঁদের কাছে বিদায় নিচ্ছিলুম। মন ঈষৎ ভারাক্রান্ত ছিল। রবীন্দ্রনাথের কবিতার একটি চরণ মনে পড়ছিল—'দুর্লভ এ ধরণীর লেশতম স্থান—।' এখানে অনেক স্নেহমোহবন্ধনের খেলা পড়ে রইল সন্দেহ নেই।

ডক্টর অম্বুজ মুখার্জি এবং স্নিগ্ধা দেবী আমাকে কেনেডি বিমানঘাঁটিতে পৌঁছিয়ে দিয়ে এলেন—তখন সন্ধ্যারাত্রি, লক্ষ লক্ষ বৈদ্যুর্যমণির আলোকমালায় পৃথিবীর বৃহত্তম নগরী নিউ ইয়র্ক তখন দিব্য দীপ্তিমান। কিন্তু তাঁরা উভয়ে জানতেও পারলেন না যে, মধ্যরাত্রের দিকে আমাদের বিলম্বিত বিমান আটলাণ্টিক মহাসাগরের ধূসর জ্যোৎস্নায় মিলিয়ে গেল।

॥ ১৩ ॥

প্রিয়বরেষু,

আমেরিকার ভূখণ্ড থেকে যেদিন বিদায় নিচ্ছিলুম, সেদিন দুর্গাষষ্ঠী। বিদায় নেবার কালে বিমানঘাঁটিতে একজন বাঙ্গালী গায়িকা সোৎসাহে এগিয়ে এসে আলাপ করলেন। তাঁর নাম শ্রীমতী মঞ্জরী লাল। তিনি আমেরিকায় এসেছেন গানের জলসা করতে। এসব ব্যাপারে আমেরিকানরা প্রচুর উৎসাহী। নাচ গান অভিনয় থিয়েটার সার্কাস ফুটবল হকি এবং বিভিন্ন আমোদ-প্রমোদে তারা সাড়া দেয় প্রচুর, ডলার খরচ করে অজস্র। কেউ যদি ছবির প্রদর্শনী করে, যদি কেউ 'বাটিক'-এর শাড়ি ঝোলায়, নতুন কোনও খাবার তৈরির সন্ধান দেয়, ম্যাজিক দেখায়, নতুন কোনও যন্ত্র উদ্ভাবন করে—অর্থাৎ কেউ যদি কোনও ব্যাপারে মাতিয়ে তুলতে পারে, তাহলে প্রতিষ্ঠা পেয়ে যায় সহজে। নিউ ইয়র্ক প্রমুখ বহু শহরের বহু পথের ধারে গান বাজনার আসর বসে যায়, সানফ্রান্সিসকোর ডাউন-টাউনে গায়ক গায়িকারা গান শুনিয়ে ভিক্ষা নেয়, ফুটপাথে দোকান দিয়ে হরেক রকম 'কিউরিয়ো' বিক্রি হয়, 'কেবল-কারে' চড়ে সানফ্রান্সিসকোর উঁচু-নিচু পথে আনাগোনার কৌতুকে মাতে- -কোনও ব্যাপারেই কেউ পিছপাও নয়। মহেশ যোগীর অতীন্দ্রিয় যোগ, 'হরেকৃষ্ণ' সম্প্রদায়ের ভজন-

কীর্তন—এগুলো এদের মধ্যেই পড়ে।

যাবার আগে আমেরিকার আত্মকেন্দ্রিক প্রকৃতি আরেকবার দেখে যাচ্ছি। সুখে বাস করব, ভোগের মধ্যে ডুবে থাকব, নিজের ঘর সাজাবো, এ-গাড়ির বদলে ও-গাড়ি কিনবো, উপার্জন বাড়াবো, কাজের সময় কমাবো—সাধারণ আমেরিকানদের এই মনোভাব। কিন্তু ওদের মধ্যে যারা অসাধারণ—যারা ইহুদী—যাদের জনসংখ্যা শতকরা মাত্র ৩ জন, তারা আমেরিকায় অতিশয় প্রতিপত্তিশালী। বিদ্যায়, বিজ্ঞান-প্রতিভায়, শিল্পোৎপাদনে, ব্যাঙ্কিং ব্যবসায়ে, যৌথ কারবারে, স্টক একসচেঞ্জে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণে—তারা সর্বাপেক্ষা অগ্রগণ্য। আমেরিকান রাজনীতিতে তাদের প্রভাব অনেক বেশি। আমেরিকার ভূমিতে দাঁড়িয়ে ওরা ইসরায়েল রাষ্ট্রকে সর্ববিধ উপায়ে রক্ষণাবেক্ষণ করে। মধ্যপ্রাচ্যের অতগুলি আরব রাষ্ট্রের আক্রোশের মাঝখানে থেকেও ক্ষুদ্র ইসরায়েল যে আপন স্পর্ধায় আক্রমণশীল হয়ে থাকে, সে কেবল আমেরিকান ইহুদীদের খুঁটির জোরে।

আরেকটি সম্প্রদায়ের কথা শুনে যাচ্ছি যাদের নাম 'মাফিয়া'। তারা দুর্ধর্ষ, শক্তিমান, প্রবল পরাক্রান্ত এবং স্বেচ্ছাচারী। তারা জাতিতে ইতালীয়ান, সিসিলিয়ান ও স্প্যানিশ মিশ্রিত। তাদের সম্প্রদায় কোথাও বশ্যতা স্বীকার করে না, এবং তারা সর্বত্রই ভয়ের পাত্র। কিন্তু তাদের আনুপূর্বিক সংবাদ আমার পক্ষে জানবার সুযোগ ঘটেনি। এই মহাদেশের প্রায় সর্বত্র বিচরণকালে এদের কুকীর্তির কথা মাঝে মাঝে আমার কানে উঠেছে মাত্র। এদের নিয়েই 'গড ফাদার' নামক বিশ্ববিশ্রুত গ্রন্থ লেখা হয়েছে। সে যাই হোক, আমেরিকা স্বর্ণভূমি হতে পারে, কিন্তু স্বর্গভূমি নয়! এই বিশাল ভূভাগ যেমন কোটি কোটি নরনারীর অবারিত স্বাধীনতার আনন্দময় লীলাভূমি, তেমনি বড় বড় শহরে দেখেছি সমাজবিরোধী ও দুষ্কৃতকারীদের জন্য সাধারণ শান্তিকামীদের মনে একটি শংকা ও দুর্ভাবনা জেগে থাকে। যেখানেই গেছি দেখেছি প্রতি গৃহস্থ চুরি বা ডাকাতির ভয়ে বাইরের দরজা বিভিন্ন কৌশলে দিবারাত্র বন্ধ করে রাখে। বহুতল বাড়ির বিশেষ কোনও ফ্ল্যাটে যাবার আগে আগন্তুকের পক্ষে নিচের থেকে টেলিফোন করে না গেলে সেই ফ্ল্যাটে প্রবেশ করা যায় না। এদেশে যারা নবাগত তাদেরকে প্রায়ই বলে দেওয়া হয়, টাকা কড়ি সঙ্গে নিয়ে জনবিরল পথে না হাঁটাই ভাল। নিউ ইয়র্কের বা ভূগর্ভস্থ 'মেট্রো' সন্ধ্যার পরে যথেষ্ট নিরাপদ নয়, একথা আমাকে বার বার শুনতে হয়েছে। উঁচু ধরনের খুনখারাপি বা রাহাজানির কাহিনী সংবাদপত্রাদির পক্ষে যেন প্রধান আকর্ষণ। পুরুষ বা মেয়ে—অপরাধী যেই হোক—তাদের ছবি, জীবনী, বংশ পরিচয় ইত্যাদি সংবাদপত্রে ফলাও করে ছাপা হয়ে থাকে। ফলে, যার যত দুঃসাহসিক অপরাধ, সে ততই প্রচারকার্যের দ্বারা একটা কৃত্রিম 'আভিজাত্য' লাভ করে। এই সব কারণে সম্প্রতি অবাধ আগ্নেয়াস্ত্র কেনাবেচার বিরুদ্ধে একটা জনমত গড়ে উঠছে। বাগে পেলে অথবা ইচ্ছা হলে, যে কোনও ব্যক্তিকে হত্যা করার পূর্ণ স্বাধীনতা বোধহয় একমাত্র আমেরিকাতেই সম্ভব। 'জেব্রা' হত্যার ধরন এই রকমই। টেলিভিশনে বালক-বালিকাদের জন্য যে প্রোগ্রাম, সেগুলি যেমন অতিশয় চিত্তাকর্ষক, সচিত্র সংবাদ পরিবেশনের যেমন মনোজ্ঞ রীতিনীতি, কৌতুক নাট্যগুলি যেমন সুকৌশলে ও সুন্দর প্রযোজনায় মনোরম—এদের ঠিক বিপরীত হল 'সিরিয়স' নাটকগুলি। হত্যা, ডাকাতি, বলাৎকার, গুন্ডামি, আগুন জ্বালানো, খণ্ডযুদ্ধ, এরা প্রায়ই হল বিষয়বস্তু।

কোনও নাটকে কোনও মহৎ চিন্তা, আদর্শ-সংঘাত, মানবতাবাদ, প্রেমের গভীরতা উপলব্ধি— এ ধরনের উপাদান কোনও নাটকে নেই। কারুণ্য, বেদনাবোধ, আত্মত্যাগ, স্বার্থহীনতা, কল্যাণকর্মে আত্মনিয়োগ—আমেরিকায় গিয়ে এগুলি ভুলতে হয়। কেউ কারও হাতে মার খেলে কাঁদে না, প্রতিহিংসার ফণা তুলে দাঁড়ায়! পৃথিবীর বহু দেশ যখন ক্ষুধায় হাহাকার করে আমেরিকার শিল্পপতিরা তখন গমের দর নিয়ে মাথা ঘামায়। সমগ্র আমেরিকায় সুদীর্ঘ ভ্রমণকালে এক ব্যক্তিরও চোখে জল দেখিনি! ওদের দেশে প্রণয় আছে পথেঘাটে, কিন্তু সেই প্রণয় প্রেমের রাজবেশ ধারণ করে কম।

প্রায় মধ্যরাত্রির কাছাকাছি যখন আমাদের বিমান ছাড়বে সেই সময় বাংলাদেশের এক সুপুরুষ যুবা আমার সহযাত্রী হলেন। তাঁর নাম মুস্তাফা কামাল। উচ্চ-শিক্ষিত, ভদ্র এবং স্বাস্থ্যবান যুবা। এঁর বাড়ি ঢাকায় ধানমণ্ডিতে। ইনি বর্তমানে বিষয়কর্ম উপলক্ষে কানাডার নাগরিক। এখন কলকাতা হয়ে ঢাকা যাবেন। মাস দুই আগে শেখ মুজিবকে যখন শেষ রাত্রে হত্যা করা হয়, মুস্তাফা তখন ধানমণ্ডির বাড়িতে—যেখান থেকে শেখ মুজিবের বাসস্থানটি দেখা যায়। মুস্তাফা সেই হট্টগোল এবং আগ্নেয়াস্ত্রের আওয়াজ ইত্যাদির কথা সবিস্তারে বলছিলেন।

আমাদের বিমান ছাড়ল দু ঘণ্টা দেরিতে। আটলান্টিক মহাসমুদ্রের উপরে যে নিঃসীম শূন্যলোক, তারই মেঘল ধূসর জ্যোৎস্নার ভিতর দিয়ে আমাদের 'এয়ার ইণ্ডিয়া-৭৪৭' জেট বিমান দূর পূর্ব দিগন্তের দিকে উড়ে যাচ্ছিল। এই বিমান নাকি জেট-যুগের সর্বাধুনিক উদ্ভাবন। এর পরেই নাকি আসছে 'সুপারসনিক'-এর যুগ। আমাদের বিমানটি আগাগোড়া লম্বায় ২৩২ ফুট, উচ্চতায় ৬৩ এবং এক-একখানি ডানা প্রায় ১৯৬ ফুট দীর্ঘ। এই বিমান প্রতি ঘণ্টায় ৬২৫ মাইল গতিতে ওড়ে। শুনলুম ১৯ জন ক্রু ছাড়াও এই বিমানে ৩৫৩ জন যাত্রী এবং মোট ৪০ হাজার পাউণ্ড ওজনের যাত্রীমাল বহন করে। এটি ভিতর দিকে চওড়ায় ২০ ফুটেরও বেশি। এই বিমানের ভিতরভাগে ভারতীয় ধরনে শ্রীরাধাকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা, রামায়ণ-মহাভারতের সচিত্র কাহিনী, গৌতম বুদ্ধের জীবনী প্রভৃতি নিয়ে দেওয়াল চিত্রণ, বিবিধ ধরনের অলঙ্করণ, যাত্রীদের আরাম ও আনন্দের জন্য সর্বপ্রকার বিলাসের উপকরণ, চলাফেরার জন্য প্রশস্ত প্যাসেজ, শীতের জন্য লেপ-কম্বল ইত্যাদির সুবন্দোবস্ত, আমিষ ও নিরামিষ মিলিয়ে রুচিকর ও মূল্যবান সুখাদ্য, রূপসী তরুণীদের সযত্ন পরিবেশন ও অন্যান্য খিৎমদগারি এবং নৈশ বা মধ্যাহ্নের ভূরি-ভোজের পর তিনটি পর্দায় সিনেমা চিত্র দেখানো—সব মিলিয়ে মনে হয় এ যেন এক রাজকীয় প্রমোদভবনে প্রবেশ করেছি! সুশ্রী তরুণীরা অনেকের পানপাত্রে মাঝে মাঝে স্কচ হুইস্কি অথবা টিনের চাবি কেটে বীয়ার ঢেলে দিয়ে যাচ্ছে এবং সঙ্গে চাটস্বরূপ পী-নাট বা নোনতা বাদামের প্যাকেট দিয়ে যাচ্ছে 'বিনামূল্যে'। সম্প্রতি আন্তর্জাতিক বিমানবিধি অনুসারে ইদানীং মদের মূল্য ধরে নেওয়া হচ্ছে। অনেকে বিমানঘাঁটি বা বিমানের ভিতর থেকে উৎকৃষ্ট বিদেশী মদ 'ডিউটি-ফ্রী' কিনে নিয়ে যায়। ভারতীয় এই বৃহৎ বিমানের নানাবিধ বৈশিষ্ট্যের জন্য শ্বেতাঙ্গ যাত্রীরাও এর প্রতি আকৃষ্ট হন। এয়ার ইণ্ডিয়ার এই বিমানের আর্থিক মূল্য ৩৩ মিলিয়ন ডলার অর্থাৎ ভারতীয় মুদ্রায় এখন এর দাম প্রায় পৌনে ৩০ কোটি টাকার মতো। রাত্রের দিকে এই বিমানের আরামদায়ক সীটে বসে বহু যাত্রী দুই কানে রবারের নল

লাগিয়ে 'পপ-সঙ্গীত' শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ে। ওই রবারের নলটির জন্য ভাড়া দিতে হয় দুই ডলার।

জানলার ধারে বসে গোল কাঁচের ভিতর দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে দেখছিলুম আকাশ ও সমুদ্র—এই দুইয়ের মধ্যে কোনও পার্থক্য-রেখা দেখা যাচ্ছে না—সমস্তটাই ধূসর ও একাকার। তারই মধ্যে মিশে রয়েছে মলিন চন্দ্রাভা—যেটা একটা অপার্থিব রহস্যজাল সৃষ্টি করেছে। পৃথিবী নেই কোথাও, আকাশ অদৃশ্য, সমুদ্র নিশ্চিহ্ন—শুধু বহু নিচে ঠাহর করে দেখা যায় একটা মেঘলোক স্থির হয়ে রয়েছে!

পশ্চিম দিক থেকে যাচ্ছিলুম পূর্ব মহাদেশের দিকে—আমেরিকা থেকে ইউরোপ—যেদিকে আগে সূর্যোদয় হবে। একটা বিশেষ সময়ের সীমারেখা আছে, যেখানে ঘড়ির টাইম একটু বদলাতে হয়। সেই সীমারেখা অতিক্রম করলে প্রায় পাঁচ ঘণ্টা তফাৎ হয়ে যায়। সুতরাং প্রভাতকাল দেখা দিতে বিলম্ব ঘটল না। আমাদের বিমান দ্রুতগতিতে সূর্যালোকের দিকে এগিয়ে চলল। পিছনে পড়ে রইল বিরাট মহাদেশ আমেরিকা, যেটি এখনও ঘন অন্ধকারে আচ্ছন্ন।

লণ্ডনের 'হিথরো' বিমানঘাঁটিতে যখন এসে নামলুম বেলা তখন ১১টা। এয়ার ইণ্ডিয়ার বিমান তার অভ্যাসমতো দু ঘণ্টা লেট। ফলে ব্রিটিশ কাউন্সিল থেকে যাঁরা আমাকে স্বাগত জানিয়ে নিতে এসেছিলেন, তাঁরা ফিরে গেছেন। আমি তাঁদের অতিথি। এর ওপর আজ আবার শনিবার। ব্রিটিশ কাউন্সিলের ছুটি। লণ্ডনের সব আপিস বন্ধ।

তেরো বছর পরে আবার এসেছি লণ্ডনে। বাসে চড়ে যখন ব্রিটিশ এয়ার টার্মিনালে নামলুম, বেলা তখন ১টা বাজে। ওখানেই কাউন্সিলের একটি ছেলেকে পাওয়া গেল, সে আমাকে ট্যাক্সি করে নিয়ে এল 'চেয়ারিং ক্রশ' হোটেলে। লণ্ডন সেই একই রকম রয়েছে, কিন্তু মনে হচ্ছিল আমেরিকা থেকে হঠাৎ যেন ছিটকিয়ে এসে পড়েছি একটা সংকীর্ণ এবং অল্প পরিসর জনপরিপূর্ণ নগরে। আমার হোটেলের নিচে দিয়ে চেয়ারিং ক্রশ রেল স্টেশন, বাঁ দিকে দেখছি সেই ট্রাফলগার স্কোয়ার আর নেলসন কলাম—যেখানে শত শত পায়রাকে দিন রাত খাওয়ানো হচ্ছে। ওর পিছনে সেই পুরনো ব্রিটিশ ন্যাশনাল আর্ট গ্যালারির বাড়ি এবং এদেরকেই ঘিরে চারিদিকে যানবাহনের জটলা। আমার চোখে ক্ষণে ক্ষণে ঝলসিয়ে উঠছিল আমেরিকার দিগ্‌দিগন্ত প্রসারিত সম্পদ প্রাচুর্যের যক্ষলোক। এখানে এবার নেমেই যতদূর দেখা যায়, লক্ষ্য করছিলুম তারই একটা মধ্যবিত্ত সংস্করণ। সন্দেহ নেই, চেয়ারিং ক্রশ হোটেল মস্ত বড়, ঐশ্বর্যশালী, রাজকীয়, কিন্তু প্রাচীন কালের। যেমন প্রাচীন ওই পুরনো কালের ট্যাক্সির মডেল। হোটেলের ভিতরের সিঁড়ি ও করিডর-গুলি জটিল মনে হচ্ছিল। এক ব্যক্তি আমাকে তিন তলার উপর তুলে একটি সুসজ্জিত ঘরে রেখে চলে গেল এবং আমি যেন 'জলের মাছ ডাঙ্গায় উঠে' এক প্রকার ছটফট করতে লাগলুম। এমন নিরুপায় এবং নির্বান্ধব এ যাত্রায় আর কোনও দিন বোধ করিনি। এর পর শুনেছিলুম, এখানকার একটি ঘরে কেবলমাত্র রাত্রিবাসের ভাড়া ১৩ পাউণ্ড, অর্থাৎ ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় পৌনে তিন শ' টাকা। অতঃপর আমি ঘরে বসেই আমার বন্ধু শ্রীমান হিরন্ময় ভট্টাচার্যকে ফোন করলুম। সে লণ্ডনেরই অধিবাসী। সপরিবারে এদেশে থাকে নিজস্ব বাড়িতে।

শুনলুম লণ্ডনে নাকি এখন প্রায় ৩০ হাজার বাঙালী। সুতরাং আজ মহা-সপ্তমী পূজায় বাঙালীর ভিড় হবে পূজা কেন্দ্রগুলিতে এ আর বিচিত্র কি। আমি গেলুম হেমস্টেডের কাছে বেলিজ পার্কে পূজা দেখতে। কিন্তু ওখানেই যে কয়জন নতুন বন্ধুকে পাওয়া গেল তাদের মধ্যে শ্রীমান রতনময় গুহ ও সুগায়িকা শ্রীমতী চিত্রলেখা ওরফে চিত্রা, শ্রীমান পরিতোষ সরকার ও শ্রীমতী সুনন্দা—এরা অল্পকালের মধ্যেই ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল। ওরা আমার নিঃসঙ্গতাকে আনন্দমুখর করে তুলেছিল। যাই হোক, লণ্ডনে দুর্গাপূজা হচ্ছিল মোট ৪টি। ইয়র্ক স্ট্রীটে বেঙ্গলী ইনস্টিটুটে একটি, একটি উত্তর লণ্ডনে ফিনসবেরি পার্কে, আরেকটি পূর্ব লণ্ডনের লেটন অঞ্চলে। একটিতে আমাকে কিছু বলতে হয়েছিল। হেমস্টেডের পূজার হলে যাঁরা আমার সঙ্গে আলাপ করছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন রাজসাহী, বাসুদেবপুরের ভট্টাচার্য দম্পতি—এঁরা সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় মহাশয়ের শ্বশুর ও শাশুড়ী।

লণ্ডনে ও অন্যত্র এবার লক্ষ্য করছি, একটি নতুন সম্প্রদায় এসে জায়গা নিয়েছে। সংখ্যায় এরা ৩০ থেকে ৪০ হাজার। এদের নাম এশিয়ান। আগেও এদের কথা বলেছি। এরা উগাণ্ডার 'ব্রিটিশ প্রজা' নামে অভিহিত ছিল। কিন্তু এরা মূলত ভারতীয় গুজরাটি ও ভাটিয়া সমাজের লোক। এরা অধিকাংশই ধনাঢ্য এবং এদের টাকাকড়ি ব্যাঙ্ক অফ ইংল্যাণ্ডে জমা হয়ে এসেছে। সুতরাং উগাণ্ডার প্রেসিডেণ্ট ইদি আমীনের তাড়ায় এদের বড় দলটা এসেছে ইংল্যাণ্ডে, অন্য দল গেছে উত্তর আমেরিকায়—একথা আগেও বলেছি। এদের নিয়ে ইংরেজের সমস্যা দেখা দেয়নি, কারণ এরা এসে ইংল্যাণ্ডে কাজকারবার জমিয়ে তুলেছে, এবং ব্রিটিশ অর্থনীতিকে পরিপুষ্ট করেছে।

লণ্ডনে এবার এসে দেখছি স্টার্লিং পাউণ্ড তার প্রাচীন সম্মান খুইয়েছে, মুদ্রা-স্ফীতি ঘটেছে, প্রতি সামগ্রীর দর সাংঘাতিক ভাবে বেড়েছে এবং দশমিক মুদ্রার চলন হয়েছে। একজন সাধারণ শ্রমিকের দৈনিক মজুরি হয়েছে ৭ পাউণ্ড, সাধারণ হোটেলে একখানা সাদামাটা কেক ও এক পেয়ালা কফির দাম নিচ্ছে ৩০ পেন্সের বেশি, অর্থাৎ ভারতীয় সাড়ে ৫ টাকা। শিলিং নামক মুদ্রার চলন কমেছে, যেটুকু আছে তাও ৫ পেন্স-এ এক শিলিং। বীয়ার বা মদ বাদ দিয়ে ভদ্র লাঞ্চ খেতে গেলে এখন আড়াই পাউণ্ডের কম হয় না। একদা ব্রিটিশ ব্রেকফাস্ট ছিল সুখ্যাত। জ্যাম, জেলী, মাখন, পাঁচ ছয়খানা টোস্ট, দুধ, কর্নফ্লেক, কমলা বা আপেলের রস, বেকনভাজা, একখানা বা চপ, কফির কেটলি, দুটো ডিমভাজা—এখন এসব খায় বিশিষ্ট ও ধনাঢ্যরা। এখন তার বদলে এসেছে 'কণ্টিনেণ্টাল' ব্রেকফাস্ট—যার মধ্যে আছে শুধু টোস্ট আর মাখন, দুধ বা কফি। একদা প্রধানমন্ত্রী মিঃ চার্চিল বছরে মাইনে পেতেন ৫ হাজার পাউণ্ড, এখন যে কোনও আপিসের পদস্থ ব্যক্তি বছরে ২৫ হাজার পাউণ্ড মাইনে পায়। সাধারণ কেরানি যারা, তাদের 'ডাইনে আনতে বাঁয়ে' কুলোয় না। ইংরেজ এখন গরীব-গেরস্থ। আমার যিনি প্রথম দিনের গাইড সেই প্রফেসর মিঃ হ্যামশায়ার বললেন, আমাদের মতো মানুষের একমাত্র সান্ত্বনা এই, আমাদের বয়স হয়েছে। অর্থাৎ মৃত্যুর দিন এগিয়ে এসেছে!

ভদ্রলোক বললেন, কমন মার্কেটে যোগ না দিয়ে আমাদের উপায় ছিল না, কিন্তু যোগ দেবার ফলে আমাদের এই হাল হয়েছে। আমাদের দেশের লোকসংখ্যা এখন ৫৬ মিলিয়ন, এর মধ্যে স্কটল্যাণ্ডের ৬ মিলিয়ন। কিন্তু আমাদের শতকরা ৫৫

ভাগ খাদ্যসামগ্রী আসে বাইরে থেকে। আমাদের সমস্যার শেষ নেই।

ব্রিটিশ কাউন্সিলের মিস আর এম গ্রীন আমাকে ওয়াশিংটনের ভারতীয় দূতাবাসে দু' তিনখানা চিঠি দিয়েছিলেন। সে সব চিঠি আমি পাই লস এঞ্জেলেসে, সানফ্রান্সিসকোয়, শিকাগোয় এবং নিউ ইয়র্কে। তাঁর চিঠিতে আন্তরিকতা ও অন্তরঙ্গতা মিলিয়ে থাকতো। কিন্তু তাঁর প্রতি পত্রে 'মিস' শব্দটি সুস্পষ্ট থাকার জন্য আমি কৌতুক বোধ করতুম। এবার সেই কাজলনয়না বর্ষীয়সী যুবতীকে প্রথম চোখে দেখলুম। তিনি সুবেশা ও সুশ্রী মহিলা। তিনি আমার ভ্রমণসূচী নিখুঁৎভাবে প্রস্তুত করে রেখেছিলেন। কিন্তু আমাকে অনেকটা 'নাবালক' ঠাউরিয়ে তিনি যেভাবে আমাকে নির্দেশ, নিয়মাবলী, পরামর্শ এবং উপদেশ দিচ্ছিলেন, তাতে আমার হাসি চেপে রাখা কঠিন হচ্ছিল। তিনি আমার জন্য দৈনিক ভাতার বন্দোবস্ত করে বলে দিচ্ছিলেন, আপনি 'কনটিনেন্টাল' ব্রেকফাস্ট খাবেন, তার খরচা আমাদের। কিন্তু এ ছাড়া যা কিছু খরচ সব আপনার ওই ভাতা থেকে। হাত খরচ, টেলিফোন, ধোবা-নাপিত, লাঞ্চ-ডিনার ইত্যাদি সব ওই 'ডেলি' এলাওয়েন্স! কেমন? বুঝেছেন? আরেকবার বলে দেবো?

আমি ওঁর মুখের দিকে চেয়েছিলুম। এবার বললুম, আপনি নামের পাশে কুমারী লেখেন কেন? ওটা কি বিজ্ঞাপন?

উনি বোধ হয় কথাটা বুঝতে পারেননি। বললেন, অ্যাঁ, কি বললেন? যা বললুম এতক্ষণ, বুঝতে পারেননি বুঝি? তা হলে আবার শুনুন—

আমার অপরিসীম ধৈর্যের অভাব ঘটেনি। কিন্তু মহিলার মিষ্ট আচরণ এবং পরিচালনা নীতি আমি তারিফ করছিলুম। পরবর্তীকালে তিনি আমার ভ্রমণ ব্যবস্থাকে সর্বপ্রকারে সফল করে তুলেছিলেন। এমন কাঠিন্যের মোড়ক ঢাকা মিষ্টভাষিনী মেয়ে কমই দেখেছি।

লণ্ডনের বর্তমান জীবনধারা এবং লণ্ডনের বহির্দৃশ্য—এ দুটো এক নয়। টেম্স নদীর দুই পারে এমন বহু অঞ্চল রয়েছে যেগুলি শোভা সৌন্দর্যে অনবদ্য। পার্লামেণ্ট হাউস, ওয়েস্টমিন্সটার আবে, সেই পুরনো 'বিগবেন' টাওয়ার ক্লক, এদিকে সেই পুলের ওপর টাওয়ার অফ লণ্ডন—যার মধ্যে ইংরেজ জাতির বীভৎস ইতিহাস পুঞ্জীভূত, ও পারে বন বাগানে ভরা সুন্দর ছায়াবীথি, লর্ডসদের একেকটি সুদৃশ্য বাগানবাড়ি, ব্যারন বা কাউন্টদের মনোরম অট্টালিকা—এগুলি দেখার মতো। লণ্ডন অতি বৃহৎ নগরী। বাকিংহাম প্যালেস, মহারানী ভিক্টোরিয়ার বৃহৎ প্রস্তর মূর্তি, মার্লবরো হাউস—এদের উপর থেকে সেই প্রাচীন জেল্লা যেন হারিয়ে গেছে। ডাউনিং স্ট্রীট এখন যেন মামুলী। সাম্রাজ্য শাসনের কালে ইংরেজদের যে গর্ব, গৌরব এবং যে পর্বত পরিমাণ আত্মগরিমা দেখা যেত,—আজ যেন সে সব উবে গেছে। ইংরেজদের চরিত্র বদলেছে, প্রকৃতির মধ্যে এসেছে সহনশীলতা। এখন সে আর বলে না, "Keep Britain White" 'গ্রেট বৃটেন' থেকে 'গ্রেট' শব্দটা হারিয়ে গেছে, সাম্রাজ্য লোপাটের পর এখন আর সেই পুরনো সিংহনাদ 'Rule Britannia' শোনা যায় না। ইংরেজ এখন শান্ত, নিরীহ। ইংরেজ এখন বন্ধু। কিন্তু আন্তর্জাতিক কূটনীতিতে ইংরেজদের মাথা আজও ঠাণ্ডা। ইংরেজের হঠকারিতা কম।

আমি যাচ্ছিলুম হাইড পার্ক আর কেন্সিংটন গার্ডেনস পেরিয়ে, বাকিংহাম

প্যালেসের পাশ কাটিয়ে, বাগানগুলো ছাড়িয়ে, বড় সেই হাসপাতালটাকে পিছনে রেখে—দূর থেকে দূরে চলে যাচ্ছিলুম। কিন্তু এরই মধ্যে এক স্থলে বৃটিশ কাউন্সিলের সাহিত্য বিভাগে দাঁড়িয়ে মিঃ লিডারডেল-এর সঙ্গে আধুনিক ইংরেজি সাহিত্য নিয়ে গল্পগুজব করে গেছি। তিনি মিষ্ট প্রকৃতির এক বয়স্থ যুবা। বর্তমানকালের ইংরেজি সাহিত্য সম্বন্ধে আমার উৎসাহ কিছু কম, এবং অনুবাদ সাহিত্যে ইংরেজদের জুড়ি নেই,—এটি তিনি শুনলেন। তিনি একটি দোকানে এনে বসলেন এবং এক গেলাস কমলালেবুর রস নিয়ে বসে সাহিত্যের আলোচনা তুললেন। প্রসঙ্গক্রমে কথা উঠল, ইংরেজদের সেই বিশুদ্ধ ইংরেজি ভাষায় একালে বহু মিশ্রণ ঘটছে। ফলে, ভাষার সেই শুচিতা কমে যাচ্ছে। আমেরিকায় শুনে এলুম, ওদের নাকি ২১ রকমের ইংরেজি ভাষা আছে! অস্ট্রেলিয়ার ইংরেজি, ভারতের ইংরেজি, খৃস্টান আফ্রিকার কলোনিয়াল্ ডায়লেক্ট,—সব এসে মিশে যাচ্ছে। যুক্তরাজ্যে ওয়েলস তার নিজস্ব ভাষা পড়ে—তার পাঠ্যতালিকায় ইংরেজি উপেক্ষিত, এবং স্কটল্যান্ড তার নিজের ডায়ালেক্ট চালায়। এদিকে ইংল্যান্ডের মূল ভূখণ্ডে অগণিত সংখ্যক জাতির লোক এসে জায়গা নিয়েছে,—তারা সবাই এক বিচিত্র ইংরেজি সৃষ্টি করে চলেছে। এদের সকলের সম্মিলিত প্রভাব ইংরেজি ব্যাকরণকে ক্ষতবিক্ষত করে যাচ্ছে এতে সন্দেহ নেই। লিডারডেল্ কমলার রসে চুমুক দিলেন। ওঁর মিষ্ট কথাবার্তায় আমি আনন্দ পেয়েছিলুম।

ইংল্যান্ডে ঠাণ্ডা পড়েছে অক্টোবরের মাঝামাঝি। মাঝে মাঝে মেঘলা, মাঝে মাঝে একটু-আধটু রোদ। পুরুষের গায়ে গরম সোয়েটার আর সুট, মেয়েরা মাথায় এবার ফেট্টি বাঁধছে।

প্রফেসর হ্যামশায়ার আমাকে প্যাডিংটন স্টেশনে এসে ট্রেনে তুলে দিলেন বেলা ঠিক দশটায়। তখনও ডেলি প্যাসেঞ্জারদের ভিড়। প্রায় প্রত্যেকের হাতে একটি করে ঝোলা বা ভদ্র চেহারার থলে—আপিস থেকে ফেরার পথে বাজার-হাট করে ফিরবে। মেয়েরাও তাই। পরিচ্ছদ তাদের নিত্য বিচিত্র হওয়া চাই, কারণ আকর্ষণীয় না হলে চলবে না! আমেরিকান মেয়েদের মতো এরা খুব বেশি 'হট্ প্যান্ট' পরে না, ওতে পুরুষের মাথা ঠাণ্ডা থাকে। এক শ্রেণীর বিলেতী মেয়ে মাঝে মাঝে ছটফটিয়ে ওঠে বটে, কিন্তু ইংল্যান্ডের ক্ষণমতী আবহাওয়ার চটুলতা ওদের দেহের অধিকাংশকেই এখনও 'আবৃত' করে রাখে। কথায়-কথায় ওদের গৃহবিচ্ছেদ বা বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে না।

ঘণ্টাখানেকের কিছু বেশি পথ। ইদানীং রেল ভাড়াও বেড়েছে প্রচুর। ধরো, ৬০ মাইল পথে সেকেন্ড ক্লাসের ট্রেন ভাড়া সাড়ে ৫ পাউন্ড। ভারতীয় টাকায় প্রায় একশ।' তবে এটা 'বাবু' ট্রেন, ঠিক ডেলি প্যাসেঞ্জারের ট্রেন নয়। মাঝপথে এ ট্রেন কোথাও থামল না। শিল্পপ্রধান অঞ্চলগুলির ভিতর দিয়ে কয়েকটি গ্রাম পেরিয়ে গাড়িখানা সোজা এসে থামল অক্সফোর্ডে। অক্সফোর্ড আমার অপরিচিত নয়। এটি মস্ত শহর এবং পুরনো কাল থেকে এর বিস্তার আধুনিক কাল পর্যন্ত এগিয়ে এসেছে। এই শহরের গৌরব এর বিশ্ববিদ্যালয় এবং মোট বোধ করি ২৪টি কলেজ এখানে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। শুধু যুক্ত রাজ্যেরই নয়, পৃথিবীর বড় বড় মনীষী ও পণ্ডিত এখানে বিদ্যার্জন করেছেন। বিধি নিয়মের কড়াকড়ি, নিয়মানুগত্য, ছাত্রাবাসগুলির সুব্যবস্থা, মিশনারি অধ্যাপকদের তপশ্চর্যার মতো

বিদ্যাদান, ছাত্র ও শিক্ষকদের মধ্যে সখ্যতা ও সম্প্রীতি—এগুলি পর্যবেক্ষণ করে আমি প্রচুর আনন্দ পেয়েছিলুম। এখানে ছাত্রদের ইউনিয়ন আছে, কিন্তু তার প্রধান উদ্দেশ্যটা বিদ্যা ও শিক্ষাকেন্দ্রিক, রাজনৈতিক কোনও হুজুগের প্রবেশ সেখানে নেই। নেতারা তাদেরকে কথায়-কথায় স্তোক বাক্য দিয়ে একদিকে বলে বেড়ায় না, তোমরাই দেশের ভবিষ্যৎ এবং অন্যদিকে তাদের ভবিষ্যৎকে প্রতি পদে পদে দুঃসাধ্য করেও তোলে না! দেশের বড় বড় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি এখানে যখন ছাত্রমহলে দেখাশোনা করে যান্—সে যেন অনেকটা তীর্থপরিক্রমার মতো। ছাত্র বা ছাত্রীরা এখানে যোগাশ্রমের তপস্বীর মতো বাস করে।

ক্যামব্রিজও তাই। ক্ষুদ্র একটি নদীর নাম 'ক্যাম', তার দুই পারে বড় বড় বিশ্ববিদ্যার কেন্দ্র। অক্সফোর্ডের জনতার সমাগম এখানে কম,—এটি বনে বাগানে উদ্যানে পুষ্পবীথিতে যেন শোভাসমৃদ্ধ। ক্যাম নদীটিতে নৌকাচালনার প্রতি-যোগিতা একটি প্রধান আকর্ষণ। পৃথিবীর বহু রাষ্ট্রনেতা এবং ভাবনায়ক এই দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ে মানুষ হয়েছেন। ক্যামব্রিজ শহর লণ্ডন থেকে সোজা উত্তরে ৫০ মাইল দূরে—এসেক্স এবং হার্টফোর্ট নামক দুটি বড় কাউণ্টির ভিতর দিয়ে ইস্ট অ্যাংলিয়ান পার্বত্যভূমি পেরিয়ে ওখানে গিয়ে পৌঁছতে হয়।

অক্সফোর্ডে লিন্টন লজ হোটেলের তেতলায় একটি ঘরে উঠেছিলুম। এদিক-টায় পথঘাট নিরিবিলি এবং অনেকটাই জনবিরল। অক্সফোর্ড নগরের এটি প্রাচীন পল্লী এবং চারিদিকে খাস ইংরেজের পাড়া। এ ইংরেজ পুরনো কালের অভিজাত, কতকটা উন্নাসিক, কিছুটা বর্ণবিদ্বেষী। কিন্তু দিনকালের আবহাওয়া অনুসারে এখন এরা আর সরব নয়। এরা জেনেছে ইংরেজের পুরনো যুগ এখন আর নেই, ব্রিটিশ 'সাম্রাজ্যে' সূর্য এখন অস্ত যায়, সেই কালের ভিত এখন নড়ে গেছে।

লিন্টন লজেই এসে আলাপ করলেন মিসেস পার্কার এবং মিঃ জন প্রেস। এঁরা উভয়েই ব্রিটিশ কাউন্সিলের কর্মচারী। এঁরা আমার ভ্রমণসূচী স্থির করার জন্য নানা জায়গায় ফোন করলেন।

প্রাচীন শহরের সরু ও সঙ্কীর্ণ গলিঘুঁজি দেখতে পাচ্ছিলুম এখানে-ওখানে। লণ্ডনে এবং অন্যত্র সারা বছরে যখন তখন বৃষ্টি ও মেঘলা প্রবাদের মতো। কিন্তু সেই বর্ষাবাদল ঘনীভূত হয় সেপ্টেম্বরে, অনেকটা যেন মনসুনের মতো। আমেরিকা বলো, ইউরোপ বলো—বৃষ্টি হতে থাকলে পথচারীদের পক্ষে সমস্ত অসুবিধা, গাড়ি-বারান্দার আশ্রয় পাওয়া যায় না। সেই কারণে ওসব দেশে ছাতা বিক্রি হয় প্রচুর। ছাতাগুলির বাঁট ছোট এবং দেখতে সুশ্রী। যাই হোক, বিদেশে বিভুঁইয়ে পথ হারাতে আমার ভালই লাগে। ওতে নতুন নতুন পথঘাট দেখে নেওয়া যায় এবং যাকে প্রশ্ন করে জানব, তার স্বভাব প্রকৃতির আভাসও পাওয়া যায়। এইভাবে এগিয়ে এক সময় বড় রাস্তার উপরে যে জাদুঘরটির সামনে এসে দাঁড়ালুম তার নাম 'অ্যাসমোলিয়ান' (Ashmolean) মিউজিয়ম। বহুকাল আগে লেডি এসমোল নামক এক মহিলার অবদান আছে এখানে প্রচুর। এটি অতি প্রাচীন। মিশরের 'মমি' থেকে ভারতীয় বৌদ্ধ যুগ, কিছু ব্রিটিশ, কিছু বা টেরাকোটা। এই জাদুঘর আমি অনেকটা দৈন্য দশাই দেখতে পাচ্ছিলুম। এদের চেয়ে অনেক উন্নত ভারতীয় জাদুঘর। কলকাতা, সারনাথ, মথুরা, দিল্লী, আগ্রা, জয়পুর, হায়দরাবাদের সালাজার—এরা সেদিক থেকে অনেক বেশি ধনী। সোভিয়েট ইউনিয়নের বিভিন্ন মিউজিয়ম

বড় বড় শিক্ষার কেন্দ্র। তারা দশ মিনিটের মধ্যে দর্শককে অভিভূত করে। তাসকন্দ মিউজিয়ম প্রাচ্য ভূখণ্ডের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জাদুঘর।

পরদিন আমি পশ্চিম ইংল্যাণ্ডের ওয়েলস প্রদেশের দিকে রওনা হলুম। এ যাত্রায় যুক্তরাজ্য ভ্রমণ শেষ করে যাব।

॥ ১৪ ॥

অক্সফোর্ড থেকে ট্রেনে যাচ্ছিলুম দক্ষিণ পথে। দুই ধারে ঘন সবুজ ময়দান এবং দূরে দূরে পাহাড়শ্রেণী। মাঠে মাঠে দেখা যাচ্ছে লোমশ ভেড়ার পাল এবং মধ্যে মাঝে বড় বড় বিশেষ আকারের ও বিভিন্ন বর্ণের গাভী। অক্টোবরের আকাশে মেঘদল ভাসছিল।

বহু লোকেই বলে, ইংরেজদের গ্রামই হল ইংরেজের প্রকৃত পরিচয়। কিন্তু সেই সব সমৃদ্ধ গ্রাম রেলপথের ধারে দেখা যায় কম। গ্রামগুলি থাকে একটু ভিতরে এবং গ্রাম মানেই একেকটি ক্ষুদ্রায়তন জনপদ। স্কুল কলেজ, টাউন হল, একাধিক ক্লাব বা অ্যাসোসিয়েশন, খেলার মাঠ, আবাসিক হোটেল, জলাশয় ও পার্ক, সর্বপ্রকার আধুনিক জীবন-ব্যবস্থা, হাট-বাজার—প্রত্যেকটি গ্রাম স্বয়ংসম্পূর্ণ। দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের পর যখন ব্রিটিশ এম্পায়ার ভাঙলো তখন পৃথিবীর নানা দেশ থেকে দখলকারী ব্রিটিশ সেনাদল এবং ব্রিটিশ প্রশাসকগোষ্ঠী স্বদেশে ফিরে আসতে বাধ্য হয়। ফলে সাড়ে তিন কোটি বা চার কোটি জনসংখ্যা এখন দাঁড়িয়েছে সাড়ে পাঁচ কোটিরও বেশী। ইংরেজের অর্থনীতিক সমস্যা এখন পর্বতপ্রমাণ। রেলপথের দু ধারে যত দূরেই যাও, দেখতে পাবে নতুন নতুন শিল্পপ্রতিষ্ঠান এবং নতুন নতুন শিল্প-নগরী—যেগুলি বিশ্বযুদ্ধের আগে দেখতে পাওয়া যেত না। একালে নতুন একটা রব উঠেছে, ব্রিটিশ রাজতন্ত্রের অধীনেই ব্রিটিশ সোস্যালিজমের অভ্যুত্থান ঘটুক। প্রকৃতপক্ষে উইলসন গভর্নমেণ্টকে সোস্যালিস্ট গভর্নমেণ্ট বলে অনেকেই অভিহিত করছে।

দক্ষিণ-পশ্চিম পথ ধরে রেলপথটি বার্কশায়ারের ভিতর দিয়ে উইল্টশায়ারে এসে সুইনডন শহরের স্টেশনে থামল। 'শায়ার' শব্দটির অর্থ ছোট বা বড় একটি জেলা। 'কাউণ্টি' হল আরও ছোট। স্টেশনগুলি শাদামাটা, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া চাকচিক্য কম। অধিকাংশ প্লাটফরম খোলা। ঠাণ্ডার জন্য বাইরে কেউ বেঞ্চিতে বসতে চায় না। সুইনডন ছেড়ে আমাদের গাড়ি গ্রামের পর গ্রাম পেরিয়ে পশ্চিম পথ ধরে এসে থামল নিউপোর্টে। এর মধ্যে গ্লসটার শায়ারে এভন নদীর মোহানা-ব্রীজ পার হয়ে আমরা ওয়েলস প্রদেশে ঢুকলুম। অতঃপর নিউ পোর্ট থেকে 'কার্ডিফ'। কার্ডিফ হল ব্রিটিশ বাণিজ্যের এক সুপ্রসিদ্ধ ঘাঁটি—এটি ব্রিস্টল চ্যানেলের তীরভূমির এক বিশাল শহর। এই শহর ছাড়িয়ে আবার আমাদের পথ চলল উত্তরদিকে। মাঝখানে আমি ডিডকট্ ও সুইনডন—এই দুটি স্টেশনে পর পর গাড়ি বদল করে নিয়েছিলুম। বলা বাহুল্য, প্রতি স্টেশনে মিনিট ধরে গাড়ি এসে দাঁড়ায়, ঘড়ির কাঁটায় তিলমাত্র ব্যতিক্রম ঘটে না।

কার্ডিফ থেকে গ্ল্যামরগান প্রদেশের ভিতর দিকে ট্রেন যাচ্ছিল। এটি

ওয়েলস-এর দক্ষিণ সমুদ্র প্রদেশের রেলপথ। ট্যালবট বন্দরের কোল ঘেঁষে অবশেষে আমার গন্তব্যস্থল সোয়ানসী নগরে এসে যখন গাড়িখানা দাঁড়াল তখন সন্ধ্যা। সোয়ানসী নগর ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। সন্ধ্যার আবছায়ার আলোতেই অস্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছিলুম, বিশাল সমুদ্র তীরবর্তী এক বিস্তীর্ণ পার্বত্য উপত্যকায় এসে পৌঁছেছি।

জ্যাক উইলিয়মস নামক এক ভদ্রলোক আমাকে নামাতে এসেছিলেন। প্রথমেই বন্ধুর মতো আপ্যায়ন করে বললেন, দুবার আপনাকে গাড়ি বদল করতে হয়েছে, অসুবিধে হয়নি তো? আপনার পরিচয় আমরা আগেই পেয়েছি।

উনি সোৎসাহে বিশেষ যত্নের সঙ্গে আমার ব্যাগ ও ব্রিফকেসটি গাড়িতে তুলে নিলেন এবং আমাকে এ পথ সে পথ ঘুরিয়ে এক সময় কিংসওয়ে সার্কেলের রাজপথে অবস্থিত ড্রেগন হোটেলের পাঁচতলার উপরে একটি ঘরে তুললেন। শুনলুম এই প্রাসাদসম হোটেলটি এই নগরের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সম্ভ্রান্ত। ঘরটি কার্পেটপাতা, বৃহদাকার, আরামদায়ক, সাজসজ্জাবহুল এবং পাশাপাশি দুটি ডানলপ-পিলোর বিছানা। হাতের কাছে টেলিভিসন সেট এবং টেলিফোন। উইলিয়মস চলে যাবার পর তরুণ বয়স্ক একটি যুবক আমার দুটি ব্যাগ এনে গুছিয়ে রাখল। আমি চায়ের অর্ডার দিলুম।

সবেমাত্র গুছিয়ে বসেছি এমন সময় দরজায় নক্ শুনে উঠে গিয়ে দেখি এক হাস্যমুখী সুশ্রী তরুণী চায়ের ট্রে নিয়ে হাজির এবং শুভ সন্ধ্যা জানিয়ে ভিতরে এসে টিপাইয়ের ওপর ট্রে-টি রেখে বিদায় নিল। পৃথিবীব্যাপী এই একই নিয়ম। বিমানের মধ্যে হোস্টেস, ব্যাঙ্কের কাউন্টারে ক্লার্ক, রেল স্টেশনে টিকিট বিক্রেতা, রেস্টুরেন্টের ওয়েট্রেস, বড় বড় হোটেলের রিসেপসনিস্ট—এরা সুন্দরী ও স্বাস্থ্যবতী না হলে চাকরি পায় না। এই আন্তর্জাতিক মহিলাবর্ষের কালেও দেখা যাচ্ছে পৃথিবীর উপরে সর্ববিধ আধিপত্য পুরুষেরই। পুরুষের চক্ষু ও মনকে উৎফুল্ল করার জন্য মেয়েদেরকে আকর্ষণীয় হতে হবে। চোখের উপর পাতায় রং, ওষ্ঠাধরে রক্ত রং, সাজসজ্জায় যৌবনশ্রী সংরক্ষণ, আনগ্ন বাহুদ্বয়—এগুলির পিছনে সেই একই প্রয়োজন, এবং সেই একই অর্থনৈতিক কারণ। মোলাটে আলোয় প্রায়নগ্না তরুণীর 'গো গো' নৃত্য, নাইট ক্লাবের স্ট্রিপটীজ, সিনেমার সেক্সি ফিলম, মেয়েদের টু পীস বিকিনি পোশাক, হট প্যান্ট—সমস্তগুলির উদ্দেশ্য একই। আমার প্রবীণ বয়সের সুবিধা নিয়ে একবার একটি আমেরিকান মেয়েকে প্রশ্ন করেছিলুম, তোমরা এত আলগা গায়ে থাক—শীত করে না?

মেয়েটি হাসিমুখে জবাব দিয়েছিল, শীত করলে আমাদের চলে না!

ওয়েলস-এর উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণে সমুদ্র। আটলান্টিক মহাসাগর এই সব স্থলভূমের দিকে সঙ্কীর্ণ হয়ে বিভিন্ন নাম নিয়েছে। ওয়েলস-এর উত্তর যেমন ব্রিস্টল চ্যানেল, দক্ষিণে ইংলিশ চ্যানেল এবং আরও দক্ষিণে নেমে গেলে বে-অফ-বিসকে। ওয়েলস ভূভাগটি যেখানে সঙ্কীর্ণ স্থলভূমি হয়ে পশ্চিম দিকে আটলান্টিকে গিয়ে শেষ হয়েছে, সেই ভূভাগটির নাম কর্নওয়াল প্রদেশ। শেষ বিন্দুটির নাম 'ল্যান্ডস এন্ড'। আমি ওই মেঘলা দিনের সকালে ভ্রমণ করছিলুম দক্ষিণ সমুদ্র তীরবর্তী সোয়ানসীর পাহাড়ে পাহাড়ে। ঠাণ্ডা প্রচুর। বৃষ্টি হয়েছে একটু আগে।

'ডাইলান টমাস অ্যাসোসিয়েশনের' নানা প্রতিষ্ঠান দেখছিলুম। উত্তরাঞ্চলের পাহাড়তলাতে প্রাচীনকালের মহারণ্য। তাদেরই মধ্যে ওয়েলস-এর ইতিহাসে কর্মবীর ও বড় যোদ্ধা কোয়ামডনাকনের নামে একটি বিশাল পার্ক ও তাঁর জন্মস্থান দেখছিলুম। আশে পাশে সুদূর জনশূন্য পথগুলি ঘুরে দেখছিলুম বটে, কিন্তু এখানকার নিভৃতলোকে আবামশ্র অভিজাত ইংরেজ সমাজের বড় বড় অট্টালিকাগুলি বন ও বাগানে পরম রমণীয় হয়ে রয়েছে। আমি এই উপত্যকার একেকটি পাহাড় অতিক্রম করে যাচ্ছিলুম।

নীচে নেমে এসে যখন ইংলিশ চ্যানেলের সমুদ্র তীরের পথ ধরলুম তখন প্রায় মধ্যাহ্ন। একদিকে সমুদ্র, দূর দূরান্তে কয়েকটি জাহাজ চলাচল করছে। দ্বীপবাসী ইংরেজের প্রাণসূত্র আজও বাঁধা রয়েছে প্রতি জাহাজে। এই প্রাণসূত্রকে নির্বিঘ্ন রাখার জন্য সে স্পেনের ফ্রাঙ্কো বা মরক্কোর সুলতানের সঙ্গে আজও ঝগড়া বাধায়নি, কারণ জিব্রালটার প্রণালী দিয়ে তার জাহাজকে পার করতে হবে! ১৯৫৬ সালে সে ফ্রান্সের সহযোগে মিশর আক্রমণ করে একবার ভুল করেছিল সুয়েজ খালের উপর আধিপত্য নিয়ে। ফলে, আন্তর্জাতিক সমালোচনা ও বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী নেহরুর তিরস্কারে তদানীন্তন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ ইডেনের চাকরি যায়। সম্প্রতিকালে ইংরেজ তার প্রাণসূত্র বজায় রাখতে বাধ্য হয় উত্তমাশা অন্তরীপের পথে তার জাহাজ চালিয়ে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপান দক্ষিণ-পূর্ব প্রাচ্যে ব্রিটিশ নৌশক্তিকে ছারখার করতে বসেছিল।

যত দূর যাওয়া যায় তত দূরই যেন নতুন নতুন আবিষ্কার। যেখানে যাচ্ছি এবং যেদিকেই চেয়ে দেখছি, ইংরেজরা বানাচ্ছে দুটি জিনিস—বসবাসের জন্য ঘরদোর এবং শিল্পপ্রতিষ্ঠান। অর্থাৎ অন্ন এবং আশ্রয়। সমস্ত ইউরোপ থেকে তাকে বহু পরিমাণ খাদ্য কিনতে হয়, কিন্তু ফ্রান্স প্রমুখ কোন কোনও জাতের বৈরিতা সত্ত্বেও কমন মার্কেটে ঢুকে তাকে নাজেহাল হতে হচ্ছে। মালের সরবরাহ যথেষ্ট নয়, সুতরাং প্রতি সামগ্রীর দাম বেড়েছে হু হু করে—যেটা বাড়ে সেটা আর কমে না! প্রতি শ্রমিককে প্রতি সপ্তাহের পাঁচ দিনের জন্য ৩৫ পাউন্ড দিতেই হবে—এটি আইনসিদ্ধ। শ্রমিকরা কাজে আসে না, অসুস্থতার অছিলায় ছুটি নেয়, একদিনের কাজ তিন দিনে করে, ডক থেকে মাল ওঠানামা করতে চায় না, কয়লাখনি কথায় কথায় বন্ধ, শ্রমিক ইউনিয়নগুলো যখন-তখন ধর্মঘটের আওয়াজ তোলে। এরই সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন সমস্যায় নাগরিকদের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, শিক্ষাকেন্দ্র, বা বহু প্রাইভেট সেকটর জাতীয়করণের ফলে সমস্যা এনেছে বহুবিধ, এবং এদেরই জাঁতাকলে পড়েছে উইলসন গভর্নমেন্ট। এই পরিস্থিতির থেকে উদ্ধার করার জন্য ব্রিটিশ রক্ষণশীল দল দাঁড়িয়েছে মিঃ হ্যারল্ড উইলসনের বিরুদ্ধে এবং তাঁদের মুখপাত্রীস্বরূপ পাদপ্রদীপের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন অপেক্ষাকৃত কম বয়সের এক সুদর্শনা মহিলা মিসেস মার্গারেট থ্যাচার।

অদূরে ট্যালবট বন্দর। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কালে হিটলারের বিমান আক্রমণের ফলে ব্রিটেনের নাভিশ্বাস দেখা দেয়। সেই কালে এই বন্দর ইংরেজের প্রাণরক্ষার কাজে লেগেছিল। এই বন্দরে এসে পৌঁছতো চুপি চুপি আমেরিকার খাদ্যবাহী জাহাজ। তারা আসত রাত্রির অন্ধকারে। কিন্তু এই ট্যালবট বন্দরও হিটলারের বোমাবর্ষণ থেকে রক্ষা পায়নি, কারণ হিটলারের লক্ষ্য ছিল ব্রিটিশ জাতিকে উপবাস

করিয়ে আত্মসমর্পণে বাধ্য করা। সেই কালে সমস্ত প্রকার দুর্দশার মধ্যে ইংরেজ জাতি আপন লৌহপ্রকৃতির যে পরিচয় দেয়—যে নিয়মানুগত্য, স্বাদেশিকতা, ইচ্ছাশক্তি এবং কর্মঠতার পরিচয় দিতে থাকে, তার তুলনা কেবল সোভিয়েট ইউনিয়নেই মেলে! আজও ওয়েলস-এর দাক্ষিণাঞ্চলে সেইকালের বোমা বর্ষণের চিহ্ন সুস্পষ্টভাবেই দেখা যায়।

দুপুরে এক সময় এসে পৌঁছলুম সোয়ানসী বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যামপাসে। এখন রৌদ্রোজ্জ্বল চারিদিক। পাহাড়ে বনে জলাশয়ে প্রান্তরে—যেন অপরূপ নিসর্গ শোভা প্রসারিত। উইলিয়মস কিছুক্ষণের জন্য বিদায় নিলেন। কিন্তু যিনি নিউ আর্টস নর্থ বিল্ডিংয়ের ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের পক্ষ থেকে বিশেষ সমাদরের সঙ্গে আমাকে গ্রহণ করলেন তিনি ডক্টর জে এ রামশরণ। ভারতীয় নামে এখানে এক প্রফেসর রয়েছেন এবং তিনি ডিপার্টমেন্টের হেড—এটি অভিনব। অল্পকালের মধ্যে তাঁর সঙ্গে আত্মীয়তা ঘটে গেল। তাঁর পরিচয়টি অধিকতর আকর্ষণীয়। একশ' বছরেরও বেশী আগে তাঁর প্রপিতামহ গোষ্ঠীকে ইংরেজরা ক্রীতদাসরূপে ধরে নিয়ে যায় বারানসী জেলার এক গ্রাম থেকে। সেদিনকার সেই শৃঙ্খলবন্দী ক্রীতদাসের দলটিকে শ্রমিকের কাজের জন্য নিয়ে যাওয়া হয় ক্যারিবিয়ন সমুদ্রের একটি দ্বীপে—সেই দ্বীপটি ওয়েস্ট ইন্ডিজ দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত। তদানীন্তন এক শ্রেণীর ভারতীয় এবং আফ্রিকার এক বিশেষ শ্রেণীর নিগ্রো—এরাই উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার মূল ভূখণ্ডে, উপদ্বীপে, দ্বীপপুঞ্জে, পোর্টোরিকোয়, ডোমিনিকানে, হনডুরাসে, ব্রিটিশ গয়না প্রভৃতি বহু অঞ্চলে ক্রীতদাস বংশের সৃষ্টি করে। ডঃ রামশরণ সেই ক্রীতদাস গোষ্ঠীরই সন্তান। তরুণ বয়সে তিনি ইংল্যাণ্ডে আসেন, লণ্ডন ইউনিভার্সিটিতে পড়াশুনো করেন এবং এক ইংরেজ নারীর সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। তিনি এখন পঞ্চাশোর্ধ্বে এবং তিন চারটি সন্তানের পিতা। লণ্ডনে তাঁর নিজস্ব বাড়ি। রামশরণ হিন্দী লেখাপড়া জানেন এবং আমার কাছে প্রতিশ্রুতি আদায় করলেন, আমার হিন্দী অনুবাদের দু'একখানি বই তাঁকে পাঠাবো! তিনি তাঁর পূর্ব পুরুষের দেশ ভারতকে একান্ত শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন এবং একদা এক বিশেষ কনফারেন্স উপলক্ষ্যে তিনি যখন ভারতে যান তখন বারানসী সীমান্তবর্তী সেই পিতৃপুরুষের গ্রাম তিনি খুঁজে পাননি। রামশরণের চোখ দুটো বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে এল। এই বিদ্বান ও সুপণ্ডিতের সঙ্গে আলাপ করে খুবই আনন্দ পেয়েছিলুম।

দুটি তরুণ বয়স্ক ইংরেজির লেকচারার আমাদের ঘরে এসে গল্পে যোগ দিলেন। একজনের নাম মিঃ এম-ডবলু-টমাস, অন্যজন মিঃ এ-ভার্নে। এঁরা দুজনেই রামশরণের ছাত্র ছিলেন। এই দুটি নব্য যুবকের হাস্যোজ্জ্বল গল্পগুজবে সেদিন ক্যানটিনের লাঞ্চ সকলের পক্ষে উপভোগ্য হয়ে উঠেছিল। সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন আরও দুজন প্রবীণ ও রসিক অধ্যাপক। আহারাদির পর তাঁরা সবাই মিলে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে আমাকে নিয়ে ঘুরিয়ে দেখান।

ওয়েলস-এর নিজস্ব ভাষা এখানে প্রচলিত। ইংরেজির পাশে-পাশে সেটি চলে। এটি রোমান হরফে বিচিত্র এক ভাষা, —আমার কাছে দুর্বোধ্য। রাষ্ট্রভাষা ইংরেজি বটে, কিন্তু ওয়েলস তার নিজের দাবি ছাড়েনি। শুধু তাই নয়, আপন স্বকীয়তা রক্ষার জন্য এখানকার অধিবাসীরা প্রতিটি মানচিত্রে ওয়েলস-এর পৃথক অস্তিত্ব

(identity) স্বীকার করিয়ে নিয়েছে।

ব্রিটিশ কাউন্সিলের মিসেস জনস্ অপরাহ্নে চায়ের আমন্ত্রণ করেছিলেন। এই মহিলার আপ্যায়ন ও আলাপচারী বড় মধুর মনে হয়েছিল। তাঁর মিষ্টপ্রকৃতির চুম্বক-আকর্ষণ পাছে আমার গতিকে ব্যাহত করে সেজন্য ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই তাকে যথাযোগ্য সমাদর জানিয়ে বিদায় নিয়েছিলুম। এবার আমি ইংল্যাণ্ডের মধ্যদেশের দিকে রওনা হবো।

উইলিয়মস-এর বোধ হয় নেশা ধরেছিল আমাকে নিয়ে বেড়িয়ে বেড়াবার। সোয়ানসী এলাকার সর্বত্র খুঁটিয়ে সে আমাকে দেখাতে লাগল। পাকা রাস্তা যে পর্যন্ত সমুদ্রের খাঁড়িতে গিয়ে শেষ হয়েছে, সেই স্থলটিতে নিয়ে গিয়ে আমাকে দেখাতে লাগল কয়েকখানি ছোট ছোট ঘর—এই ঘরগুলি প্রমোদপ্রিয় তরুণ-তরুণীদের জন্য ভাড়া খাটে। ঘরের নিচেই স্নানের ঘাট এবং বালুচর। এমন নিভৃত নিরিবিলিতে তারা না এসে যাবে কোথা? আপনিও যদি জুলাই মাসে এখানে আসতেন, আপনারও বয়স কমে যেত!—ওর কথা শুনে হেসে অস্থির হচ্ছিলুম।

অবশেষে এক সময় এই সুন্দর সমুদ্রদেশ ত্যাগ করার সময় হল। এই প্রাকৃতিক শোভাসমৃদ্ধ নগরীর পার্বত্যলোক, সমুদ্র, বন, উপবন, জলাশয় এবং এর সম্মিলিত কাব্যরূপ আমার মনে এক স্থায়ী স্মৃতি রাখল। মিসেস জনস্-এর আতিথেয়তা মনে রাখব বৈকি। এককালে ভারতে দেখতুম শাসক ইংরেজকে, তাদের ছায়া মাড়াতে মন চাইত না। ইংরেজ টমি অপেক্ষা গ্রে-হাউণ্ড কুকুর অনেক বেশি নিরাপদ ছিল—এ আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। কিন্তু এই নিয়ে দু'বার ইংল্যাণ্ডে এসে ভদ্র শিক্ষিত নিরভিমান ইংরেজকে দেখে বন্ধুত্ব পাতাতে ইচ্ছা হল। তরুণ টমাস ও ভার্নেকে দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছিলুম। সোয়ানসীতে যেন আমি হৃদয়ের একটা অংশ রেখে এলুম।

উইলিয়মস আমাকে এক সময় গাড়িতে তুলে দিয়ে এল। আমি কার্ডিফে গাড়ি বদল করে দক্ষিণ থেকে উত্তরপথে মধ্য ইংল্যাণ্ডের দিকে রওনা হয়ে গেলুম।

ইংল্যাণ্ডের গ্রাম দেখতে দেখতে চললুম। পথের দুই ধারে একেকটি 'শায়ার'। যেমন 'মনমাউথ, গ্লস্টার, হিয়ারফোর্ড, ব্রেকনক, ডরসটার' ইত্যাদি। এর মধ্যে শহর বা সুসমৃদ্ধ জনপদও আছে একটির পর একটি। তার মধ্যে 'চেলতেনহাম, উরসেস্টার' এবং আরও কয়েকটি। মাঝে মাঝে পার্বত্যলোক, মাঝে মাঝে জলাশয়, ঘন সবুজ এক একটি ময়দান, ঝোপঝাড়, মাঝে মাঝে শীর্ণা নদী চলেছে আপন মনে। ঘোড়ার দল দেখা যাচেছ মাঠে মাঠে। ঘোড়ায় চড়া ওদের জাতিগত অভ্যাস। পল্লী-প্রদেশে যেখানে মোটরের সংখ্যা একেবারেই কম, সেখানে ঘোড়া প্রচুর কাজে লাগে। ইংল্যাণ্ডের ঘোড়া অতিশয় বলবান ও সুগঠিত।

ইউরোপের দেশগুলিকে আমরা চিনতুম তাদের সাহিত্যে, সংস্কৃতি ও শিল্পকলার ভিতর দিয়ে। ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালী, স্ক্যানডিনেভিয়া, পোল্যাণ্ড, রাশিয়া ইত্যাদি দেশের সাহিত্যের সংজ্ঞা ছিল 'কণ্টিনেণ্টাল'। কিন্তু এদের সর্বপ্রকার সাহিত্যের অনুবাদগ্রন্থ পেতুম ইংরেজিতে। ইংরেজকে যেমন আমরা চিনে এসেছি দুশ' বছর ধরে, তেমনি তাদের সাহিত্যকেও আমরা জেনে এসেছি দেড়শ' বছর হতে চলল। ইংরেজকে আমরা কাছের থেকে দেখেছি, দেখতে দেখতে চিনেছি। ওদের মুখের চেহারা, বাচনভঙ্গী, আচার-ব্যবহার, সমাজজীবন, রীতিনীতি—এসব চিনি। ওদের

সৌজন্য ও অসভ্যতা, ওদের সাম্রাজ্যবাদ ও শোষণ, ওদের ন্যায় বা অন্যায় বোধ, ওদের শিল্প সাহিত্য বা সংস্কৃতি—সব মিলিয়ে ওদেরকে দেখে এসেছি সুদীর্ঘকাল। ওরা কোনওদিন আমাদের আপন হয়নি, কিন্তু অনাত্মীয়ও হয়ে ওঠেনি। সেই কারণে যেদিন আমেরিকা ছেড়ে লণ্ডনে এসে নামলুম, সেদিন আমার নিজের মনোভাবকে একটু বিচিত্র মনে হয়েছিল। আলাস্কা ও পলিনেশিয়ার দ্বীপপুঞ্জ হয়ে সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের এপাড়া-ওপাড়া মাড়িয়ে এবং আটলাণ্টিক পেরিয়ে মোটামুটি ১৬।১৭ হাজার মাইল ঘুরে লণ্ডনে এসে প্রথমেই একটা কথা আমাকে পেয়ে বসল, যাক্ চেনা জগতে এলুম এতদিন পরে! সেই দেখতে পাচ্ছি চেয়ারিং ক্রশ, ট্রাফলগার স্কোয়ারের কবুতরখানা, ডাউনিং স্ট্রীটের গেট, পিকাডিলি, বুশ হাউস, আর্টগ্যালারি, মিউজিয়ম, লণ্ডন টাওয়ার, টেমস-এর ওপর মোট বোধ হয় একুশটা ব্রীজ, পার্লামেণ্ট, এমন কি ওই বিগ বেন ঘড়িটা—এসবই চেনা। এখানে আবিষ্কার নেই—সবই যেন ঘরোয়া।

এবার দেখতে দেখতে এমন একটি ছোট শহরে এসে নামলুম যেটি পৃথিবীর সকল সাহিত্য কর্মীর পক্ষে তীর্থস্থান। এটি এভন্ নদীর তীরবর্তী স্ট্রাটফোর্ড। ইংরেজি মানচিত্রে এটিকে বলা হয় স্ট্রাটফোর্ড-অন-এভন। এই কাষ্ঠপ্রধান ক্ষুদ্র শহর মহাকবি উইলিয়ম শেকসপীয়রের জন্ম ও কর্মভূমি। এটি ওয়ারউইক শায়ারের মধ্যে পড়ে এবং এভন নদীর ধার দিয়ে উত্তরপথে কয়েক মাইল অগ্রসর হলে পাওয়া যায় বিশাল বার্মিংহাম নগরী। দ্বিতীয় বড় শহর কভেনট্রি, লিমিংটন, রাগবি, ওয়ারউইক ইত্যাদি। এই জেলা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে, পার্বত্য উপত্যকায়, স্বচ্ছসলিল জলাশয়ে এবং হরিৎবর্ণ মাঠময়দানে আজও অপরূপ হয়ে রয়েছে। স্ট্রাটফোর্ডের উপর দিয়ে চলে গেছে অনেকগুলি শতাব্দী। এখানে কেবল শেকসপীয়র নন, তাঁর ভগিনী, আত্মীয় কুটুম্ব, পিতামাতা, শ্বশুর শাশুড়ি—সকলেই প্রায় এই অঞ্চলেরই মানুষ ছিলেন। তাঁরা সবাই ছিলেন মধ্যবিত্ত গৃহস্থ। আমি সকলের আগে স্ট্রাটফোর্ড শহরটি ঘুরে-ঘুরে দেখছিলুম। মহাকবি জন্মগ্রহণ করেন ১৫৬৪ সালে এবং তাঁর মৃত্যু ঘটে ১৬১৬ সালে। তাঁর পিতার নাম ছিল জন শেকসপীয়র ও জননী শ্রীমতী অ্যানি। ওদের ৩টি সন্তান ছিল। শ্রীমতী অ্যানি তাঁর স্বামী অপেক্ষা ৮ বছরের বড় ছিলেন। উভয়ের বিবাহ ঘটেছিল যে গির্জাটিতে সেটির নাম 'গীল্ড চ্যাপেল'। এই গির্জাটি নির্মিত হয় ১২৬৯ খৃষ্টাব্দে। এখানে একটি প্রাচীন নথিগ্রন্থে শেকসপীয়রের জন্ম, নামকরণ (christening), বিবাহ এবং তাঁর মৃত্যু—প্রত্যেকটির তারিখ ধরে বিভিন্ন পৃষ্ঠায় লিখিত রয়েছে। তাঁর মৃত্যুর ৫৪ বছর পরে তাঁরই বংশের লেডি বার্নার্ডের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বংশের (direct line) বিলুপ্তি ঘটে। মহাপুরুষের বংশ সচরাচর থাকে না।

সাড়ে ছয়শ' বছর আগে বুঝি শহরটি নির্মাণ করা হয়েছিল। তখন সিমেণ্ট হয়নি, মোজাইক টালি জন্মায়নি। লোহা গালাই হত শুধু কাঠের আগুনে,—নিউ কাসলের কয়লা তখনও ওঠেনি। যন্ত্রযুগ, ইলেকট্রিক, টেলিফোন, রেডিয়ো, মুদ্রাযন্ত্র, হরফ তৈরি, শেলাইয়ের কল, একালের চিকিৎসা ও ঔষধ পত্রাদি, এখনকার বিচিত্র ধরনের খাদ্যসামগ্রী, চা বা কফি, ফটোগ্রাফি—এদের কোনটা কি ছিল সেই কালে? সেই অনুন্নত যুগে চারশ' বছরেরও আগে শেকসপীয়র জন্মগ্রহণ করেন একটি কাঠের বাড়িতে। এটি সারিবদ্ধ বাড়িগুলির অন্যতম। তখন ঘোড়ায় টানতো গাড়ি, রাস্তাগুলো কাঁচা, প্রতি বাড়ির ভিতর মহল ছিল অন্ধকার, চর্বির বা তেলের আলো

জেবলে কাজ সারতে হত। আমি ওই পুরনো কালের অনেকগুলি বাড়ির মধ্যে উঁকিঝুঁকি মেরে প্রাচীন কালটাকে উপলব্ধি করার চেষ্টা পাচ্ছিলুম। স্ট্রাটফোর্ডের ত্রিসীমানার মধ্যে তৎকালে হাসপাতাল ছিল না এবং দুরারোগ্য ব্যাধি—যথা টাইফয়েড, যক্ষ্মা, হাঁপানি, কলেরা, বসন্ত—এদের প্রতিষেধক পাওয়া যেত না বলে সংখ্যাতীত মানুষের অপমৃত্যু ঘটত। সেই যুগে এই বিশ্ববিজয়ী প্রতিভা আপন প্রবল প্রাণ-শক্তির জোরে সুস্থ জীবন যাপনে সমর্থ হয়েছিলেন, এটিও এক বিস্ময়। ইংল্যাণ্ডের এই হৃৎকেন্দ্র থেকে চিরায়ত সাহিত্য সৃষ্টির দ্বারা সেই ব্যক্তি আপন প্রতিভা ও অত্যাশ্চর্য ধীশক্তির দ্বারা পৃথিবীর সাহিত্যের উপর যে আলোকসম্পাত করেছিলেন, সর্বাধুনিক এটমিক রশ্মি অপেক্ষাও সেই আলো ছিল উজ্জ্বলতর। শেকসপীয়র অদ্যাবধি নিভুলভাবে অম্লান। তাঁর সেই সুপ্রাচীন ইংরেজি ভাষা কালক্রমে ক্ষয় হয়েছে, কিন্তু তাঁর নাটক ও কাহিনী অনশ্বর রয়ে গেছে। তাঁর বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে এই কথাগুলিই ভাবছিলুম। চলাচলম ইদম সর্বম, কীর্তির্যস্য স জীবতি।

শেকসপীয়রের জন্ম যে ঘরটিতে এবং যে স্থলে সেটি সযত্নরক্ষিত। ঘরের জানলার কাঁচের উপর পরবর্তী যুগ ও যুগান্তরে যাঁরা আপন-আপন হাতের স্বাক্ষর রেখে গেছেন, তাঁদের মধ্যে স্যার ওয়ালটার স্কট, হেনরি আর্ভিং, এলেন টেরি, কারলাইল, টেনিসন, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, কোলরীজ, স্যামুয়েল জনসন প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

কেমন একটা প্রাচীনের হাওয়া বয়ে চলেছে বনবৃক্ষরাজির ছায়ায়-ছায়ায়। এরা যেন চারিদিকে এক অনির্বচনীয় মহিমাকে ধারণ করে রয়েছে। দিক-দিগন্তরে জলাশয়ের এখানে ওখানে শেকসপীয়রের করুণ কাব্যভাবনা যেন 'জুলিয়েটের' দুই আয়ত চক্ষুর মতো ছলছল করছে' দূরে দূরে শস্যপ্রান্তর। গোচারণভূমির আশেপাশে শুভ্রলোমশ মেষশিশুর দল চরে বেড়াচ্ছিল।

ওই জলাশয়ের ধারে দাঁড়িয়ে সেদিন শেকসপীয়রের উপর লেখা রবীন্দ্রনাথের একটি সনেট আমাকে কিছু দোলা দিচ্ছিল। তারই দু' একটি ছত্র এখানে উদ্ধৃত করি

"—অনন্তের নিঃশব্দ ইঙ্গিতে দিগন্তের
কোল ছাড়ি শতাব্দীর
প্রহরে-প্রহরে উঠিয়াছ দীপ্তজ্যোতি
মধ্যাহ্নের গগনের পরে—"

অতঃপর আমি বার্মিংহামের দিকে অগ্রসর হলুম। ইতি—

॥ ১৫ ॥

প্রিয়বরেষু

মধ্য ইংল্যাণ্ডের প্রাকৃত শোভা শুধু সুন্দর নয়, অপরূপ তার কমনীয় শ্রী। এই মধ্যদেশের কয়েকটি 'শায়ারে' আমি ভ্রমণ করছিলুম। এটি অক্টোবরের তৃতীয় সপ্তাহ। এখনো কুয়াশা আসেনি, আকাশ এখনো নীল, মেঘের মালাও শাদা। এমনি একটা সময়ে যখন ইংল্যাণ্ডের হৃৎকেন্দ্র বার্মিংহামে এসে ট্রেন থেকে নামলুম তখনও রাত

৮টা বাজেনি। সামনে দাঁড়িয়েছিলেন মিঃ এচ উইলকিনসন, তিনি এগিয়ে এসে বিশেষ সমাদরের সঙ্গে আমাকে গ্রহণ করলেন এবং অতিথির সম্মান স্বরূপ আমার দুটি ব্যাগ নিয়ে নিজেই গাড়িতে তুললেন। এই রীতি ও সামাজিক সৌজন্য পাশ্চাত্ত্য দেশে সুপ্রকট।

আলোকোজ্জ্বল বিশাল নগরী বার্মিংহাম চারদিকে সম্পদ শোভায় ঝলমল করছিল। রাজপথগুলি যানবাহনে ও জনবহুলতায় থিকথিক করছে। অত্যুগ্র আলোকের ছটায় বহু দূর পর্যন্ত দৃশ্যমান হচ্ছিল। উইলকিনসন সবিনয়ে বললেন, আপনি যদি বলেন আপনাকে খানিকটা ঘুরিয়ে দেখাতে পারি। এই প্রাচীন শহর এখন আধুনিক হয়ে উঠেছে।

আমি তৎক্ষণাৎ রাজি হলুম। উনি গাড়ির মুখটি ঘুরিয়ে নিলেন।

নগরের সজ্জা তার বড় বড় সরকারি অট্টালিকা, ডাউন টাউনের বাজার হাট, ছোট ছোট সাজানো বাগান এবং যানবাহনের জটলা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কালে এই শিল্প নগরীর অনেক স্থল নাৎসী বোমাবর্ষণে বিধ্বস্ত হয়, সেজন্য সর্বত্র নবনির্মাণ ঘটেছে। নতুন নতুন সুশ্রী অট্টালিকা মাথা তুলেছে। সবাই জানে যুদ্ধের কালে সত্য সংবাদ চেপে যেতে হয়। সেজন্য প্রবাদ আছে "Truth is the first victim in a war" ইংরেজের বেলাও তাই। আমরা ভারতে বসে রয়টারের খবরে প্রায়ই শুনতুম, ইংল্যান্ডের দক্ষিণে ডোভারের পল্লী অঞ্চলে বোমাবর্ষণের ফলে মরেছে দু চারজন বৃদ্ধ বা বৃদ্ধা, আর মরেছে দু চারটি মুরগী। ক্ষতি কিছু হয়নি। সেই যুদ্ধের কালে হিটলার এক সময় আক্ষেপের সঙ্গে বলেছিলেন, ইংল্যান্ড আমার হাত থেকে বেঁচে গেল শুধু ওই ২৩ মাইল জলনালীর জন্য -যেটি ফ্রান্সের ক্যালে (Calais) ও ইংল্যান্ডের ডোভারের মাঝখানে। ওটার নাম ডোভার প্রণালী। একাধিক সাঁতারু বলে থাকেন তাঁরা ইংলিশ চ্যানেল সাঁতরিয়ে পার হয়েছেন। আসলে তাঁরা অতিক্রম করেছেন ডোভার প্রণালী, ইংলিশ চ্যানেল নয়।

উইলকিনসন আমাকে তুলেছিলেন এখানকার কলমোর রো নামক রাজপথে অবস্থিত সুপ্রসিদ্ধ গ্রান্ড হোটেলে—যার অতি বৃহৎ অট্টালিকার অলি গলির মধ্যে আমি বারবারই হারিয়ে যেতুম। এমন একটি মনোরম ও সুনিভৃত কক্ষ আমাকে দেওয়া হয়েছিল যেখানে বাস করতে গেলে গা ছুম ছুম করে। আমি যেন এক নির্জন দ্বীপে নির্বাসিত হয়েছিলুম।

মাত্র একরাত্রির মধ্যে হ্যারল্ড উইলকিনসন তাঁর নিজ গুণে আমার বন্ধু হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর বয়স পঞ্চাশের কম। পরদিন সকালে এসে প্রথমেই তিনি অনুরোধ জানালেন, আমার স্ত্রী জিদ ধরেছেন আজ সন্ধ্যায় আমাদের বাড়িতে আপনাকে ডিনার খেতে হবে। তিনি আপনাকে স্বরচিত কবিতা শোনাবেন। তাঁর নাম প্যাট্রিসিয়া।

হাসিমুখে আমি বললুম, একটি শর্তে আমি নেমন্তন্ন নেবো। আপনাদের নাম ধরে ডাকব।

তথাস্ত। ওতে আমরা আনন্দই পাবো।

ভারতীয় হাই কমিশনের শাখা আপিস খুব কাছেই। যে রাস্তাটা ডানদিকে ঘুরে গিয়ে ট্রামরাস্তায় পড়েছে, তারই উল্টোদিকে। ভিতরে ঢুকবার দরজাটি ছোট। বাড়িটির তিনতলাটা ভারতীয় হাই কমিশনের। বর্তমানে যিনি সহকারী মিঃ জি

ডি চৌধুরী, তিনি পাঞ্জাবী। তিনি এবং ভারতীয় কনসাল অফিসার মিঃ আজাইব সিং—এঁরা দুজন জানতেন আমি আসব। এঁরা আমাকে নিয়ে আজ মধ্যাহ্নভোজে বসবেন। যাই হোক, ভারতের সর্বশেষ সংবাদ কি প্রকার, এই নিয়ে আমার মনে কিছু উদ্বেগ ছিল। মিঃ চৌধুরীর সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ আলাপ করে অনেকটা আশ্বস্ত হলুম। ইংল্যান্ডের কাগজগুলিতে নানাপ্রকার উদ্বেগজনক ও অশ্রদ্ধেয় সংবাদ ছাপা হচ্ছিল। একথা মনে করার কারণ নেই যে, ইংল্যান্ড মানে 'সব পেয়েছির দেশ।' সেখানে যে ধরনের অর্থনীতির নৈরাজ্যবাদ এবং শ্রমিক সাধারণের মধ্যে স্বেচ্ছাচার দেখতে পাচ্ছিলুম, তার চেয়ে আপাতত ভারতের অবস্থা সহনীয় কিনা তাই ভাবছি। এই স্বেচ্ছাচারের ফলে ভদ্র ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের দৈনন্দিন জীবন কথায় কথায় অচল হয়ে উঠছে। বিভিন্ন সমস্যায় উইলসন গভর্নমেণ্ট এখন ক্ষতবিক্ষত।

আমাদের আলাপচারির সময় এক সুদর্শনা বাঙ্গালী মহিলা আমারই খোঁজে এসে উপস্থিত হলেন। ইনি এখানে সুপরিচিত। এঁর নাম শ্রীমতী মণিকা রাও। এখানকার এক বিশিষ্ট শল্য-চিকিৎসক (neuro surgeon) ডঃ ভিক্টর রাওয়ের স্ত্রী। ডঃ রাও অন্ধ্রদেশীয়, কিন্তু বহুকাল কলকাতায় থাকার জন্য 'বাঙ্গালী' হয়ে গেছেন। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই খৃষ্টান। পরে জেনেছিলুম শ্রীমতী মণিকা আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু প্রেমানন্দ নাগ মহাশয়ের কন্যা। কন্যার কথাবার্তা এবং আচরণ পিতার মতোই মধুর ও সৌজন্যশীল। মণিকা যাবার আগে জানিয়ে গেলেন, বার্মিংহামের বাঙ্গালী মহল আমাকে নিয়ে একটি অনুষ্ঠান করতে চান।

যানবাহনের ঘন জটলা ও জনসংকুল পথগুলির একটিতে এক চীনা রেস্টুরেন্টে আমরা তিনজনে ঢুকলুম মধ্যাহ্নভোজে। ইংল্যান্ডের বড় বড় শহরগুলিতে ভারতীয়, পাকিস্তানী ও বাংলাদেশী হোটেল আছে বহুসংখ্যক। এ ছাড়া আছে ইরানী, আরবী, বর্মী প্রভৃতি নানা রেস্টুরেন্ট। পশ্চিমবঙ্গের একদল ছেলে যদি লন্ডনের কোনও পাড়ায় গিয়ে মুদি, মনোহারী, মশলা বা ময়রার দোকান দিয়ে বসে যায়, তবে ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। বর্তমান ইউরোপ, আমেরিকা ও ইংল্যান্ডে ভারতীয় সামগ্রী ও খাদ্যের চাহিদা যথেষ্ট বেড়েছে। ভারতীয় চাটনি, মাথার সুগন্ধ তেল, বাটিক সিল্কের মিনি-ঘাগরা, সন্দেশ, কাবুলি-ঘুন্টির জুতো, চন্দনের সাবান এগুলি আমেরিকার সাধারণ লোক লুফে নেবে। চীনা রেস্টুরেন্টে আহারাদির কালে আমরা এ নিয়ে আলোচনা করছিলুম।

মিস্টার চৌধুরী বিদায় নেবার পর আজাইব সিং আমাকে নিয়ে ডাউন টাউনের হাট-বাজার দেখাতে চললেন। এখন শীতের মরশুমের কেনাবেচার কাল। অনেক শপিং সেন্টারে নিলাম চলছে। যাদের অবস্থা একটু ভাল তারা দুরকমের ওভার-কোট কিনছে। প্রবল ঠান্ডা বাতাস রোধ করার জন্য একপ্রকার শাদা ক্যাম্বিশ-জাতীয় কোট, অন্যটি পশমের। প্রতি দোকানে অজস্র সামগ্রীসম্ভার। আমরা ঘণ্টা দুই ঘুরে সরকারি আপিসগুলি দেখতে দেখতে ভিন্নপথে যখন হোটেলে ফিরলুম, বেলা তখন পাঁচটা।

ঠিক সন্ধ্যার পর এলেন হ্যারল্ড। আমি প্রস্তুত ছিলুম। ওঁর বাড়ি বার্মিংহাম শহর কেন্দ্রের একটু বাইরে। পাড়াটা 'ওয়ারলির' অন্তর্গত 'ওল্ড বেরিতে'। এবং রাস্তার নাম মার্টন ক্লোজ। ওঁদের বাড়ির লনের পাশে গ্যারাজে গাড়ি রেখে আমরা দোতলায় উঠে এলুম। প্যাট্রিসিয়া মহা খুশী হয়ে আমার হাত ধরে ওই ছোট্ট

লাউঞ্জটিতে বসালো। বলল, আজ কাব্যের আসর বসুক।

ইংরেজির 'ইউ' শব্দটি 'আপনি, তুমি ও তুই'—সব কটাকেই বোঝায়। সুতরাং আমাদের পারস্পরিক সম্ভাষণ থেকে মিস্টার ও মিসেস বাদ যাওয়ায় একটা অনায়াস আন্তরিকতা খুব সহজে দাঁড়িয়ে গেল। মহিলার বয়স আন্দাজ চল্লিশ। হাসিমুখে উনি বললেন, আমার হাতের লেখা ভাল নয়, তাই আপনার জন্য টাইপ করে এনেছি আমার আপিস থেকে।

প্যাট্রিসিয়া সোৎসাহে একখানা বাঁধানো খাতা এবং তিন চারটি টাইপ করা কবিতা আমার হাতে দিলেন। খাতা খুলে চোখ বুলিয়ে দেখলুম, ওঁর হাতের লেখা বেশ সহজেই পড়া যায়। সবগুলোই গদ্য কবিতা। ওঁদের বাড়িতে ছেলেপুলে একটিও নেই। স্বামীস্ত্রী কেউই ধূমপান করে না। কিন্তু আমার জন্য এক প্যাকেট সিগারেট আনা রয়েছে। মহিলা এক সময় উঠে গিয়ে কিছু ভাজাভুজি নিয়ে এলেন। বললেন, আজ আপনাকে সহজে যেতে দেবো না।

আমি ওঁর কয়েকটি কবিতা শুধু যে একে একে পড়ে গেলুম তাই নয়, কোন্ কবিতায় ওঁর মন কি প্রকার কাজ করেছে তার কিছু কিছু বিশ্লেষণও আরম্ভ করে দিলুম। হ্যারল্ড চুপ করে শুনছিলেন। এবার বললেন, ভালবাসার প্রতি ওঁর সিনিক্ বিদ্রূপের পিছনে ওঁর মানসিক ক্ষোভ রয়েছে, আপনি কেমন করে জানলেন?

প্যাট্রিসিয়া উল্লাসে সরব হয়ে বলে উঠলেন, আমার জীবনকে উনি বোধ হয় চিনেছেন। He has found me out. শুনুন, আপনার কাছে কিছু লুকোব না।

আমি মুখ তুলে তাকালুম। হ্যারল্ড বললেন, বুঝতে পারছি ওই কবিতাটা আপনার সব চেয়ে পছন্দ হয়েছে। প্যাট্রিসিয়া ওটি আমার দিকে চেয়ে লিখেছে। এই জীবনে আমরা দুজনেই মারখাওয়া মানুষ! আমরা ঝড়ের পাখী। পাঁচ বছর আগেও আমরা কেউ কারোকে চিনতুম না। একটা সাংঘাতিক ঝঞ্ঝার ভিতর দিয়ে আমরা দুজনে দুজনকে আবিষ্কার করেছি।

কাব্য আলোচনা থেকে বাস্তব জীবনের আলোচনায় এসে দাঁড়ালুম। প্যাট্রিসিয়া বলল, আঠারো বছর বয়সে প্রথম বিয়ে হয়েছিল আমার। তারপর সতেরো বছর ধরে মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করে সেই স্বামীকে ত্যাগ করেছি।

প্যাট্রিসিয়ার জ্বলজ্বলে চোখের দিকে চেয়ে হ্যারল্ড বললেন, আমারও একই কাহিনী। বাইশ বছর বয়সে প্রথম বিয়ে করেছিলুম। তারপর যেন এক ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন আরম্ভ হল। অসহ্য মানসিক উৎপীড়ন বরদাস্ত করেছি দীর্ঘ কুড়ি বছর। তারপর সেই স্ত্রীকে ত্যাগ করেছি!

হাসিমুখে বললুম, এত দীর্ঘকাল একত্র বাস করে বিচ্ছেদ ঘটানো কি যায়?

যায়!—প্যাট্রিসিয়া যেন গর্জিয়ে উঠল। বলল, আমার দুটি ছেলে—অনিচ্ছার থেকে যাদের জন্ম। আর জন্মদান ত' ঘটে পাঁচ মিনিটের বিভ্রান্তির থেকে। ছোট ছেলেটার বয়স এখন পনেরো। বাপের মতনই সে ক্রূর, কুচক্রী, মিথ্যাবাদী, ধাপ্পাবাজ, বাপের মতন স্বার্থপর আর ইতর। বড় ছেলে ঠিক উল্টো। সে বাপের কাছে থাকে না। তার বয়স একুশ। মাঝে মাঝে আমার কাছে এসে কেঁদে যায়। আমি তখন নিরাশ্রয়। থাকি এখানে ওখানে। সংস্থান কিছু নেই।

হ্যারল্ড বললেন, না, আমার ছেলেপুলে নেই। **I never slept with her, not even for a single night.** ঘরে টিঁকতে পারিনে—যেন দম বন্ধ হয়ে আসে।

কেন?

ঠাণ্ডা, নির্বিকার মেয়েছেলে! যেন হিমশীতল অন্ধকার একটা গহ্বর। না হৃদয়, না মন, না একটু হাসি, না বা একটি মিষ্ট কথা। এ যেন একটা গুরুভার, একটা অভিসম্পাত—ছুটে গিয়ে রাস্তায় দাঁড়ালে তবে যেন স্বস্তি বোধ করি। সে আমাকে তিলমাত্র দুঃখ দেয়নি, কিন্তু আমি কুড়ি বছর ধরে অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করেছি। যখন আমাদের ডিভোর্স হল, তখনও সে নির্বিকার, যেন প্রাণহীন পাথরের ডেলা! আমি যেন পালিয়ে বাঁচলুম।

তারপর?

প্যাট্রিসিয়া বলল, তারপর একদিন আমাদের দুজনের হঠাৎ দেখা হল। সামান্য পয়সা নিয়ে হোটেলে খেতে গিয়েছিলুম। দুজনে চিনলুম দুজনকে। ভালবাসা নয়, রোমান্স নয়—আমরা যেন দুই টুকরো নৈরাশ্য (frustration)। জীবনের মূলে শিকড় থেকে দুজনেই বিচ্ছিন্ন। আমরা দুজনে জীবনকে নতুন করে গড়ে তোলবার কাজে লাগলুম। অস্তিত্বের অর্থ আবিষ্কার করলুম। We found out the meaning of our survival.

হ্যারল্ড বললেন, এ বাড়ি আমরা দুজনে দাঁড়িয়ে থেকে করিয়েছি। দারিদ্র্য অন্নাভাব—সব দেখে এসেছি দুজনে। প্যাট্রিসিয়া এখন স্কুলে মাস্টারি করে, আমি ব্রিটিশ কাউন্সিলে আছি। কিন্তু আমাদের দুজনেরই প্রতিজ্ঞা, আমরা সন্তানাদি হতে দেবো না। আমরা স্বাচ্ছন্দ্য আর আনন্দ সৃষ্টি করব।

খাবারের টেবলে এসে তিনজনে বসলুম। প্যাট্রিসিয়া সুস্বাদু রান্না করেছিল। খাওয়াটা ছিল ব্রিটিশপন্থী। সুপটা উপাদেয়। রোস্টেড চিকেন্। সব্জিতে মেলানো 'সাওয়ার মিল্ক।' ল্যাম্বের টুকরো দিয়ে ফ্রাই।

সেদিন অনেক রাত্রে হ্যারল্ড আমাকে গ্রাণ্ড হোটেলে পৌঁছে দিয়ে গেলেন।

পরদিন সকালে আমাকে নিতে এলেন আর এক সৌম্যদর্শন প্রবীণ ভদ্রলোক ও তাঁর স্ত্রী, মিস্টার ও মিসেস উইন্‌ট্রিংহাম। ইনি রয়াল ইঞ্জিনিয়ার, ধনবান ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। আমাকে ওঁরা সমগ্র বার্মিংহাম ও তার শহরতলী, বিশ্ববিদ্যালয়, প্রশাসন কেন্দ্র এবং দূরান্তরের কয়েকটি গ্রামাঞ্চলে নিয়ে যাবেন। ড্রাইভ করবেন মিসেস। আমি ওঁর পাশে বসে চললুম। স্বামী শান্ত প্রকৃতি, মহিলা গল্পমুখর। নগরের নানা দৃশ্য দেখতে দেখতে বহুদূর পর্যন্ত ওঁরা আমাকে নিয়ে চললেন, এ যেন ইংল্যাণ্ডের এক নতুন ভাষ্য। লণ্ডনে আন্তর্জাতিক জনবহুলতা দেখি, সেখানকার প্রায় সকল পথে প্রাক্তন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সকল দেশের মানুষ দিনে-দিনে এসে এক-প্রকার আপন-আপন অধিকারে জায়গা নিয়েছে। যেমন ধরো, আফ্রিকার ব্রিটিশ প্রটেকটরেটের নরনারী, যেমন ধরো ওয়েস্ট ইণ্ডিজ, ব্রিটিশ সোমালিয়া, গায়ানা, মিশর, ভারত, এডেন, সিংহল, হণ্ডুরাস প্রভৃতি বহু দেশের নরনারী এসে ইংল্যাণ্ডের উদার আতিথেয়তায় আশ্রয় পেয়েছে। এরা ছাড়া আরও অনেক দেশের ও সম্প্রদায়ের লোক এসে এদেশে বসে গেছে। বার্মিংহামের দিকে কোন কোনও শিল্পাঞ্চল দেখে মনে হতে পারে, এ যেন পাঞ্জাবীদের উপনিবেশ। দল বেঁধে পাঞ্জাবী মহিলারা রৌদ্রপথে পরিভ্রমণে বেরিয়েছেন। কিন্তু বার্মিংহাম শহর থেকে অনেকটা দূরে গ্রামাঞ্চলে যেখানে এসে পৌঁছলুম, সেই গ্রামটির নাম 'লিচফিল্ড'। এই লিচফিল্ড সম্পূর্ণ ব্রিটিশ গ্রাম, এবং বহুকালের পুরনো। কিন্তু এই পুরনো গ্রামটিই জগৎ-

প্রসিদ্ধ হয়ে রয়েছে ইংরেজি সাহিত্যের গুরু ডঃ স্যামুয়েল জনসন-এর জন্য। এ গ্রামটি স্টাফোর্ডশায়ার জেলার মধ্যে পড়ে। আমি জনসনের জন্মস্থল ও তাঁর সেই প্রাচীন বাড়িটি দেখতে এসেছি। এটি এখন যাদুঘরে পরিণত। সম্মুখে যে সরু রাস্তাটি ঘুরে বাজারের দিকে গেছে, তার নাম ব্রেডমার্কেট স্ট্রীট।

বাড়িটি সাবেক কালের এবং তিনতলা। সামনেই যাঁর বৃহৎ মূর্তিটি সংকীর্ণ পথটিকে আড়াল করেছে সেটি হল ডঃ জনসনের পিতা মাইকেল জনসনের—এই বাড়ির নিচের ঘটরটিতে যাঁর বইয়ের দোকান ছিল। তিনি নিজে পুস্তক প্রকাশকও ছিলেন—যে যুগে বইও তেমন বিক্রি হত না এবং কষ্টেই দিন চলত। এমনি একটা সময়ে ১৭০৯ সালে মাইকেলের স্ত্রী সারা ফোর্ডের গর্ভে স্যামুয়েলের জন্ম হয়। ব্রিটেন তখন অনুন্নত, স্বল্পবিত্ত এবং তখনও তার সাম্রাজ্যবিস্তার ঘটেনি। ভারতে তখন মোগলদের রাজত্বকাল, এবং রাজা রামমোহনের জন্মের প্রায় ৬৫ বছর আগের কথা। এই লিচফিল্ডেই বছর সাতেক পরে আরেকটি শিশু বড় হতে থাকে, পরবর্তীকালে সে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনেতারূপে গণ্য হয়, তার নাম ডেভিড গ্যারিক। ডেভিড এবং স্যামুয়েলের ভাগ্য একই সূত্রে বাঁধা পড়ে। ডেভিড গ্যারিক ১৭১৬ সালে হিয়ারফোর্ডে জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু তার পিতামাতা লিচফিল্ডেই চলে আসেন।

এই ছোট বাড়িটির প্রত্যেকটি ঘরে সুপ্রাচীন স্মৃতিচিহ্ন, গ্রন্থাদি ও সামগ্রীগুলি পর্যবেক্ষণ করছিলুম। দেখছিলুম স্যামুয়েল স্কুল ছেড়ে পেমব্রোক কলেজে ঢুকেছেন, কিন্তু দারিদ্র্যদশার জন্য তাঁকে কলেজ ছাড়তে হয়। এখান থেকে আবার তিনি শিক্ষালাভের জন্য যান অক্সফোর্ডে। এখন তাঁর ২২ বছর বয়স। ২৬ বছর বয়সে তিনি এলিজাবেথ পোর্টার নাম্নী এক বিধবাকে বিবাহ করে ইডিয়াল হল-এ একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। এরই বছর দুই পরে পিতৃবিয়োগ ঘটলে তিনি তাঁর ছাত্র ডেভিড গ্যারিককে নিয়ে লণ্ডনে যান এবং সেখানে গিয়ে 'জেন্টলম্যানস ম্যাগাজিনের' কাজে আরম্ভ করেন। গ্যারিকের বয়স তখন ২০। অতঃপর এই দুই ইতিহাস প্রসিদ্ধ ব্যক্তির কঠোর জীবন সংগ্রাম আরম্ভ হয়। স্থির হয় একজন হবেন লেখক অন্যজন হবেন অভিনেতা। কিন্তু তখন সাহিত্যকর্মের দ্বারা স্বামী-স্ত্রীর অন্নবস্ত্রের সংস্থান করা ছিল স্বপ্ন অপেক্ষাও অবাস্তব। তিনি লিখতে লাগলেন নাটক, প্রবন্ধ কবিতা, জীবনী এবং সাময়িক পত্রাদির বিভিন্ন কাজ। তাঁর 'আইরিন' নামক নাটকের অভিনয় করেন গ্যারিক। কিন্তু গ্যারিক তাঁর অভিনেতৃ-জীবনে প্রথম বিপুল সাফল্যলাভ করেন তৃতীয় রিচার্ডের ভূমিকায়। লণ্ডনের নাট্যলোকে গ্যারিক সর্বজনমান্য হয়ে ওঠেন। তাঁরই প্রতিভাবলে থিয়েটার বা অভিনয় সেইকালে প্রথম জাতে ওঠে। রক্ষণশীল ইংল্যাণ্ডে মেয়েছেলে নিয়ে রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হওয়া নিন্দনীয় ছিল।

উইনটিংহাম দম্পতি সাগ্রহ যত্নে আমাকে একতলা, দোতলা ও তেতলার ঘরগুলি একেকটি নম্বর ধরে দেখিয়ে বেড়াচ্ছিলেন। ৫নং ঘরটিতে দেখছি ১৭৬৫ সালে আয়ার্ল্যাণ্ডের ডাবলিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্যামুয়েল জনসনের সাহিত্যকর্মের জন্য তাঁকে ডক্টরেট উপাধি দেওয়া হয়। এই সময় জনসন প্রথম ইংরেজি ভাষার বিশ্ব-বিশ্রুত অভিধান রচনা করেন। জনসনের জীবনের সঙ্গে যে কয়েকজন ব্যক্তির নাম অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, তাঁদের মধ্যে গ্যারিক ছাড়াও যিনি অদ্যাবধি

জগৎপ্রসিদ্ধ হয়ে রয়েছেন তিনি হলেন ডঃ জনসনের জীবনীকার বসওয়েল। ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় তারিখ হল ১৬ই মে, ১৭৬৩—যেদিন একটি বইয়ের দোকানের পিছন দিকে জনসন ও জেমস বসওয়েলের দেখাশোনা হয়। বসওয়েল ছিলেন জনসনের রচনার একান্ত অনুরাগী। এই অনুরাগ ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বে পরিণত হয়। বসওয়েল এক ধনী স্কটিশ জজের ছেলে এবং উচ্চাঙ্গ সাহিত্যের লেখক। জনসনকে সঙ্গে নিয়ে তিনি সুদীর্ঘ ভ্রমণে বের হন। প্রকৃতপক্ষে বসওয়েলের লেখা জীবনী (Life of Samuel Johnson) থেকেই ডঃ জনসন ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাসে অমরত্ব লাভ করেন। এই মহাপুরুষের মৃত্যু ঘটে ৭৫ বছর বয়সে ১৭৮৪ সালে এবং ইংরেজি সাহিত্যের আলোচনায় এই শতাব্দীকে বলা হয় 'জনসনের কাল'।

সমস্ত বাড়িটিতে জনসনের ছোট ছোট স্মরণচিহ্ন, তাঁর পাণ্ডুলিপি, হস্তাক্ষর, গ্রন্থাদি, ছবি, মুদ্রিত নানা লেখা, তাঁর সেই কালের অভিধান, তাঁর কয়েকটি কফির পেয়ালা, মাথার একগোছা চুল প্রভৃতি এই যাদুঘরে সুরক্ষিত রয়েছে। যে ঘরটিতে তাঁর জন্ম হয়েছিল, সেইটিতে এক ফরাসী যুদ্ধবন্দীকে নেপোলিয়নের পরাজয়ের পর আটক রাখা হয়েছিল।

এই কাঠনির্মিত প্রাচীন যুগের বাড়িটির প্রত্যেকটি ক্ষুদ্র ও সংকীর্ণ কক্ষ একটির পর একটি দেখতে দেখতে আমি তন্ময় হয়েছিলুম। ওঁরা আমাকে দিয়ে ওখানকার 'ভিজিটর্স বুকে' নাম স্বাক্ষর করিয়ে নিলেন। ডঃ জনসনের অতি প্রিয় ছিল তাঁর এই গ্রামের বাড়ি, এবং এটিকে তিনি বহুপ্রকারে সংস্কার করেছিলেন। একবার তিনি বলেছিলেন, "Every man has a lurking wish to appear considerable in his native place."

স্যামুয়েল জনসনের ছাত্র ডেভিড গ্যারিক বিপুল খ্যাতি ও জাতীয় সম্মানের মধ্যে মারা যান জনসনের মৃত্যুর ৫ বছর আগে ১৭৭৯ সালে। ঐতিহাসিকরা তাঁর সম্বন্ধে একবাক্যে বলেন, "one of the greatest actors of all time. His funeral was a huge ceremonious affair, attended by the greatest in the land."

জেমস বসওয়েল জনসনের জীবনী প্রকাশ করেন ১৭৯১ সালে এবং ১৭৯৫ সালে তিনিও মারা যান। লণ্ডনের ওয়েস্টমিনসটর আব্বেতে দেখেছি ডঃ জনসনের সমাধির ঠিক পাশে ডেভিড গ্যারিকের সমাধি। ইংল্যাণ্ডের হাজার বছরের গৌরবের ইতিহাস ওয়েস্টমিনসটার আব্বের মধ্যে সমাহিত এবং তার প্রাচীন কলঙ্কের কাহিনী 'টাওয়ার অফ লণ্ডনে' সুরক্ষিত। কিন্তু এবার 'টাওয়ার অফ লণ্ডনের' নিচের প্রাঙ্গণে সেই জীবিত ছয়টি বৃদ্ধ 'দাঁড়কাককে' দেখিনি!

অতঃপর উইনট্রিংহাম দম্পতি বর্তমানের ক্ষুদ্র শহর লিচফিল্ডের নানা স্থলে ও নানা দর্শনীয় পথঘাটের ভিতর দিয়ে আমাকে নিয়ে এলেন বনবাগান পেরিয়ে লিচফিল্ড ক্যাথিড্রালের পাড়ায়। এই ক্যাথিড্রালের তিনটি পাশাপাশি চূড়ার উচ্চতা (২৫৮ ফুট) দেখে প্রথমটা একটু হকচকিয়ে গিয়েছিলুম। এটি অতি প্রাচীন এবং এর ভাস্কর্য ও কারুকার্য দৃষ্টিকে অভিভূত করে। ১৩শ শতাব্দীতে এই গির্জার বড় অংশটা নির্মাণ করা হয় বটে, কিন্তু ৭ম শতাব্দীতে এর প্রথম পত্তন ঘটে। এর একেকটি চূড়া একেক যুগে নির্মিত হয়েছে। লিচফিল্ড শব্দটি এসেছিল নাকি স্যাক্সনীয় যুগে—প্রায় দেড় হাজার বছর আগে—যখন একে বলা হত 'জলাশয়-

ভূমি'। আরেক দল বলে, এর নাম ছিল 'লিসেট ফিল্ড'—অর্থাৎ 'প্রেতভূমি বা মৃত্যুলোক।' এখানকার তদানীন্তন নরপতি ডায়োক্লেসিয়ান এক হাজার বৃটিশ খৃষ্টানকে এখানে হত্যা করেছিলেন তাদের ধর্ম-বিশ্বাসের জন্য—সেটি তৃতীয় শতাব্দীর শেষ দিকে।

এই বিরাট ও পরম সৌন্দর্যময় ক্যাথিড্রাল বালুবর্ণ ও বালুপাথরের তৈরি। প্যারিসের নোটার ডাম (Notre Dame) বা জার্মানির কলোন্ ক্যাথিড্রাল—দুটোই আমি খুঁটিয়ে দেখেছি, কিন্তু এটির তুলনায় সে দুটি 'মধ্যবিত্ত'। আমি যখন এই ক্যাথিড্রালের মধ্যে ঢুকে এর বিচিত্র ও বিস্ময়কর নির্মাণকলা দেখছিলুম এবং এর অন্তর্বর্তী বিশালতা, এর জাদুকরী ভাস্কর্য, মূর্তির খোদাই, উর্ণনাভের জালের মতো এর শতসহস্র খিলান, এর আশ্চর্য শিল্পকলা ও কারুকার্য—এরা যদিও তখন আমাকে মনে করিয়ে দিচ্ছিল দক্ষিণ ভারতের অনেকগুলি মন্দির, পশ্চিম ভারতের দিলওয়ারা, পূর্ব ভারতের কোণার্ক, মধ্য ভারতের খাজুরাহো, তাজমহল, ফতেপুর সিক্রি বা কেরালার পদ্মনাভস্বামীর মন্দির,—তবুও বলব এটির তুলনায় সেগুলি সামান্যই। সমগ্র ইউরোপে এর জুড়ি নেই, আমেরিকায় ত' একেবারেই নেই!

হতবুদ্ধির মতো ঘুরে ঘুরে আমি অবাক বিস্ময়ে স্থাপত্যের এই নয়নবিমোহন শোভা ও সম্পদ দেখতে দেখতে ঘণ্টাখানেকের জন্য অভিভূত হয়েছিলুম। এক পাশে দেওয়ালে দেখলুম একটি সুদৃশ্য ও সুসজ্জিত স্মৃতিসৌধ। ১৮৪৫-৪৬-এ যে সকল লিচফিল্ডবাসী ব্রিটিশ সৈন্য পাঞ্জাবের অন্তর্গত 'শতদ্রু যুদ্ধে' (Sutlej Campaign 1845-46) প্রাণ দিয়েছিল, এটি তাদেরই নামে উৎসর্গীকৃত। রাণা রণজিৎ সিং-এর নামটি কোথাও নেই।

ইংল্যান্ডের এটি মধ্যদেশ, ওরা যাকে বলে মিডল্যান্ড। কিন্তু এটি কালক্রমে যুক্তরাজ্যের প্রধান তীর্থস্থান হয়ে ওঠায় লিচফিল্ড এখন একটি মধ্যবিত্ত নগরে পরিণত। বলা বাহুল্য, এখন এটি স্ট্যাফোর্ডশায়ারের মস্ত বড় আকর্ষণ।

উইনট্রিংহাম দম্পতি আমাকে নিয়ে একটি মাঝারি ধরনের রেস্টুরেন্টে এসে লাঞ্চের জন্য নানা সামগ্রীর ফরমাস করলেন। এ রেস্টুরেন্টটি মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত, এবং এখানকার মেয়েরা খুবই ভদ্র ও সৌজন্যশীল। ওদের চোখে ও সহাস্য মুখে বর্ণবিদ্বেষের তিলমাত্র ছাপ নেই।

সেইদিনই সন্ধ্যার পর উইনট্রিংহাম আবার আমাকে হোটেল থেকে নিয়ে যেতে এলেন। এই মিষ্টস্বভাব দম্পতি এক সময় বললেন, আমার বিবিধ প্রশ্নবাণে তাঁরা ক্ষত-বিক্ষত হলেও আমার সকল বিষয় জানবার ঔৎসুক্য নাকি তাঁদের কাছে খুবই আনন্দদায়ক। ভদ্রলোক নিজে একজন বিশিষ্ট 'রয়াল' ইনজিনিয়ার এবং ওঁর ধারণা স্থাপত্য ও নির্মাণ-শিল্পের আমি নাকি এক বিশেষ সমঝদার। বন্ধুত্বের নিদর্শন স্বরূপ ওঁরা আমার জন্য আজ এক নৈশভোজের আয়োজন করেছেন। সেখানে থাকবেন বার্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর স্যার রবার্ট আইটকেন, ডঃ রেনল্ডস, মিঃ অমুক এবং অমুক, এবং তাঁদের মহিলারা। আপনি আমাদের প্রধান অতিথি। বেশি নয়, মোট হয়ত দশবারো জন। আমাদের আয়োজন সামান্যই।

খাস ইংরেজরা, যারা কখনও ভারতবর্ষ দেখেনি, ইংল্যান্ডের যারা বিত্তবান সম্প্রদায়, তারা নাকি অতিশয় কেতাদুরস্ত। তাদের ডিনার স্যুট একটু আলাদা ধরনের। গায়ের কোট নিচের দিকে দুধারে অর্ধচন্দ্রাকার এবং গলার নিচে প্রজাপতি

ধরনের নেকটাই গেরো বাঁধা। কেন জানিনে নেকটাই আমার দু'চোখের বিষ। অনেককাল আগে এক-আধবার ওটা গলায় বাঁধিনি তা নয়, কিন্তু অনভ্যস্ত হাতে ওটার ফাঁস টানতে আধঘণ্টারও বেশি সময় লাগে। জানি ওই 'গলায় দড়িটা' আন্ত-র্জাতিক, এবং ওটাই ভদ্রব্যক্তির পরিচয়। কিন্তু আমি নেকটাই ছুঁইনে। এদিকে বিশ্বভ্রমণ উপলক্ষে বহু ব্যবহারের ফলে আমার গায়ের গলাবন্ধ কোটটা কিছু চট্‌কানো, এবং আমেরিকায় বহু ভ্রমণের পরিণামস্বরূপ আমার জুতো জোড়াটা একদম বিবর্ণ। কলকাতার এক পাদুকা ব্যবসায়ী এটা চামড়ার জুতো বলেই বিক্রি করেছিলেন, এবং এক বছরের গ্যারাণ্টি দেওয়া সত্বেও এর ভিতর থেকে ক্রমাগত পিচবোর্ডের ছোট ছোট টুকরো বেরিয়ে আসার ফলে এখন জুতো জোড়াটা এলিয়ে (disintegrate) যাচ্ছে!

উইনট্রিংহাম আমাকে নিয়ে চললেন বহুদূরে। বার্মিংহাম নগরী তখন আলোকোজ্জ্বল। কিন্তু ক্রমশ সেই আলোকসজ্জা ক্ষীণ হয়ে এল। আমরা নগর ছাড়িয়ে ও শহরতলীর প্রান্তভাগ পেরিয়ে যেদিকে চললুম, সে অঞ্চলে শুধু একটির পর একটি বাগানবাড়ি। বাড়িগুলি সকল সময়েই অপেক্ষাকৃত ছোট, কিন্তু তাদের বাগানের বিস্তার বহুদূর পর্যন্ত। এসব অভিজাত ইংরেজের বাসস্থান। এ যেন একেকটি এস্টেট। এগুলি লর্ড, ব্যারন, কাউন্ট এবং বিভিন্ন খেতাবধারী ব্যক্তিদের সম্পত্তি, আজ যারা করভারে পীড়িত! এইসব অঞ্চল থেকেই নিয়ে যাওয়া হত সাম্রাজ্যের শাসনকর্তাদের, এবং যাবার আগে তারা তালিম নিত সরকারি আপিসে গিয়ে। এদেরই প্রশাসন ব্যবস্থাকে কঠোর করে রাখত ব্রিটিশ সামরিক শক্তি, এবং এরাই নানা দেশকে পদানত রেখে তাদের ভিতর থেকেই পুলিস ও গোয়েন্দাবিভাগ সৃষ্টি করত।

৩০।৩৫ মাইল চলে গিয়ে এক অন্ধকার এস্টেটের মধ্যে ঢুকে উইনট্রিংহাম গাড়ি থামালেন। সামনে বড় একটা আলো জ্বলছে, আশেপাশে গাছপালা ও ঝোপ-ঝাড়ের ভিতর দিয়ে মস্ত এক ফুলবাগান দেখতে পাচ্ছিলুম। মিসেস বেরিয়ে এলেন, তাঁর সঙ্গে জনদুই ভদ্রলোক। করমর্দনের দ্বারা সকলে হাসিমুখে অভ্যর্থনা করে একটি সরু পাথুরে পথ ধরে ভিতরে নিয়ে গেলেন। এ যাত্রায় এই দ্বিতীয়বার 'ব্রিটিশ হোম'-এ ঢুকলুম। ছোট লাউঞ্জে যাঁরা বসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে একজন হলেন স্যার রবার্ট। তিনি পক্ককেশ এবং সিপসিপে। তাঁর স্ত্রী এবং অন্য মহিলারা সবাই হাসিখুশী। মিসেস উইনট্রিংহাম ঘরে ঢুকতেই রবার্ট এগিয়ে গিয়ে মহিলাকে ঘন আলিঙ্গন ও চুম্বনে বিব্রত করলেন। ওঁদের মাঝখানে থেকে আমি হঠাৎ তামাসা করে বসলুম, অতটাই কি ওঁর পাওনা?

সকলেই হেসে উঠলেন। মিসেস এখন আমার সুপরিচিত। তিনি বললেন, দেখুন ড., যত বয়স হচ্ছে লজ্জাশরম কমছে। শালিকার প্রতি ব্যবহারটা একবার দেখুন!

কৌতুকপ্রিয় স্যার রবার্ট এবার আমার পাশেই এসে বসলেন। মুখোমুখি বসলেন মিসেস রবার্ট, রেনল্ডস, উইনট্রিংহাম, রেনল্ডস-এর স্ত্রী, মিসেস মুর, আরেকজন মিঃ কপার ও তাঁর সালংকারা স্ত্রী। বর্তমান ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এঁদের সকলের অপরিসীম কৌতূহল। গৃহকর্তা ও কর্ত্রী এক সময় উঠে সকলের পানাদির ব্যবস্থা করলেন এবং তার সঙ্গে কিছু রুচিকর খাদ্যসামগ্রী।

সমস্ত বাড়ি রাঙা কাঠের তৈরি। সেই কাঠের একপ্রকার মিহি মিষ্ট গন্ধ আমাকে বার বার কাশ্মীরের ওয়ালনাট্ জঙ্গলের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছিল। কাঠের সীলিং মাত্র ৮ ফুট উঁচুতে, এতে নাকি ঠান্ডা কমে। পাশেই রয়েছে পুরনো আমলের মতো ফায়ার প্লেস এবং তার পাশে এক বোঝা কাঠের গুঁড়ি। আমার প্রশ্নের উত্তরে ওঁরা বললেন, পুরনো কালে ছিল এটাই সব বাড়ির রেওয়াজ, এখন ইলেকট্রিকের যুগে এটা বিলাস। এ বাড়িটি এত ছোট কেন—এ প্রশ্নের উত্তরে ওঁরা বললেন, ঠিক যতটুকু দুজনের পক্ষে দরকার, এ বাড়ি ততটুকুই। আমাদের 'নীড্স্' অনুসারে আমি এ বাড়ির প্ল্যান করেছিলুম।

ভিতরটা পরিচ্ছন্ন ও সুসজ্জিত, সুরুচির পরিচয় রয়েছে সর্বত্র। আলোটা একটু কমানো, যাকে বলে 'মেলোড লাইট'। প্রবীণা মহিলাদের মধ্যে বিশেষ করে একজন হলেন খুবই মধুরকণ্ঠী এবং মিষ্টভাষিণী, তিনি মিসেস রবার্ট। আরেকজন যিনি একটু বেশি পরিমাণ গয়নাগাঁটি পরেছেন, তাঁর গলায় তিন চার ছড়া মুক্তো-লহরীর নিচে বেটি জ্বলজ্বল করছিল এই 'মেলোড' লাইটে, সেইদিকে লক্ষ্য করে আমি প্রশ্ন করলুম, আপনার গলার লকেটটা কী ধরনের হীরে?

উনি সহাস্যে বললেন, হ্যাঁ, হীরেই বটে, তবে এটা ক্ষণে ক্ষণে রং বদলায়। একটু বড়। স্যার রবার্ট এবার বললেন, ভারতের অবস্থা এখন কিরূপ? আমি কখনও সে দেশে যাইনি।

জবাব দিতেই হলো। বললুম, আপনারা যখন ছেড়ে এলেন তখন ভারত ছিল অনুন্নত, এখন উন্নতিশীল। উন্নতিশীল বলেই সমস্যা দেখা দিয়েছে একটির পর একটি।

সম্প্রতি এখানকার কাগজপত্রে যে সব কথা বেরোচ্ছে, এগুলো কি সত্যি?

আমি জানালুম, প্রায় ছ'মাস আমি দেশছাড়া, সুতরাং জরুরী অবস্থার সম্পর্কে কোনও কথা আমার জানা নেই। কিন্তু এখানকার কোন কোনও কাগজে ভারত সম্বন্ধে যেসব খবর ছাপা হচ্ছে সেগুলো অধিকাংশ আজগুবী এবং অতিরঞ্জনে বিকৃত। ইংরেজরা ভারত ছাড়ার আগে যে অপরিসীম দুর্দশার মধ্যে ভারতকে রেখে এসেছিল, আজকের সমস্যাগুলি তারই 'লিগেসি'। আপনারা কি রবীন্দ্রনাথের লাস্ট টেস্টামেন্ট 'সভ্যতার সংকট' বা 'Crisis in civilization পড়েছেন?

ওঁরা বললেন, ওঁরা কেউ সেটি পড়েননি। শুধু তাই নয়, ব্রিটিশ আমলের শেষ দিকে ওঁরা সচরাচর ভারতের ঘনিষ্ঠ খবরও জানতেন না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আমলে ভারতবর্ষ আমাদের কাছে অনেকটা অজ্ঞাত থাকত।

আমি হাসছিলুম। বললুম, ইংল্যান্ডের বর্তমান অবস্থা ভারতের চেয়ে যথেষ্ট উন্নত নয়। আপনাদের শ্রমিক সম্প্রদায়ের মধ্যে এখন নিয়মানুগত্য (discipline) একেবারেই কম। পারিশ্রমিক আদায় করে অথচ শ্রমবিমুখ, এ দেখছি চারদিকে। মিস্তিরিরা কাজ করতে চায় না, ডাকলে সাড়া দেয় না, কথা দিয়ে কথা রাখে না, কথায় কথায় ধর্মঘট আর লক আউট, কারখানা বা খনিতে যখন তখন কাজ বন্ধ, খুনোখুনি বা মারামারির মামলা, এবং এদের সঙ্গে যারা হাত ধরাধরি করে চলে, তারা সকল কাজেরই অযোগ্য (unemployable)। আজকের ইংল্যান্ড কোথায় ধীরে ধীরে নামছে, নিশ্চয়ই আপনারা লক্ষ্য করছেন। তেরো বছর পরে আমি আবার এসেছি এদেশে, কিন্তু একে আর চেনা যায় না! ইংল্যান্ডের রং চটে গেছে। এর

ওপর যথেচ্ছ মূল্যবৃদ্ধি এবং তার সঙ্গে ভয়াবহ মুদ্রাস্ফীতি। আপনাদের সংবাদ-পত্রগুলি সব সময় সত্য সংবাদ প্রকাশ করে না। ইংরেজ সভ্যতার সেই প্রাচীন গৌরব ম্লান হচ্ছে!

আমার কণ্ঠে কিছু উত্তাপ সৃষ্টি হয়েছিল। স্যার রবার্টের একটি বিশেষ প্রশ্নের উত্তরে সেদিন আমি বলতে বাধ্য হয়েছিলুম, ব্রিটেন ও ভারতের পূর্ব-সম্পর্কের কথা যদি তোলেন তাহলে বলব, চার্চিল ভারতবন্ধু ছিলেন না। কিন্তু লর্ড ব্রেবোর্নের মত যদি আরও দু'চারজন ভদ্র গভর্নরকে আপনারা ভারতে পাঠাতেন, তাহলে ভারত-বৃটেন সম্পর্কের ইতিহাস একটু অন্যরকম হতো!

মিসেস উইন্ট্রিংহাম বিশেষ সমাদরের সঙ্গে সকলকে ডেকে ডাইনিং টেবলে নিয়ে বসালেন। মিসেস রবার্ট আমার পাশে বসলেন। আমি ঠিক মাঝখানে। এই স্নেহ-প্রবণ এবং শান্তহাসিনী মহিলা সারাক্ষণ তাঁর বাঁ হাতখানি আমার গায়ের উপর রেখে কথা বলছিলেন।

টেবলের উপর তিনচারটে মোমবাতি জ্বালানো হয়েছিল। গৃহকর্ত্রী সযত্নে পরিবেশন করছিলেন। আহার্য সামগ্রী ছিল প্রচুর। স্যার রবার্ট ছিলেন হাস্য-মুখর ও কৌতুকভাষী। সমগ্র ব্যাপারটা ছিল আনন্দদায়ক। আমি ওঁদের সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়েছিলুম।

সেদিন প্রায় মধ্যরাত্রে উইনট্রিংহাম আমাকে হোটেলে পৌঁছিয়ে দিয়েছিলেন।

॥ ১৬ ॥

প্রিয়বরেষু,

বার্মিংহামে আমার বসবাসকাল কিছু দীর্ঘতর হচ্ছিল। আমি ঘোরাফেরা করছিলুম নানা পথে। এই নগরে একটি অনাড়ম্বর রুচিশীলতার পরিচয় পাচ্ছিলুম সর্বত্র। এ লণ্ডন নয় যে, কথায় কথায় হুজুগ ওঠে। মিডল্যাণ্ডে যেখানে লণ্ডনের ঢেউ যখন তখন পৌঁছয় না, সেখানে দেখছিলুম একটি অনাহত শান্তভাব। এখানে সাধারণ ভদ্র ইংরেজ কেমন একটা নির্লিপ্ত চেহারায় বাস করে। বার্মিংহাম আজও যথেষ্ট 'আধুনিক' হয়ে ওঠেনি, এখানে পুরনো কালের আভিজাত্যবোধ বজায় রয়েছে।

আরেকটি কথা। বর্ণবিদ্বেষ এবার যেন ইংল্যাণ্ডে অনেকটা সরে দাঁড়িয়েছে। এর কারণ খুব অস্পষ্ট নয়। আগেই বলেছি পৃথিবীর বহু দেশের বহু জাতির লোক এদেশে এসে কিছু-না-কিছু কাজ নিয়েছে। তারা উৎপাদনও যেমন বাড়িয়েছে, অর্থনীতিকেও অনেকটা জোরালো করেছে। অন্যদিকে জাত-ব্রিটিশ শ্রমিক মহলে এসেছে আলস্যের মন্থরতা। এবারে এসে দেখতে পাচ্ছিনে সেই বিটল্‌স বা বিটনিকের দলকে যারা বিগত বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে একটা সমস্যার সৃষ্টি করেছিল। একদা বিলেতী সংবাদপত্রেই দেখা যেত, যুদ্ধের পর আমেরিকান সৈন্যরা এদেশে তিন লক্ষেরও বেশি জারজ শিশুকে রেখে গিয়েছিল যাদেরকে সমাজ জীবনে গ্রহণ করা হবে কি না এ প্রশ্ন দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু ব্রিটিশ জাতি সহনশীল। অবশেষে গভর্নমেন্ট এই 'অরফান' শিশুর পালকে ব্রিটিশ নাগরিক হিসাবে গ্রহণ করেন। কিন্তু প্রতিপালনের দায়িত্ব ছিল সমস্যাসংকুল। ফলে, এদেরই একটা বৃহৎ

অংশ 'মানুষ' হয়নি। এরা দেশের নানা অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে এক-এক দলে। চুরি-ডাকাতি বাড়ে, বিভিন্ন সামাজিক ও নৈতিক অপরাধ ঘটতে থাকে এবং তাদের জীবন বেপরোয়া হয়ে ওঠে। এরা বর্ণবিদ্বেষ ছড়িয়ে বেড়ায় পথে-ঘাটে, এ পাড়া ও পাড়ায় মারামারি বাধায়, কৃষ্ণাঙ্গদের কাছ থেকে কাজকর্ম কেড়ে নিতে থাকে। এখন ওদের মাথা কিছু ঠাণ্ডা হয়েছে। সম্ভবত বৃটিশ অর্থনীতির মূলধারার সঙ্গে ওরা মিলে গেছে। এবারে আর কোথাও শুনছিনে 'কীপ ব্রিটেন হোয়াইট'।

বার্মিংহামে ভারতীয়ের সংখ্যা যথেষ্ট, তাদের মধ্যে বাঙ্গালীর সংখ্যাও প্রচুর। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন চিকিৎসক, অধ্যাপক, শিক্ষাবিদ, ইন্জিনিয়ার, আইনজ্ঞ ইত্যাদি। এদেশে নানা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে, কারখানায়, পূর্ত বিভাগে কাজও করেন বহু বাঙ্গালী। শুনলুম ভারতীয় ব্যবসায়ীও আছেন কয়েকজন। যাই হোক, বাঙ্গালী মহলের মুখপাত্রস্বরূপ ডাঃ আদক গ্রান্ড হোটেলে এসে বিশেষভাবে আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়ে গেলেন একটি বন্ধু সম্মেলনে যোগদানের জন্য। শুধু তাই নয়, ওঁরা এই উপলক্ষে বাঙ্গলা 'কাঁচকাটা হীরে' ছবিটি কোথা থেকে কি প্রকারে যেন আনিয়েছেন, সেটি আগামীকাল সকালে একটি ছোটখাট সিনেমা হলে দেখানো হবে। সেখানে আমার উপস্থিত থাকা দরকার, কেননা 'কাঁচকাটা হীরে' বইটি আমারই লেখা। হিসেব করে দেখলুম, সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত ওঁরা অনুষ্ঠানসূচী প্রস্তুত করেছেন। আগামীকাল রবিবার।

এবার আমার পক্ষে বার্মিংহাম ত্যাগ করার সময় হয়েছে। বিগত প্রায় ছয় মাস কাল একটানা ভ্রমণে কিছু ক্লান্তি এসেছিল। কিন্তু নিজকে চাবকিয়ে রাখছিলুম পাছে অসুস্থ হই এবং পাছে অবসাদের তন্দ্রা নেমে এসে আমাকে আচ্ছন্ন করে।

পরদিন সকালে সিনেমা হলে গিয়ে নিজের বইটি এই প্রথম দেখলুম এবং ছবি দেখার পর কয়েকজন মহিলা ও পুরুষকে চোখ মুছতেও দেখলুম। ওটি বিকাশ রায়ের অভিনয়ের গুণে। অতঃপর মধ্যাহ্নভোজে নিয়ে গেলেন ডাঃ রায় ও তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী মঞ্জু। তাঁদের সেই সুন্দর বাড়িটিতে ভূরিভোজের আয়োজন দেখে ঈষৎ ভয়ই পেলুম। বিশেষ করে খাঁটি ঘিয়ে ভাজা লুচির সংখ্যা, চর্বিযুক্ত মাংস, মাছের বাটি এবং মিষ্টান্নের পাত্র লক্ষ্য করে আমার দুর্ভাবনা দেখা দিল। ভ্রমণকালে আধ-পেটা খাওয়া আমার অভ্যাস। খাদ্যসামগ্রীর অতিপ্রাচুর্য দেখে আমেরিকায় আমার আহারের প্রতি অরুচি এসেছিল!

অপরাহ্নকালে ওঁরা আমাকে নিয়ে গেলেন গ্রীনল্যান্ড রোডের শেলী পার্কে। সেখানে ভিক্টোরিয়া হল নামক এক কক্ষে যাঁরা একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ডাঃ প্রভাস ঘোষ, অসীমা মিত্র, রমা সিং, সতী ঘোষ, জিম্মি মিত্র, ইন্দ্রজিৎ ও মীরা মিত্র, শ্রীমতী মণিকা রাও, পার্থ ঘোষ প্রভৃতি কয়েকজনের নাম মনে আছে। একটি বালিকা-নৃত্যের আয়োজন করেছিলেন শ্রীমতী বাসন্তী চ্যাটার্জি ও মঞ্জু রায়। ওখানে আমার প্রিয় দুই বন্ধু প্যাট্রিসিয়া ও তাঁর স্বামী হ্যারল্ড উইলকিনসনকে দেখে খুব উৎসাহিত হলুম। বলা বাহুল্য, নাচে গানে কৌতুকে এবং ভাষণে ওরা সকলেই মুখর হয়ে উঠেছিল। আমাকেও কিছু বলতে হয়েছিল। এর পর একে একে ছবি তোলাতুলির পালা। শ্রীমতী প্যাট্রিসিয়া আমার কাঁধে মাথা হেলিয়ে ছবি তুলিয়েছিলেন, এজন্য কৌতুকরঙ্গে মেতে উঠেছিলেন শ্রীমতী [illegible]।

ঘন্টা তিনেক পরে শ্রীমতী মণিকা রাও আমাকে নিয়ে চললেন তাঁদের ব[illegible]তে।

তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ। সেখানে নৈশভোজের মস্ত আয়োজন করেছিলেন ওখানকার প্রসিদ্ধ নিউরো-সার্জেন ডাঃ ভিকটর রাও। এখানেও সকলের সঙ্গে যোগদান করেছিলেন প্যাট্রিসিয়া ও উইলকিনসন। বন্ধুবর আজাইব সিং-এর বাঙ্গালী স্ত্রী শ্রীমতী রমা এই ভোজের আসরটিকে বাক্যচ্ছটায় মুখরিত করেছিলেন। সেদিন ছুটি পেয়েছিলুম রাত ১১টার পর। ডাঃ রাও অতঃপর আমাকে নিয়ে প্রায় মধ্যরাত্রে গ্রান্ড হোটেলে পৌঁছিয়ে দিয়ে এলেন।

পরদিন সকাল ১০টায় একখানা উত্তরমুখী ট্রেন ধরে বার্মিংহাম ছাড়লুম। স্টেশনে আমাকে পৌঁছিয়ে দিয়ে এবারের মতো বিদায় নিলেন মিঃ উইলকিনসন। বললেন, আপনি যে আমার আর প্যাট্রিসিয়ার জীবনকাহিনী সহানুভূতির সঙ্গে শুনেছেন, এজন্য চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকব।

এবার আর করমর্দন নয়, সোজা আলিঙ্গনাবদ্ধ! শুধু বললুম, তোমাকে ভুলব না হ্যারল্ড, এ প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেলুম। চোখে হয়ত আর তোমাদের দেখব না, কিন্তু মন দিয়ে দেখব।

চলন্ত ট্রেনের দিকে হ্যারল্ড চেয়ে রইল। আমার ট্রেন চলল দ্রুতগতিতে। গত ছয় মাসকাল ধরে এইভাবে শত সহস্র নরনারীর কাছ থেকে সকরুণ বিদায় নিচ্ছিলুম।

আমার বিদেশ ভ্রমণকালে আমি পন্ডিত বা মনীষী খুঁজে বেড়াইনে। খুঁজি মানুষকে। একটি খাঁটি মানুষের মধ্যে তার দেশকে দেখতে পাই! জ্ঞানলাভ করার জন্য আমি দেশত্যাগ করিনি, কারণ জ্ঞানের বিকল্প রূপই হল অভিজ্ঞতা। আমার দরকার জীবনকে, দেশে-দেশে নগরে-নগরে যে-জীবন নব নব রূপে উচ্ছ্বসিত হচ্ছে। এ ছাড়া আমার নিজেরও কিছু আত্মাভিমান আছে। আমার ধারণা, জ্ঞান ও সমাজদর্শন চর্চায় ভারত আজও অগ্রগণ্য।

মাঝখানে স্টাফোর্ড স্টেশনে আমাকে গাড়ি বদল করতে হল। আজ মেঘলা। উত্তর পথের দিকে একটু শীতের হাওয়া উঠেছে। কোটের উপর ওভারকোট চড়েছে অনেকের। প্লাটফরমে মিনিট পাঁচেক অপেক্ষা করতে হচ্ছিল। এদিক ওদিক চেয়ে দেখি, একটি ইংরেজ ঝাড়ুদার ওভার-ব্রীজের সিঁড়িগুলি ধোওয়া-মোছা করছে। বড় ন্যাতাটা নিংড়োচ্ছে বালতির মধ্যে। কাছে গিয়ে বললুম, ঠাণ্ডা জল ঘাঁটতে কষ্ট হচ্ছে না?

কষ্ট! —লোকটা সোজা হয়ে সিঁড়িতে দাঁড়াল। হাসিমুখে বলল, মাস দুই পরে বরফে যে কষ্ট হবে, তখনকার কথা ভাবুন। এখন বয়স হয়েছে, এ ছাড়া অন্য কাজ পাবো কোথায়?

গাড়ি এসে দাঁড়াল। আমি উঠে পড়লুম।

অজানা উত্তরে চলেছি দ্রুতগতি ট্রেনে। মিডল্যান্ডের ভিতর দিয়ে চেশায়ারে। ছোট ও বড় জনপদ হয়ে, মিডলউইচ, নর্থউইচ, রানকর্ন, ওয়ারিংটন ইত্যাদি আশেপাশে থেকে যাচ্ছে। এরা সব মধ্যবিত্ত জনপদ, অর্থাৎ মফস্বল শহর। চেশায়ারের উত্তর-পূর্বে পড়ছে ম্যানচেস্টার এবং উত্তর-পশ্চিমে আইরিশ সমুদ্রতীরে পড়ছে লিভারপুল শিল্পনগরী। ভারতের চোখে এই দুই শিল্পনগরী ম্যানচেস্টার ও লিভারপুল একদা অতিশয় কুখ্যাত হয়ে ওঠে। গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের কালে (১৯২১-২২) বিলেতী বস্ত্র বয়কট, বনফায়ার ইত্যাদি অনেক ঘটনা ঘটে এবং সেই থেকে খাদি বা খদ্দরের প্রচলন আরম্ভ হয়। বিলেতী কলের তৈরি কাপড়গুলি ছিল মিহি, সিল্ক ফিনিস, সুশ্রী এবং লোভনীয়। তখন শ্রেষ্ঠ একজোড়া ধুতি সাত

সিকে, এবং ভাল শাড়ি একজোড়া ন' সিকে। কিন্তু তৎকালের শ্লোগান ছিল একটি কবিতার চরণ ঃ "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই—"

ল্যানকাস্টারের বড় স্টেশনটি ছাড়িয়ে সোজা উত্তরপথে গাড়ি ছুটছিল। বেলা তখন অপরাহ্ণ। এর মধ্যে দুজন ভদ্রলোক ইংল্যাণ্ডের অর্থনীতিক গোলযোগ নিয়ে আলাপ করছিলেন। কিন্তু তখন 'অকসেনহলমে (Oxenholme) নামক একটি স্টেশনে গাড়ি বদলের জন্য আমাকে নামতে হচ্ছিল। ওঁদের একজন পিছন থেকে বললেন, আপনি যতই বলুন, আমরা উইলসন গভর্নমেন্টের উদ্ভট সোস্যালিজম সমর্থন করিনে। বরং মিসেস থ্যাচার 'এনটারপ্রাইজিং'।

অকসেনহলম স্টেশনে গাড়ি বদল করে নতুন যে গাড়িটিতে উঠলুম, সেটি অনেকটা টয়-ট্রেনের মতো ছোট। কোলিয়ারি অঞ্চলের ওয়াগন ট্রেনের মতো শব্দসাড়া তুলে গাড়িটি ঢুকল পাহাড়ী জঙ্গলের মধ্যে এবং একটু পরেই দেখতে পাওয়া গেল দুই দিকের পর্বতশ্রেণীর কোলে বড় বড় জলাশয়গুলি পশ্চিমের আলোয় ঝলমল করছে। এটি পার্বত্যভূমি। জলে, পাহাড়ে, উপত্যকায়, বনশোভায়- এ যেন প্রকৃতির এক অবাধ লীলাভূমি। চারিদিকে যেন মধুর কাব্য উচ্ছ্বসিত হচ্ছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই 'উইনডারমেয়ার' (Windermere) স্টেশনে এসে গাড়ি থামল। এই শাখা লাইনে এইটিই শেষ স্টেশন। গাড়ি থেকে নামতেই এক প্রবীণা মহিলা ও তাঁর বৃদ্ধ স্বামী এগিয়ে এসে অভ্যর্থনা জানিয়ে বললেন, ইনি আমার স্বামী ডবল্ বি ক্রেসওয়েল। আসুন, এই সামনেই গাড়ি রয়েছে। না না, আমিই সুটকেস নিচ্ছি।

বৃদ্ধের চেহারা দেখে আমিই টেনে নিলুম সুটকেসটা। মহিলাটি প্রবীণা, কিন্তু সাজ-সজ্জা ও প্রসাধনে খুবই আধুনিক। কিন্তু ভদ্রলোকটির মতো এমন নিরীহ, নিরভিমান এবং শান্ত প্রকৃতির বৃদ্ধ ইংল্যাণ্ডে খুব কমই দেখেছি। ওঁর মিষ্ট কথাবার্তায় আমি আকৃষ্ট হলুম। তিনি পিছন দিকে বসলেন। মহিলা ড্রাইভ করবেন। আমি পাশে বসলুম। প্রথমেই হেসে বললুম, আগে কিছু খাদ্য আমার চাই আমি ঈষৎ ক্ষুধার্ত। মহিলা আমার কথায় বেশ উৎসাহ বোধ করলেন এবং কিছুদূর গিয়ে বাঁ-হাতি একটি হোটেলের সামনে গাড়ি রাখলেন। হোটেলে ঢুকে দেখি, সুসজ্জিত ভিতরবাগে দুজন মহিলা ছিলেন কর্মব্যস্ত। ক্রেসওয়েল দম্পতি স্পষ্টত তাঁদের পরিচিত। আমরা পাশের সিঁড়ি ধরে ভূগর্ভের নীচে বেসমেন্ট হলে বসে তিনজনেই সুপ ও স্যাণ্ডউইচ আনালুম। এখানেই পারস্পরিক পরিচয়ের সুবিধা পাওয়া গেল। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই বিশেষ সজ্জন। উইনডারমেয়ারেই ওঁদের নিজস্ব বাড়ি। এই জেলার নাম 'লেক ডিস্ট্রিক্ট'। লেক ডিস্ট্রিক্ট ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাসে অমরত্বলাভ করেছে মহাকবি উইলিয়ম ওয়ার্ডসওয়ার্থের জন্য। তিনি এখানকার এই নন্দনকাননের শোভার মধ্যেই জীবন কাটিয়ে গেছেন। শ্রীমতী ক্রেসওয়েল থাকেন 'কাম্ব্রিয়া' অংশে। ওঁদের সন্তানাদি নেই। মিঃ ক্রেসওয়েল এখন পেনসন পান। উনি ছিলেন রেলওয়ে বিভাগের একজন বিশিষ্ট অফিসার। শ্রীমতী কখনও পৃথকভাবে উপার্জন করেননি। হাসিমুখে শুধু বললেন, বুড়ো বয়স পর্যন্ত ওঁর ঘাড়েই তো আছি!

চারিদিকের অরণ্যময় পর্বতশ্রেণীর কোলে এ এক রমণীয় সুবৃহৎ উপত্যকা, এবং এর কোলে-কোলে মোট আটটি বড় বড় জলাশয়। সর্বাপেক্ষা যেটি বিস্তৃত, সেটির নাম 'লেক উইনডারমেয়ার'—এটি লম্বায় সাড়ে ১০ মাইল। আমরা রয়েছি ক্ষুদ্র শহর

গ্রাসমেয়ারে (Grassmere)। এ যেন অনেকটা কালিম্পং বা নৈনীতালের পার্বত্য উপত্যকায় এসেছি। ওঁরা আমাকে নিয়ে এলেন একটি পাহাড়ের ঠিক নীচে। পিছনের পাহাড়টির নাম 'ন্যাব স্কার'। কোলের অংশটাকে বলা হয় 'রাইডাল মাউন্ট'। আমি ঈষৎ বিস্মিত হলুম যখন শুনলুম এই রাইডাল মাউন্টেন বাড়িটিতে আমার বাসস্থান নির্দিষ্ট হয়েছে। এই সুন্দর দোতলা বাংলোটিতে সপরিবারে কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ তাঁর জীবন অতিবাহিত করেছেন। প্রায় প্রত্যেকটি ঘর ও কক্ষ এখন মিউজিয়মে পরিণত। কিন্তু কবি যে ছোট ঘরটিতে লেখাপড়া ও রাত্রিবাস করতেন, তার বাইরে সরু বারান্দাটির মেঝের উপর একটি প্লেট বসানো রয়েছে। ওতে লেখা, 'প্রাইভেট'। আমাকে কবির ওই প্রাইভেট ঘরটিই দেওয়া হল। ঘরের মধ্যে রয়েছে একটি নিচু টেবিল ও আরাম কেদারা। অন্য দিকে একটি আলমারি দেওয়ালের সঙ্গে সাঁটা। মাঝ-খানে মুখ হাত ধোওয়ার একটি বেসিন ও জলের কল। একটি আয়না ওর উপরে লটকানো। ইউরোপে কোথাও পুরনো কালে শোবার ঘরের গায়ে স্নানাগার সংলগ্ন থাকত না। ওটা থাকত অনেকটা দূরে। ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালী—সর্বত্রই প্রায় এই। ওরা আধুনিক হয়েছে এই শতাব্দীর প্রথম পাদে।

ওয়ার্ডসওয়ার্থের পুরনো খাটখানায় আমার বিছানা পড়েছে, তবে ডানলপ-পিলো গদিটি একালের। বলা বাহুল্য, ঘরখানিতে ঢুকে প্রথমটায় আমার একটু থ্রিল হয়েছিল। আমার সমগ্র বসবাস ব্যবস্থার খুঁটিনাটি দেখাশোনা যিনি এতক্ষণ ধরে করলেন তিনি হলেন রয়াল নেভির লেফটেনান্ট কমান্ডার মিঃ পি পি আর ডেন। তিনি এবং মিসেস ডেন এখন এই যাদুঘরের সম্প্রতি-নিয়োজিত পরিচালক (curator)। ওদের হাতেই 'রাইডাল মাউন্ট' এস্টেটটি দেখা শোনার ভার। মিসেস ডেন বললেন, আমিই রান্নাবান্না করব। আপনার যখন যা দরকার বলবেন, সংকোচ করবেন না।

আমি কিন্তু সংকোচের সঙ্গেই এক পেয়ালা কফির কথা বলে ওই হাসিখুশী মহিলাকে শশব্যস্ত করে তুললুম। কফির সঙ্গে কেক প্রভৃতি এসে গেল।

ক্রেসওয়েল দম্পতি এখানে আমাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে সন্ধ্যার প্রাক্কালে বিদায় নিলেন। আগামীকাল সকাল নটায় ওঁরা আবার আসবেন। আমি ওঁদের হেপাজতেই আছি।

বাড়িটি আড়াইতলা, টিপিক্যাল বৃটিশ বাংলো। এই বাড়িটি এতকাল ধরে বাইরের লোককে দেখতে দেওয়া হয়নি। কিন্তু গত সালে ওয়ার্ডওয়ার্থের জন্মের দুইশত বছর পূর্তি উপলক্ষে ৭ই এপ্রিল তারিখ থেকে ভিজিটারদের আসতে দেওয়া হচ্ছে। ওঁরা বললেন, আমিই প্রথম ভারতীয় যিনি এ বাড়িতে এলেন! ভিজি-টারদের বইতে আমিও সেইভাবে স্বাক্ষর রাখলুম। মিঃ ডেন আমাকে অপর একটি বাড়ির ছবি উপহার দিলেন। এ বাড়িটি 'ককার-মাউথ' নামক একটি গ্রামের বাড়ি। এখানেই কবি উইলিয়ম ১৭৭০ সালের ৭ই এপ্রিল জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম জন ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও জননী মেরী অ্যান। মাত্র আট বছর বয়সে উইলিয়ম মাতৃহারা হন এবং যখন তাঁর পিতার মৃত্যু ঘটে তখন তাঁর বয়স তেরো বছর। তিনি তখন হক্স হেড স্কুলের ছাত্র। দারিদ্র্য ও দুর্দশায় তাঁর সেই জীবন কাটে। ১৭ বছর বয়সে তিনি ক্যামব্রিজের সেন্ট জনস্ কলেজে মেধাবী ছাত্র হিসাবে ভর্তি হন এবং ২০ বছর বয়সে তাঁর বন্ধু রবার্ট জোনস-এর সঙ্গে পায়ে হেঁটে ইউরোপ মহাদেশ ভ্রমণ করেন। ১৭৯১-৯২ সালে তিনি ফ্রান্সে বাস করেন ফরাসী বিপ্লবের একজন সক্রিয়

সমর্থকরূপে। সেখানে তিনি এক ফরাসী তরুণীর প্রণয়াসক্ত হন, তার নাম অ্যানেট ভ্যালন। উভয়ের মধ্যে বিবাহ সম্পর্ক ঘটেনি। অতঃপর ভ্যালন একটি কন্যা প্রসব করে এবং শিশুর নাম রাখা হয় অ্যানকেরোলিন ওয়ার্ডসওয়ার্থ। উইলিয়মের জীবন বিবিধ ঘটনায় পরিপূর্ণ। অ্যানেট ভ্যালনের আর কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি।

কবির কনিষ্ঠা সহোদরা ডরোথি তাঁর চেয়ে এক বছরের ছোট। ভাই বোনে গিয়ে ডরসেট মহকুমায় রেসডাউন অঞ্চলে বাসা বাঁধলেন। ওখানে অ্যানেট ভ্যালন তার শিশুকন্যাকে নিয়ে এসে উঠল কিনা, ইতিহাসে সেটি নেই। কালক্রমে কবির খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে এবং কবি স্যামুয়েল টেলর কোলরিজ তাঁর কাছে আসেন এবং উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হয়। সেই বন্ধুর কাছাকাছি থাকার জন্য উইলিয়ম এসে বাসা নেন কোলরিজের পাড়ায়। অতঃপর শতাব্দীর শেষ প্রান্তে এসে কবি তাঁর সহোদরাকে সঙ্গে নিয়ে এই ক্ষুদ্র জনপদ গ্রাসমেয়ারে এসে 'ডাভ কটেজটি' ভাড়া নেন। বছর তিনেক পরে কবি বিবাহ করেন মেরি হাচিনসনকে (১৮০২ খৃঃ)। পরবর্তী ৮ বছরের মধ্যে একে একে তাঁর ৫টি সন্তান জন্মগ্রহণ করে--তিনটি ছেলে ও দুটি মেয়ে। ইতিমধ্যে কবির সহোদর জন ওয়ার্ডসওয়ার্থ শুনে আসছিলেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলে কোনও মতে ভারতে পেঁছিতে পারলেই ভাগ্যলক্ষ্মীর অজস্র কৃপা ঘটে! লর্ড ক্লাইভের আমলে লুণ্ঠনকারী ইংরেজের দল গিয়েছিল ভারতের অন্তর্গত বাঙলা দেশে এবং তার ফলে ইংল্যান্ডে ঘটেছিল শিল্পবিপ্লব (১৭৭৪)। যে-সব লুটেরা ইংল্যান্ডে ধনরত্ন সম্ভার নিয়ে ফিরেছিল তাদের নাম হয়েছিল 'ন্যাবব' অর্থাৎ নবাব। শিল্প-বিপ্লবের কালে বৃটিশরা আমেরিকার ওপর দখল ছেড়ে এসে 'ইস্ট ইন্ডিয়ার' দিকে মনঃসংযোগ করে। জন ওয়ার্ডসওয়ার্থ 'ইস্ট ইন্ডিয়াম্যান' নামক জাহাজের ক্যাপটেন থাকাকালীন ১৮০৫ সালে সৌভাগ্যের স্বপ্ন দেখেন এবং তারই অপ্রতিরোধ্য টানে তিনি যখন ভারত অভিমুখে যাত্রা করেন, তখন উইমাউথ বে-র কাছাকাছি এসে ঝড়ের তাড়নায় জাহাজটি তীরভূমির পার্বত্য অঞ্চলে আছড়িয়ে পড়ে। জন ছিটকিয়ে সমুদ্রে পড়ে সাঁতার কাটার চেষ্টা পান, কিন্তু তিনি বাঁচতে পারেননি।

১৮১২ সাল পর্যন্ত কবি উইলিয়মের পক্ষে কোথাও স্থিতিশীল হওয়া সম্ভব হয়নি। তিনি একই অঞ্চলে এখান থেকে ওখানে, ওখান থেকে সেখানে বাসা বেঁধে বেড়াচ্ছিলেন। এই বছরেই তাঁর দুটি ছেলেমেয়ের কঠিন ব্যাধিতে মৃত্যু ঘটে। তাঁদের বাসস্থানের সামনে গ্রাসমেয়ারের গির্জার বাগানে ওই শিশুসন্তান দুটিকে সমাধিস্থ করা হয়। কিন্তু প্রতিদিন সেই সমাধির দৃশ্য শোকার্ত পিতা-মাতার পক্ষে অসহনীয় হয়ে ওঠে। এই অবস্থায় লেডি ডায়না ফ্লিমিং তাঁর ওই এস্টেট 'রাইডাল মাউন্ট' ও তৎসংলগ্ন বাড়িটি কবিকে ভাড়া দেন (১৮১৩ খৃঃ)। সেটি এই বাড়ি। এখানে তিনি ও তাঁর ফ্যামিলি ৩৭ বছর বাস করেন ও এই বাড়িতেই তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি ৮০ বছর জীবিত ছিলেন। এখানে তাঁর স্ত্রী মেরি, তিনটি ছেলেমেয়ে—জন, ডোরা ও উইলিয়ম, সহোদরা ডরোথি ও শ্যালিকা শ্রীমতী শারা হাচিনসন—মোট ৭ জন বাস করতেন। প্রতি ঘরে, কক্ষে, লাউঞ্জে, স্টাডিতে, ডাইনিং হলে,—এবং সর্বত্র ঘুরে ঘুরে কবির সমগ্র জীবনটি পর্যালোচনা করার চেষ্টা পাচ্ছিলুম। প্রত্যেক সামগ্রীর দৃশ্য আমার মধ্যে রোমাঞ্চ আনছিল।

একটি জায়গায় দেখলুম কবি তাঁর বিদুষী সহোদরা ডরোথি সম্বন্ধে লিখেছেন :

"—and in thy voice I catch
The language of my former heart, and read
My former pleasure in the shooting lights
Of thy wild eyes."

কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থের জীবনে ডরোথি বোধহয় সর্বাপেক্ষা প্রধান স্থান অধিকার করে আছেন। এই চিররুগ্না ও শীর্ণা মহিলার যৌবনকালের কোনও সংবাদ পাওয়া যায় না। কোলরিজ বলতেন, "exquisite sister."

কোলরিজের সঙ্গে এক সময়ে কবি উইলিয়মের মনোমালিন্য ঘটলেও উভয় পরিবারের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। কিন্তু কোলরিজ কখনও 'রাইডাল মাউন্টের' বাড়িতে আসেননি।

কাব্য সাধনার সাফল্যের ফলে সমগ্র মহাদেশে ও ইংল্যান্ডে উইলিয়মের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়লেও তিনি ছিলেন অভাবগ্রস্ত। সাহিত্যের কাজে অর্থোপার্জন তৎকালে ছিল স্বপ্নবৎ। সেই কারণে ১৮১৩ সালে লর্ড লন্সডেল্-এর চেষ্টায় ওয়ার্ডসওয়ার্থ ওয়েস্টমরল্যান্ডে একটি স্ট্যাম্প বিতরণের (Distributor of Stamps) কাজ পান। এতে তাঁর আর্থিক সুরাহা ঘটে। বাড়িতে দু'একটি পরিচারিকা ও বাগানে একজন মালী রাখা সম্ভব হয়।

ছোটবেলায় শুনতুম ওয়ার্ডসওয়ার্থ ছিলেন প্রকৃতির কবি এবং প্রাকৃতের সকল অভিব্যক্তির সঙ্গেই ছিল তাঁর হৃদয়ের অন্তরঙ্গতা। এই সূত্রে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর তুলনামূলক আলোচনা অনেকেই করতেন। ব্রিটিশ আমলে আমাদের মিশনারি ইস্কুলে ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিতা মুখস্থ না লিখতে পারলে পরীক্ষায় নম্বর কাটা যেত। একালে এসে সেই ওয়ার্ডসওয়ার্থের বাড়ির ডাইনিং হলে বসে যখন নৈশভোজন করছিলুম এবং কমান্ডার ডেন (Dane) যখন সযত্নে পরিবেশন করছিলেন, তখন আমার এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বললেন, হ্যাঁ, ঘরের এই মেঝে স্লেট পাথরের এবং চালার উপরেও স্লেট পাথরের টালিছাওয়া। তবে বাড়িটা আসলে ওক কাঠের তৈরি। এগুলি সবই ১৬ শতাব্দীতে বানানো। চেয়ার টেবিল আসবাবপত্র যা দেখছেন চারদিকে, এ সবই ওয়ার্ডসওয়ার্থের আমল থেকে এ পর্যন্ত তাঁর উত্তরাধিকারীরা দেড়শ' বছর ধরে ব্যবহার করে গেছেন। সামনের দেওয়ালে কবির যে ছবিটি রয়েছে ওটি ১৮৪৪ সালে এঁকেছিলেন মিঃ হেনরি ইনম্যান। তখন ফটোগ্রাফির জন্ম হয়নি। শিল্পী মিঃ ইনম্যান এসেছিলেন আমেরিকা থেকে। এই বাড়িতে দুমাস থেকে উইলিয়ামের পোর্ট্রেটটি তিনি আঁকেন। ছবিটি এমন নিভুর্ল, অবিকল এবং মনোজ্ঞ হয় যে, কবির স্ত্রী মেরি এটি দেখে মুগ্ধ হন এবং শিল্পীকে অনুরোধ জানান, তাঁর নিজেরও একটি ছবি এঁকে দিতে। মূল দুটি ছবি আমি পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিমধ্যেই দেখেছি। এখানকার ড্রইংরুমে তাদেরই দুটি কপি রয়েছে।

এই প্রশস্ত কক্ষেই ১৮৪০ সালে চতুর্থ উইলিয়মের বিধবা পত্নী রানী এডিলেড তাঁর ভগ্নীকে নিয়ে কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থের সঙ্গে একদিন জুলাই মাসের কিরণদীপ্ত দিনে দেখা করতে এসেছিলেন। রানীকে সঙ্গে নিয়ে কবি এই রাইডালের একটি ঝর্ণার ধারে গিয়ে বিশ্রম্ভালাপ করেন। এই সম্বন্ধে কবি নিজেই তাঁর ডায়েরী লিখেছেন, "I walked by the Queen's side up to the higher waterfall, and

she seemed to be struck much with the beauty of the scenary—"
আবার এক স্থলে লিখেছেন, "...The Queen, who having sat some little time in the house took her leave, cordially shaking Mrs. Wordsworth by hand, as a friend of her own rank might have done...."

১৮৪৩ সালে তৎকালীন মহারানী ভিকটোরিয়ার কাছ থেকে ওয়ার্ডসওয়ার্থ একখানি চিঠি পান। তাতে লর্ড চেম্বারলেন তাঁকে জানান, মহারানী তাঁকে 'রাজ-কবি' (Poet Laureate) নিযুক্ত করেছেন! এই পত্রের উত্তরে ওয়ার্ডসওয়ার্থ জানান, তাঁর বয়স এখন ৭৪, সুতরাং তিনি গৌরববোধ করলেও তাঁর এই বার্ধক্যে এই গৌরব তিনি প্রত্যাখ্যান করতে বাধ্য হচ্ছেন। তাঁর এই প্রত্যাখ্যানপত্র পেয়েই লর্ড পীল তাঁকে লেখেন, আপনি আরেকবার এটি পুনর্বিবেচনা করুন। এতে আপনার উপর কোনও দায়িত্ব বা বাধ্যবাধকতা চাপানো হচ্ছে এমন ভয় পেয়ে সরে দাঁড়াবেন না। আপনাকে আমি কথা দিচ্ছি, "that you shall have nothing required of you."

কবি তখন মহারানীর দেওয়া "রাজকবির" সম্মান গ্রহণ করেন। বোধ হয় সাহিত্যের ইতিহাসে এই পত্র বিনিময়ের দ্বিতীয় উদাহরণ কোথাও নেই। রবীন্দ্র-নাথের মৃত্যুর ঠিক এক বছর আগে (অগাস্ট ৭, ১৯৪০) ভারতের তদানীন্তন প্রধান বিচারপতি স্যার মরিস গয়ার (Gawyer) সমগ্র ব্রিটিশ জাতির পক্ষ থেকে শান্তি-নিকেতনে গিয়ে মহাকবিকে ডক্টরেট উপাধিতে ভূষিত করে আসেন। বলা বাহুল্য, ১৯১৯ সালে জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকান্ডের পরে মহাকবি তাঁর নাইটহুড খেতাব পরিত্যাগ করেন।

ওয়ার্ডসওয়ার্থের জীবন গ্রাসমেয়ার গ্রামের মধ্যেই অতিবাহিত হয়। গ্রামীণ সভ্যতা ও পরিবেশকে তিনি সুন্দর ও মনোরম করতে যত্নবান হয়েছিলেন, এবং তৎ-কালে উইনডারমেয়ার বা 'লেক ডিস্ট্রিক্ট' সকল প্রকারেই স্বয়ম্ভর ছিল। কবির পারি-বারিক জীবনে যাঁদের প্রভাব সর্বাপেক্ষা বেশি কাজ করেছিল তাঁদের মধ্যে তাঁর সহো-দরা ডরোথি, কন্যা ডোরা, স্ত্রী মেরি এবং অন্য দু-একজন। তাঁর শেষ জীবনে এক প্রতিভাময়ী নারী তাঁর সান্নিধ্যে এসেছিলেন। এঁর নাম ছিল ইসাবেলা কেনউইক। কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ এই আদর্শবাদিনী, ভক্তিমতী ও কাব্যপ্রেমিকা মেয়েটির জন্য রাইডাল মাউন্টের ঢালু অবতরণ প্রান্তের ক্ষুদ্র সমতলটিতে একটি ঘর বেঁধে দিয়ে-ছিলেন। ইসাবেলা কবির পরিবারের মধ্যে খুবই ঘনিষ্ঠ হন।

তাঁর ডাইনিংরুমে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ছবির মধ্যে দেখতে পাচ্ছি স্যার জর্জ বিউমণ্টের মতো ইংল্যান্ডের সুপ্রসিদ্ধ শিল্পানুরাগীর ছবি। তিনি ওয়ার্ডস-ওয়ার্থের জন্য নিজের হাতে নিকটবর্তী জলাশয়ভূমির একখানি ল্যান্ড-স্কেপ এঁকে দিয়েছিলেন। কবির কন্যা শ্রীমতী ডোরার অংকনশিল্পে খ্যাতি ছিল। তিনিও পিতার জন্য একাধিক চিত্রাঙ্কন করেছিলেন। ঘরের মধ্যে আরেক স্থলে রয়েছে কবির সহোদর খৃস্টফার ওয়ার্ডসওয়ার্থের তৈলচিত্র। তিনি ছিলেন ক্যামব্রিজের মাস্টার অফ ট্রিনিটি কলেজ। খৃস্টফারের পাশেই রয়েছে তাঁর পুত্র চার্লস-এর ছবি। খৃস্টফার এবং উইলিয়ম—দুই সহোদরের মধ্যে প্রথম জীবনে তেমন সৌহার্দ্য না থাকলেও পরবর্তীকালে খৃস্টফার কবির একখানি বইতে পেনসিল দিয়ে লিখেছিলেন, "...শব্দচয়ন ও প্রকাশভঙ্গী, তাঁর কাব্য প্রকৃতির মাধুর্য, ভাবের সততা, বৈচিত্র্য, শুচিতা, দার্শনিকতা, সুনীতি, ধর্মবোধ,—সব মিলিয়ে তিনি আমাদের দেশের

সকল লেখককে কি ছাড়িয়ে যাননি?”

তৎকালে খৃস্টফারের সমতুল্য পণ্ডিত ছিল কমই। অধ্যাত্ম এবং ইতিহাস বিষয়ে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। খৃস্টফারের তিন পুত্র ছিল, তিনটিই ছিল রত্ন সমান। প্রথম পুত্র জন অকালে মারা যায়। উচ্চশিক্ষিত আর দুটি ছেলে চার্লস ও খৃস্টফার (জুনিয়র)—এঁরা দু'জন পরবর্তীকালে সেণ্ট এনড্রুজ ও লিংকন গির্জার ধর্মযাজক হন। কবির ভ্রাতুষ্পুত্র খৃস্টফার সর্বপ্রথম উইলিয়ম ওয়ার্ডসওয়ার্থের প্রামাণ্য জীবনী রচনা করেন।

তবু কবির স্ত্রী মেরির কথা ভুলতে পারা যায় না। তিনি সুযোগ্যা গৃহিণী ছিলেন। আপদে ও সম্পদে তিনি কবি সহোদরা ডরোথির মতোই প্রকৃত কবি-বন্ধু ছিলেন। ওয়ার্ডসওয়ার্থের প্রসিদ্ধ কবিতা, “I wondered lonely as a cloud”-এর মধ্যে স্বয়ং মেরি দুটি অপূর্ব ছত্র সংযোজনা করে স্বামীর কাছ থেকে শ্রেষ্ঠ সার্টিফিকেট পেয়েছিলেন। সে দুটি এই, “They flash upon that inward eye which is the bliss of solitude.” ওয়ার্ডসওয়ার্থের মৃত্যুর ৯ বছর পরে মেরির মৃত্যু ঘটে। তাঁর বয়স তখন হয়েছিল ৯০।

গ্রাসমেয়ারের চার্চের বাগানে মহাকবির মৃতদেহ সমাধিস্থ করা রয়েছে। পাশে তাঁর স্ত্রীরও সমাধি।

কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থের খাটখানাতে শুয়ে রাত্রে আমার ভালো ঘুম হয়নি। এর কারণ ছিল দুটি। বোধ হয় সমস্ত বাড়িখানায় আমি ছিলুম একা, কারণ কমাণ্ডার ও তাঁর পত্নী অদৃশ্যলোকে ছিলেন, এবং এই খাটখানি একদা কবির ‘মৃত্যুশয্যা’ ছিল। দ্বিতীয় কারণ, কবি বোধ হয় ঈষৎ খর্বকায় ছিলেন কেননা, আমার পা দুখানা খাটের বাইরে মাঝে মাঝে বেরিয়ে পড়ছিল। আমার তন্দ্রাচ্ছন্ন নিদ্রার কালে যেন কবির প্রেতস্বর শুনতে পাচ্ছিলুম :

“She gave me eyes, she gave me ears,
And humble cares, and delicate fears,
A heart, the fountain of sweet tears,
And love and thought and joy!”

....“Oft I had heard of Lucy Gray
And when I crossed the wild,
I chanced to see at break of day
The solitary child....”

ভোর বেলায় চায়ের ট্রে হাতে নিয়ে কমাণ্ডার ডেন আমাকে ঘরে না পেয়ে ফিরে গেছেন। আমি অতি প্রত্যুষে কবি উইলিয়মের বাগানে প্রভাতী পাখির কাকলী শোনার জন্য ঘন ওক'বৃক্ষ-জটলার মধ্যে ঘোরাফেরা করছিলুম। পরে ডেন-দম্পতির কাছে ক্ষমা চেয়েছিলুম।

প্রাতরাশের পরে এলেন ক্রেসওয়েল দম্পতি। আমি ডেন-দম্পতির কাছে বিদায় নিয়ে মিসেস ক্রেসওয়েলের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লুম। এবার উইনডারমেয়ার বা লেক ডিস্ট্রিক্ট ভ্রমণ করব।

ইংল্যাণ্ডের প্রায় সর্বত্রই পাহাড়ী এলাকা দেখা যায়। কোথাও কম, কোথাও বেশী। কিন্তু এ দেশ উপত্যকাবহুল। এর এ-পাশে ও-পাশে সমুদ্র, কিন্তু এ যেন চারিদিকেই পাহাড়ের ফ্রেমে আঁটা। ভূতত্ত্ববিদরা বলতে পারতেন, এই ফ্রেম না থাকলে ইংল্যাণ্ড চলে যেতে পারত সমুদ্রগর্ভে—যেমন দক্ষিণ-পশ্চিমের কর্নওয়াল প্রদেশের মাটি আটলাণ্টিক মহাসাগর একটু একটু করে চাটতে বসেছে! কিন্তু এই প্রথম উইনডারমেয়ারে এসে দেখছি এখানকার সুউচ্চ পর্বতশ্রেণী চারিদিকে এই প্রদেশটিকে বাইরের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। এর বড় বড় জলাশয়গুলি একদিকে যেমন চিরকাল ধরে শোভামণ্ডিত হয়ে রয়েছে, তেমনি এর জনবিরলতা এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য একে দিয়ে রেখেছে একটি কাব্যরূপ। উইলিয়ম ওয়ার্ডস-ওয়ার্থকে এরাই যেন কবি বানিয়ে তুলেছিল! সুতরাং 'রাইডাল মাউণ্ট' হয়ে উঠেছে উইনডারমেয়ারের সর্বশ্রেষ্ঠ আকর্ষণ। আমরা একটির পর একটি জলাশয়ের ধার দিয়ে বনবাগান পেরিয়ে গ্রাসমেয়ার ছাড়িয়ে দূরদূরান্তর অতিক্রম করছিলুম। দেখতে পাচ্ছিলুম গ্রাসমেয়ারের আরণ্যক অংশ অপেক্ষা অ্যামবালসাইড ও কার্মাব্রিয়া অংশে মানুষের চলাফেরা, হাটবাজার ও দোকানপাট কিছু বেশী। ঘণ্টা তিনেক ধরে শ্রীমতী ক্রেসওয়েল আমাকে নানা জায়গা দেখিয়ে ঘোরাচ্ছিলেন এবং অবশেষে লাঞ্চের জন্য একটি রেস্তরাঁয় এসে গাড়ি থামালেন।

লাঞ্চের পর এবার আমি বিদায় নেবো। ক্রেসওয়েল দম্পতি আমার কাছে প্রতিশ্রুতি নিলেন, আমি যেন দেশে গিয়ে তাঁদের না ভুলি এবং পেঁছিনো সংবাদ দিই। আহারাদির পর তাঁরা আমাকে ট্রেনে তুলে দিয়ে এলেন।

॥ ১৭ ॥

প্রিয়বরেষু,

অক্টোবরের চতুর্থ সপ্তাহ চলছিল। আমি যাচ্ছিলুম উত্তরপথে ঠাণ্ডার দেশে। উইনডারমেয়ার ছেড়ে এসেছি দুপুরবেলায়। আমার গাড়ি ছুটছিল ওয়েস্টমরল্যাণ্ডের ভিতর দিয়ে। উত্তর ইংল্যাণ্ডে এখন শীত পড়েছে এবং এরই মধ্যে মাঝে মাঝে বরফানি বাতাস এক একবার ঝিলিক দিয়ে কাঁপন ধরিয়ে দিচ্ছিল। দুই ধারে দূরে দূরে দেখছিলুম পাহাড়শ্রেণী—মাঝে মাঝে তার নীলাভ উপত্যকা আর অধিত্যকা। গ্রামের সংখ্যা যেন একটু করে কমে আসছে। বনভূমি দেখছি এখানে ওখানে, কোথাও কোথাও জলাশয়। ক্বচিৎ কোথাও একটি দলছাড়া ছোট শিল্পসংস্থা আপন মনে দাঁড়িয়ে। মেঘলা দিনে বাইরে মানুষ দেখা যাচ্ছে না। উত্তর মেরুর বাতাস নামতে বিলম্ব নেই। আমার পথের পূর্বদিকে পড়ছে ইয়র্ক-শায়ারের বিস্তৃত জেলা,—যার মধ্যে রয়েছে বড় বড় শিল্পনগরী, যেমন শেফিল্ড, হাল ব্রাডফোর্ড, লীডস প্রভৃতি। এরা স্ব স্ব প্রধান। এদের উৎপাদনশক্তি প্রচুর। এখানকার বহুস্থলের ইস্পাতশিল্প পৃথিবীর সর্বত্র সমাদৃত। ইংরেজ যে সমস্ত তৈরি মাল রপ্তানি করে তার তুলনায় আমেরিকা এখনও সাবালক হয়নি। ব্রিটিশ টেক্সটাইল, ব্রিটিশ স্টীল, ব্রিটিশ উল, ব্রিটিশ কনস্ট্রাকশন,—এদের প্রতিদ্বন্দ্বী আজও কম। একখানা রোলস রইস গাড়ি কেনার জন্য আমেরিকান ধনপতিরা আজও অগ্রিম ডলার জমা দিয়ে রাখে।

ওয়েস্টমরল্যাণ্ডের ভিতর দিয়ে উত্তরে কাম্‌বারল্যাণ্ডে এসে গাড়ি ঢুকল। পাহাড়ের পর পাহাড়। কিন্তু আমি হিমালয়ের দেশের লোক। সেদিকে আবার আমি একটু আত্মাভিমানী। 'স্কিডাড' পাহাড় শ্রেণী হয়ত বা ১০ হাজার ফুট উঁচু হবে। কিন্তু হিমালয়ের তুলনায় কতটুকু? সেজন্য বিদেশী পাহাড় দেখলেই মনে আসে একটু অনুকম্পা। এক সময় আমাদের গাড়ি এসে দাঁড়াল 'কারলাইল' শহরের স্টেশনে। উত্তর ইংল্যাণ্ডের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ শিল্পনগরী হল কারলাইল। এই নগর ছেড়ে একসময় লংটাউন নামক শহর পেরিয়ে যখন স্কটল্যাণ্ডে প্রবেশ করলুম তখন সন্ধ্যার প্রাক্কাল। এদিকে অসংখ্য নদী-নালা। এদের স্রোত নেমে আসছে উত্তর থেকে দক্ষিণে। সমগ্র স্কটল্যাণ্ড এক সুবৃহৎ পার্বত্য উপত্যকা এবং যতদূর দেখতে পাচ্ছি পাহাড়ের পর পাহাড় দক্ষিণ স্কটল্যাণ্ডকে যেন বেষ্টন করে রয়েছে।

'ডামফ্রাইজে'র ভিতর দিয়ে যাচ্ছিলুম বীটক জনপদ পেরিয়ে ক্লাইড নদীর ধার দিয়ে। এখান থেকে একটি পথ গেল গ্লাসগোর দিকে, অন্যটি উত্তরপূর্ব পথে এডিনবরা অভিমুখে। আমার গন্তব্যস্থল স্কটল্যাণ্ডের রাজধানী এডিনবরা। প্রখর জাতীয়তাবাদী এবং স্বাধীনচিত্ত স্কটল্যাণ্ডের সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি এডিনবরাতেই পাওয়া যায়। ব্রিটিশ সেনাদলের একটা বড় অংশ, যাদের নাম 'হাইল্যাণ্ডার্স' তাদের জন্ম এই স্কটল্যাণ্ডে। এদের স্বাস্থ্য ও শক্তি বজ্রের সমতুল্য। এরা অতি সুন্দর পোশাক পরে, এবং এরা পার্বত্যলোকে যুদ্ধ করতে সর্বদা প্রস্তুত থাকে বলেই এরা ডোরাকাটা এবং কুঁচিদেওয়া কম্বলের মিনিস্কার্ট পরে। এদের ব্যাণ্ড বাদ্য শরীরের রক্তকে গরম করে তোলে। ব্রিটিশ আমলে কলকাতায় মাঝে মাঝে এদেরকে দেখা যেতো। এদের স্বাদেশিক চেতনা প্রবল বলেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এদেরকে অনেকটা এড়িয়ে চলত এবং অনেক ক্ষেত্রে এদের বদলে গোর্খা সৈন্যকে মোতায়েন করা হত। ইংরেজদের সঙ্গে স্কচদের রাজনীতিক বিতর্ক বহু শত বছরের।

এডিনবরার ওয়েভারলি স্টেশনে যখন নামলুম তখন সেখানে দাঁড়িয়েছিলেন মিসেস জীন উডিউইস নাম্নী এক বয়স্কা মহিলা। হাসিমুখে শুভ সন্ধ্যা জানিয়ে তিনি হ্যাণ্ডশেক করলেন এবং রীতি অনুযায়ী প্রশ্ন করলেন, কোনও অসুবিধা হয়নি ত?—আমাকে রীতি অনুযায়ী বলতে হল, আজ্ঞে না, চমৎকারভাবে আপনাদের দেশ দেখতে দেখতে এসেছি।

মহিলা গাড়ি এনেছেন। নিজেই তিনি চালাবেন। স্টেশন থেকে বেরিয়ে এসে তাঁর গাড়িতে উঠলুম। সামনে আমার একটা শীতার্ত, অপরিচিত ও বিরাট শহর। কিন্তু মিনিট পাঁচেকের মধ্যে আমাকে তিনি নিয়ে এলেন জর্জ স্ট্রীটের এক প্রাসাদোপম হোটেলে, এবং এটির নামও জর্জ হোটেল। ওখানকার 'রিসেপসনে' আমাকে পৌঁছিয়ে দিয়ে তিনি হাসিমুখে বিদায় নিলেন এবং কথা রইল আগামীকাল সকাল সাড়ে দশটায় আমার কাছে অন্য একজন আসবেন।

এই হোটেলের সাত তলার উপরে একটি ঘরে আমাকে তুলে দিয়ে এল এক স্কচ যুবক। আমার একটু শীত ধরেছিল, সেজন্য ওই ছোকরা ঘরের বড় জানালাটার ঠিক নীচে 'হীটিংটা' খুলে দিয়ে গেল। একটু পরেই একটি ফুটফুটে মেয়ে কফির ট্রে নিয়ে ঢুকে শুভ সন্ধ্যা জানিয়ে টিপাইয়ের উপর ট্রে রেখে যখন বিদায় নিচ্ছিল তখন আমি প্রশ্ন করলুম, খাবার জায়গাটা কোথায়?

মেয়েটি জবাব দিল, নীচে।

আমি আর নীচে যাব না। ফোনে বলব, ঘরেই ডিনার দিয়ো।—মেয়েটি হাসি-মুখে চলে গেল। পথে আসতে আসতে মিসেস উডিউইস বলেছিলেন, আপনি লেখক মানুষ বলেই আপনাকে একটি নিরিবিলি ঘর দেওয়া হয়েছে। ওখান থেকে আপনি সমস্ত এডিনবরাটা দেখতে পাবেন।

প্রশ্ন করেছিলুম, এডিনবরার বানানের সঙ্গে উচ্চারণটা মেলে না কেন?

উনি জবাব দিয়েছিলেন, ওটা স্কচ উচ্চারণ, ওটাই বরাবর চলে এসেছে।

জানলার কাঁচের ভিতর দিয়ে আমি এই বিরাট নগরীর বিস্তার দেখছিলুম। নগরের সর্বত্র আলো জ্বলেছে এবং মেঘলার ফাঁকে ফাঁকে চাঁদের আলো দেখা যাচ্ছিল। কোজাগরী পূর্ণিমা চলে গেছে, এটি এখন কৃষ্ণপক্ষের ম্লান জ্যোৎস্না। অতঃপর আমি গুছিয়ে বসলুম।

যুক্তরাজ্যে ভ্রমণকালে অনেক স্থলে লক্ষ্য করছিলুম, জাতীয়তাবাদী স্কটল্যাণ্ড কিছু পরিমাণ আত্মাভিমানী। তার ধারণা, পর পর দুই বিশ্বযুদ্ধে ইংরেজ তার কাছ থেকে প্রাপ্যের অতিরিক্ত আদায় করে নিয়েছে। যেমন ধরো, ইংল্যান্ডের বর্তমান জনসংখ্যা হল ৫ কোটি, সেখানে স্কটল্যান্ডের জনসংখ্যা মাত্র ৬০ লক্ষ। কিন্তু এই স্বল্পসংখ্যার ভিতর থেকে গত বিশ্বযুদ্ধে যে বিপুল সংখ্যক স্কটিশ যুবাকে আত্মদান করতে হয়েছিল, ইংল্যান্ডের তুলনায় সেটি অনেক বেশি। (History ot Scotaland by J D Mackie).

পরদিন সকালে এক প্রবীণ স্কট ভদ্রলোক মিঃ ইভানস যথাসময়ে এসে আমাকে তাঁর গাড়িতে তুলে নিয়ে নগর পরিভ্রমণে চললেন। দেখতে পাচ্ছিলুম নতুন এবং পুরনো এডিনবরার সুস্পষ্ট পার্থক্য। বহু শতাব্দী আগে পুরনো এডিনবরা যেমন-তেমনভাবে গড়ে উঠেছিল—যার কোনও নক্শা ছিল না। মিঃ ইভানস আমাকে নিয়ে চললেন সেই সব ঠাণ্ডা, অন্ধকার এবং পাথুরে গলির ভিতর দিয়ে। এসব অঞ্চলে এখন অনেক ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের দপ্তর বসে গেছে। প্রাচীন ইতিহাস এই সব অঞ্চলেই যেন বন্দী হয়ে রয়েছে। হাজার হাজার বছর আগে যে উপজাতিরা উত্তর স্কটল্যাণ্ডে এসে বাসা বেঁধেছিল, তাদের প্রথম দলটার নাম ছিল পিকটস'। তারপর আসে ব্রুইটনিরা, যারা পরবর্তীকালে হয়ে ওঠে 'প্রিটানি' ওরফে ব্রিটন। পিকটস-এর পর আয়ার্ল্যান্ডের দিক থেকে আরেক উপজাতি এসে পৌঁছয় তাদের নাম স্কট। স্কটের পর ব্রিটন এবং শেষ পর্যায়ে আসে 'অ্যাংলেস'। এই করতে করতেই কমবেশি দু' হাজার বছর পেরিয়ে গেছে। সপ্তম শতাব্দীতে নর্থাম্বিয়ার নরপতি রাজা এডুইনের নাম থেকে রাজধানী এডিনবরার নামকরণ ঘটে। প্রাচীন এবং আধুনিক এডিনবরা একটি উঁচু সাঁকোর দ্বারা সংযুক্ত। আমরা তার তলাকার প্রশস্ত রাজপথ দিয়ে আনাগোনা করছিলুম। সকাল থেকে আবার মেঘলা করেছে, এখন বৃষ্টি হচ্ছে। ঠাণ্ডা দেশের বৃষ্টি একটু গায়ে লাগে বই কি। যাই হোক, এই নগর প্রাচীন বলেই নিন্দনীয় নয়। সেই কোন্ যুগে নর্মানদের রাজত্বকাল থেকে বিগত শতাব্দীর ভিকটোরীয় যুগ পর্যন্ত স্তরে স্তরে একটির পর একটি চিত্তাকর্ষক ভাস্কর্য ও স্থাপত্যকলা দেখতে দেখতে যাচ্ছিলুম। ইতিহাস প্রসিদ্ধ রমণী মেরি কুইন অফ স্কটস, তারপর জন নক্স, ষষ্ঠ জেমস, বনি প্রিন্স চার্লি প্রভৃতির স্মৃতি-চিহ্ন ও মূর্তি রয়েছে নগরের নানা স্থলে। পথে পথে প্রস্তরময় অলঙ্করণ ও

বিভিন্ন অট্টালিকার উপরে খোদিত মূর্তিগুলি আমাকে কথায় কথায় পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ নগরী লেনিনগ্রাডের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছিল। আমি এক পথ থেকে অন্য পথের দিকে চলে যাচ্ছিলুম।

অতঃপর প্রিন্সেস স্ট্রীটের বাগানের দিকে অগ্রসর হলুম। এটি এডিনবরার হৃৎকেন্দ্র। স্কটল্যাণ্ডের পরম বরেণ্য সাহিত্যগুরু স্যার ওয়ালটার স্কটের নামাঙ্কিত এক বিশাল স্মৃতিস্তম্ভ এখানে অপরূপ কারুকার্যসহ দণ্ডায়মান—যার উচ্চতা ২০০ ফুট। ১৮৪৪ সালে এটি নির্মিত হয়। সামনে ক্যানোপির নীচে স্যার ওয়ালটারের মর্মরমূর্তি। একদা স্যার ওয়ালটার স্কট আমাদের বাঙলায়ও ছিলেন বিশেষ প্রসিদ্ধ ও জনপ্রিয়। বহু সমালোচক একদা মনে করতেন, স্যার ওয়ালটার স্কটের 'আইভানহো' উপন্যাসটির সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনীর মিল আছে অনেক। বাঙলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস দুর্গেশনন্দিনী প্রকাশিত হয় ১৮৬৫ সালে। সমালোচকরা দুর্গেশনন্দিনীর আয়েষার সঙ্গে আইভানহোর 'রেবেকার' চরিত্রসঙ্গতি খুঁজে পেয়েছিলেন। এডিনবরার সীমান্ত অঞ্চলে যেখানে স্যার ওয়ালটার বাস করতেন খুবই অভাব-অনটনের মধ্যে—সেই জনপদটির নাম এবটসফোর্ড। মিঃ ইভানস সেখান থেকে আমাকে ঘুরিয়ে আনলেন। সে অনেক দূর পথ।

পার্বত্য উপত্যকা পথে উত্তর সমুদ্রের তীর ধরে চলে যাচ্ছিলুম। উত্তর সমুদ্রে দূর থেকে কয়েকখানি জাহাজকে দেখছিলুম। সম্প্রতি এই সাগরের তীরে ভূগর্ভে অপরিস্রুত বিরাট এক তৈলখনি আবিষ্কৃত হয়েছে এবং সেখানে দিবারাত্র কাজ চলছে। ঠিক এইটি দেখে এসেছি আলাস্কার উত্তরে উত্তরমেরু সাগরের প্রান্তে পয়েন্ট ব্যারো নামক ক্ষুদ্র এস্কিমো জনপদে। উত্তর সাগরের তেল উঠতে আর বছর দুই বাকি। এই তেল সমগ্র ব্রিটিশ জাতিকে তাদের প্রবল অর্থনীতিক সংকট থেকে সম্পূর্ণ উদ্ধার করবে—এটি যুক্তরাজ্যের সর্বত্রই শোনা যাচ্ছে।

উত্তর সমুদ্রের পূর্বদিকে ডেনমার্ক ও স্ক্যানডিনেভিয়া, পশ্চিমে যুক্তরাজ্য, দক্ষিণে জার্মানি. হল্যাণ্ড, বেলজিয়ম ও ফ্রান্সের অংশ—সুতরাং উত্তর সমুদ্র অল্প পরিসরের মধ্যেই আন্তর্জাতিক গতিবিধির একটা বড় রকমের ঘাঁটিতে পরিণত রয়েছে। ইউরোপে আন্তর্জাতিক সংঘর্ষ ঘটলে উত্তর সমুদ্রে টান পড়ে বেশি। প্রথম মহাযুদ্ধের কালে এই উত্তর সমুদ্রেই ব্রিটিশ নৌ-সেনাপতি এডমিরাল লর্ড কিচেনার জার্মানির সাব মেরিনের আঘাতে জাহাজডুবি হয়েছিলেন। ব্রিটেনের ভাগ্য বিচিত্র। সে সব যুদ্ধেই জয়ী হয়, এবং জয়ের সঙ্গে সর্বস্বান্তও হয়! আমরা 'লীথ' অঞ্চলে 'ফার্থ অফ ফোর্থ' উপসাগরের ধারে ধারে বিচরণ করছিলুম। পরিণত বয়স্ক স্বভাবশান্ত মিঃ ইভানস তাঁর পারিবারিক গল্প বলে যাচ্ছিলেন। তাঁর বড় ছেলেটি কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, ছোটটি ডাক্তারি পড়ছে এখানকারই বিশ্ববিদ্যালয়ে। তিনি শীঘ্রই বড় ছেলের বিবাহ দেবেন, পাত্রীটিকে সে নিজেই পছন্দ করেছে। মেয়েটি রূপে-গুণে চমৎকার।

আপনারা কি সপরিবারে একত্রেই থাকেন?

হ্যাঁ, কেন থাকব না? —ইভানস বললেন, মস্ত বাড়ি আমাদের, অনেকগুলো ঘর। ঈশ্বরের ইচ্ছেয় আমাদের অভাব অভিযোগ কম। এ ত ইংল্যাণ্ড নয় যে, নিত্য হাহাকার। ওদের মতো ইঁদুরের গর্তে আমরা থাকিনে! আমরা ছড়িয়ে থাকি। আমাদের দেশ ৩০ হাজার বর্গ মাইল পরিমাণ, আর সেই অনুপাতে অঢেল জায়গা

আমাদের।

আমরা একে একে নানা দৃশ্য দেখে বেড়াচ্ছিলুম। সেন্ট মেরি ও সেন্ট গাইলস ক্যাথিড্রাল, হোলিরুড প্রাসাদ, ন্যাশন্যাল গ্যালারি, লেডি স্টেয়ার্স হাউস—যেটি ১৬২২ সালে নির্মিত হয়েছিল এবং যার সংগ্রহশালায় অদ্যাবধি স্কটিশ সাহিত্যের তিনজন সুমহান সাহিত্যকর্মীর পাণ্ডুলিপি ও অন্যান্য স্মৃতিচিহ্ন সুরক্ষিত রয়েছে। তাঁরা হলেন স্যার ওয়ালটার স্কট (১৭৭১-১৮৩২), কবি রবার্ট বার্নস (১৭৫৯-১৭৯৬) এবং রবার্ট লুইস স্টিভেনসন। কবি বার্নস-এর "কটার্স স্যাটারডে নাইট" অদ্যাবধি জনপ্রিয়। স্টিভেনসনের 'ওয়োকিং টুয়ার' বা 'অ্যান এপলজি ফর আইডলার' কে না জানে। রাজপথের ধারে স্টিভেনসনের বড় বাড়িটির সামনে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়েছিলুম। অতঃপর মেলভিল ড্রাইভ, কুইন স্ট্রীট, ওয়াটারলু প্লেস, রিজেন্ট রোড, গ্রাসমার্কেট, মেডোব্যাঙ্ক, স্পোর্টস সেন্টার, সপ্তম শতাব্দীর রাজ্য এডুইনের পার্বত্য প্রাসাদ, আর্ট সেন্টার, ন্যাশন্যাল লাইব্রেরি এবং শেষ পর্যন্ত চিড়িয়াখানা! আমি আসছি হিংস্র জানোয়ারের দেশ থেকে সুতরাং চিড়িয়াখানা খুঁটিয়ে দেখার দরকার নেই। তবে একটি 'চিড়িয়া' খুবই চিত্তাকর্ষক। সেটি বর্ণবাহার পেঙ্গুইন পাখি। এই রঙিন পাখি কেবল দেখা যায় দক্ষিণ মেরুলোকে। আমেরিকার ফ্লোরিডায় যে পেঙ্গুইন দেখে এলুম, তাদের রং বিবর্ণ ও কালচে। এদের বহুবর্ণ অতি সুদৃশ্য।

ইংলেস দেখতে পাচ্ছিলেন আমি ক্লান্তি হচ্ছি। কিন্তু আমার প্রয়োজন ছিল ফরাসী দূতাবাসে। সেখানে কাজ সেরে আমি ফিরে গেলুম জর্জ হোটেলে। এখানকার নীচের তলায় বিশ্রম্ভালাপ ও বিলাস ব্যবস্থার যে বিচিত্র শোভাসম্ভার, সেটি চট করে অন্যত্র দেখা যায় না।

সেদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টাফ ক্লাবে যাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎকার ছিল, তিনি সাহিত্য বিভাগের অধিনায়ক ডক্টর আয়ান ক্যাম্পবেল। তিনি নব্য বয়স্ক অধ্যাপক এবং তিনি লেখক ও সাহিত্যকর্মী। আমার সঙ্গে তিনি গল্প করতে বসলেন একটি হলে। জানলা দিয়ে আসছিল অবেলার হালকা রোদ। এক কেটলি কফি আর বিস্কুট এনে রেখে গেল একটি তরুণ বয়স্ক ক্যানটিনের লোক। বলা বাহুল্য, ভারত ও স্কটল্যাণ্ডের সাহিত্য নিয়ে আলোচনা উঠল এবং এই হাসিখুশী ও অতিথিবৎসল অধ্যাপক বার্নস-এর কবিতার আলোচনায় মেতে উঠলেন। আমিও কম যাইনে। আমার হাতে ছিল রংয়ের গোলাম, একেবারে বাল্মীকি, বেদব্যাস, কালিদাস থেকে রবীন্দ্রনাথ। উনি আবৃত্তি করলেন বার্নস, আমি ধরে নিলুম রবি ঠাকুর। বার্নস-এর বই কি স্কটের উপন্যাস বছরে দশ লক্ষ টাকায় দেশবাসী কেনে? আপনার দেশের কোনও কবি কি তিন হাজার শ্রেষ্ঠ গান লিখেছেন যা লোকের মুখে মুখে ঘোরে? জানেন, রবীন্দ্রনাথের একটি গান কোনও সুকণ্ঠী ভাল করে গাইতে পারলে তার বিয়ের পাত্র জুটে যায়?

আমাদের এই ধরনের সাহিত্য আলোচনা অবশেষে হাস্যে ও কৌতুকে মুখর হয়ে উঠল এবং ডঃ ক্যাম্পবেল শেষ পর্যন্ত স্থির করলেন, কাব্যসাহিত্য, ললিতকলা ও জনসংস্কৃতির দেশ পশ্চিম বাংলায় যেমন করেই হোক, একদিন তিনি যাবেন। অবশেষে যা হয়, রাজনীতি নিয়ে কথা উঠল। উনি বললেন, স্কটল্যাণ্ড উগ্র জাতীয়তাবাদী, তার রাজনীতি চিরকাল জটিল। ইংরেজ চায় আমাদের গ্রাস করতে। আমরা তা হতে দেবো না। আমরা সমানে সমানে বন্ধুত্ব চাই। আমাদের ভাষা এক

সংস্কৃতি ও সভ্যতা এক নয়। ওরা আমাদের গিলতে চেয়েছিল, কিন্তু আমরা প্রায় একশ বছর ধরে স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছি। ১২৮৬ থেকে ১৩৭১ পর্যন্ত। রবার্ট ব্রুসের গল্প কি আপনারা পড়েননি? অবশেষে দুই দেশ এক হল। কিন্তু পৃথক আমাদের অস্তিত্ব। ভাষা এক, কিন্তু উচ্চারণ ও নামের সংজ্ঞা আলাদা। আপনি কি এর মধ্যে শোনেননি যে, ১৯৭৬ থেকে আমাদের নিজস্ব পার্লামেণ্ট হচ্ছে?

মুখ তুলে তাকালুম। সে কি? দুই পার্লামেণ্ট? দুই রকম আইন পাস হলে দুই দেশের সংহতি বজায় থাকবে?

থাকবে!—ডঃ আয়ান হাসছিলেন। স্কটদের প্রতিনিধিত্ব থাকবে ওয়েস্টমিনস্টারে। কেউ বলছেন, দুই দেশ মিলে ফেডারেশন, কেউ বলছেন, দুই দেশের বিচ্ছেদ চাই। কিন্তু তবু থাকবে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। এখনও ব্রিটেনের রাজপরিবারের সঙ্গে আমাদের কুটুম্বিতা। বর্তমান রাণী এলিজাবেথের শাশুড়ী আমাদেরই মেয়ে। রাজ-পরিবারের বহু নরনারীর নাম স্কটিশ টাইটেলযুক্ত। কিন্তু তবু স্কটল্যাণ্ড স্বকীয়, স্বতন্ত্র, স্বাধীন। আমরা ইংল্যাণ্ডের রাজমুকুট মেনে নিয়েছি, কিন্তু আত্মনিয়ন্ত্রণের সর্বাঙ্গীণ অধিকার জলে ভাসিয়ে দিইনি। আমরা আগুন-খেকো ন্যাশন্যালিস্ট।

এবার দুজনে উঠলুম। এখান থেকে কাছেই ডেভিড হিউম টাওয়ার নামক এক অট্টালিকার একটি হলে আয়ান আমাকে নিয়ে চললেন। একটি বিশাল ভবনের দোতলায় উঠে আমরা পাশাপাশি সীটে বসলুম। ১৯৩৫ সালে কানাডার গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হয়েছিলেন স্কটল্যাণ্ডের রাজনীতিক নেতা জন বুকান। তিনি ছিলেন বড় একজন লেখক। এটি তাঁরই স্মৃতিসভা। কয়েকজন বিশিষ্ট বক্তার মধ্যে একজনের ভাষণে ডঃ আয়ানের বিশেষ গুণপণার উল্লেখ শুনলুম। আয়ানের প্রতিষ্ঠা এখানে প্রচুর।

ইভানস নীচে আমার জন্য গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন। আমি তাঁর সঙ্গে ফিরে এলুম হোটেলে। কিন্তু সে কেবল ঘণ্টাখানেকের জন্য। তারপরেই আবার এলেন ডঃ ক্যাম্পবেল। তিনি ট্যাক্সিযোগে আমাকে নিয়ে চললেন রাত্রির এডিনবরার চেহারা দেখাবার জন্য। পাশ্চাত্ত্য জগতের নৈশজীবন কিছু অন্য রকমের—দিবা-ভাগের কর্মব্যস্ততা ও চাঞ্চল্যের সঙ্গে যার কোনও যোগ নেই। তিনি অধ্যাপক, সামাজিক সম্মান তাঁর প্রচুর এবং আমি লেখক। কিন্তু অল্পকালের মধ্যে আমাদের সখ্যতা ও বন্ধুত্ব খুবই ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল।

আমার দরকার ছিল এঁদের সমাজের সামগ্রিক জীবনের ছবিটি দেখে যাবার। আমি নিজে একদা স্কটিশ চার্চ মিশনের ছাত্র ছিলুম। পাদ্রীসাহেব রেভারেণ্ড ব্রাউনের কোলে পিঠে চড়েছি। স্কচ ম্যাকলিন ছিলেন একদা আমাদের শিক্ষক। ডঃ আয়ান হলেন সেই স্কচ। তিনি নৈশভোজন উপলক্ষে আমাকে একটি স্বল্পালোকিত রেস্তরাঁয় নিয়ে গিয়ে তুললেন, যেটি ইতিহাসপ্রসিদ্ধ। বিগত তিনশ বছর ধরে যাঁরা এই হোটেলে এসেছেন, খেয়েছেন, রাজনীতি করেছেন এবং দেশের ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণের কাজে নেমেছেন—তাঁদের ছবি প্রতিটি দেওয়ালকে অলঙ্কৃত করে রেখেছে।

সেদিন মধ্যরাত্রির পর ক্যাম্পবেল আমাকে জর্জ হোটেলে পৌঁছিয়ে বিদায় নিয়ে-ছিলেন। আমি তাঁর কাছে নানা কারণে কৃতজ্ঞ রয়ে গেলুম।

দেখতে পাচ্ছিলুম কুয়াশাচ্ছন্ন এবং ঠাণ্ডা শূন্যালোকের নীচে উত্তর সমুদ্র ধূ ধূ করছে—যার উত্তরে কূলকিনারা পাওয়া যায় না। এ্যাবারডিন ছাড়িয়ে আর একটু উত্তরে শেটল্যাণ্ড দ্বীপপুঞ্জ। একটু দক্ষিণে অর্কনি। কিন্তু এই সমুদ্র অঞ্চলেই মিশেছে পশ্চিমের আটলাণ্টিক মহাসাগর এবং উত্তর মেরুসাগর। আরও উত্তরে যাও পাবে 'ফারো' দ্বীপ। এই দ্বীপ তিমি শিকারের একটি বড় ব্রিটিশ ঘাঁটি। ফারো থেকে পাঁচশ মাইল সমুদ্রপথে উত্তরে আইসল্যাণ্ড। এই তিমি শিকারকে উপলক্ষ করে সম্প্রতি আইসল্যাণ্ডের সঙ্গে ব্রিটেনের কিছু মন কষাকষি চলছে। শীতকালে যখন প্রাকৃতিক রহস্যনিয়মে দক্ষিণ আমেরিকার পথ ধরে উত্তপ্ত এবং ফুটন্ত জলরাশি (Gulf stream) দক্ষিণ মেরুর দিক থেকে আটলাণ্টিকের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়, তখন তিমি শিকারও যেমন সহজ হতে থাকে, তেমনি তুষারাচ্ছন্ন উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ড বা স্কটল্যাণ্ডের আবহাওয়া আর্দ্র এবং উষ্ণ হয়ে আসে। তখন এই শীতার্ত উত্তরলোকে মানুষের কষ্টের যেমন লাঘব হয়, তেমনি দেখা দেয় সবুজ তৃণরাশি। উত্তর স্কটল্যাণ্ডে তখন ফলন হয় প্রচুর এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি সক্রিয় হয়ে ওঠে।

এবার আমি দক্ষিণে নামবো। যেদিকে তাকাই সব যেন ক্রমশ ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। আর দেরি নেই, এবার তুষারবিন্দুপাত ঘটতে আরম্ভ করবে। সেদিনকার ঘন কুয়াশা আর মেঘমলিন সকালে আমি ব্রিটেনের সর্বাপেক্ষা দ্রুতগামী ট্রেনটি ধরলুম। এটি ঘণ্টায় প্রায় ৯০ মাইল বেগে ছুটবে। একটির পর একটি নদী পার হয়ে আমি চেভিয়েট পর্বতশ্রেণী অতিক্রম করে নর্দামবারল্যাণ্ডে প্রবেশ করব এবং উত্তর সমুদ্রের সীমানা ধরে নিউ কাসলে পৌঁছব।

নিউ কাসল বোধ করি ব্রিটেনের অন্যতম অতি বৃহৎ শিল্পনগরী। টাইন নদী এই নগরীকে দ্বিধা বিভক্ত করেছে। একদিকে নিউ কাসল অন্য দিকে ডারহাম জেলার গেটস্‌হেড নগরী। কিন্তু এপার-ওপার দুই মিলিয়ে একই শিল্প উৎপাদন কেন্দ্র। এ অঞ্চল কয়লার জন্য বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ। অন্য দিকে লোহা, সিমেন্ট, ফসফেট, চুনপাথর, তামাক, কয়লাজাত বিভিন্ন শিল্প প্রভৃতি বহু সহকারী প্রতিষ্ঠানও এখানে বর্তমান। টাইন নদীর দুই পারেই চিত্রবৎ এক একটি সর্বাধুনিক শহর গড়ে উঠেছে। যেমন, ওয়ালস্‌য়েণ্ড, সাউথশীলসে, সাণ্ডারল্যাণ্ড, যারো প্রভৃতি। বাঙলায় একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে, 'তেলা মাথায় তেল দেওয়া', খৃষ্টান স্কুলে সেটিকে অনুবাদ করে বলতে হত, 'to carry coal to New Castle' ভাবগত কিছু মিল থাকলেও অর্থগত মিল একেবারেই থাকত না।

শেফিল্ড আর নটিংহাম ছেড়ে যাচ্ছিলুম দক্ষিণ পথে। লিসেসটার থেকে রাগবি আর নর্দামটন। না, ক্যামব্রিজ নয়। কভেনট্রি থেকে সোজা বেডফোর্ড। এবার দেখা দিয়েছে রৌদ্র আর ফিকে নীল আকাশ। এবার সেণ্ট আলবান্স ছেড়ে সেই চিলটার্ন পাহাড়শ্রেণী। তারপরেই এসে ঢুকলুম মিডলসেক্সে। বেলা সওয়া তিনটে হয়ে গেছে। গাড়ি ধীরে ধীরে ঢুকছে গ্রেটার লণ্ডনে। ঠিক যেমন দিল্লী। অনেকগুলি রেল পথ বহু ধারাপথে একে একে এসে মিশছে মেট্রোপলিটান লণ্ডনে। এই বৃহত্তর লণ্ডনের চতুঃসীমায় রয়েছে ক্রয়ডন, চাথাম, ওয়েস্টহাম ও মিডলসেক্স। আমি এসে কিংক্রশ স্টেশনে পৌঁছলুম।

কিংক্রশ স্টেশনে এমন কতকগুলি লক্ষ্যচিহ্ন রয়েছে যেগুলি বিলেতী আভি-

জাত্যের পরিচয় দেয়। শুনলুম এই স্টেশন দিয়েই নাকি রাজা ও রানী, অমাত্য ও পারিষদবর্গ আনাগোনা করেন। তা হবে। কিন্তু ইদানীং সোস্যালিস্ট ভাবনার ফলে অভিজাত শব্দটা তার ধার খুইয়েছে। কথায় কথায় এখন 'কমন ম্যান, ম্যান অন দি স্ট্রীট'—এই সব কথা চলে। হাউস অব কমনস-এর এখন জয়-জয়কার। হাউস অব লর্ডস-এর লর্ডরা অনেকেই এখন ইনকামট্যাক্স মেটাবার ভয়ে কাঁপছে। রানী এলিজাবেথের মাসোহারা বা বাৎসরিক মঞ্জুরির পরিমাণ নিয়ে যখন-তখন বিতর্ক ওঠে। তাঁর মাথার মুকুটে ভারতপ্রতীক কোহিনুরটি এখনও আছে কিনা খোঁজ করিনি।

প্লাটফরম পেরিয়েই ট্যাক্সি। পুলিস ট্যাক্সি ধরে দিচ্ছে। সেই ট্যাক্সি নিয়ে আমি দশ মিনিটের মধ্যে চেয়ারিং ক্রশ হোটেলে এসে উঠলুম। এ আমার পুরনো বাসস্থান। তবে এবার অন্য একটি ঘরে উঠলুম।

দু ঘণ্টা গেল না, সন্ধ্যায় এসে পেঁছলেন ব্রিটিশ কাউন্সিলের নব্যবয়স্ক অফিসার মিঃ গিয়াভল। তিনি এসে বললেন, বেশী দূর নয়, কাছেই একটি রেস্টুরেণ্টে আপনার জন্য একটি টেবল রিজার্ভ করেছি। আমরা সেখানে ডিনার খেয়ে থিয়েটার দেখতে যাব। আসুন—

লণ্ডনের হোটেল বহু শ্রেণীর খাবার রাখে। ইংরেজরা যদি শস্তায় খায় তবে ভারতীয় হোটেল! ভাত রুটি ডাল সবজি—নিরামিষ। আবার আছে বিস্বাদ ইলিশ মাছের ঝোল, মাংস, আলু-ফুলকপি,—চাটনি চাও চাটনি। পাকিস্তানিতে ঢোকো. —গরু আর মুরগি। আরবি-ফার্সিতে যাও—টার্কি, গরু আর পোলাও। ইংরেজী বা চাইনীজে যাও--শুয়োরের ছড়াছড়ি। গিয়াভলকে বললুম, আমি ভাই ডাল-ভাত-রুটি—এ সব খাইনে। আমাকে দাও ইয়োগার্ট (দই), কমলার রস আর কেক।

যাই হোক, একটি হোটেলে আহারাদি সেরে উনি আমাকে একটি থিয়েটারে নিয়ে এলেন। পালাটা হলো, 'তিনটি খৃষ্টমাস।' এটি নাকি বিলাতের নবনাট্য আন্দোলনের একটি প্রতীক নাট্য। আমরা গিয়ে ড্রেস সার্কলে জায়গা নিলুম।

প্রথম নাটকটির সম্বন্ধে আমাদের বাংলায় প্রবাদ আছে, "বাইরে কোঁচার পত্তন. ভিতরে ছুঁচোর কীর্তন।" জাতীয় উৎসবকালে বাইরের বৈঠকখানায় যখন আমোদ-আহ্লাদ, খানাপিনা, লৌকিকতা, অতিথিআপ্যায়ন চলছে, তখন পাশের ঘরে গৃহকর্তা ও কর্ত্রীর কী দুরূহ অর্থনীতিক সমস্যা! সমাজের সামনে মুখরক্ষার জন্য যত রকমের কথার কারচুপি, প্রকৃত অবস্থা গোপন করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা, উপযুক্ত পোশাকের অভাবে বাড়ির মহিলার আত্মগোপন বৃত্তি, দারিদ্র্য ও অভাব ঢাকার জন্য সংগ্রাম—এগুলি পর পর নাটকে বিশেষ যোগ্যতার সঙ্গে অভিনীত হয়েছে। দর্শকেরা অনেক সময় হাস্যরোল তুলছিলেন।

সেদিন মধ্যরাত্রে যখন মিঃ গিয়াভল আমাকে হোটেলে পেঁছে দিলেন তখন আমি একটু ক্লান্তই। কিন্তু ব্রিটিশ কাউন্সিলের শ্রীমতী গ্রীন বোধ করি আমার অধ্যবসায় এবং স্বাস্থ্যের পরীক্ষা করছিলেন! আমারও জিদ, বিশ্রাম আমি নেবো না। সমগ্র ব্রিটেনকে আমার দেখা দরকার। এককালের দেশী উন্নাসিকরা যাঁরা প্রাক-বিমান যুগে জাহাজে চড়ে বিলাতে আসতেন, তাঁরা দেশে ফিরে নাম নিতেন 'বিলেতফের্তা।' তাঁদের কথায়, চালচলনে, ভঙ্গিতে এবং সামাজিক ব্যবহারে তাঁরা স্বদেশবাসীর প্রতি কেমন একটি অনুকম্পা বা করুণা প্রকাশ করতেন—যেটি শিক্ষিত মহলের পক্ষে পীড়াদায়ক

মনে হত। বিমান যুগে সেটি কমেছে। অলীক বা সিউডো-আভিজাত্যের আত্মাভিমান এখন আর চোখে পড়ে না। ব্রিটিশ খেতাব এখন ব্রিটেনেও বেশী দামে বিকোয় না। যাই হোক, এই সব কারণে ব্রিটেনকে আমার আগাগোড়া দেখে যাওয়া চাই। কেমন করে সে একশ্রেণীর ভারতীয় বা বাঙালীকে সম্মোহিত ও মূঢ় বানিয়ে রেখেছিল সেটিও আমার জেনে যাওয়ার প্রয়োজন ছিল।

মিস গ্রীন আমার অনুরোধ রাখলেন এবং এক প্রফেসরের সঙ্গে আমাকে ব্রিস্টল নগরে পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন। অধ্যাপক মহাশয় সুশ্রী এবং ঋজুকায়, ভদ্র ও সৌজন্যশীল। তাঁর নামটি আমার ঠিক মনে নেই। তিনি আমাকে প্যাডিংটন স্টেশনে এনে বেলা ১০টার ট্রেনে তুললেন। ট্রেন যে পথ দিয়ে চলল, সেই পথ আমার চেনা হয়ে আছে। অর্থাৎ লন্ডন থেকে রেডিং এবং তারপর বার্কশায়ারের ভিতর দিয়ে সেই সুইনডন এবং এভন নদীর ধার দিয়ে ব্রিস্টল নগরী। ব্রিস্টল পড়ে গ্লস্টার এবং সমারসেট জেলার সীমানায়। সমারসেটের পশ্চিমে আটলান্টিক সংকীর্ণ হয়ে ব্রিস্টল চ্যানেল নাম নিয়ে মূল ভূখণ্ডে প্রবেশ করেছে। এই সংকীর্ণ জলাশয় এবং উত্তরস্থ বৃহৎ ব-দ্বীপের নাম হয়েছে স্যাভার্ন প্লেন। সাগরতীরের ছোট জনপদটিকে বলা হয় এভন-মোহানা। বিশাল ব্রিস্টল নগরী এই উপসাগরের পূর্বকূলে অবস্থিত। আমরা ১১০ মাইল পথ চলে এলুম ২ ঘণ্টা ১০ মিনিটে। প্রবল উদ্দীপনা নিয়ে ব্রিস্টলে আমি নেমেছিলুম।

ট্যাক্সিতে মাইল দেড়েক এসে একটি বড় গেটের মধ্যে যখন ঢুকছি, দেখি ফটকের দুধারে তামা ও ব্রোঞ্জের ট্যাবলেটে লেখা 'ব্রিস্টল ক্রিমেটোরিয়ম'। আমি যে ভারত-জননীর একটি চেতনা মনে মনে বহন করে এনেছি, এটি নিজেও এতক্ষণ বুঝতে পারিনি। সেজন্য সন্তানবিয়োগাতুরা জননীর মতো রাজা রামমোহন রায়ের সমাধি-ফলকটি খুঁজে বার করার জন্য বাঁ দিক দিয়ে অগ্রসর হলুম। এটি অনুচ্চ পাহাড়তলী। উপরে নীচে এপাশে ওপাশে দূরে—সর্বত্র শত শত সমাধিফলকের ভিতরে ভিতরে আমি বিচরণ করছিলুম। অবশেষে এই অধিত্যকার প্রদক্ষিণ পথে এই শ্মশান-ভূমির সর্বাপেক্ষা সুপ্রকট যে সমাধিসৌধের সামনে এসে দাঁড়ালুম, সেটি ছোট আকারের একটি অতি সুদৃশ্য নবনির্মিত মন্দির—যার বেদীর নীচে রামমোহনের দেহাবশেষ নিহিত। প্রতি বছর ২৭ সেপ্টেম্বরে ভারতীয় হাই কমিশন থেকে কর্তৃপক্ষ এখানে এসে নবভারতের প্রথম গুরুর উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি দান করে যান। অধ্যাপক মহাশয় নিজের পায়ের জুতো খুলে রাজার শেষ শ্রদ্ধামাল্যের থেকে একটি শুষ্ক ফুল আমাকে উপহারস্বরূপ উপর থেকে নামিয়ে দিলেন।

সামনের একটি বেঞ্চিতে বসলুম। শ্রান্ত পথিক যেমন চারিদিকের রুক্ষ প্রান্তরের মাঝখানে বিরাট এক জন্মজরাহীন অশ্বত্থের স্নিগ্ধ ছায়া খুঁজে পায়, আমিও যেন তাই পেলুম। রাজা রামমোহনের কীর্তি-ইতিহাসটি পাথরের গায়ে উৎকীর্ণ। লেখা রয়েছে তাঁর জন্ম সাল ১৭৭৪, মৃত্যু ১৮৩৩। কিন্তু তাঁর নামটি জন্মমৃত্যুর অতীত এক পুণ্য নাম।

বহুক্ষণ অবধি সেদিন যেন প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের মধ্যে তলিয়ে গিয়ে-ছিলুম।

অতঃপর এই ভদ্র ও মিষ্ট প্রকৃতির অধ্যাপক আমাকে নিয়ে চললেন বিভিন্ন পল্লীতে নানা দৃশ্যদর্শনে। এখানে বিশ্ববিদ্যালয়, ওখানে হাসপাতাল, সেখানে

অমুক এবং অমুক জনপ্রতিষ্ঠান। ব্রিস্টল খাস প্রাচীন ব্রিটিশ নগরী এবং এটি পার্বত্য উপত্যকাবেষ্টিত। একটি হোটেলে ঢুকে উভয়েই মধ্যাহ্ন বা অপরাহ্ণ ভোজ সেরে নিলুম। ভোজটি ইংরেজী। সুপটি আমার খুবই প্রিয়। সামুদ্রিক মাছের একটি বিশেষ ডিস। ছোট বান্‌টি মোলায়েম। সবজির মধ্যে লেটুস-বাঁধাকপি, আলুসিদ্ধ আর কড়াইশুঁটি। ওতেই পড়ে গেল ভারতীয় মূল্যে প্রায় ৭৭ টাকা। আহারাদির পর অধ্যাপক আমাকে নিয়ে ট্যাক্সিতে উঠলেন।

নগর পরিক্রমা পথে আমরা যে বৃহৎ সাঁকোটি পার হলুম সেটি ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসে প্রথম লৌহনির্মিত সেতু। এই সেতুর প্রায় ৫০০ ফুট নীচে বন্য এভন নদী খরবেগে বয়ে চলেছে। এই সুগভীর গিরিখাদের দিকে চেয়ে আমার মনে পড়ছিল চম্পানগরীর (Chamba Valley) পথে সরযূ নদীর 'গর্জ'। "ক"-অক্ষরটি শুনলে বৈষ্ণবদের যেমন মনে পড়ে "কৃষ্ণ", আমিও পৃথিবীর সকল পাহাড় দেখলে হিমালয়কেই ভাবি। আলাস্কার মাউণ্ট ম্যাকিন্‌লে (২০,০০০ ফুট) দেখে হিমালয় সম্বন্ধেই আমার মন উচ্ছ্বসিত হয়েছিল।

সেতু অতিক্রম করে প্রথমেই লক্ষ্য করলুম, এভন নদী ব্রিস্টল নগরকে দ্বিখণ্ডিত করেছে। কিন্তু এপারের অধিকাংশটাই হল 'পশ' অঞ্চল। অবস্থাপন্ন নাগরিকদের বাগানবাড়ি একটির পর একটি ছড়িয়ে রয়েছে এদিকের পার্বত্য ও বনময় অঞ্চলে। ওরই মধ্যে রয়েছে ছোট-বড় দোকান বাজার। বহু ক্ষেত্রে অবসরপ্রাপ্ত বুড়ো বা বুড়িরা দোকান দেয়, নিজেরাই বিকিকিনি করে। বড় দোকান হলে অল্প বয়সী মেয়েরা কাজে নিযুক্ত হয়। অনেক ক্ষেত্রে সপরিবারে দোকান চালায় এবং বাড়ির ভিতর মহলে সবাই বসবাস করে। সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে দোকান বন্ধ হলে বুড়ো-বুড়িরা হিসাবপত্র নিয়ে বসে এবং ছেলে বা মেয়েরা রঙ্গরসের আকর্ষণে পথে বেরিয়ে পড়ে। কিন্তু ব্রিটিশ মেয়ের কিছু সুনাম আছে, তারা পুরুষের পর পুরুষ বেছে বেড়ায় না! ওদের চটুলতা অপেক্ষাকৃত কম। প্রধানত ওরা 'একপুরুষঘাতিনী' হয় এবং স্বামীকে নিয়েই ঘরকন্না করতে মনোযোগী হয়ে থাকে। আমেরিকা অপেক্ষা বিলাতে গড়পড়তা বিবাহ-বিচ্ছেদ কম। ওদের বিবাহ পথে-ঘাটে না হয়ে গির্জাতেই হয়। ওদের রক্তের মধ্যে রক্ষণশীলতা।

আমরা বহু পথ ঘোরাঘুরি করে পুনরায় ব্রিস্টলের হৃৎকেন্দ্রে এসে পৌঁছলুম। কিন্তু আমাদের আর কোনও কাজ ছিল না। সুতরাং, বিকাল ৪টার ট্রেন ধরে আবার লণ্ডনের দিকে রওনা হলুম।

॥ ১৮ ॥

প্রিয়বরেষু,

একদিন জনৈক ইংরেজ ছোকরা আমাকে নিয়ে লণ্ডনের ইণ্ডিয়া হাউস লাইব্রেরি, ব্রিটিশ মিউজিয়ম ও ব্রিটিশ আর্ট গ্যালারি—এগুলি চিনিয়ে দিয়ে বিদায় নিল। এগুলি আমার চেয়ারিং ক্রশ হোটেল থেকে কাছাকাছি এবং আমার গাইডের দরকার ছিল না। ১৩ বছর আগে এগুলি প্রায় সবই দেখে গেছি, কিন্তু সেবার ইণ্ডিয়া হাউস কি কারণে যেন বন্ধ ছিল। আমি কেবল লর্ড ক্লাইভের সেই বিজয়ী প্রস্তর

মূর্তিটি দেখে চলে গিয়েছিলুম। ক্লাইভ ছিলেন ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রধান নায়ক। ১৮শ' শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে গ্রেট ব্রিটেনে এত বড় সম্মান ও গৌরব আর কেউ পায়নি। প্রধানত তাঁরই ভারত লুণ্ঠনের ফলে ব্রিটেনে বিরাট এক শিল্প-বিপ্লব ঘটেছিল (১৭৭৪)। ক্লাইভ তাঁর পুরস্কারস্বরূপ লর্ড উপাধি পেয়েছিলেন।

লর্ড ক্লাইভের সেই মূর্তিটি আজ আমার প্রবেশপথে দেখছিনে। ওটা সাম্রাজ্য-বাদের প্রতীক, তাই বোধ হয় ওটা নিঃশব্দে সরে গিয়ে ব্রিটিশ যাদুঘরে ঠাঁই পেয়েছে। একদা লন্ডনে বসে লর্ড জেটল্যান্ড গান্ধীজীকে হুমকি দিয়ে বলেছিলেন, তরবারির জোরে আমরা ভারতবর্ষকে জয় করেছি, তরবারির জোরেই তাকে আমরা রক্ষা করব। তার উত্তরে বোম্বাইতে বসে গান্ধীজী শান্ত মিষ্ট কণ্ঠে জবাব দিয়েছিলেন, কে জানে, হাতের জোর বৈ ত' নয়। সেই হাত পক্ষাঘাতগ্রস্তও হয়ে যেতে পারে! —জেটল্যান্ড আর কথা বলেননি। পরবর্তীকালে ইংরেজকে উদ্দেশ্য করে রবীন্দ্র-নাথ একটি কবিতায় বলেছিলেন, "জানি তারও পথ দিয়ে বয়ে যাবে কাল। কোথায় ভাসায়ে দেবে সাম্রাজ্যের বেড়াঘেরা জাল—"

ইন্ডিয়া হাউস লাইব্রেরির দরজাতেই একটি বাঙ্গালী মেয়ে আমাকে ধরে নিল। মেয়েটি এখানে কাজ করে। নাম শ্রীমতী প্রতিভা বিশ্বাস। সে আমাকে নিয়ে একটি কক্ষে এক মহিলার কাছে হাজির করল। ইনি এখন এখানকার ডাইরেকটর। নাম জোয়ান-সি-ল্যাঙকাসটার। তিনি সমাদরের সঙ্গে আমাকে স্বাগত জানিয়ে একখানি বই "A guide to the India office Library," উপহার দিলেন। ব্রিটিশ কাউন্সিল সম্ভবত আমার সম্বন্ধে কিছু নির্দেশ দিয়ে থাকবেন, সেজন্য শ্রীমতী জোয়ান (Joan) প্রতিভাকে বলে দিলেন, ইনি এখানে যা কিছু দেখতে চান ভাল করে দেখিয়ো।

প্রতিভার কাছে আমি অপরিচিত নই। সুতরাং সে সোৎসাহে হাসিমুখে আমাকে নিয়ে এক কক্ষ থেকে অন্য কক্ষে বিপুল সংখ্যক গ্রন্থাদির অরণ্যের মধ্যে একটির পর একটি সংগ্রহশালা দেখিয়ে বেড়াতে লাগল। ১৮শ' শতাব্দীর শেষ ভাগে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি নিজেদের ভাগ্যলক্ষ্মী জয় করেই ক্ষান্ত থাকেনি, তারা ভারতীয় সংস্কৃতি, সাহিত্য, বিভিন্ন শ্রেণীর পান্ডুলিপি, চিত্রাঙ্কণ, বহুযত্নে রক্ষিত স্বর্ণ ও রৌপ্যপাত্রাদি, বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় লেখা পুঁথি, ফার্সি লেখকদের মূল্যবান পত্রাদি—এগুলি তারা সংগ্রহ করে নিজের দেশে পাঠাতে থাকে এবং তাদের ডাইরেক-টরদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৮০১ সালে ইন্ডিয়া হাউস লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠিত হয়। 'কোম্পানির' কর্তৃপক্ষ অতঃপর এই অমূল্য রত্নখনি থেকে উদ্ধৃত সামগ্রীসম্ভার নিয়ে বিরাট এক মিউজিয়ম প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে ভারতীয় চিত্রাঙ্কণ, শিল্পকলা, বিভিন্ন স্বর্ণমুদ্রা, পুঁথি, পান্ডুলিপি, ঐতিহাসিক সামগ্রী, মূর্তি, পুতুল, পুরনো কালের ভারতীয় পোষাক ও কিউরিয়ো, ঢাকাই মসলিন, পট, প্রাচীন যুগের আসবাব-পত্র, বাদ্যযন্ত্র, তখনকার কালের ভারতীয় জড়োয়া, নবাবদের স্বর্ণমণ্ডিত ব্যবহার সামগ্রী, মেয়েদের তৎকালীন অলঙ্কার প্রভৃতি বহুবিধ সজ্জাসম্ভার—এগুলি আসে জাহাজের পর জাহাজে। এদের থেকে পাওয়া যায় ভারতীয় সমাজ জীবনের ছবি, ইতিহাসের তথ্যাবলী, প্রাকৃতিক কাহিনী, ভারতীয় ধর্মাচার, ব্রতানুষ্ঠান ইত্যাদির নানা ইতিবৃত্ত। পরবর্তী ১৮৫৮ সালে যখন ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাত থেকে ব্রিটিশ রাজের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয় মহারানী ভিকটোরিয়ার নির্দেশে, তখন

এই লাইব্রেরি ও তৎসংলগ্ন মিউজিয়মটি স্টেট ডিপার্টমেণ্টের হাতে আসে। অতঃপর প্রায় ৯০ বছর পরে ১৯৪৭ সালে "ইণ্ডিয়ান ইনডিপেনডেন্স য়্যাক্ট" নামক আইন পাস হবার পর এটি কমনওয়েলথ রিলেসনস-এর সেক্রেটারির প্রভুত্বের আওতায় আসে এবং তিনি ভারত ও পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করেন। কয়েক বছর আগে ভারত গভর্নমেণ্ট চেষ্টা করেছিলেন এই লাইব্রেরি ও মিউজিয়মকে ভারতে তুলে নিয়ে যাবার জন্য, কিন্তু পাকিস্তান এটিকে ভাগাভাগি করার জন্য চাপ দেওয়ার ফলে একটি রাজনীতিক জটিলতা দেখা দেয়, এবং ভারত নিরস্ত হয়।

এই বৃহৎ অট্টালিকাটি বহুতল। প্রতিটি তলায় উঠে-উঠে আমি পরিদর্শন করছিলুম। প্রথম বাংলা বই ছাপা ও মুদ্রিত কাগজ শ্রীমতী প্রতিভা আমাকে দেখাচ্ছিল। একালের বহু বাংলা বই এবং সর্বাধুনিক লেখকদেরও বই মজুত রয়েছে। সঙ্কোচের সঙ্গেই বলি, প্রতিভা টেনে-টেনে বার করল আমারও খানকয়েক বই। এখানে ওখানে ঘুরে দেখি, বেশ কয়েকজন ইংরেজ নরনারী বিভিন্ন কাজে মোতায়েন রয়েছে। এই বিপুল সংগ্রহশালা, এর পরিপাটি বিধিব্যবস্থা, এর পরিচালনা এবং নিয়মানুগত্য, ভিতরে ভিতরে এর অসংখ্য বিভাগের সাজসজ্জা—সবগুলি মিলিয়ে খুবই চিত্তাকর্ষক মনে হচ্ছিল। সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সমগ্র ইণ্ডিয়া হাউস লাইব্রেরি পরিচালিত হয়। অপর একটি বাঙ্গালী মহিলা আমাকে কয়েকখানি পুরনোকালের চিত্রাঙ্কণ উপহার দিলেন।

অতঃপর আমি গিয়ে ঢুকেছিলুম ব্রিটিশ আর্ট গ্যালারিতে,—এটি ট্রাফলগার স্কোয়ারের পাশেই। এই বিশাল চিত্রশালায় যাঁরা প্রহরা দেন তাঁদের মধ্যে জনতিনেক পাকিস্তানীকে দেখে আলাপ করলুম। তাঁদের একজন বিশেষ যত্নের সঙ্গে আমাকে বিভিন্ন কক্ষে এক একখানি পোট্রেট দেখাতে লাগলেন। এখানে ব্রিটেনের ৭।৮ শ' বছরের চিত্রাঙ্কণ এবং শিল্প প্রতিভার অজস্র পরিচয় পাওয়া যায়।

ব্রিটিশ যাদুঘরে এক বিপুল সংগ্রহশালা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। পৃথিবীর প্রত্যেক মহাদেশের একেকটি অংশে ব্রিটেনের আধিপত্য এবং উপনিবেশের ইতিহাস সবাই জানে। সে নিজে দ্বীপবাসী এবং সকলের থেকে বিচ্ছিন্ন। সকল দেশের থেকে সামগ্রী এনে সে নিজের ঘর সাজিয়ে তুলেছে। সুতরাং ব্রিটিশ মিউজিয়মে ঢুকলে পৃথিবীর সব দেশেরই স্বাদ অল্পবিস্তর পাওয়া যায়। এর মধ্যে চীন, মঙ্গোলী, দক্ষিণপূর্ব প্রাচ্য, ভারত ও মিশর—এরা সামগ্রী জুগিয়েছে সব চেয়ে বেশি।

কিন্তু আনন্দ পেয়েছিলুম ম্যাডাম তুষোর স্বকৃত যাদুঘরটি দেখে। ইনি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ বহু ব্যক্তির 'অবিকল' মূর্তি রচনা করেছেন নিজের হাতে। কোনটি বল্‌ডুইন, কোনটি গ্লাডষ্টোন, কোনটি বা চার্চিল,—এটি চিনিয়ে দিতে হয় না। মূর্তিগুলির কোনটাই আধমরা বা নিষ্প্রাণ নয়, সবগুলি যেন অতিশয় জীবন্ত। তারা বক্তৃতারত অবস্থায় হঠাৎ যেন থমকিয়ে গেছে! ওদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী ও জওয়াহরলালকে দেখছিলুম। এমন নির্ভুল এবং জীবন্ত মূর্তিরচনা স্বল্পই দেখেছি। 'টাওয়ার অফ লণ্ডনে'র যাদুঘরে প্রাচীন ব্রিটিশ ইতিহাসের যে-সকল ভয়াবহ এবং বীভৎস কাহিনীকে মূর্ত করে রাখা হয়েছে, সেগুলি না দেখলেই যেন ভাল হত। ইংরেজি একটি প্রবাদ বার বার মনে পড়ছিল, "What man has made of man" ইতিহাসের আদি পর্ব থেকে মেয়েরা চিরকাল অকথ্য উৎপীড়ন সহ্য

করে এসেছে পৃথিবীর সব দেশে। এখানে তার সাংঘাতিক ইতিবৃত্ত দেখতে পাওয়া যায়। নারকীয় হত্যালীলা, জীবন্ত পুড়িয়ে মারা, জীবন্ত সমাধি দেওয়া, 'উইচ-হান্টিংয়ের' কালে অবর্ণনীয় উৎপীড়ন, মানুষের উপর মানুষের বর্বরোচিত অনাচার —প্রভৃতি বহু ইতিহাস।

ওয়েস্টমিনসটার হাউসের অভ্যন্তর ভাগ খুবই সুদৃশ্য। এই বিরাট হলে বিলাতের পার্লামেণ্ট বসে এবং কমবেশি ৬৫০ জনের মতো সীট রয়েছে। একদিকে ট্রেজারি বেঞ্চ, অন্যদিকে বিরোধী দল। স্পীকারের আসন সর্বপ্রধান। এই হলের মেঝের উপর একটি স্থল চিহ্নিত করা রয়েছে। একদা ওই স্থলটিতে ভারতশাসক ওয়ারেন হেসটিংস নতমুখে অপরাধীর বেশে দাঁড়িয়ে সমগ্র পার্লামেণ্টের কাছ থেকে তিরস্কার ও ধিক্কার মাথায় তোলেন। (Impeachment of Warren Hastings)

হাউসের ভিতর দিয়েই অন্য একটি অট্টালিকায় প্রবেশ করলুম। এটি সেই গির্জার একটি অংশ। এটির নাম ওয়েস্টমিনসটার আব্বে বা অ্যাবে। ভিতরটা বৃহৎ, কিন্তু স্বল্পালোকিত। এখানে ব্রিটেনের ইতিহাসে সকল কালের রাজা রানী রাজন্য সম্রাট-সম্রাজ্ঞি, বড় বড় রাষ্ট্রনেতা, দার্শনিক, কবি, বড় বড় সাহিত্যরথী, অভিনেতা ও শিল্পী—এদের সকলের সুদৃশ্য সমাধি একটির পর একটি দেখে যাচ্ছিলুম' পৃথিবীর সকল দেশের সংবাদপত্র একদা যে সকল অমিততেজ ব্যক্তির কথায় মুখর থাকত, যাদের এক একটি বিবৃতিতে বহু রাষ্ট্রের উত্থান বা পতন ঘটতো, তারা মাত্র ছয় ফুট লম্বা প্রস্তরাধারের মধ্যে এখন চিরনিদ্রায় নিদ্রিত! জনৈক বিশপ হাতে একটি প্রদীপ নিয়ে আমাকে একটির পর একটি সমাধি দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন।

ইণ্ডিয়ান হাই কমিশনের বৃহৎ অট্টালিকাটি এখন ফ্লীট স্ট্রীটের পাড়ায়। এটির এখন নাম হয়েছে ইণ্ডিয়া হাউস। হাই কমিশনার মিঃ বি কে নেহরু এখন উপস্থিত নেই। কিন্তু আমার একটু কাজ ছিল মিনিষ্টার-কাউন্সেলর প্রফেসর ডোগরার সঙ্গে। মানুষটি অমায়িক ও মিষ্টভাষী। আমার সামান্য একটি অনুরোধ ছিল। টেলিফোনযোগে তিনি সেটির ব্যবস্থা করে ছিলেন। ওখানে কয়েকজন বাঙ্গালী উচ্চপদস্থ হয়ে কাজ করেন। ওখানেই একটি যুবক ছাত্র আমাকে নানামহলে নিয়ে গিয়ে আলাপ-পরিচয় করিয়ে দিল। ছেলেটির নাম স্বপন রায়চৌধুরী। লণ্ডনে সে পড়াশুনো করে, কিন্তু কষ্টে তার দিন চলে। হাই কমিশন আপিসে সে ফাই-ফরমাস খেটে সপ্তাহে মাত্র সাড়ে ১২ পাউণ্ড পায়। ওতে বিশেষ কিছুই হয় না। ভারতীয় ছাত্রের জীবন লণ্ডনে এখন খুবই কষ্টকর।

ইণ্ডিয়া হাউসের পাশেই বুশ হাউস। এটি ব্রিটিশ ব্রডকাষ্টিং কর্পোরেশনের প্রধান কেন্দ্র। ওখানকার বাঙলা বিভাগের যিনি কর্মকর্তা হয়ে রয়েছেন, তিনি আমাদের বন্ধু কমল বসু। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কালে তিনি লণ্ডনে আসেন বি-বি-সিতে কাজ নিয়ে। সেই থেকেই এখানে রয়ে গেছেন। ওঁর সঙ্গে আমার অন্তরঙ্গতা অনেক কালের। যাই হোক, ওঁদেরই বিভাগের এক বিশিষ্ট কর্মী শ্যামল লোধ মহাশয় আমার সঙ্গে তাঁর একটি সাক্ষাৎকার টেপ-রেকর্ড করে নিলেন। ওটি তিনি প্রচার করবেন আগামী জানুয়ারিতে।

লণ্ডন শহরের বিশালতার বর্ণনা হয়ত একালে কিছু বেমানান মনে হতে পারে। বহুকাল ধরে লণ্ডনের সঙ্গে ভারতবাসীর যোগাযোগ চলে এসেছে,—তার সেই

সম্পর্কের ইতিহাস রাজা রামমোহনের আমল থেকে। আমার বাসস্থান এখন লণ্ডনের হৃৎকেন্দ্রে। কিন্তু বন্ধুজনের কল্যাণে আমার গতি ছিল দূর-দূরান্তরে। সেই কারণে লণ্ডনের তিনদিকের এবং টেমস্ নদীর ওপারের শহরতলী—একটির পর একটি দেখে যাচ্ছিলুম। আমার বিশ্রাম ছিল না।

এরই মধ্যে একদিন স্বাধীন বাঙ্গলাদেশের হাই কমিশনার সৈয়দ আবদুস সুলতান আমাকে মধ্যাহ্নভোজের আমন্ত্রণ করেছিলেন। আমি জানিয়েছিলুম, আমার কয়েকজন নিত্যসঙ্গী তরুণ-তরুণী আমার সঙ্গে থাকলে অসুবিধা হবে কিনা। সুলতান-সাহেব সানন্দে রাজি হয়েছিলেন। সুতরাং আমার সঙ্গে চলল পরিতোষ সরকার ও সুনন্দা, রতনময় গুহ এবং চিত্রা, এবং তাদের সঙ্গে শ্রীমান দিলীপ রায়—আমরা মোট ৬ জন তাঁর বাগানবাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলুম। সুলতান সাহেব প্রবীণ ব্যক্তি। তিনি ও তাঁর সুযোগ্যা স্ত্রী আমাদেরকে আন্তরিক সমাদর জানিয়ে ভিতরের লাউঞ্জে বসালেন। পরবর্তী মিনিট পনেরোর মধ্যে আমরা এবং ওঁরা ভুলেই গেলুম যে, আমরা দুই স্বাধীন দেশের নাগরিক। ভুলে গেলুম আমাদের আলাপচারীর মধ্যে কতক পরিমাণ কূটনীতি, কতকটা কেতাদুরস্ত মৌখিক সৌজন্য, কিছু পরিমাণ লৌকিক ভদ্রতা—এগুলি থাকা দরকার। কিন্তু তার পরিবর্তে আমাদের সকলের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল সেই আদি ও অকৃত্রিম বাঙ্গালী। সেই ভাবপ্রবণ, সেই বিগলিত হৃদয়াবেগ, সেই সাহিত্য, কাব্য ও শিল্পপ্রাণ, সেই রসধর্মী, ক্ষণমর্জী, হুজুগপ্রিয় এবং ভালবাসার স্পর্শপাগল—অর্থাৎ সেই আদিযুগের বৈষ্ণব-প্রেমী বাঙ্গালী সর্বপ্রকার রাজনীতিক মুখোস খুলে বেরিয়ে এল!
স্বাধীনতার সংগ্রামকালে বাঙ্গলাদেশের সর্বপ্রকার দুর্যোগে সুলতান ও তাঁর ফ্যামিলি কি প্রকারে দৈবানুকূল্যে রক্ষা পান, তার আনুপূর্বিক ইতিবৃত্ত। তিনি এবং তাঁর সহকর্মী বাঙ্গলাদেশের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট আবু সঈদ চৌধুরী ইউনাইটেড নেশনস-এ গিয়ে জে-কে-ব্যানার্জি ও সমর সেনের সহায়তায় কি-কি কাজ সম্পাদনে সমর্থ হয়েছিলেন,—অপরিসীম শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে সেগুলি তিনি স্মরণ করছিলেন। শ্রীমতী সুলতান ও তাঁর সন্তানাদি কোথায় কি ভাবে নিখোঁজ হয়েছিলেন—সেই কাহিনীর রোমাঞ্চকর খুঁটিনাটি শুনতে শুনতে আমরা স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলুম। স্থান, কাল, পাত্র—সবই ভুলে বসেছিলুম।

বাঙ্গলাদেশের হত্যাকাণ্ডের আনুপূর্বিক সংবাদ আলোচনা করতে গিয়ে হৃদয়াবেগ সামলাতে না পেরে সুলতান সাহেব চোখের জল ফেলছিলেন। এর আগে আমি কখনও তাঁকে চোখে দেখিনি, কিন্তু তিনি বললেন—বহুকাল থেকে আমি নাকি তাঁর পরম প্রীতির পাত্র! সেদিনকার মধ্যাহ্নভোজনে বসে যে আত্মীয়তা ও আন্তরিকতার স্বাদ পেয়েছিলুম, সেটি স্মরণীয়। বন্ধুত্ব ও ভালবাসার যে নিদর্শন সেদিন তিনি রাখলেন, সেটি সচরাচর সুলভ নয়। শুনে এলুম শীঘ্রই তিনি অবসর গ্রহণ করবেন।

অতঃপর দুটি সন্ধ্যায় আমাকে দুটি বন্ধুসম্মেলনে যোগদান করতে হয়েছিল। তার মধ্যে একটি ছিল প্রকাশ্য, অন্যটি ঘরোয়া। প্রকাশ্যটিতে শ্রীমতী চিত্রা দাস অতি মধুর কণ্ঠে গান গেয়েছিলেন এবং আমাকেও কিছু বলতে হয়েছিল। এই অনুষ্ঠানটি হয় লণ্ডন শহরের দূর প্রান্তে। ঘরোয়া বৈঠকটি অত দূরে নয়। এটি ছিল গল্পগুজবের আসর, এবং এখানে শ্রীমতী প্রীতিকণা মুখার্জি ও তাঁর স্বামী

মধ্যরাত্রি পর্যন্ত সকলকে ধরে রেখে খোশগল্প শুনেছিলেন।

পরদিন মধ্যাহ্নকালে ব্রিটিশ কাউন্সিলের দপ্তরে গিয়ে শ্রীমতী গ্রীনের কাছে যখন এবারের মতো বিদায় নিচ্ছিলুম, তখন দেখি আমার যুবক বন্ধু কলকাতার ব্রিটিশ হাই কমিশনের মিঃ জ্যাকসন হাসিমুখে দাঁড়িয়ে। ভদ্রলোকের বয়স ৩০।৩২, কিন্তু তাঁর নধর শান্তশ্রী দেখে অনেকদিন পরে আনন্দ পেলুম। ওঁর সঙ্গে আজ আমার মধ্যাহ্নভোজের ব্যবস্থা আছে। মিস গ্রীন এতদিন বাদে বিদায় সম্ভাষণ জানাবার কালে প্রশ্ন করলেন, বলুন, আমাদের দেশ আপনার কেমন লাগল?

বললুম, দাঁড়ান, আগে ধন্যবাদের পালা শেষ করি। আপনাদের সকলের কাছে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা রেখে যাচ্ছি। এই নিয়ে দ্বিতীয়বার আপনাদের কাউন্সিল আমাকে আনলেন। কিন্তু কি জানেন, আপনাদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় কমবেশি দুশ' বছরের। উভয়ের প্রকৃতি উভয়েই মোটামুটি জানি। সেইজন্য পৃথিবীর প্রায় তিন-চতুর্থাংশ ভূভাগ ঘুরে যখন লণ্ডনে কোনও ভারতীয় এসে দাঁড়ায়, সে মনে করে এ তার অতি পরিচিত ঘর, এখানে সে যেন একপ্রকার ন্যায়সঙ্গত অধিকার নিয়ে আসে! আপনাদের সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতি ও শিক্ষা এবং আমাদেরও ওই একই কয়েকটি বস্তু—এরা যেন মিলে-মিশে আমাদের সম্পর্ককে অনেকটা অচ্ছেদ্য করে রেখেছে। এ ধরণের আত্মিয়তা ধন্যবাদের অপেক্ষা রাখে না।

জ্যাকসন ও মিস গ্রীন উভয়েই হাসছিলেন। আজ গ্রীনের মুখে কর্মচাঞ্চল্যের উদ্বেগ দেখাচ্ছনে। সেজন্য একটু সাহস পেয়ে এবার বললুম, আপনি কন্‌টিনেণ্টের বাইরে বসে আমার জন্য কন্‌টিনেণ্টাল ব্রেকফাস্ট বরাদ্দ করেছিলেন, ওটাতে বোধ হয় মাত্রাবোধের অভাব ছিল—!

মিস গ্রীন আবার হেসে উঠলেন। বললেন, আপনি ত' ভ্রম সংশোধন করে নিয়েছিলেন!

আজ্ঞে হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। সেই জন্য যাবার আগে একটি সুপরামর্শ দিয়ে যাই—

কি, বলুন? —মিস গ্রীন উৎসুক হলেন।

সবিনয়েই বলি, এবার আপনি একটি বিবাহ করুন!

মিস গ্রীনের বড় বড় চক্ষুতারকাদুটি কাজলের রেখায়-রেখায় একবার ঘুরপাক খেল, তারপরেই উচ্চকণ্ঠে হেসে তিনি বিদায় নিলেন। জ্যাকসন ও আমি এবার হাত ধরাধরি করে এই অট্টালিকারই নিচের ক্যানটিনের দিকে অগ্রসর হলুম।

খেতে বসে শান্ত হাসিমুখে এক সময় জ্যাকসন প্রশ্ন তুললেন, আপনার ইম্‌প্রেসন্‌ কেমন হল, একটু বলুন।

বললুম, মুখ বুজে আমি চলে যেতে চাইনে, মিঃ জ্যাকসন। দেখে যাচ্ছি ইংল্যাণ্ডের রাজশক্তি একটু যেন দুর্বল হতে যাচ্ছে।

জ্যাকসন আমার মুখের দিকে তাকালেন। আমি বললুম, উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ড আপনাদের প্রভুত্ব মানতে চাইছে না! ওখানে ক্যাথলিক আর প্রটেষ্টাণ্টের মধ্যে দাঙ্গা বাধিয়ে বেশিদিন ধরে রাখা বোধ হয় আর চলবে না। ভারতে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে রাজনীতিক সংঘর্ষের মূল রহস্য কেউ ভোলেনি! ওয়েলস্‌ দেখে এলুম, —সেখানে ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি অন্যরকম। সেখানে অসন্তোষ ধূমায়িত হচ্ছে। স্কটল্যাণ্ডের সঙ্গে আপনাদের বহুকালের বিবাদ এবং পুরনো আমলের মন কষাকষি আর যুদ্ধবিগ্রহ সবাই মনে রেখেছে। ওরা চাইছে ওদের নতুন পার্লামেণ্ট, নিজেদের

আইনকানুন, স্বাধিকার এবং সম্পূর্ণ আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা। ওরা শীঘ্রই ঝড় তুলবে মনে হচ্ছে। সেদিন কানাডার প্রাক্তন গভর্নর জেনারল জন বুকানের (Buchan) স্মৃতিসভায় গিয়ে বক্তৃতাদি শুনে মনে হচ্ছিল, স্কটল্যান্ড বোধ হয় চাইছে কানাডার মতো ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস। ক্রাউনকে স্বীকার করবে, কিন্তু অন্যের সর্বময় প্রভুত্বকে মানবে না। ইংল্যান্ডের কাছে তার অর্থনীতিক দাসত্বও কিছু নেই।

এক সময় আমি নিজেই থমকিয়ে গিয়ে বললুম, ক্ষমা করবেন, আমি আপনাদের এসব ঘরোয়া ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাতে আসিনি। আমার আশঙ্কা, ব্রিটেনের সংহতি পাছে নষ্ট হয়। আমরা এখন উভয়েরই বন্ধু।

মিঃ জ্যাকসনের কথাবার্তায় ব্রিটেনের সমাজ জীবন এবং অর্থনীতি সম্পর্কে এঁদের মনোভাব প্রকাশ পাচ্ছিল,—যেটি যথেষ্ট উৎসাহজনক মনে হচ্ছিল না।

সেদিন আহারাদির পর বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে ফিরে গেলুম। এ যাত্রায় ব্রিটিশ কাউন্সিলের সদ্বিবেচনা, মিষ্ট ব্যবহার ও আতিথেয়তা আমার পক্ষে স্মরণীয় হয়ে রইল।

আমার সর্বশেষ আমন্ত্রণ ছিল একজন বিশিষ্ট বাঙ্গালী মহিলা চিকিৎসকের বাড়িতে। ওঁর নাম শ্রীমতী অমিয়া দেব। রোমান হরফে ওঁর নামের বানানটি লিখলে অনেক সময় ওঁকে পুরুষ বলে ভুল হতে পারে, হয়ত সেই কারণে উনি দেবা—এই পদবীতে পরিচিত। ডাঃ দেবা অনেকদিন অবধি লন্ডনে প্র্যাকটিস করছেন, সেজন্য তিনি এই নগরে বিশেষভাবে সুখ্যাত এবং বাঙ্গালী সমাজে তাঁর সুনাম ও সমাদর প্রচুর। ডাঃ দেবা বিবাহ করেননি। সেদিন তাঁর ছুটি ছিল। সন্ধ্যার ঠিক পরেই তিনি গাড়ি নিয়ে এলেন 'চেয়ারিং ক্রশ' হোটেলে। তাঁকে এই আমি প্রথম দেখলুম। তাঁর মৃদু মিহি কণ্ঠে আন্তরিকতা লক্ষ্য করে আনন্দ পেলুম। তাঁর বাসস্থান এখান থেকে প্রায় ৪০ মাইল দূরে—এটি জানিয়ে তিনি জানতে চাইলেন, আমার কষ্ট হবে কিনা। হাসিমুখে আমি বললুম, অতিথিকে খাওয়াবার জন্য আপনার এই কাহিল শরীর কতখানি পরিশ্রম করেছে, আমি সেই কথাই ভাবছি। কষ্টের কথাই ওঠে না।

অতঃপর এই মৃদুভাষিণী মহিলা লন্ডনের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করে চললেন। এদেশে ঘরোয়া কাজের জন্য কোনও লোক নেই, কেনাকাটা সবই নিজেদের করে নিতে হয়, রান্নাবান্না বাসন ধোওয়া কাপড় কাচা ঘরদোর পরিস্কার—সবই নিজেদের হাতে। তিনি তাঁর নানাবিধ অভিজ্ঞতার কথা বলে যাচ্ছিলেন। এক সময় তাঁর বাড়ির সামনে এসে মোটর থামালেন। তাঁর বাড়িটির নাম প্লেন এভন লজ। এটি সাউথ উডফোর্ডে।

ডাঃ দেবার তিনতলার ফ্লাটে উঠে এসে দেখি অপর এক মহিলা মিসেস নীনা দে। ইনিও বিশেষ উচ্চশিক্ষিতা মহিলা। এঁরা উভয়েই আত্মীয়-বন্ধু সম্পর্কিত। শ্রীমতী নীনা এসেছেন লন্ডনে বেড়াতে। কথায়-কথায় জানতে পারলুম মিসেস দে হলেন জেনারল অসিতরঞ্জন দত্ত এবং প্রসিদ্ধ অভিনেতা উৎপল দত্ত মহাশয়ের কনিষ্ঠা ভগ্নী। প্রায় বছর দুই আগে যখন আমি নাগাল্যান্ড ও মনিপুর পরিক্রমায় বেরিয়ে-ছিলুম, তখন কোহিমা থেকে মাইল দশেক দূরে উচ্চতর পর্বতে 'জাখামা' ক্যান্টন্-মেন্টে ওখানকার জেনারল অফিসার কমানডিং অসিতরঞ্জন দত্ত মহাশয়ের কোয়ার্টারে

একপ্রকার রাজকীয় আতিথেয়তায় দিন তিনেক বাস করেছিলুম। আমাদের এই গল্পগুজবের কালে এসে পৌঁছলেন আরও তিনজন। আমার সাংবাদিক বন্ধু সস্ত্রীক বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় এবং এখানকারই বাসিন্দা মিঃ গাঙ্গুলী। আমাদের আসর জমে উঠল। বিশ্বনাথের সঙ্গে এ যাত্রায় এমন আকস্মিকভাবে দেখা হয়ে যাবে ভাবিনি।

সেই রাত্রে ডাঃ দেবা সকলের জন্য যে পরিমাণ আহারাদির আয়োজন করছিলেন সেটি স্মরণীয়। তিনি সেদিন সকলের অভিনন্দন লাভ করেছিলেন। মিঃ গাঙ্গুলী যখন আমাকে চেয়ারিং ক্রশ হোটেলে পৌঁছিয়ে দিলেন তখন প্রায় মধ্যরাত্রি। ইউরোপেই বলো আর আমেরিকাই বলো, রাত্রের দিককার জীবনই হল প্রকৃতপক্ষে ওদের সামাজিক জীবন।

ব্রিটেন থেকে এবারের মতো বিদায় নিচ্ছিলুম। পরদিন প্রভাত সাতটার পরেই ব্রিটিশ কাউন্সিল থেকে গাড়ি নিয়ে এক ভদ্রলোক হোটেলে এলেন। আমি প্রস্তুত ছিলুম। যখন পথে বেরোলুম তখনও ঝাড়ুদাররা এখানে ওখানে রাস্তা সাফ করছে। ভদ্রলোক তাঁর গাড়িতে ফুল্ স্পীড দিয়ে আমাকে নিয়ে চললেন 'হিথ্রো' বিমানঘাঁটির দিকে—অন্তত ৪০।৫০ মাইল দূরে। বিভিন্ন পথ, বহু আবাসিক পল্লী, একটি পর একটি শিল্প কেন্দ্র, পাখিডাকা উপত্যকা এবং ময়দান,—এদেরই ভিতর দিয়ে আমরা ছুটে যাচ্ছিলুম। ভদ্রলোক বয়সে প্রবীণ। উনি এক সময় বললেন, ভারতবর্ষ স্বাধীনতালাভ করার পর থেকে ভারতের প্রতি আমাদের অনুরাগ অনেক বেড়েছে।

বললুম, আগে কম ছিল কেন?

তখন অপরিচিত ছিল। আমাদের চিনতে দেওয়া হয়নি। ভারতের নিন্দেই শুনতুম কিন্তু ভারতের মানুষদেরকে জানতুম না। আমাদের অনেক ভুল ভেঙেগেছে!

আমি চুপ করে হাসছিলুম। ভদ্রলোক এখানকার ভারতীয়দের সম্বন্ধে অনেক-গুলি প্রশংসাবাক্য উচ্চারণ করছিলেন। এয়ারপোর্টে এসে যখন পোর্টার খুঁজে পাওয়া গেল না, তখন তিনি নিজেই আমার লগেজ দুটি নিয়ে ভিতরের কাউণ্টারের কাছে পৌঁছিয়ে দিলেন। আমার প্লেন ছাড়বে ৯টার ঠিক পরে। এখনও প্রায় ঘণ্টাখানেক বাকি। উনি এবার হাসিমুখে করমর্দন করে বিদায় নিলেন। আমি প্যারিস যাচ্ছিলুম।

অবাক করল এয়ার ইণ্ডিয়া। ওদের ৯টার প্লেন এসে পৌঁছল প্রায় ১২টায়। নির্ভুল সময়টি ওরা মেনে চলতে চায় না, ওরা চায় যাত্রীসংখ্যা বাড়ুক। দেরি করলে যদি দুচারটে যাত্রী ছিটকিয়ে চলে আসে, মন্দ কি। আমার সন্দেহ, বিদেশী মুদ্রা-লাভের দিকে ওরা চোখ রাখে, সেখানে যাত্রীদের দুর্ভোগ ওদের পক্ষে সামান্য কথা। বেশি প্রশ্ন করো, শুনবে প্লেন এখনও প্রস্তুত হয়নি। ইউরোপ বা আমেরিকার বিমানগুলি প্রায় সকল সময়েই নির্ভুল টাইম মেনে চলে। এটি দুঃখের সঙ্গেই বলছি।

এয়ার ইণ্ডিয়ার বিমান ছাড়ল বেলা ১টার পর—যখন সকলেই অল্পবিস্তর বিরক্ত হয়ে উঠেছে।

কতটুকুই বা আকাশপথ? হয়ত বা চারশ' কিলোমিটার। দেখতে দেখতেই পার হয়ে এলুম ইংলিশ চ্যানেল, তারপরেই ফরাসী ভূখণ্ডে এসে ছোট ছোট ছবির

মতো জনপদগুলি পেরিয়ে যাওয়া। মিনিট চল্লিশেকের মধ্যেই চোখের সামনে আলোর নিশানা দপ করে উঠল, 'কোমরবন্ধ এঁটে নাও। ধূমপান করো না।' থাক্ যথেষ্ট হয়েছে! যদি য়্যাকসিডেণ্ট হয়, কোমরবন্ধটা কি বাঁচাবে? পেট বাঁধা অবস্থাতেই ত 'কাঠকয়লা' হয়ে মরব! না, কোমরে বাঁধবোনা ওই বেল্ট। এ যাত্রায় একবারও বাঁধিনি! "মারে কেষ্ট ত' রাখে কে?"

প্যারিসের 'ওরলি' বিমানঘাঁটিতে নামলুম ৪৫ মিনিটে। ইউরোপের বিমান-ঘাঁটিগুলি প্রায় একই ধরণের। দীর্ঘলম্বিত করিডর, কোন্ শাখাপথ কোন্‌দিকে গেছে তার হদিশ পেতে গেলে 'তীরমার্কা' নিশানাগুলির দিকে চোখ রেখে চলতে হয়। এখানে ওখানে 'এলিভেটরের' সিঁড়ি ঘুরছে। এক জায়গায় দাঁড়াও, তোমাকে টেনে নিয়ে যাবে বহুদূরে। সিঁড়ির একটা ধাপে দাঁড়িয়ে পড়ো, সোজা তোমায় উপরতলায় তুলে দেবে, কিংবা নিচের তলায় নামিয়ে নিয়ে যাবে। এমনি করে এসে পৌঁছলুম 'ব্যাগেজ ক্লেম'-এর কাছে। সেখানে এক বিরাট 'কুম্ভীপাক' ঘুরছে। তোমার লগেজটি সেখানে অনেকের মালের সঙ্গে ঘুরছে! তোমারটা তুমি তুলে নাও! রসিদ দেখিয়ে মালটা নিয়ে বেরিয়ে যাও!

ডক্টর রমাপ্রসাদ ও শ্রীমতী কমলমণি ব্যানার্জি ঠিক সেইখানে আমাকে ধরে নিলেন। ওঁরা আমার অপরিচিত। কিন্তু ওঁরা জানতেন এই বিমানেই আমি আসব। আমাকে সাদরে নিয়ে গিয়ে ওঁদের গাড়িতে তুললেন। ডঃ ব্যানার্জি বয়সে প্রবীণ, এবং প্যারিস ইনসটিট্যুট অফ বায়োলজির অন্যতম বায়ো-কেমিষ্ট। ওঁরা আমাকে এক সম্ভ্রান্ত পল্লীতে ওঁদের সুসজ্জিত ফ্ল্যাটের দোতলায় নিয়ে গিয়ে তুললেন। বাড়ির গৃহিণী শ্রীমতী কমলমণি জলযোগের আয়োজন করলেন।

সেদিন রাত্রে আহারাদির পর আমার এক প্রিয়বন্ধু বিনয় চক্রবর্তী—যিনি মধ্য-পূর্ব ফ্রান্সের 'গ্রেনোবল্' শহরের অধিবাসী—প্যারিসে এসেছিলেন কোন্ কাজে,—তাঁকে এবং আমাকে নিয়ে ডঃ ব্যানার্জি বেরোলেন। কোন্ দিকে চললুম আমি জানিনে। জটিল পথে রাত্রের দিকে শহরতলীর 'লোজেয়ার' (Lozere) অঞ্চলে এসে একস্থলে আমরা নামলুম। যিনি আমাকে বিশেষ সমাদরের সঙ্গে অভ্যর্থনা করে ভিতরে নিয়ে গেলেন, তিনি পরিণতবয়স্ক এক সুশ্রী এবং অবিবাহিত যুবা। নাম ডক্টর ভূপেশ দাশ,—একজন বিশিষ্ট রাসায়নিক এবং 'মাস স্পেকট্রোমেট্রি' (mass spectrometry) গবেষণাকেন্দ্রের অধিনায়ক। ইনি নিজের বাড়ির দোতলায় একটি ঘরে আমার বসবাসের ব্যবস্থা করলেন। আমি ক্লান্তদেহে বিনয় ও ডঃ ব্যানার্জির কাছে বিদায় নিয়ে সেই রাত্রির মতো বিছানা নিলুম। আশ্চর্য, নিজের দিকে চেয়ে অবাক হচ্ছি, এই জগৎজোড়া ভ্রমণকালে আমি তিলমাত্র অসুস্থ হচ্ছিনে, অথচ এই ভ্রাম্যমান অবস্থায় অনিয়ম ও বিশৃংখলায় আমার প্রতিটি দিন বিপর্যস্ত। আমি সকল সময়ই একা, বোধ হয় একা বলেই অদৃশ্যলোক থেকে কেউ আমার হাল ধরে রাখে!

এটি প্যারিসের শহরতলীর একটি নিরিবিলি পথের ধার। আশেপাশে গৃহস্থ-পল্লী। এখানে ওখানে দু-একটি দোকান। পথঘাট যথেষ্ট উন্নত নয়। নিজেকে অনেকটা বিচ্ছিন্ন মনে হচ্ছিল। দিন দুই পরে ডঃ ব্যানার্জি সস্ত্রীক এসে আমাকে নিয়ে চললেন প্যারিস নগরের হৃৎকেন্দ্রের দিকে। গত রাত্রে ওঁর ওখানে একটি নৈশভোজের আয়োজন করে অনেকের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন।

শ্রীমান বিনয় চক্রবর্তী আমার জন্য একটি হোটেলের ঘর ঠিক করে রেখেছেন।

এর মধ্যে ডঃ ভূপেশ দাস আমার সঙ্গে যাঁকে জুটিয়ে দিলেন, তিনি একজন বিশিষ্ট ফরাসী ভাষার লেখক, অনুবাদক ও সাংবাদিক শ্রীমান পৃথ্বীন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ইনি এক শিক্ষিতা ফরাসী রমনীকে বিবাহ করেছেন এবং এখন একটি শিশুকন্যার জনক। পৃথ্বীন্দ্র প্যারিসের বিভিন্ন শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত সমাজে পরিচিত এবং বহু নবাগত ভারতীয় বা বাঙ্গালীর প্রিয় সুহৃদ্। পৃথ্বীন্দ্রর অপর এক পরিচয়, সে যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ওরফে বাঙলার বিপ্লববাদীগণের গুরুস্থানীয় 'বাঘা যতীনের' পৌত্র এবং তেজেন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র। আমার প্যারিসে আসার সংবাদ আগে থেকেই সে শুনেছিল। তেজেনবাবুরা এখন থাকেন পণ্ডিচেরীতে শ্রীঅরবিন্দের যোগাশ্রমে। প্যারিসে পৃথ্বীন্দ্র আমার নিত্যসঙ্গী হয়ে উঠল। তার সহৃদয় ও বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার আমার পক্ষে বিশেষ আনন্দদায়ক হয়েছিল।

সে আমাকে নিয়ে ভারতীয় রাষ্ট্রদূতাবাসে তুললো এবং বর্তমান রাষ্ট্রদূত মিঃ ডি-এন-চ্যাটার্জির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। এই সৌম্যদর্শন, শান্ত ও ভদ্র মানুষটি হলেন আমার স্বর্গত বন্ধু সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সম্পর্কে ভাগিনেয়। মিঃ চ্যাটার্জির সঙ্গে বহুবিষয় নিয়ে আলোচনা করে আনন্দ পেলুম। ওঁদের অফিসের এক বিশিষ্ট কর্মচারী শ্রীবিজয়কুমারের সঙ্গেও পরিচয়াদি ঘটল। অতঃপর পৃথ্বীন্দ্র আমাকে নিয়ে বহু পথ ঘুরে যেখানে এসে পৌঁছল, সেটি জগদ্বিখ্যাত 'ইউনেসকো' (United Nations' Educational, Social and Cultural Organisation) প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্মকেন্দ্র। এর একাধিক সুবৃহৎ অট্টালিকা, বিভিন্ন বিভাগ, চারিদিকের কর্মব্যস্ততা, বিভিন্ন দেশের নরনারীর আনাগোনা—সব মিলিয়ে এর কর্মমুখরতা চিত্তাকর্ষক। এখানকার প্রকাশনা বিভাগের যিনি প্রধান অধিনায়ক তাঁর নাম মিঃ মিল্টন রোজেনথাল। তিনি বিশেষ সমাদরের সঙ্গে আমাদের উভয়কে কাছে বসিয়ে চায়ের অর্ডার দিলেন। ওঁর ছোট ঘরটির ভিতরে সর্বত্র গ্রন্থাদির জমাট জটলা দেখতে পাচ্ছিলুম। মিষ্টভাষী ভদ্রমানুষটি সানন্দে বললেন, আপনার 'মহাপ্রস্থানের পথে' বইটির ইংরেজি অনুবাদটি দিল্লী থেকে আমার কাছে এসেছে। এটি নিয়ে এখন নাড়াচাড়া করছি। দিল্লী থেকে লোকনাথ ভট্টাচার্য মহাশয়ের চিঠিও আমি দেখলুম।

মিঃ রোজেনথাল কয়েকখানি বই আমাকে উপহার দিলেন। আগামী বছরে তিনি অবসর গ্রহণ করবেন, এটিও শুনতে পেলুম।

গল্পগুজব ও চা পানাদির পর আমরা ওখান থেকে বিদায় নিয়ে বাইরে এসে দাঁড়ালুম।

ডঃ ব্যানার্জি যে হোটেলটিতে আমাকে তুলে দিয়ে এখনকার মতো বিদায় নিলেন, সেটির নাম 'বার্নারিডিন্স্' হোটেল। এটি মাঝারি ধরণের এবং মধ্যবিত্তদের উপযোগী। হোটেলের নিচে পথটির নাম স্কোয়ার মোন্জে' (Monge)। পাঁচতলা পর্যন্ত একটি লিফ্ট্ উঠে যায়, তারপর ছয়তলায় উঠে যেতে হয় সিঁড়ি ভেঙ্গে। ঘরটি ছোট, চলনসই। একটি একক বিছানা, টেবল চেয়ার, টেলিফোন, এবং ঘরটির ভিতরেই স্নানাগার। এই ঘরটি এবং সকালের ব্রেকফাষ্ট-এর জন্য ধার্য মূল্য হল দৈনিক ৩৪ ফ্রাঁ, অর্থাৎ এখন ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৬৩ টাকা। বলা বাহুল্য, ইউরোপের প্রায় সর্বত্রই—বেড এণ্ড ব্রেকফাষ্টেরই রেওয়াজ। মধ্যাহ্ন বা নৈশভোজন

সবই বাইরে-বাইরে।

কার কাছে যেন খবর পেয়ে পৃথ্বীন্দ্র ছাড়া আরও দুই বন্ধু আমার সামনে এসে পৌঁছলেন। একজন হলেন পূর্ববঙ্গের বাঙালী রেজাউল ইসলাম, অন্যজন সুপ্রিয় মুখার্জি। রেজাউল অবিবাহিত, এবং এখানে স্বল্পবেতনে শিক্ষকতা করেন কোন্ ইস্কুলে। এমন অমায়িক মিষ্টমধুর ব্যক্তিকে পেয়ে আমি খুবই খুশী হয়েছিলুম। সুপ্রিয় উৎসাহী, বাকপটু এবং বহু বিষয়ে অভিজ্ঞ। তিনি একদা কলকাতায় কোন্ কোন্ কাগজের সঙ্গে যেন লিপ্ত ছিলেন। এখানেও তিনি সাংবাদিকরূপে পরিচিত। সুপ্রিয় আমাকে নিয়ে পথে বেরোলেন, এবং তাঁর বাক্যস্রোতে ভাসতে-ভাসতে একসময় একটি রেস্তরাঁয় এসে পৌঁছলুম। এখন রাত প্রায় ন'টা। কিন্তু এখানে সন্ধ্যারম্ভ থেকে প্যারিসীয়রা চোখ খুলতে থাকে। রাত যত ঘনিয়ে উঠবে, জনকলরব বা জনস্রোত ততই বাড়বে।

চারিদিকে জনতা থৈ থৈ করছে। খাবারের জায়গাগুলি সব সময়েই ভরা। সকলপ্রকার দাম ১০।১২ বছর আগের তুলনায় ৪।৫ গুণ বেড়েছে। আমি যেখানে রয়েছি, সেখান থেকে সীন্ নদী বেশি দূরে নয়। পথে নেমে ডান দিকে মোড় ফিরলেই অদূরে দেখা যায় 'নোটার-ডাম' (Notre-Dame) গির্জা—যেটি জগৎপ্রসিদ্ধ। কিন্তু এদের সম্বন্ধে আলোচনা পরের চিঠিতে আমি করব। আমি কেবল আরেকবার দেখতে এসেছি, মোট ৭টি পাহাড় এবং উপত্যকা দিয়ে ঘেরা এই প্যারিস নগরী,—প্রথম দর্শনে যেটিকে মনে হয় অপেক্ষাকৃত ছোট,—অথচ প্রত্যেক উপত্যকার কোণে-কোণে আড়ালে ও আবডালে এই নগরী ছড়িয়ে রয়েছে নানাভাবে এবং নানাদিকে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কালে হিটলারের কাছে এই প্যারিস আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। সেটি ১৪ জুন, ১৯৪০। তখন এই নগরকে 'ওপেন সিটি' বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। হিটলার বলেছিলেন, 'এই পরম সুন্দর প্যারিস নগরীকে আমি ধ্বংস করতে পারব না। আমি কেবল ওদের মুখে পরাজয়ের গ্লানি মাখিয়ে দিতে চাই।'

সমগ্র ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড এবং ইউরোপ যখন সেদিন হিটলারের নাৎসী বাহিনীর আতঙ্কে কম্পমান, আগুনের লকলকি শিখায় যখন প্যারিসের পারিপার্শ্বিক দেশ জ্বলছে হিটলারের বোমাবর্ষণে, পলায়নপর জনতার দুর্ভেদ্য স্রোতের ভিতর দিয়ে মিলিটারি ট্রাক গতিরুদ্ধ হয়ে অচল অবস্থার সৃষ্টি করছে, তখন সেই জাতীয় আত্মসমর্পণের পূর্বরাত্রে এই নগরীর বুদ্ধিজীবী, বেপরোয়া ও সাহিত্যরসপিপাসু অধিবাসী তাদের জাতীয় রঙ্গমঞ্চে বসে-বসে রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর' নাটকের অভিনয় দেখছিল। সেদিনের সংবাদপত্র ঘাঁটলেই এটি আজও চোখে পড়বে।

॥ ১৯ ॥

প্রিয়বরেষু,

প্যারিস আমার অপরিচিত নয়। কিন্তু এই পাহাড়ঘেরা মনোরম নগরী আমার অতিপরিচিত, এটি বললে সম্পূর্ণই ভুল হবে। কমবেশি এক হাজার বছর ধরে বিভিন্ন রাষ্ট্রশক্তি এই নগরীর বিভিন্ন অংশ ভেঙেগ-ভেঙেগ গড়েছে, এবং গড়তে-গড়তেও ভেঙেগছে। এই ভাঙাগড়ার সঙেগ প্যারিসের নক্সাও বদলিয়েছে যুগে-যুগে। প্যারিসে ভ্রমণ করলেই বুঝতে পারা যায়, স্থিতিশীলতায় এরা বিশ্বাস করে না। বিপ্লববাদের বীজ রয়েছে এদের রক্তে, সমাজবিদ্রোহের ধ্বজা তোলে এরা কথায়-কথায় এবং এক-নতুন থেকে অন্য-নতুনের দিকে যাবার জন্য এরা কোন স্বেচ্ছাচারেরই পরোয়া করে না। প্যারিস হল চটুল, দুরন্ত, অবাধ্য, ক্ষণমর্জী, বেপরোয়া—তবু প্যারিস অতি সুন্দর, অতিশয় আনন্দদায়ক। মাঝে মাঝে মনে হতে থাকে, ফ্রান্স হল পৃথিবীর মধ্যে বিশালতম এক গবেষণাগার বা পরীক্ষাগার। এখানে সমগ্র বিশ্বের রাজনীতি, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, কাব্য, শিল্পকলা, ভাস্কর্য, স্থাপত্য প্রভৃতি প্রত্যেকটি বিষয়ের উৎকর্ষ বিচার করা হয়। রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনে তাঁর চিত্রাংকন পদ্ধতি এই প্যারিসের প্রদর্শনীতেই প্রথম অভিনন্দন লাভ করে। ইউরোপীয় সংস্কৃতির পীঠস্থান হল প্যারিস। এই নগরীকে বাদ দিলে বিশ্বভ্রমণ অসমাপ্ত থেকে যায়।

এখানকার 'কংগ্রেস ফর কালচারাল ফ্রীডম' নামক এক প্রতিষ্ঠানের অধিনায়ক মিঃ আইভান ক্যাট্স্ আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, আমি যেন আমার ইউরোপ ভ্রমণকালে প্যারিস ঘুরে যাই। এই প্রতিষ্ঠান কাদের, এদের উদ্দেশ্য কিরূপ, এদের খরচপত্র কারা চালায়,---তখন এসব আমার জানা ছিল না। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকাশিত কোন কোনও পেপার-ব্যাক বই আমার চিত্তাকর্ষক মনে হয়েছিল। এঁদের প্রধান দপ্তর ছিল প্যারিসের সেণ্ট অগাষ্টিন পল্লীর অনতিদূরে বুলভার হস্মান্ নামক এক প্রশস্ত পথের ধারে। আইভান আমাকে নানাপ্রকারে প্যারিস পরিভ্রমণে সহায়তা করেছিলেন। পরে আমি শুনেছিলুম এই প্রতিষ্ঠান নাকি আমেরিকা থেকে আর্থিক সহায়তা লাভ করে। যাই হোক, তখন দেখে গিয়েছিলুম, একটি বিরাট অট্টালিকা—যেটি 'ন্যাটো'র (North Atlantic Treaty Organisation) প্রধান কর্মকেন্দ্র। ফ্রান্স এবং জার্মানি মিলিয়ে ৩০ হাজার আমেরিকান সৈন্য এখন ইউরোপে মজুত থাকে।

সেণ্ট অগাষ্টিন-এর বিশাল প্রস্তরমূর্তির সামনেই একটি সরু গলিপথের কোণে 'পেন্থিভার' নামক একটি ছোট হোটেলের তিনতলার একটি ঘরে আমি এসে উঠি। আমার সর্বাপেক্ষা অসুবিধা আমি এক বর্ণও ফরাসী ভাষা বুঝি না। যে বর্ষীয়সী মেয়েছেলেটি এই হোটেলের মালিক, সে ভাঙগা-ভাঙগা অশুদ্ধ ইংরেজি বলার চেষ্টা পায়, এবং ওতেই কোনওমতে কাজ চলে যায়। তখন 'নুভো ফ্রাঁ' দাম খুব কম, তবুও আমাকে ঘর ও ব্রেকফাস্টের দরুন দৈনিক ২০ নুভো ফ্রাঁ দিয়ে যেতে হবে।

আমার হোটেলের সামনেই রয়েছে একটি মধ্যবিত্ত রেস্তরাঁ—যেটি এক ভদ্রলোক সপরিবারে পরিচালনা করেন। স্ত্রী রাঁধেন, কন্যা জোগাড় দেয়, দুই ছেলে পরিবেশন করে, এবং কর্তা ক্যাশ নিয়ে বসেন। রেস্তরাঁ যারা চালায় তাদের পক্ষে

একটু আধটু ইংরেজি জানতে হয়। খাদ্যসামগ্রী ফরাসী ধরণে তৈরি,—মশলাবিহীন নয়। ফরাসী পাউরুটি বাঁশের মতো লম্বা—সেটিকে চিরলে তবে নরম অংশ পাওয়া যায়। একগাড়ি লম্বা 'বাঁশ' এসে দাঁড়াল, মানে—একগাড়ি রুটি। ওগুলিকে টুকরো করে তবে খাওয়া যায়। মাংস, মাছ, কাবাব—এগুলি বাঙালী রসনার সঙ্গে বেশ মেলে। খাবার দোকান যেখানে সেখানে পথের ধারে জনবহুল রাজপথের আশেপাশে। আমি প্রথম দিনই অপরাহ্ণকালে ইফেল টাওয়ারের উপরে উঠলুম একটি বিদ্যুৎচালিত ক্যাবিনের সাহায্যে। আমার উদ্দেশ্য, ওটার উপরে উঠে সন্ধ্যার প্যারিসের আলোকোজ্জ্বল চেহারাটা দেখা। কিন্তু প্রায় মাঝামাঝি পর্যন্ত উঠে একটি বৃহৎ-আকার বারান্দায় ওরা ছেড়ে দেয়। ওখানে চা ও খাদ্যসামগ্রীর দোকানও রয়েছে। ইফেল টাওয়ার উচ্চতায় ৮৯৪ ফুট এবং এটি লৌহনির্মিত। ইফেল নামক এক ফরাসী ইন্‌জিনিয়ার ১৮৮৭ থেকে ৮৯—মোট দু বছরে এটি নির্মাণ করেন। এতে ৭ হাজার টন লোহা লেগেছিল। এর উপর দাঁড়িয়ে প্যারিস নগরীর আলোকমালা না দেখলে দেখাটাই অসম্পূর্ণ থাকে। দেখতে দেখতে দেখার নেশাই পেয়ে বসে। সেদিন বড় সুন্দর মনে হয়েছিল।

দেখতে গেলুম 'লা-কন্‌কর্ড।' এই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ স্থলটিতে রাজা পঞ্চদশ লুই-এর চাটুকার পারিষদ্‌বর্গ রাজার এক অশ্বারোহী মর্মরমূর্তি নির্মাণ করিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে ষোড়শ লুই-এর রাজত্বের সময় (১৭৮৯) যখন ফরাসী বিপ্লব ঘটে, তখন এই মূর্তি সরিয়ে এই স্থলটিকে বিপ্লবের কেন্দ্রে পরিণত করা হয়, এবং এই স্থলে শিরশ্ছেদনের যন্ত্র বানিয়ে ১৩ হাজার ব্যক্তির ছিন্নমুণ্ড গড়াগড়ি দেওয়া হয়। এই ছিন্নমুণ্ডগুলির মধ্যে সম্রাট ষোড়শ লুই এবং মেরি এণ্টনিয়েট বা রানী আঁতোয়ানাতের মুণ্ডদুটিও ছিল। এই শিরশ্ছেদনের যন্ত্রের উপর দিকে থাকে একটি ধারালো কুঠার, এবং ফরাসী বিপ্লবের ঠিক আগে যিনি এই যন্ত্রটি ব্যবহারের প্রস্তাব করেন,. তিনি ছিলেন জনৈক চিকিৎসক জোসেফ ইগ্‌নেস্‌ গিলোটিন। সেই থেকেই 'গিলোটিন' শব্দটি চলে আসছে।

যে সুপ্রশস্ত নয়নাভিরাম রাজপথটি প্যারিসের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ সেটির ফরাসী নাম 'সাঁজ্‌ এলিজে' (Les Champs-Elysces)। এই অঞ্চল একদা ছিল বনজঙ্গলময় জলাভূমি। জনৈক উৎসাহী মহিলা মেরি মেডিসিস বহুকাল আগে সীন্‌ নদীর সমান্তরাল ধরে একটি সরু রাস্তা এই জলাভূমির মাঝখানে সিঁথির মতো নির্মাণ করান। ক্রমে এই পথের একদিকে একেকটি বনময় উদ্যান রচনা করা হয় এবং বড় বড় গাছ লাগানো হতে থাকে। ১৯ শতাব্দীর প্রথম দিকে একেকটি ফোয়ারা, ফুলবাগান ও সরোবর সৃষ্টি করা হয়। পৃথিবীর অপর কোথাও এমন একটি সুদীর্ঘ ও শোভাসম্পদে ভরা রাজপথ দেখা যায় না। এই পথ প্রতিদিন সন্ধ্যায় অপ্সরালোকে পরিণত হয়,.এবং এর বর্ণবাহার ও সুকৌশল আলোকসজ্জা দেখার জন্য পৃথিবীর সকল দেশ থেকে নরনারীরা এসে এই পথে পরিভ্রমণ করেন। এই পথের দৈর্ঘ্য কমবেশি ৪ মাইল, এবং এর একপ্রান্তে সম্রাট নেপোলিয়নের সমাধিস্তম্ভ, অন্যপ্রান্তে অনুচ্চ উপত্যকার উপর গোলাকার আর্ক দ্য ট্রম্প (Arc de Triomphe)-এর বিজয়কেতন। এই পথেরই একধারে বিরাট একেকটি প্রস্তর প্রাসাদ শ্রেণীবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান, যেগুলি রাজপুরুষগণের বাসস্থান। ওগুলির মধ্যে ফরাসী রিপাবলিকের প্রেসিডেণ্টের প্রাসাদও অন্যতম। আমি যখন ওই পথে

বিচরণ করছিলুম তখন বিগত বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম নাটকীয় ব্যক্তিত্ব প্রেসিডেণ্ট দ্য গল (Gaulle) জীবিত রয়েছেন। 'সাঁজ্ এলিজে' পথটির দুই ধারের সারিবন্ধ বর্ণাঢ্য পুষ্পবীথির কোলে-কোলে ৩ হাজার মানুষের বসবার আসনগুলি পিছনের বনশোভায় আচ্ছন্ন। এখানে প্রতি বছরে ফ্রান্সের বহু নগরের মেয়রগণ প্রেসিডেণ্টের আমন্ত্রণে সমবেত হন।

লিয়োঁ কক্‌টিয়ে (Leon Cocktean) নামক জনৈক প্রচারবিশেষজ্ঞ বলেন, "The visit to Paris is very simple for those who look only at its decor, less simple for those who would penetrate its nooks and crannies. For Paris is a smiling and secret city."

'লা ইন্‌ভ্যালিড্‌স্' নামক একটি প্রাসাদ স্থাপন করেন সম্রাট চতুর্দশ লুই। সেখানে যুদ্ধের ফেরৎ পঙ্গু ব্যক্তিরা আশ্রয়লাভ করে। ১৫৭৬ সালে এটি নির্মিত হয়। অতঃপর ২১৩ বছর পরে ফরাসী বিপ্লবীরা এই প্রাসাদ আক্রমণ করে এবং এখানে লুক্কায়িত ২৮ হাজার রাইফেল লুট করে নিয়ে বিপ্লবের নিশানা দেয়। পরবর্তী যুগে ব্রিটেনের সঙ্গে ১৭ বছর ধরে আলাপ-আলোচনার পর ১৮৪০ সালে রাজা লুই-ফিলিপ তাঁর ছেলেকে সেণ্ট হেলেনা দ্বীপে পাঠান, এবং সেই রাজকুমার সেখানকার মাটি খুঁড়ে প্রাক্তন সম্রাট নেপোলিয়নের কফিনটি তুলে এনে তার ডালাটি খোলেন। দেখলেন নেপোলিয়নের মৃতদেহ সুন্দরভাবে সুরক্ষিত এবং সেটি তখনও যেন সতেজ রয়েছে। এই কফিনটি সসম্মানে প্যারিসে আনা হয় এবং সেই বছরে ১৫ ডিসেম্বর তারিখে এক বিরাট শবযাত্রা করে আর্ক দ্য ট্রেম্প্ হয়ে এই লা ইন্‌ভ্যালিড্‌স্-এর সামনে সেণ্ট জেরোম গির্জায় রাখা হয় দর্শনার্থে। এরই প্রায় ২১ বছর পরে একটি গোলাকার মর্মর সমাধি-সৌধের ভিতরে সম্রাট নেপোলিয়ন সমাধিস্থ হন। সকলেই জানেন, ব্রিটেনের কাছে নেপোলিয়ন পরাজিত হয়েছিলেন এবং সেণ্ট হেলেনা দ্বীপে নির্বাসিত অবস্থায় তাঁর মৃত্যু ঘটে। নেপোলিয়ন ছিলেন দিগ্বিজয়ী। সমাধি-সৌধের ভিতরে নেপোলিয়নের মূর্তিটির চারিদিক অপরূপ ভাস্কর্যের শোভায় সমৃদ্ধ।

প্যারিসে প্রথম ভূগর্ভ ট্রেন চালু হয় ১৯০০ সালে। বোধ হয় এইটিই পৃথিবীতে প্রথম। কিন্তু আমার বিশ্বাস, এই ভূগর্ভ রেলপথ মস্কোতেই এখন সর্বশ্রেষ্ঠ আকার নিয়েছে। প্যারিসের এই ভূগর্ভ রেলপথ ধরে আমি ব্যাষ্টিলে গিয়ে হাজির হয়েছিলুম। ব্যাষ্টিলের ইতিহাসে কিছু রোমাঞ্চ ছিল। এখানে এককালে রাজা পঞ্চম চার্লস তাঁর অপেক্ষাকৃত নিরাপত্তার জন্য একটি দুর্গ নির্মাণের পরিকল্পনা করেন। সেটি ১৩৭০ সালের কথা। কিন্তু দুর্গনির্মাণ শেষ হয় তাঁর মৃত্যুর দু বছর পরে। নির্মাণের দায়িত্ব যাঁর উপরে ছিল তিনি ছিলেন এক গির্জার প্রধান আচার্য। কর্কশ ও রুক্ষ মেজাজের মানুষ তিনি ছিলেন। এর ফলে নব অভিষিক্ত যুবরাজ উক্ত আচার্যকে (Provost Hugues Aubriot) ওই দুর্গেরই কারাগারে— যেটি তাঁর নিজেরই সৃষ্টি—তাঁকে নিক্ষেপ করেন। ব্যাষ্টিল দুর্গ রাজবন্দীদের জন্যই ব্যবহার করা হত। কিন্তু ফরাসী বিপ্লবের পাঁচ বছর আগে এই ব্যবস্থা লোপ করা হয়। সেই থেকে এই দুর্গ একপ্রকার শূন্যই ছিল। বিপ্লবীরা এই প্রায়-শূন্য দুর্গ আক্রমণ করে, এবং সারাদিন প্রতিরোধের পর এর গভর্নর আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হন। তিনি, তাঁর অধীনস্থ কয়েকজন কর্মচারী, জনকয়েক সুইস সৈন্য এবং কয়েক-

জন অশক্ত ব্যক্তি—এ'রাই বিপ্লবীদের হাতে প্রাণ দেন। (জুলাই ১৪, ১৭৮৯) কিন্তু বিপ্লবীদের যেটি লক্ষ্য ছিল—সেটি ব্যাষ্টিল কারাগার। ঐতিহাসিকমাত্রই জানেন, এখানকার কৌতুকজনক ঘটনা। ওই কারাগারটিতে ছিল মাত্র ৭ জন ব্যক্তি। ৪ জন ঠগ, ২ জন পাগল, এবং ১ জন যুবক—যে ছিল ধনী বাপের অবাধ্য। ওই ৭ জনকে নিয়ে বিপ্লবীরা প্যারিসে এসে মস্ত মিছিল বার করে। অবশেষে ঠগদের পাঠানো হয় বিচার বিভাগে, পাগল দুটিকে পাঠানো হয় গারদে, এবং অবাধ্য যুবকটি বাড়ি ফিরে যায়। সেই ব্যাষ্টিল দুর্গের চিহ্নও এখন দেখছিনে। রয়েছে শুধু একটি স্মৃতি স্তম্ভ। ব্যাষ্টিলের ছোট আধুনিক শহরটি আমি ঘুরে-ঘুরে দেখছিলুম।

আমার অসুবিধা ছিল ফরাসী ভাষা। এই ভাষায় কিছু দখল না থাকলে ফ্রান্সে অনেক সময় ভ্রমণ করা দুঃসাধ্য। পথে-ঘাটে-হোটেলে-দোকান-বাজারে বহুলোক ইংরেজি জানে ও বোঝে। তুমি প্রশ্ন করো বা কথা বলো ইংরেজিতে,—কিন্তু সে ব্যক্তি জবাব দেবে ফরাসীতে। এটি তাদের ইচ্ছাকৃত। ফরাসীরা বিশ্বাস করে তাদের ভাষাই পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, অন্য ভাষা তাদের কাছে অনুকম্পা বা উপেক্ষার বস্তু। ওদের ধারণা, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্য, কাব্য, শিল্পকলা, চিত্রাঙ্কন, ভাস্কর্য, স্থাপত্য, বিজ্ঞানের বিভিন্ন আবিষ্কার প্রভৃতি সমস্তই ওদেরই সৃষ্টি। ওদের দেশে বিদেশী যারা আসে, তারা কেবল শিখতে আসে, এবং 'গুরুবাড়িতে' এসে কেবল মাথা ঠুকে যায়। আমেরিকা, ব্রিটেন বা ইউরোপ—ওদের পাঠশালায় পড়েই রাজনীতি বিজ্ঞানের পাঠ নিয়েছে। ইংরেজ ও ইংরেজি ভাষা বা সাহিত্য সম্বন্ধে ওদের এমন একটা তাচ্ছিল্যভাব দেখতে পাওয়া যায়, যেটি কৌতুকজনক।

আমি গিয়েছিলুম ভার্সাইতে,—প্যারিস থেকে মাইল ছয়েক দূরে। ওখানে সম্রাট ত্রয়োদশ, চতুর্দশ, পঞ্চদশ ও ষোড়শ লুইয়ের রাজপ্রাসাদ আমার দেখার দরকার ছিল। ভিতরে ঢুকেছিলুম একটু আড়ষ্ট হয়ে। কিন্তু দেখি একদল টুরিষ্টকে নিয়ে একজন বাকপটু ও কৌতূহলপ্রিয় মহিলা তাদের গাইড্ হয়ে একে একে কক্ষের পর কক্ষ ঘুরিয়ে দেখাচ্ছেন। মহিলা নিজে ফরাসী, কিন্তু ইংরেজিতে প্রতিটি কক্ষের ইতিহাস বলে যাচ্ছেন। আমি ওদেরই সঙ্গী হয়ে এই বিরাট প্রাসাদের ভিতরভাগ একে একে দেখে যাচ্ছিলুম। এই প্রাসাদের সমগ্র ইতিহাস মহিলাটির নখদর্পণে। ওঁর উজ্জ্বল দুটি চোখে বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা, কৌতুক, ব্যঙ্গ-বক্রোক্তি, পরিহাসসরস বর্ণনা—ওঁর ওই সুশ্রী চেহারাটাকে যেন আরও ধারালো করে তুলেছে। সেদিন টুরিষ্টদের সংখ্যা ৫০ জনের কম নয়। সকলেই তারা শ্বেতাঙ্গ পুরুষ ও রমণী। কিন্তু মেষপালক যেমন মেষপালকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়, ওঁর সকৌতুক আচরণে আমি সেই চেহারা দেখছি-লুম। উনি যেন ধরেই নিয়েছিলেন টুরিষ্টমাত্রই মূঢ়মতি এবং অর্বাচীন। কিন্তু ওঁর বাকচাতুর্য, ইতিহাস বর্ণনার খুঁটিনাটি প্রভৃতি অনেককেই অভিভূত করেছিল। তবু এই বিশাল নিরেট প্রাসাদ—যার সৌসাদৃশ্য রয়েছে লন্ডনের বাকিংহাম রাজ-প্রাসাদের সঙ্গে,—এ একদিনে বা কয়েক ঘন্টায় দেখে শেষ করা যায় না। চারিদিকের বিপুল রাজকীয় বৈভবের শোভা ও সৌন্দর্য্য দেখতে দেখতে এক সময় মানসিক ক্লান্তি আসে। সম্ভবত এই প্রাসাদেই বসে ষোড়শ লুইয়ের পত্নী রাণী মেরি এন্‌টনিয়েট্ (আঁতোয়ানাত) বলে থাকবেন সেদিনকার ক্ষুধার্ত বিপ্লবী জনতার উদ্দেশে,—"ওরা রুটির জন্যে অত চেঁচাচ্ছে কেন? বাজারে যদি রুটি না থাকে, 'কেক'

কিনে খাক্ না?"

বিপ্লবীদের হাতে সম্রাট ও সম্রাজ্ঞী সবংশে নিহত হয়েছিলেন! অনুরূপ ঘটনা ঘটেছিল রাশিয়ায় পরবর্তীকালে। ক্ষুধার্ত জনতা সেন্ট পিটার্সবার্গে (অধুনা লেনিনগ্রাড) 'উইনটার প্যালেস'-এর সামনে তুষারসমাকীর্ণ ময়দানে দাঁড়িয়ে রুটি চাইতে গিয়ে বুলেট খেয়ে মরেছিল ('Bloody Sunday')। কালক্রমে সোভিয়েট রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠাকালে জার নিকলাস সপরিবারে নিহত হয়েছিলেন! ব্রিটিশ আমলে বিশ্বযুদ্ধের কালে বাঙলায় কমবেশি ৫০ লক্ষ লোক না খেয়ে মরে (man-made famine—1943), কিন্তু কেউ কোথাও হিংস্র হয়ে ওঠেনি!

১৬শ' শতাব্দীতে এই ভার্সাই (versailles) ছিল ঘন অরণ্যঘেরা একটি সামান্য গ্রাম। এরই চারিদিকের জঙ্গলে রাজা ত্রয়োদশ লুই শিকার সন্ধানে আসতেন। এই গ্রামের পাশের রাস্তা দিয়ে চিরকাল বধ্য গরুর পালকে নিয়ে যাওয়া হত প্যারিসের দিকে, সেইকালে এই গ্রামের রাস্তাটার নাম ছিল 'গো-পথ' বা কাউজ্‌ওয়ে। এর এখানে ওখানে ছিল জলাভূমি। এর পর নাবালক ছেলে যিনি পরে হন রাজা লুই-১৪, সেও এখানে আসতো শিকারের উদ্দেশ্যে। এই আনাগোনার ফলে এখানে একটি প্রাসাদ (chateau) গড়ে ওঠে। অতঃপর লুই-১৪ এখানে রাজপ্রাসাদ নির্মাণ করেন,—তাঁর ক্ষমতা ও গৌরবের প্রতীক-চিহ্ন হিসাবে। এর অনেককাল পরে জনৈক ফরাসী স্থপতিবিদ্ হারদুঁই মানসার্ট এই প্রাসাদকে ইতালীয় বা রোমান ভাস্কর্যের চেহারা বদলিয়ে ফরাসী ষ্টাইলে পরিণত করেন। লুই-১৪র রাজত্বকাল প্রায় ৫০ বছর অবধি ছিল। তিনি মারা যান ১৭১৫ সালে। এখনও তাঁর শয়নকক্ষের বিছানাটি তেমনি পাতা রয়েছে। এঁর পৌত্র হলেন রাজা লুই ১৫, আবার তাঁরও পৌত্র হলেন লুই-১৬। এঁরই রাজত্বকালে ফরাসী জনগণের অভ্যুত্থান ঘটে এবং বিপ্লবীরা এই প্রাসাদের ভিতরে ঢুকে বিলাস ও প্রমোদভবনগুলি তচনচ করে। এর পরের ইতিহাস সবাই জানে।

এর পর একে একে দেখ যাচ্ছিলুম ফন্‌টেনিব্লু, রয়াল গার্ডেনস ও পশুশালা এবং অন্যান্য দর্শনীয় বস্তু। এই পশুশালা থেকে প্রায় ৫০ বছর আগে পালিয়ে যায় পৃথিবীর বৃহত্তম গোরিলাটি—যার জন্য ভয়ভীত সমগ্র ফ্রান্সের সৈন্যদল, হাজার হাজার পুলিস, দমকলবাহিনী, স্বেচ্ছাসেবক সম্প্রদায় প্রভৃতিকে মোতায়েন করা হয়েছিল। দুদিন পরে উৎকণ্ঠিত ফরাসীরা জানতে পারে, সেই নিখোঁজ গোরিলা নিজেই ফিরে এসে ক্ষুধার্ত ও রুক্ষ মেজাজে নিজেরই খাঁচার পাশে বসে রয়েছে। জানিনে, বোধ হয় এই ঘটনাটি নিয়ে 'কিংকং' ছবিটি নির্মাণ করা হয়েছিল।

প্যারিস বা ফ্রান্সের ইতিহাসে দেখি, আজ যিনি শ্রদ্ধেয়, কাল তিনি ঘৃণ্য। গতকাল যাঁর ব্রোঞ্জ মূর্তি নির্মাণ করে পথের ধারে বসিয়েছি, আজ নিতান্ত অশ্রদ্ধার সঙ্গে সেই মূর্তিটি ভেঙ্গে চুরমার করলুম। এটি ফরাসী প্রকৃতির চটুলতার দিক। যেমন ধরো, লুই-১৪র প্রতিমূর্তিটি ফরাসী বিপ্লবকালে টান মেরে খুলে আগুনে গালিয়ে ফেলা হল। আবার সেই একই মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হল কুড়ি বাইশ বছর পরে। চতুর্থ হেন্‌রির (ইংল্যান্ডের) মূর্তি ভাঙ্গা হল ওয়াটার্লুতে পরাজয়ের পর। ১৮৭১ সালের প্যারিস কমিউনের কালে নেপোলিয়নের মূর্তিটি ভেঙ্গে ফেলা হয়েছিল, কিন্তু থার্ড রিপাবলিক প্রতিষ্ঠিত হয়ে আবার সেই মূর্তিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হল। দেখে দেখে বেড়াচ্ছিলুম ন্যাশন্যাল অপেরা ও থিয়েটার, লা প্যালেস

রয়াল, রুয়ে রিভোলি, রুয়ে নেপোলিয়ন, এবং শেষ পর্যন্ত এসে পেঁছিলুম নোটার দাম (Notre Dame) গির্জায়।

এই গির্জা রাজা লুই-১৩ রাজবংশের জয় গৌরবের চিহ্নস্বরূপ প্রতিষ্ঠা করেন ১৬২৯ সালে। এই অতি বৃহৎ ও পরম সুন্দর গির্জা পৃথিবী প্রসিদ্ধ। এটি ভার্জিন মেরির উদ্দেশে উৎসগীকৃত এবং সেন্ট অগাষ্টিন—যাঁর অধ্যাত্মজীবনের ঘটনাবলী বিশ্ববিশ্রুত,—তাঁরই জীবনের অনেকগুলি ঘটনা এই গির্জার মধ্যে চিত্রাঙ্কিত। কাশীর অন্তর্গত সারনাথের মূলগন্ধকুটি বিহারে যেমন গৌতম বুদ্ধের জীবনের নানা ঘটনা দেওয়ালচিত্রে ধরা আছে, এখানেও তাই। এই গির্জার ভিতরে বর্ণবাহার স্ফটিকের এবং রঙগীন পরকলার শোভা ও শ্রী দেখার জন্য আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়েছিলুম। এর ভিতরের বিশালতা, বর্ণাঢ্যতা, এর মহিমা এবং এক প্রকার 'রাজকীয় আভিজাত্য'—এগুলি অবর্ণনীয়। আমার ধারণা, ফরাসী জাতির শিল্প-কলা ও সৌন্দর্যবোধ এই গির্জায় যেন সংহত হয়ে রয়েছে। ওখানকার আচার্য আমাকে একটি প্রজ্জ্বলিত মোমবাতির টুকরো উপহার দিলেন। এখানে আসেন দেশ দেশান্তরের তীর্থযাত্রীরা। ১৮৮৭ সালে মহিমান্বিতা তপস্বিনী সেন্ট থেরেসা যখন তাঁর প্রব্রজ্যাপথে প্যারিসে আসেন তখন তিনি এই প্রার্থনা মন্দির দেখে এমনই তন্ময় হন যে এই গির্জার মধ্যেই তিনি তপশ্চর্যা করে যান।

আমার হোটেলটি ছিল রুয়ে দ্য প্যান্থিভারে। সকাল বেলা ব্রেকফাষ্টের জন্য নিচের তলায় যাবো, এমন সময় একটি মেয়ে সামনে এসে দাঁড়িয়ে সহাস্যে শুভপ্রভাত জানালো এবং প্রশ্ন করলো, আপনি কি ভারতীয়?

হ্যাঁ, কেন?

মেয়েটি বলল, আমি দুদিন ধরে আপনাকে দেখছি, কিন্তু কথা বলতে সাহস পাইনি।

ভাষাসংকট নিয়ে আমি সর্বক্ষণ কষ্ট পাচ্ছিলুম, সুতরাং মেয়েটির মুখে পরিচ্ছন্ন ইংরেজি শুনে এবার উৎসাহিত হয়ে বললুম, না না, সংকোচের কিছু নেই। আমি সানন্দেই শুনব।

তা হলে আসুন, ব্রেকফাষ্টের টেবিলেই বলব।—মেয়েটি বলল, আমি এই হোটেলেরই তেতলায় একটি ঘর নিয়েছি।

দোতলা থেকে নেমে এসে গলির অপরদিকে সেই ফ্যামিলি-হোটেলে ঢুকে একটি টেবিল নিলুম দুজনে। বললুম, কোথা থেকে এসেছ তুমি?

মেয়েটি বলল,. আমি ক্যানাডিয়ান, আমাদের বাড়ি উইন্ডসরে, রেড উড এভেনুতে। আমার নাম মারজোরি ষ্টুয়ার্ট। প্যারিসে আমি এসেছি ফ্রেঞ্চ শিখতে। মাস ছয়েক এখানে থাকলে ফ্রেঞ্চ শিখতে পারবনা?

হাসিমুখে বললুম, সেটি ত' তোমারই ওপর নির্ভর করে!

মারজোরি বলল, আপনার কাছে একটি অনুরোধ আছে। প্যারিসের কিছুই আমি এখনও দেখিনি। আপনি যদি আমাকে আর্ক দ্য ট্রম্প-এ নিয়ে যান তাহলে খুবই খুশী হই। ওখানে আপনাদের প্রধানমন্ত্রীকে আজ অভ্যর্থনা দেওয়া হবে। তাঁর অত নাম, আমি একটু তাঁকে দেখব!

তখন সেপ্টেম্বর। প্রধানমন্ত্রী নেহরু লন্ডন হয়ে প্যারিসে এসেছেন। প্রেসিডেন্ট জেনারেল দ্য গল তাঁকে আজ অপরাহ্নে প্রকাশ্যে অভিনন্দন জানাবেন।

মারজোরির অনুরোধ আমি স্বীকার করে নিলুম। বলা বাহুল্য আমারও সুবিধা হয়ে গেল। একটি সঙ্গী পেয়ে গেলুম। ব্রেকফাস্ট সেরে ওকে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে চললুম মধ্য-প্যারিসের 'হ্যালে' (Halles) মার্কেটে। এই বিরাট বাজার সর্বপ্রকার খাদ্যসামগ্রী ও গৃহস্থালীর জিনিসপত্রে ভরা। অতি প্রাচীন কালে সাড়ে আটশ' বছর আগে এই বাজার ছিল খোলামেলা জায়গায়, এবং গ্রামের ফড়েরা, কসাই ও মেছুনিরা এখানে মাছ মাংস ফলফলাদি বেচে যেত। দর্জি, মুচি, নাপিত, ময়রা, কাঠুরে প্রভৃতি সম্প্রদায়ের লোকরা দোকান দিয়ে বসে থাকত। কিন্তু সেই অন্ধকারের যুগ এখন আর নেই। সেই যে রাজা ফিলিপ-অগাষ্টাস ১১৮৩ সালে এই সুবৃহৎ 'হ্যালে' মার্কেটের অট্টালিকা ও পাঁচিলঘেরা প্রশস্ত উঠোন বানিয়ে দিয়েছিলেন, সেই আটশ' বছর হতে চলল। ফ্রান্সের সকল স্থাপত্যই পুরনো কালের—দুশ' থেকে হাজার বছর আগেকার। প্রত্যহ-জীবনে ওরা কেবল নতুনকে খোঁজে। সাহিত্যে আন্‌কোরা টেক্‌-নিক, চিত্রাঙ্কনে কিম্ভূতকিমাকার ভঙ্গী, কাব্যে ইচ্ছাকৃত দুর্বোধ্যতা, উপন্যাসে বিরামচিহ্ন লোপ করে শুধু তাকে বর্ণনাত্মক করা, (narrating without punctuations), 'চরিত্রশূন্য' ছোট গল্প এবং তার বিচিত্র আঙ্গিক—এইসব নিয়ে ওদের নিত্য গবেষণা চলে। যাই হোক, আইভান ক্যাট্‌স্‌ আমাকে বলে দিয়েছিলেন আপনি যদি সাহিত্য সম্বন্ধে কিছু জানতে চান তাহলে আলবেয়ার ক্যামু-র (Albert Camus) এক বন্ধু মিঃ জর্জের সঙ্গে আলাপ করতে পারেন। আইভান ওঁর ঠিকানা দিয়েছিলেন। কিছুকাল আগে আল্‌বেয়ার ক্যামু একটি পথ-দুর্ঘটনায় মারা যান। তিনি নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন।

প্যারিসে এমন বহু সংখ্যক পথঘাট ও অলিগলি আছে, যেগুলি কানা, 'খোঁড়া', এবং অগম্য। ভাঙ্গা-ভাঙ্গা সরু ফুটপাথ, তার ধারে পরটা, চচ্চড়ি আর কাবাবের দোকান, যানবাহনের উচ্ছৃঙ্খল জটলার হুড়োহুড়ি, এখানে ওখানে ময়লা নর্দমা, ছেলেমেয়েদের হৈ-হল্লা, চলন্ত মোটরের থেকে কাদার ছিটে, চায়ের দোকানের আড্ডা, ওরই মধ্যে ফড়ে আর ফেরিওলা, পাগলকে ধরে তার পিছনে-পিছনে হাততালি আর রগড়, এবং তাদেরই ভিতর দিয়ে ছিপ্‌টি মেরে ঘোড়ার গাড়ি ছোটানো,—এসব দৃশ্য দেখে শান্ত ও কোমলস্বভাব মারজোরি হেসেই অস্থির। আমি তখন ভাবছিলুম, ইন্‌টেলেকচুয়াল প্যারিসের সঙ্গে ইন্‌টেলেকচুয়াল কলকাতার কোথায় কোথায় মিল ঘটেছে!

শ্রীমতী মারজোরির ক্লাস আরম্ভ হতে কয়েকদিন বাকি। কানাডায় থাকতেই সে য়্যাড্‌মিশন নিয়ে এসেছে। সে ধরে বসল, এখানে কোথায় ল্যাটিন কোয়াটার্স আছে, চলুন—সেখানে ঘুরে আসি।

বেলা তখন ১১টা। ল্যাটিন কোয়ার্টাস আমার আগে দেখা ছিল। সাধারণত আমি একই জায়গায় দুবার যাইনে। কিন্তু তরুণী তন্বী মেয়ের অনুরোধ এড়ানোও কঠিন। শ্রীমতী মারজোরির পোষাক পরিচ্ছদ, সাজগোছ, প্রসাধনের প্রতি আসক্তি, কিংবা কোনওরূপ বিশেষ ভাবভঙ্গী—এগুলির কোনটাই না থাকার জন্য আমার মনে একটু সম্ভ্রমবোধ জেগেছিল। তাকে নিয়ে একখানা ট্যাক্সি করে চললুম। কিন্তু পথ বেশি-দূর নয়। নোটার দাম ছাড়িয়ে সীন্‌ নদী পার হয়ে গাড়ি কতকটা এগোতেই আমরা একস্থলে নামলুম। ট্যাক্সিভাড়া দিতে গেল মারজোরি। আমি বললুম, খবরদার, পুরুষের ভ্যানিটি আহত হবে। আমিই দেবো।

মিষ্ট হেসে মেয়েটা চুপ করে গেল। হাঁটতে হাঁটতে এক সময় প্রশ্ন করলুম, দেশে তুমি কি করো, মারজোরি?

ইস্কুল-মাষ্টারি।

সে কি, এইটুকু বয়সে মাষ্টারি?

মারজোরি সহাস্যে বলল, বাঃ বয়স কি কম হয়েছে? পঁচিশ থেকে তিরিশের দিকে ছুটেছি!

থমকিয়ে এক জায়গায় ফুটপাথের ভিড়ের মধ্যে দাঁড়ালুম। একটি যুবক চকখড়ি দিয়ে ফুটপাথ ভরা মস্ত এক ছবি আঁকছে। পায়ে তার জুতো নেই, ছেঁড়া চটি এক পাশে রেখেছে। হাফশার্ট ময়লা, একটাও বোতাম নেই, চেহারাটায় সাবান পড়েনি বহুকাল, মাথাব চুল ঠিক পাগলের ঝাঁকড়া,—নিজের মনে সে উবু হয়ে ঘুরে-ঘুরে ওই চড়া রোদ্দুরে ছবি এঁকে চলেছে।

ভিড়ের মধ্যে এক বর্ষীয়সী মহিলাকে বোধ করি ভূতে পেয়েছিল। সুন্দর সৌখীন পোষাকপরা সেই মহিলা। তিনি ফরাসীতে সম্ভবত এই কথাই বললেন, তোমার ছবি আঁকা বড় সুন্দর হচ্ছে, ভাই।

ছেলেটা হঠাৎ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল। চোখ পাকিয়ে বোধ হয় এই কথাই বলল, ছবির কী বোঝেন আপনি? আপনার সুখ্যাতি পাবার জন্যে কি আঁকছি?

ওর ধমকটা যেন সকলেরই উদ্দেশে। মহিলাটি একেবারে কাঁচুমাচু। মারজোরি আমার হাতখানা টেনে বলল, চলুন এখান থেকে।

ল্যাটিন কোয়ার্টার্স বৃহত্তর প্যারিসেরই অঙ্গ। মূল প্যারিস নগর হিসাবে খুব বড় নয়। কিন্তু তিনদিকের পাহাড় ও উপত্যকার ফ্রেমের ভিতরে-ভিতরে অলক্ষ্যে অদৃশ্যে ছোট ছোট টুকরো জনপদ নিজের চেষ্টায় স্বাধীনভাবে গড়ে উঠেছে যুগে যুগে। কিন্তু ল্যাটিন কোয়ার্টার্স বোধ হয় ওদের মধ্যে বৃহত্তম। এখানেও ভূগর্ভপথে ট্রেন চলেছে, সেজন্য মাঝে মাঝে পায়ের তলায় গোঁ গোঁ শব্দ শুনছিলুম। এটা সুপ্রশস্ত রাজপথ। সারি সারি বড় দোকান। থরে থরে সাজানো খাদ্যসামগ্রী, অলঙ্কার, মনোহারি, কিউরিয়ো, এন্টিক, পোযাক, সব্জি-ফল-মাংস—অজস্রতায় সমস্ত পথ আকীর্ণ। মাঝে মাঝে একেকটি সিনেমার পটে যে সমস্ত অশ্লীল বিজ্ঞাপনের রঙ্গীন ছবি,—সেগুলির দিকে চোখ ফেরানো আপাতত অসুবিধাজনক! মারজোরিকে আমি অন্য-কথায় ব্যস্ত রাখার চেষ্টা পাচ্ছিলুম। কিন্তু এরই মধ্যে একদিন মধ্যরাত্রি পর্যন্ত বসে একখানি সিনেমাচিত্র দেখে গেছি,—সেটি এখনও চলছে ওখানে। ওই ছবিটি সম্প্রতি ফরাসীবিচারে সর্বাপেক্ষা প্রাধান্য (notoriety) লাভ করেছে। এটি দলবদ্ধ নগ্ন নরনারীর আদিমবৃত্তির রঙ্গলীলা। তারই বিভিন্ন ভঙ্গী ও বিচিত্র ক্রিয়াকলাপ।

হাঁটতে হাঁটতে আমরা অনেকটা ক্লান্ত হয়ে এক সময় একটি সরু গলিতে ঢুকলুম। বেলা প্রায় একটা বাজে। গলির মুখে দুতিনটে খাবারের দোকান, এবং এই সব দোকানে মধ্য এশিয় জিলাপী, কচুরি, বালুসাই বা গুড়ের মিষ্টান্ন যে সব উপকরণযোগে প্রস্তুত হয়, সেগুলি প্রায়শই একপ্রকার অখাদ্য। আমরা গলির ভিতরে অনেকটা গিয়ে ডানহাতি একটি ছোট রেস্তরাঁয় ঢুকে একটি টেবিল দখল করে বসলুম। মারজোরি বলল, এবার আমাকে কিছু খরচ করতে দিন?

আমি খুব হেসে উঠলুম।—বেশ ত', আমার পকেট যখন শূন্য হবে, তখন তোমাকে মানা করবনা।

সে আমার দিকে তাকালো। বলল, আমার কৃতজ্ঞতার ঋণও ত আছে! আপনাকে খাওয়াতেও ত ইচ্ছে করে!

আচ্ছা, তাহলে যখন হোটেলে ফিরবো, রাত্রে ডিনার খাইয়ো।—এই বলে ওকে নিরস্ত করলুম।

চিকেন সুপ, সব্জি সিদ্ধ, মাছ ভাজা ও ছোট একটি বান্—এই আমরা নিলুম। কিন্তু আমাদের কাছাকাছি একটি যুবকের দিকে আমার চোখ ছিল। ছেলেটি সুশ্রী, কিন্তু তার পা জামা ভরা কাদার ছিটে, পায়ে চটি, গায়ে অতি পুরনো একটা কোট, ভিতরে ছেঁড়া ময়লা গেঞ্জি। একখানা পেপারব্যাক বই খুলে এক মনে সে পড়ছে। সামনে তার এক পেয়ালা কফি রাখা। বোহেমিয়া প্রদেশের কথা আমি জানি। 'লা বোহেমি' নামক একটি সিনেমা ছবি বহুকাল আগে কলকাতায় দেখে মুগ্ধ হয়েছিলুম। যাদের চাল-চুলো নেই, হতভাগা হয়ে ঘুরে যারা জীবনের নৌকা কোথাও নোঙর করেনা, বিভিন্ন বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে ভাগ্যহত যারা পথে-বিপথে ঘুরে বেড়ায়, এককালে তাদেরকে বলা হত 'বোহেমিয়ান'। এই ছেলেটি তাদেরই একজন কিনা মনে-মনে ভাবছিলুম। ওর ওই একাগ্রমতি চেহারাটার দিকে চেয়ে কেমন যেন একটি সুদূর আত্মীয়তা বোধ করছিলুম।

আহারাদি সেরে আমরা বেরিয়ে এলুম। এই সরু পথটিতে আবার মেরামতি কাজ চলছে এবং একখানা খোয়ামাড়ানো এঞ্জিন রাস্তা পিষে-পিষে অগ্রসর হচ্ছে। আমরা ওটার পাশ কাটিয়ে ফিরে যাবার সময় দেখি, সারিবদ্ধ নতুন ও পুরনো বইয়ের কতকগুলি দোকান এবং প্রতি দোকানেই তরুণ বয়স্ক-পুরুষের জটলা ও কলরব। আমরা থমকিয়ে একটি দোকানের ভিতরে ঢুকলুম। ভিতরটা স্বল্পপরিসর, আলো জ্বলছে। মেয়ে ও ছেলে উভয় মিলে বেচাকেনা করছে। নতুন বই বা অমুক লেখকের সর্বশেষ বই বেরিয়েছে কিনা, অনেকে খোঁজ করছে। ওরই মধ্যে মজলিশ বসিয়েছে ছেলে আর মেয়ে। আন্দাজে বুঝলুম সাহিত্য নিয়ে তর্ক চলছে এবং অমুক-অমুক লেখক বা লেখিকাকে নস্যাৎ করে দিচ্ছে। একজন মাত্র ভাঙগা-ভাঙগা ইংরেজি বলছে, —বাঙগালী যেমন কয়লাওয়ালা বা বলদটানা গাড়িওয়ালাদের কাছে হিন্দি শিখে অন্যত্র বলতে থাকে, ঠিক তেমনি। ওই যুবকটিকে ধরে আমি বললুম, আমি পেপার-ব্যাক ইংরেজি এডিশনের কয়েকখানা বই কিনতে চাই।

যুবকটি আমার দিকে সোজা তাকালো,—কি বই?

বললুম, আনাতোল ফ্রাঁ, গুস্তাব ফ্লবেয়ার, হুগো—এঁদের যে কোনও বই।

ফস করে যুবকটি বলল, ওসব বাজে বই (rubbish) এ দোকানে থাকেনা।

তাহলে আলবেয়ার ক্যামুর বই একখানা দাও?

ক্যামু?—ছেলেটা হাসলো। বলল, যে সব লেখক প্রাইজ্ পায় তাদেরকে আমরা লেখকের সম্মান দিইনে। "We throw them into the dust-bin." যান ওই সীন্ নদীর ধারে, পুরনো বইয়ের দোকানে হয়ত পাবেন।

ছেলেটির এই ঔদ্ধত্য অনেকটা যেন আমাদের দুজনকে দোকান থেকে তাড়িয়ে দিল। বাইরে এসে মারজোরি একেবারে হেসেই খুন। আমি যেন পালিয়ে বাঁচলুম। ফরাসী যুবসম্প্রদায় যে গ্রন্থকীট, এবং কথায়-কথায় পুরনো সাহিত্যকে বর্জন করে কেবলই নতুনকে খোঁজে, এটি জানা ছিল। কোন লেখক বা লেখিকা যদি সরকারি স্বীকৃতি পায় বা ন্যাশন্যাল একাডেমির দ্বারা অভিনন্দিত হয় অথবা আন্তর্জাতিক

খ্যাতিলাভ করে—ওদের ধারণা সেই লেখক নষ্ট হয়ে গেল! ফরাসী পাঠকদের আত্মহারা মনোযোগ সম্বন্ধে একটি প্রচলিত কথা আছে ; "সীন্ নদীর ধারে পুরনো বইয়ের দোকানগুলোয় বসে যারা বই পড়ে এবং নদীর পাঁতায় বসে যারা একান্ত মনে মাছ ধরে, তারা প্যারিস নগরীর উপর বোমাবর্ষণ ঘটলেও চাঞ্চল্যবোধ করেনা।"

আমাদের একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল। আমরা ওখান থেকে 'মাদেলিন প্রাসাদ-পুরী' দেখতে গিয়েছিলুম। এটি প্রায় দুশ' বছর আগে তৈরি হয়। কিন্তু ১৮০৬ সালে সম্রাট নেপোলিয়নের একটি হুকুমজারির ফলে এটির পাথরের গায়ে একটি বাক্য উৎকীর্ণ করা হয়, "The Emperor Nepoleon to the Grand Army." তাঁর আমলে যাঁরা রণক্ষেত্রে প্রাণবিসর্জন দিয়েছেন সেই সব কর্ণেল ও জেনারেলদের নামও খোদিত। এই মাদেলিন প্রাসাদ পরে রাজা লুই-১৮র কালে গির্জায় পরিণত হয়। এরই ধার দিয়ে যে প্রশস্ত রাজপথটি চলে গেছে সোজা ব্যাষ্টিল অবধি, তার নাম হয়েছে লা গ্রান্ড বুলেভার্ডস। এই পথেই চারশ' বছর আগে ব্রিটিশ সেনাদলের আক্রমণের হাত থেকে প্যারিসকে রক্ষা করার জন্য সুদীর্ঘ ট্রেঞ্চ কাটা হয়েছিল। তার আগেই ব্রিটিশ সেনাদল নিকটবর্তী জনপদ পিকার্ডিকে ধূলিসাৎ করে।

আমরা যখন আর্ক দ্য ট্রেম্প-এর কাছাকাছি এসে পৌঁছলুম বেলা তখন প্রায় তিনটে বাজে। কিন্তু বর্ণাঢ্য পোষাকপরা ফরাসী পুলিশ আমাদের বাধা দিল। এ পথ বন্ধ। নেহরুর অভ্যর্থনা চলছে। পুলিশকে বললুম, আমি ভারতীয় এবং ইনি কানাডিয়ান। আমরা অভ্যর্থনাটা দেখতে এসেছি। পুলিস বলল, সাবওয়ের ভিতর দিয়ে ওপারে গিয়ে উঠুন।

সেই নির্জন ও স্বল্পান্ধকার সাবওয়ের ভূগর্ভপথ ধরে মারজোরি ও আমি অগ্রসর হলুম। কিন্তু মেয়ে সব দেশেই এক। ওই নির্জন ভূগর্ভ দেখে সে ভয়ে-ভয়ে, আমার হাত ধরল। সামান্যই পথ। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই আমরা উপরে উঠে এসে সামনেই দেখি, দুইধারের বিপুল সংখ্যক জনসমাবেশের শেষ প্রান্তে প্রেসিডেণ্ট দ্য গল, প্রধানমন্ত্রী নেহরু এবং অন্যান্য ফরাসী রাজপুরুষেরা। প্রেসিডেন্ট দীর্ঘকায় এবং বৃদ্ধ, তিনি অভিনন্দনজ্ঞাপক বক্তৃতা করছেন ফরাসীতে। মারজোরি নেহরুর দিকে তাকিয়ে উজ্জ্বল মুখে বলল, অবিকল ছবির মতন। ওটা কি ভারতীয় পোষাক ?

বললুম, হ্যাঁ, আচকান আর চুড়িদার।

কী সুন্দর দেখাচ্ছে।—বলে মারজোরি চুপ করে গেল।

বছর খানেক আগে ব্যারিষ্টার রণদেব চৌধুরী ও আমি পণ্ডিত নেহরুর সঙ্গে কথা বলতে গিয়েছিলুম অসমীয়া ও বাঙ্গালীর সমস্যা নিয়ে দিল্লীতে। "কলিকাতা নাগরিক সমিতি" আমাদের তিন চারজনকে পাঠিয়েছিলেন। ঘন্টাখানেক ধরে পণ্ডিতজী আমাদেরকে স্পষ্ট ভাষায় কয়েকটি কথা বলেছিলেন। আমাদের পক্ষে সেগুলি যথেষ্ট পরিমাণ আনন্দবর্ধক হয়নি। সেই কথাগুলি স্মরণ করে আমি মনে মনে হাসছিলুম। আমি তাকিয়েছিলুম দ্য গলের দিকে। ১৯৪০ সালে হিটলারের ফ্রান্স আক্রমণ এবং পতনের কালে জেনারেল দ্য গল লন্ডনে পালিয়ে যান এবং নানা ঘটনাচক্রের ভিতর দিয়ে প্রধানমন্ত্রী মিঃ চার্চিল ও দ্য গল হঠাৎ একদিন রাত্রে একটি নতুন রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠার সংবাদ ঘোষণা করেন। সেই নবপত্তনী রাষ্ট্রের নাম দেওয়া হয়, "ইউনাইটেড ষ্টেটস অফ গ্রেট ব্রিটেন এণ্ড ফ্রান্স।" কিন্তু পরে ফ্রান্সের পতন এবং

মিত্রশক্তির জয়লাভের পর এই যৌথরাষ্ট্রের অলীক কল্পনা শৃগালের যুক্তির মতো ভেঙ্গে পড়ে। জেনারেল দ্য গল ও মিঃ চার্চিলের মধ্যে মতবিভেদ, এমন কি মনান্তরও ঘটে। ইতিহাসের কোনও পর্বেই ব্রিটেন ও ফ্রান্সের মধ্যে বন্ধুত্ব দীর্ঘস্থায়ী হয়নি।

অভিনন্দনাদির উত্তরে সেদিন নেহরুজির প্রাণময় ভাষণ সকলকেই আনন্দিত করেছিল।

ওই বিরাট সমাবেশ এক সময়ে ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল। আমরা দুজনে যখন ফিরবার উদ্যোগ করছি, এমন সময় দেখি জনৈক তরুণ ও সুদর্শন ভারতীয় বিমান বাহিনীর নীলাভ পোষাকপরা অফিসার আমার দিকে চেয়ে হাসছেন। প্রথমটা বুঝতে পারিনি, শেষটায় অবাক। যুবকটি এবার কাছে এগিয়ে এল। মাথার ক্যাপটি নামিয়ে পরিষ্কার বাঙলায় বলল, আপনাকে আমি চিনি। আপনি না অমুক? ভাবতেই পারিনি আপনাকে এখানে দেখব। কবে এলেন? কোথায় উঠেছেন? আমার নাম এস-মুখার্জি। আমি ফ্লাইট-সার্জেন্ট। আজ এখানে ডিউটিতে ছিলুম।

বাঙালা ভাষা যেন ভুলে গেছি বহুদিন! যুবকটির নাম সমীর কিংবা সুধীর—এখন আর ঠিক মনে নেই। ওর সঙ্গে মারজোরির পরিচয় করিয়ে দেবামাত্রই মুখার্জি আমার সম্বন্ধে মারজোরিকে যে সমস্ত কথা শোনাতে আরম্ভ করলেন, সেগুলি একত্র করলে প্রশস্তি-প্রবন্ধ লেখা চলতো। যাই হোক, মুখার্জি ধরে বসলেন, আর কোথাও আমাদেরকে তিনি এক পাও যেতে দেবেন না। আমার বাসায় আপনাদের দুজনকে নিয়ে যাবো, চলুন। এই মাউন্ডের নিচেই রাস্তার ধারে আমি গাড়ি রেখেছি, আসুন—আসতেই হবে।

নান্য পন্থাঃ। আমাদের দুজনকে নিচে নামিয়ে এনে মুখার্জি তাঁর গাড়িতে তুললেন। আমাদের প্ল্যানের চাকাটা যেন ঘুরে গেল। অপ্রত্যাশিতের পথ ধরে এল নতুন এক বৈচিত্র্য। সংস্কৃতে বলে, তং তু দেশং ন পশ্যামি যত্র ভ্রাতা সহোদরঃ। কিন্তু এই অজানা দেশে সেদিন 'সহোদরকে' খুঁজে পেয়েছিলুম!

অনেকটা দূর পথ পেরিয়ে এসে মুখার্জি তাঁর বাড়ির সামনে গাড়ি থামালেন। সুশ্রী এবং হাসিখুশী মিসেস মুখার্জি এসে আমাদের দুজনকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে একতলায় তাঁদের ফ্ল্যাটে নিয়ে এলেন। উনি আমার বৌমা হয়ে উঠলেন এক মিনিটের মধ্যেই এবং মারজোরি ওর 'ছোট্ট বোনকে' পেয়ে উদ্দীপ্তা এবং বাঙ্ময়ী হয়ে উঠল। আমরা তিনজনে যখন গল্পগুজবে মেতে উঠলুম, মুখার্জি তখন এক-ফাঁকে বেরিয়ে গাড়ি নিয়ে বোধ করি বাজারের দিকে গেলেন। বৌমা বললেন, রাত্রে আপনাদের খেয়ে যেতেই হবে। কিন্তু কি খাবেন তাই বলুন।

মারজোরি বলে বসল, যে কোনও বাঙালী খাদ্য আমি সানন্দে খাব।

আমি বললুম, সাড়ম্বরে পাঁচ রকম রান্না রাঁধতে দেবো না, বৌমা। সব চেয়ে কম পরিশ্রমে খিচুড়ি তৈরি হোক, সব রকম সব্জি ওর মধ্যে থাক, সঙ্গে ডিম সিদ্ধ। মাছভাজা যদি পাই তবে সোনায় সোহাগা। যদি টমাটো-কিসমিসের চাটনি হয় ত' লাখ টাকা। বাজারে বোঁদে পাওয়া গেলে বলতুম ইয়োগার্ট (দই) আনো!

বৌমা হেসে কুটোকুটি। বললেন, দেখি না কি করা যায়।

উনি এক সময় চা, পাঁপর, ভাজা বাদাম ও কেক নিয়ে এসে পরম যত্নে খেতে দিলেন। মারজোরি বলল, শুভক্ষণে আজ রাত পুইয়েছিল! আপনাদের মতন এমন বন্ধু পাবো কখনই আশা করিনি।

মুখার্জি মাছ নিয়ে ফিরে এলেন। আমাদের গল্পের আসর জমে উঠল। মারজোরি বার বার আমার দিকে ফিরে বলতে লাগল, সারাদিন ধরে আপনি ছদ্মবেশে ছিলেন! এবার আপনার সত্যিকার পরিচয় পেয়ে—ইত্যাদি ইত্যাদি।

কী আত্মীয়তা সেদিন সকলের মধ্যে। ভুলে গেলুম আমরা কেউ কারও নয়, জেনে গেলুম বিদেশ বিভুঁইয়ের এই একান্ত আত্মীয়তা আজীবনের ছাপ রেখে গেল। মারজোরি যেন আমাদের একান্ত আপন হয়ে উঠেছিল মাত্র ৭।৮ ঘণ্টার মধ্যে। সেদিন রাত্রের সেই উপাদেয় ভুনি-খিচুড়ি, মাছভাজা, চাটনি এবং ক্ষীরের পায়স সে খেল প্রচুর পরিমাণে। সে সত্যই ক্ষুধার্ত ছিল। ওকে নিয়ে যখন মুখার্জি ও আমি আমাদের হোটেলে ফিরলুম, তখন প্রায় মধ্যরাত্রি। মুখার্জি আন্তরিক সম্ভাষণ জানিয়ে বিদায় নিলেন। ভিতরে ঢুকে দেখি, সকল দিক নিশ্চুপ, কেউ জেগে নেই। হোটেল-কর্মী মাদাম রুফাটি নিজের ঘরে ঘুমোচ্ছেন। সিঁড়ির আলোটা নিজের থেকেই নিবছে আর জ্বলছে। আমরা দুজনে দোতলায় উঠে এলুম। মৃদুগলায় মারজোরি বলল, য়্যাম ইন্‌ফিনিট্‌লি গ্রেটফুল টু ইউ!

আমি হাসিমুখে ওকে বিদায় ও শুভরাত্রি জানালুম। দুপা সিঁড়িতে উঠে মেয়েটা বলল, আমার দুর্ভাগ্য, আপনাকে ডিনার খাওয়াতে পারলুম না!

আমি বললুম, আমার আনন্দ, তুমি ভারতীয় ডিস খেয়ে খুশী হয়েছ। গুড নাইট।

মারজোরি তেতলায় উঠে গেল। আমি ঘরে ঢুকলুম।

পরদিন একটু বেলায় উঠেছিলুম। স্নানাদি সেরে পোষাকপত্র বদলিয়ে যখন নিচে নেমে এলুম, মাদাম রুফাটি আমার হাতে একখানি খোলা খাম দিলেন। ভিতরে একখানা ছোট কার্ড। ছাপা অক্ষরে লেখা 'মারজোরি ষ্টিউয়ার্ট। উইণ্ডসর স্কি ক্লাব।' কার্ডের পিছনে মারজোরি নিজের হাতে নাম ও দেশের ঠিকানা লিখেছে। তার সঙ্গে আরেকটি ছোট্ট কাগজে উপর দিকে লেখা, "Pray forget me not. Hotel Racine, 23 Rue Racine, Paris. Your Marjorie."

শুনলুম মারজোরি ভোরে উঠে হোটেল ছেড়ে চলে গেছে! মেয়েটা আমাকে তার ঠিকানা দিয়ে আমন্ত্রণ জানিয়ে গেল কিনা ঠিক বুঝতে পারলুম না।

আমার যাবার কথা আইভান ক্যাট্‌স্‌-এর ওখানে। উনি আমার সম্বন্ধে একটি সংবাদ পাঠিয়েছেন জনৈক মহিলার ওখানে। তাঁর নাম মিস ক্রিষ্টিন বসেনেক (Bossenec), তাঁর ঠিকানা হল ২ রুয়ে রেনুয়ার্ড (Raynouard), প্যারিস-১৬। এ মহিলা সুন্দর বাঙলা বলেন এবং লেখেন। ভারতীয় দূতাবাসের মিঃ পুষ্প দাসও এঁর কথা বলছিলেন। শুনলুম শ্রীমতী ক্রিষ্টিন রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি রচনা ফরাসীতে অনুবাদ ও প্রকাশ করেছেন।

সকালে ব্রেকফাষ্টের পর আমি বেরিয়ে পড়লুম।

॥ ২০ ॥

প্রিয়বরেষু,

যদি একথা বলি প্যারিস এবং তার শহরতলী মিলিয়ে এমন লাখখানেক অট্টালিকা রয়েছে যাদের দিকে তাকালে চোখ ফেরানো কঠিন, তাহলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। এদের মধ্যে বহু সহস্র মর্মরপ্রাসাদ—যাদের একটা অংশ শ্রেণীবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে প্যারিসের সর্বপ্রসিদ্ধ রাজপথ 'সাঁজ্ এলিজে'-র এপাশে ওপাশে। এদের নির্মাণ কৌশল কেবলমাত্র স্থপতিবিদ্যার উপর নির্ভর করেনি, এদের প্রতিটি নির্মাণের উপর যে ধরনের অলঙ্করণ ও আভরণ ভাস্কর্যের পরম সৌন্দর্যকে ধারণ করে রয়েছে সেটি বিস্ময়জনক। ফরাসীরা নিজেদের দেশ সম্বন্ধে খুবই আত্মাভিমানী। নিজেদের সাহিত্য, সংস্কৃতি এবং শিল্পকীর্তির ব্যাপারে বহু সময়েই তাদের কিছু দম্ভই প্রকাশ পায়, এবং তারা মনে করে ইউরোপে তাদের ভাষাই সর্বশ্রেষ্ঠ। তারা অনেকটা এইরূপ অভিমতই ব্যক্ত করে, যে-ব্যক্তি ফরাসী না শিখে ফ্রান্সে ভ্রমণ আসে, সে অর্বাচীন, সে আদর পাবার যোগ্য নয়। আমার নিজের একটি সামান্য অভিজ্ঞতার কথা বলি। আইভান ক্যাট্স্-এর অফিসের এক ব্যক্তির মারফৎ আমি একখানি চিঠি পাঠিয়েছিলুম বিশ্ববিশ্রুত গ্রন্থকার আঁদ্রে মরয়-এর (Andre Morois) কাছে। এঁর লেখার আমি বিশেষ অনুরাগী। ইনি ফরাসী এবং ইংরেজি—উভয় ভাষাতেই সমান সুদক্ষ। আমি তাঁকে লিখেছিলুম, ফরাসী ভাষা আমি জানিনে, কিন্তু আপনার সঙ্গে পাঁচ মিনিটের জন্য দেখা না করে ফ্রান্স ছেড়ে যেতে আমার মন উঠছে না। উনি সেই চিঠির জবাবে যে চিঠি আমাকে লেখেন, সেটি ফরাসী ভাষায়! চিঠিখানি পেয়ে আমি ক্ষুণ্ণ হই, এবং তাঁর ওখানে যাবার কল্পনা ত্যাগ করি। তাঁর আচরণ আমার মনঃপূত হয়নি। উনি তাঁর চিঠিতে কী লিখেছিলেন, সেটি অদ্যাবধি আমার কাছে অজ্ঞাত। একবার মনে হয়েছিল ওঁর চিঠি কারোকে দিয়ে পড়িয়ে আমি বাঙলা বা হিন্দিতে তার জবাব পাঠিয়ে দিই!

প্যারিস নামটির আদি ইতিহাস চিত্তাকর্ষক। দু' হাজার বছর আগে সীন্ নদীর ছোট একটি দ্বীপের নাম ছিল 'আইল্ দে লা সিটে।' সম্রাট জুলিয়াস সীজারের কালে এই দ্বীপটির নাম হয় 'লুটেটিয়া।' এখানে বাস করত 'পারিসি' নামক এক উপজাতি। রোমানরা এসে সীন্ নদীর তীরে একটি জনপদ নির্মাণ করে এবং লুটেটিয়ার বদলে নাম দেয় প্যারিস। অতঃপর চতুর্থ শতকে এক জার্মান (Garmanic) উপজাতি—যাদের নাম ছিল ফ্রাঙ্ক,—তারা এই জনপদকে আক্রমণ করে। দেশের নামকরণ করে 'ফ্রান্স' এবং প্যারিস তাদের প্রধান বাসস্থান হয়। ওই শতকেই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ হূন সর্দার এটিলা প্যারিসের উপর সাড়ে সাত লক্ষ হূনদের নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। প্যারিস জনপদ ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পায় একটি অসমসাহসিকা নারীর উপস্থিত বুদ্ধির প্রভাবে। এই তরুণী নারী ছিল ঈশ্বরবিশ্বাসী। পলায়মান জনপদবাসীদের মাঝখানে গিয়ে বোধ হয় এই কথাই

সে বলেছিল, কাপুরুষদের ঈশ্বরও বাঁচান না! তোমরা পালিয়ো না, ঈশ্বর তোমাদের রক্ষা করবেন।

এটিলা প্রমুখ হুনরা এসে জনপদের মধ্যে থমকিয়ে দাঁড়ালো, এদিক ওদিক তাকিয়ে দ্বিধাজড়িত হল, তারপর 'পারিসি' ত্যাগ করে নিজেদের পথে তারা চলে গেল!

মেয়েটির নাম জেনিভিয়েভ। সে জার্মান উপজাতির আক্রমণ কালেও ১১ খানা নৌকা নিয়ে শত্রুব্যূহের মধ্যে প্রবেশ করে এবং নৌকাগুলিতে খাদ্য বোঝাই করে চমকপ্রদভাবে ফিরে আসে। এই নারীর মৃত্যু ঘটে ৫১২ সালে এবং আজও এঁকে বলা হয় 'লেডি অফ দি ল্যাম্প'। এঁকে সমাধিস্থ করা হয় একটি পাহাড়ের চূড়াস্থলে। সেই গির্জাটির নাম দেওয়া হয়, মন্‌টেন্‌ স্টে, জেনিভিয়েভ। এরই সামনে সেদিন আমি দাঁড়িয়েছিলুম।

সীন্‌ নদীর ধারে সেই কাল থেকে ছোট দু'একটি দ্বীপ পরস্পর সংযুক্ত করে ধীরে ধীরে 'পারিসি' থেকে প্যারিস দাঁড়িয়ে উঠল, ইউরোপ বা ইংল্যাণ্ড তখন সভ্যতাবিহীন অন্ধকার যুগে পড়ে রয়েছে। যেদিন রোমান সাম্রাজ্য টুকরো-টুকরো হয়ে ভেঙ্গে পড়লো, তখন এই একমাত্র নগর প্যারিস তার বিদ্যা, জ্ঞান এবং সভ্যতার আলো বিকীর্ণ করেছিল সমগ্র ইউরোপে। অতঃপর এল গৌরব ও পুনরুজ্জীবনের (Renaissance) যুগ। প্যারিস হয়ে উঠল সমস্ত মহাদেশের শিল্পকলা, সাহিত্য, কাব্য, সঙ্গীত, স্থাপত্য, দর্শন, সংস্কৃতি ও বিজ্ঞান প্রভৃতির মধ্যমণি। এই প্যারিস থেকেই উদ্ভূত হয়েছিল সর্বপ্রকার রাজনীতিক আদর্শ—যেগুলি তৎকালীন পাশ্চাত্য দেশগুলিতে সামন্ততন্ত্র ও বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন রাজন্যশক্তিকে (Oligarchic) প্রথম গণ-তন্ত্রবাদের দিকে অনুপ্রাণিত করে। সভ্যতার প্রথম প্রারম্ভকাল গ্রীসদেশে, তারপর সেটি এগিয়ে আসে রোমে, রোম থেকে প্যারিসে এসে সেই সভ্যতা সগৌরব পরিণতি লাভ করে। আমি ইতিহাসের ছাত্র নই, আমার ধারণা আমি জ্ঞানভিক্ষু পর্যটকমাত্র। কিন্তু প্যারিস নগরের পাথরে, স্ফটিকের দেওয়ালে, সেণ্ট লুই গির্জায়, প্রতি হোটেলে, গ্রন্থে, চিত্রকর্মে, নদীতীরে, প্রাসাদে, কন্‌কর্ড অট্টালিকায়, প্রতি সমাধি ফলকে, প্রতি বইয়ের দোকানে, প্রতি পথের ধারে, প্রতি স্মৃতিসৌধ ইত্যাদিতে—ইতিহাসবিষয়ে যে শিক্ষা বা জ্ঞানলাভ করে যাচ্ছি, সে আমার পক্ষে অনেক। মিঃ এন এস ব্রাইনেল নামক এক প্রসিদ্ধ লেখক প্যারিসের বর্ণনা প্রসঙ্গে যে কয়েকটি কথা বলেছেন, সেগুলি আমি ভুলতে পারিনি ঃ "Paris, like France, has been through many ups and downs in history, through defeats and victories, invasions and occupations but, like France itself, Paris is indestructible. It survives and grows more beautiful with each generation. No army has ever conquered it. No occupation has ever left the shadow of an impression upon the people or the city. In two wars, bombers avoided the city partly through fear of world opinion and party through awe of a monument to the civilization which mothered all Europe and America."

প্যারিসে ছোটখাটো আর্টগ্যালারি অনেকগুলি। সর্বাধুনিক তরুণ শিল্পীরা নানাস্থলে নিজেদের আঁকা ছবি গুছিয়ে রাখে। অনেক সময় সেগুলি প্রদর্শনীতেও

দেখানো হয়। জগৎপ্রসিদ্ধ ফরাসী চিত্রশিল্পী পিকাসোর বহু ছবি এবং লৌহ-মূর্তিরচনার আয়তন মার্কিন দেশে ঘুরে ঘুরে আমি দেখেছি। কয়েকখানি ছাড়া অধিকাংশই আমার কাছে দুর্বোধ্য মনে হয়েছে। তাঁর চিত্রাঙ্কন এই শতাব্দীতে যুগান্তর এনেছে সবাই বলে। অনেকের বিশ্বাস, বিশ্বচিত্রকলায় এত বড় বৈপ্লবিক আইডিয়া আর কেউ আনেননি। কিন্তু আমার চিত্রবোধ অতদূর পৌঁছয়নি বলেই হিজিবিজি আঁকাকে আমি ছবি বলতে বাধা পাই। এই ধরনের ভাবনা আমার মনে ছিল বলেই আমি 'লা লুভ্ রে' বা লুভ্র চিত্রশালার সামনে এসে বহুক্ষণ দাঁড়িয়ে-ছিলুম।

সীন্ নদীর তীরবর্তী লুভ্ রে প্রাসাদ পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম চিত্রপ্রাসাদ—এটি সর্বত্র সুবিদিত। রাজা ফিলিপ-অগাষ্টাস ১২০০ সালে এটিকে দুর্গ হিসাবে নির্মাণ করেন প্যারিস নগরীর প্রতিরক্ষার কেন্দ্র হিসাবে। এখানে থাকতো রাজার রত্নসম্ভার, জাতীয় নথিপত্রাদি এবং এটি ছিল তাঁর অস্ত্রশালা। এর মতো সুদৃশ্য, মনোরম ও চিত্তাকর্ষক প্রাসাদ প্যারিসে তখন দ্বিতীয় ছিল না এবং আজও বোধ হয় নেই। রাজা ফিলিপ-অগাষ্টাস এর সৌন্দর্যের দিকে চেয়ে নিজেই এর নামকরণ করেন লুভ্র (L' oeuvre)। তাঁর পরবর্তীকালে এই লুভ্র দুর্গের উপর দিয়ে বহু শতাব্দীর যুদ্ধবিগ্রহ, বহু পরিবর্তন, হাতবদল, রাজশক্তির সংঘর্ষ, ভাঙ্গাগড়া—একে একে সব চলে যায়। লুভ্র প্রাসাদ একদা সর্বশূন্য হয়ে জনহীন প্রেতপুরীতে পরিণত হয়। ১৫০ বছর ধরে কেউ এই যক্ষপুরীর সন্ধান রাখেনি। অতঃপর ১৭শ' শতাব্দীতে আরেকবার এই বিরাট অট্টালিকা যখন জনশূন্য হয়ে থাকে, তখন আসে একদল ঘরছাড়া লক্ষ্মীছাড়া বোহেমিয়ান শিল্পী। তারা এই প্রাসাদ প্রাঙ্গনে তাঁবু খাটায়, ষ্টল খোলে, নোংরা ছড়ায়, মদের ও নাচের আড্ডা জমায়, কাঠের আগুনের ধোঁয়ায় অন্ধকার করে, ঝোপড়া ও ঝাঁপিঘর তৈরি করে। অবস্থা এমনই দাঁড়ায় যে, প্রাসাদটি ভেঙ্গে ফেললেই ভাল হয়। এমন সময় কর্তৃপক্ষ হস্তক্ষেপ করেন। কিন্তু সেই বোহেমিয়ানরা চতুর্দশ লুইয়ের রাজত্বকাল, ফরাসী বিপ্লব ও লুইয়ের হত্যাকাণ্ড অবধি এই লুভ্র দখল করে থাকে। কিন্ত ১৮৭১ সালের প্যারিস কমিউন প্রকাশের পর আবার এর উপর হামলা চলে। অতঃপর রিপাবলিক প্রতিষ্ঠার পর লুভ্রকে নতুন করে সজ্জিত করা হয় এবং নেপোলিয়ন এর সংস্কারকর্মে হাত দেন।

এই উত্থান-পতনের আদিকালে বাজা প্রথম ফ্রান্সিস ইতালীর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা-কালে সে দেশের ভাস্কর্য ও কলাশিল্পের প্রতি অনুরক্ত হয়ে বহুপ্রকার শিল্প-সামগ্রী সংগ্রহ করেন। তাদের মধ্যে বহু মূল্যবান চিত্রাঙ্কন, মর্মরমূর্তি, ধাতব শিল্প প্রভৃতি ছিল। অদ্যাবধি লুভ্র চিত্রশালার তালিকায় দুই লক্ষেরও বেশি সংগ্রহ রয়েছে।

লুভ্র প্রাসাদের ভিতরে ঢুকে আমি একে একে বিভিন্ন চিত্রশালাগুলি দেখে যাচ্ছিলুম। এই বিরাট গ্যালারিগুলির সংগ্রহসম্ভার একদিনে বা একমাসে শেষ করা যায় না। এখানে প্রতি দেশের শিল্পগ্যালারি প্রত্যেকটি পৃথকভাবে সাজানো। যেমন ধরো মিসরীয় সংগ্রহ, প্রাচ্যদেশের বিভিন্ন সংগ্রহ। এ ছাড়া রাফাএল, মাইকেল এনজেলো, বিভিন্ন ভেনাস, দা ভিঞ্চি, মূল ম্যাডোনার ছবি, গৌড়ীয় মূর্তি প্রভৃতি। তারপর গ্রীক ও রোমান ইতিহাসের বিভিন্ন চিত্র ও শিল্পসামগ্রী। এর পর রয়েছে

এপলো গ্যালারি—মধ্য ও পুনরুজ্জীবনের যুগ থেকে আধুনিক কাল। ওদের ছাড়িয়ে গেলে রেনোয়ার বিভিন্ন চিত্রকলা। তাদের সঙ্গে বড় বড় শিল্পীর আঁকা ছবি—যাদের নাম এভিগনন, ক্লুয়েৎ, লে নাইন, শামপেন, পুষিন, চার্ডিন, গ্রিউজ, মিলেট, কুর্বেট প্রভৃতি বহু শিল্পী। এদের পরে রয়েছে স্প্যানিশ, ফ্লেমিশ, ডাচ, জার্মান, ইংরেজ ও আমেরিকান। আমি যেন এক অপার্থিব কল্পলোকের পথে-পথে মোহাবিষ্টের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছিলুম।

যখন ক্লান্ত হয়ে বাইরে যাবার পথ খুঁজছি, তখন দেখি বড় একটি গ্যালারির মধ্যে অদূরে শাড়িপরা এক সুশ্রী মহিলা ও তাঁর পাশে একটি তরুণ যুবক—এঁরা আলাপ করছেন একজন ভারতীয় ও আরেকজন শ্বেতাঙ্গ ব্যক্তির সঙ্গে। কিন্তু ওই ভারতীয় বয়স্ক যুবক হঠাৎ আমাকে দেখে সচকিত হয়ে কাছে এসে বললেন, 'আমি বসু, শ্যামবাজারে আমার বাড়ি।' প্রথমেই বুঝলুম, এঁরা তিনজনই বাঙ্গালী এবং চতুর্থ ব্যক্তি ইংরেজ। কিন্তু বাধা দেওয়া সত্ত্বেও মহিলা আমাকে প্রণাম করে বললেন, আপনি আমার দাদার মতন!

আমার এই অপ্রত্যাশিত সঙ্গলাভ নিয়ে আলাপ করার কালে মিঃ বসু বললেন, ইনি হলেন ইলা ব্যানার্জি, প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী শঙ্করদাস ব্যানার্জি মহাশয়ের স্ত্রী, এবং এটি ওঁরই ছেলে শ্রীমান কালিদাস, ক্যামব্রিজে পড়ে। মাকে নিয়ে প্যারিস বেড়াতে এসেছে।

শ্রীমতী ইলা বললেন, দাদা, আপনাকে ছাড়বো না, আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকবেন।

জননীর সঙ্গে কালিদাসও যোগ দিল, এবং আমাকে নিয়ে একটি দল বেঁধে উঠল। ওঁরাও আমার মতো ঘণ্টা চারেক ধরে এই লুভ্‌র দেখে-দেখে অনেকটা ক্লান্ত। সুতরাং এক সময় আমরা সকলে বেরিয়ে পড়লুম এবং শ্বেতাঙ্গ ভদ্রলোকটি আলাপ-আলোচনা সেরে এক সময় বিদায় নিলেন। কালিদাস এবং বসুমহাশয় পথঘাট চেনেন, সুতরাং আমরা চারজন বাঙ্গালী 'সাঁজ্‌ এলিজের' রাজপথ ধরে একটি হোটেলের খোঁজে অগ্রসর হলুম।

সেদিন সারাক্ষণ আমরা সাঁজ্‌ এলিজে-র আশেপাশে পরিভ্রমণ করে সন্ধ্যার দিকে যখন ল্যাটিন কোয়ার্টার্সের পথ ধরলুম তখন মিঃ বসু একসময় বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

প্যারিসের ভূগর্ভজগৎ সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা ছিল না, তবে সিনেমায় নিয়ে গিয়ে আমার দুজন বন্ধু এর আগে আমাকে দু-একখানি নগ্ন নরনারী সম্বলিত ছবি দেখিয়েছিলেন। এগুলিকে অশ্লীল অথবা ঘৃণ্য বলতে আমার বাধে। সব নিয়েই জীবন। এ সকল বস্তুও জীবনের অঙ্গ, এবং ইংরেজিতেও বলে এগুলি "true facts of life". যারা এক একটি মহাদেশ জুড়ে আধুনিক সভ্যতা সৃষ্টি করেছে, বিজ্ঞানে ও আবিষ্কারে যারা বিশ্বজয়ী, দর্শন-সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ে আধুনিক জগতে যারা সর্বজনশ্রদ্ধেয়, তারা যদি নরনারীর আদিম বৃত্তি নিয়ে রস-রঙ্গে আনন্দ পায়,—আমি তার কড়া সমালোচক হতে যাব কোন্‌ অধিকারে? সুতরাং এগুলি সেই চিরন্তনকালের মানব মানবীর আদিম নিরাবরণ যৌনলীলার চিত্র সবাই নিঃশব্দে দেখে চলে যায়। ভারতও এর ব্যতিক্রম নয়, সেখানে বহু মন্দিরের পাথরে-পাথরে পুরাকালের ভাস্কর এইসব ছবি ধরে রেখে গেছেন!

শ্রীমতী ইলাদেবী এবং কালিদাস স্থির করলেন আগামী কাল সন্ধ্যায় আমরা তিনজনে প্যারিসের কয়েকটি নাইট-ক্লাব দেখব, এবং এর জন্য সম্পূর্ণ একটি রাত্রি ব্যয় করতে আমরা প্রস্তুত থাকব। ওঁরা জানতেন, কোন্ প্রতিষ্ঠানের গাড়ি এই ধরনের পরিদর্শনের দায়িত্ব নেয়। এর জন্য বিশেষ এক শ্রেণীর মোটরবাসের মালিকের কাছে মাথাপিছু ৭৫ ফরাসী টাকা আমরা জমা দিয়ে টিকিট কিনলুম। কথা রইল আমার হোটেলের কাছ থেকে আমাকে তুলে নেওয়া হবে।

পাশ্চাত্ত্য দেশের প্রায় প্রত্যেক শহরে—আমেরিকা ও পশ্চিম ইউরোপ ধরেই বলছি—দিনমানের কর্মচঞ্চল জীবনের সঙ্গে নৈশজীবনের মিল অনেক সময় খুঁজে পাওয়া যায় না। দিনের বেলায় নিজ নিজ কর্মকেন্দ্রে যাদেরকে মনে হয় রাশভারী, গম্ভীর, সংযতপ্রকৃতি ও কর্মনিষ্ঠ,—সেই তারাই সন্ধ্যার অবসরকালে হয়ে ওঠে হাস্যরসপ্রিয়। কৌতুকে, আমোদে, মজলিশে, নাচে-গানে-পানাহারে—তারা অনেক সময়ে প্রমত্ত হয়ে ওঠে। লক্ষ্য করেছি প্যারিসের গৃহস্থ মধ্যবিত্ত অতি ভদ্র, বিনয়ী এবং মিষ্টস্বভাব, এবং সব দেশের মতো এরাও শান্তিপ্রিয়। আপন আপন পারিবারিক জীবন নিয়ে এরা ঘরকন্না গুছিয়ে থাকে, ছেলেমেয়েদেরকে উত্তমরূপে মানুষ করার চেষ্টা পায়, স্ত্রীপুত্রকে নিয়ে শান্তিতে সংসারযাত্রা নির্বাহ করে। বাইরে থেকে যারা ক'দিনের জন্য প্যারিস ঘুরে গিয়ে নানা উদ্ভট কথা রটনা করতে থাকে, তারা ফরাসী জাতির প্রতি খুবই অবিচার করে। এরই মধ্যে ইংরেজিজানা বহু ভদ্রব্যক্তির সঙ্গে আলাপ করে আনন্দ পেয়েছিলুম। বিশেষ করে আলবেয়ার ক্যামুর সেই ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও লেখক মসিয়েঁ জর্জের কথাবার্তা আমার খুবই ভাল লেগেছিল। ঠিক এই ধরনের আনন্দ পেয়েছিলুম লন্ডনে ইংরেজ ঔপন্যাসিক মিঃ উইলিয়ম কুপারের সঙ্গে আলাপ করে। ইনি হ্যারি হফ—এই ছদ্মনামে পরিচিত। আমরা উপন্যাসের আধুনিক উপাদান নিয়ে আলোচনায় বসেছিলুম এবং কুপার কথা প্রসঙ্গে ডি-এইচ-লরেন্স-এর 'লেডি চ্যাটার্লিজ লাভার' উপন্যাসটির প্রচুর নিন্দাবাদ করেছিলেন। জানি, এক-ময়রা অন্য ময়রার কচুরি ভাল বলে না! বোধ হয় ওঁরই সঙ্গে গিয়েছিলুম হে-মার্কেট থিয়েটারে "দি স্কুল ফর স্ক্যান্ডাল" নামক একখানি সামাজিক বিদ্রূপাত্মক নাটকের অভিনয় দেখতে। এমন "জীবন্ত" এবং হাস্যরস-সমন্বিত নাটক এর আগে আর দেখিনি।

আমরা টুরিষ্ট বাসে চড়ে সন্ধ্যার দিকে রওনা হলুম। সেই গাড়ি কোথা থেকে কোন্ পথ দিয়ে যাচ্ছিল সেটি আমার জানার কথা নয়। কিন্তু পথে-পথে বর্ণবাহার আলোকচ্ছটার ভিতর দিয়ে এই পরম ঐশ্বর্যশালী প্যারিস নগরীর মনোরম দৃশ্যাবলী দেখতে দেখতে যাচ্ছিলুম যেন এক স্বপ্নরাজ্যের ভিতর দিয়ে। এক সময় সেই গাড়ি সহসা এমন একটি সঙ্কীর্ণ প্রায়ান্ধকার গলিপথে ঢুকল, যে-পল্লীটি সুপ্রাচীন যুগের একটা ইতিহাসকে ধরে রয়েছে। পথটির দুই দিকে একই ধরনের অতি উচ্চ ইমারৎ গায়ে-গায়ে ঠাসা,—যেখানে দিনের রোদ বা রাত্রির জ্যোৎস্না, কোনটাই দেখা যায় না। গলিটা হয়ত বা মাইল দুই লম্বা,—কিন্তু কোথাও কোনও ফাঁক বা অবকাশ নেই। যদি কোনও খুনী ডাকাত এই স্বল্পালোকিত পথটি ধরে পালাবার চেষ্টা পায়, তবে তাকে সোজাই দৌড়তে হবে—গা ঢাকা দেবার ফাঁক কোথাও নেই। শুনলুম এই পল্লীর এই একেকটি নীরেট বাড়ি ছয়শ' বা সাতশ' বছর আগে নির্মাণ করা হয়েছিল। এমন নিশ্ছিদ্র ও নিরন্ধ্র জনবসতি এর আগে দেখিনি।

একস্থলে এসে গাড়ি দাঁড়াল ছমছমে অন্ধকারে। কালিদাস এবং তার মা সোৎসাহে নামলেন। পিছনে-পিছনে আমি। শুনলুম ফরাসী ভাষায় এই ক্লাবটির নাম 'নির্বুদ্ধিতা' (Folly)। এটি তরুণ-তরুণীদের দ্বারা পরিচালিত। এরা শিক্ষিত ও ভদ্র। ক্লাবটি করেছে তারা নিজেদের চেষ্টায়। পরে শুনেছি এরা কেউ-কেউ কলেজের ছাত্র বা ছাত্রী। দিনমানে এদের অনেকে আপিসে কাজ করে। একটু পরে টিমটিমে আলোয় একজন জিম্‌নাষ্ট-এর নির্দেশ অনুযায়ী নাচ আরম্ভ করল। মেয়েদের গায়ে কোনও প্রকার আবরণ নেই, কিন্তু কটিতট থেকে একপ্রকার জরির আবরণে নিচের দিকটা ঢাকা,—অনেকটা মাছের মতো। এটির নাম 'মারমেড' ডান্স্‌। সমুদ্রের গভীর গর্ভ থেকে উঠে আসছে পাতালবাসিনী এক অর্ধনগ্না নারী,—যার দুই চোখে অপার্থিব এক সৌন্দর্যের স্বপ্নমদিরতা, এবং যার এলায়িত ও আলুলায়িত দেহভঙ্গী এক অবাস্তব মোহ সৃষ্টি করে। স্তব্ধ ও বিস্ময়াভিভূত হয়ে আমি সেই দিকে চেয়েছিলুম।

আধঘণ্টা পরে যখন বেরিয়ে এসে গাড়িতে উঠলুম রাত তখন দশটা বাজে। এরপর আমরা যাই সীন্‌ নদীর তীরে একটি সরাইখানায় (French tavern)। অনেকে সেটাকে বলে 'ক্যাবারে' (Cabaret)। সেখানে বহু তরুণ-তরুণীর বিচিত্র নাচ ও গান চলছিল। গাত্রবর্ণের সঙ্গে রং মিলিয়ে যে টাইট্‌ পাজামা মেয়েরা পরে এবং যে ভঙ্গীতে নরনারী পরস্পর জড়িতভাবে নাচে, ভারতীয় চক্ষু ওতে কিছু সঙ্কোচ বোধ করে বৈকি। দর্শক যাঁরা, তাঁদের প্রায় সকলেরই চক্ষু মাদকপ্রভাবে মদির, কিন্তু চাঞ্চল্য বা মত্ততা কোথাও দেখছিনে। বহু সম্ভ্রান্ত সমাজের মহিলারাও ওখানে উপস্থিত ছিলেন।

রাত্রের দিকে ঠিক ঠাহর করতে পারা যায় না, এই 'নাইট ক্লাবগুলি' ল্যাটিন কোয়াটার্সের অন্তর্ভুক্ত কিনা। তবে যত শিল্পী, লেখক, কবি, ভাস্কর, নৃত্য-শিল্পী, চিত্রাভিনেতা এবং হুজুগপ্রিয় ব্যক্তিদের বসবাস হল এই ল্যাটিন কোয়াটার্সে। এখানকার নৈশ জীবনের ক্রিয়াকলাপ দেখে যাবার জন্য পৃথিবীর সকল দেশ থেকে পর্যটকরা এসে পৌঁছয়। এখানে আমরা আহারাদি সেরে নিলুম।

অতঃপর আমরা যে নাইট ক্লাবে এসে পৌঁছলুম, সেটি ফ্রান্স তথা প্যারিসের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। এটির নাম 'লিডো' (Ledo)। একটি সুন্দর অট্টালিকার তলার দিককার 'বেসমেণ্ট' (basement) বা ভূগর্ভে অতি বিশাল একটি হলে নৃত্যানুষ্ঠান হয়ে থাকে। ইউরোপের বহু শহরে এবং লণ্ডনপ্রমুখ যুক্তরাজ্যের অনেকগুলি নগরের নানাস্থলে এইপ্রকার বেসমেণ্ট নাইট ক্লাব পরিচালিত হয়। এটি বিশেষ কোথাও নিন্দনীয় নয়। রাজপুরুষ, রাজনীতিক নেতা, শিক্ষাবিদ, ব্যবসায়ী, উচ্চ-পদস্থ ব্যক্তি, অভিজাত বা ধনবতী মহিলা, নববিবাহিত দম্পতি, পেনসনপ্রাপ্ত বৃদ্ধ বা ঠাকুমারা,—নাইট ক্লাবে সকল সমাজের মানুষ আসে। পথের উপর থেকে আমরা যখন সিঁড়ি ধরে নেমে এসে প্রবেশপথে ঢুকছি, আমার মনে হচ্ছিল এটি রাজবাড়ির তোরণ। এ যেন চারদিকে অলঙ্করণে এবং চারুকলার বিচিত্র সম্পদে ঝলমল করছে। ভিতরের আসনগুলি স্বর্ণমণ্ডিত রক্তনীল মখমলে তৈরি। দেওয়ালের এখানে ওখানে চিত্রাঙ্কন। জ্যাজ্‌বাদ্যের জন্য পৃথক পরিবেশ। চতুর্দিকে বহু মূল্যবান স্ক্রীন। মনে হচ্ছিল এই প্রথম যেন ইন্দ্রসভায় প্রবেশ করেছি। আমার বাঁদিকে বসল তরুণ যুবক ও মধুরপ্রকৃতি শ্রীমান্‌ কালিদাস এবং ডানদিকে সোৎসাহে

বসলেন ইলাদেবী। আমার মধ্যে কিছু আড়ষ্টতা ছিল। বোধ হয় সেই কারণেই মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হচ্ছিলুম। সৌন্দর্য-সভার এই আনন্দময় পরিবেশ শ্রীমতী ইলাকে উদ্দীপ্ত করেছিল।

গান নয়,—মিউজিক্, যন্ত্রবাদন। তান, লয়, মান সম্বলিত একপ্রকার গুরুবাদ্য—যার প্রথমদিক কিছু মিহি, এবং স্তরে-স্তরে যেটির থেকে একপ্রকার নাদ নির্গত হয়—যে-ধ্বনি তোমার শিরায়-শিরায় সঞ্চালিত হয়ে বিচিত্র শিহরণ আনে এবং বক্ষোরক্তকে চঞ্চল করে তোলে। সেই প্রকার অবস্থায় ভিতর থেকে নৃত্যপরা নগ্ন-দেহা সুন্দরীরা যখন আবির্ভূতা হয়, তখন সমগ্র বিরাট নাটমঞ্চকে মনে হয় এক অপরূপ সৌন্দর্যভরা অপ্সরালোক। এই অনৈসর্গিক পরিবেশের ভিতরে নিঃশব্দে এই ক্লাবের যারা কিঙ্কর তারা প্রায় প্রতি দর্শকের পায়ের কাছে রেখে যাচ্ছিল শামপেন-এর এক একটি পিতলের বালতি। ওর ঠাণ্ডা জলের মধ্যে ডোবানো রয়েছে দু'তিনটি করে বোতল। যার যে পরিমাণ ইচ্ছা, শুধু পান করে যায়! ফুরিয়ে গেলে আবার দেবে, বার বার দেবে। বলা বাহুল্য, ফ্রান্সের একটি জনপদের নাম শামপেন্ (Champagne), এবং এই স্বচ্ছ পানীয়টি সেই জনপদেই প্রথম উৎপন্ন হয়। এই সুস্বাদু মদ্য ধনী ও অভিজাত মহলেই চলে, এবং এটি খুবই মূল্যবান। শোনা যায়, এই মদ্যপানের পর গায়ে হাওয়া যত লাগে, ততই বেশি এর প্রভাব বৃদ্ধি পায়।

সামনে ওই অপ্সরালোকের শত শত প্রায়-নগ্না নারীর রোমাঞ্চকর নৃত্যভঙ্গী ও লাস্যলীলা যাঁরা নিমেষনিহত চক্ষে দেখছেন তাঁদের কণ্ঠ থেকে মাঝে মাঝে এক-প্রকার চাপা স্বর স্ফুরিত হচ্ছিল। সেটি লক্ষ্য করে আমি দর্শকদের দিকে চেয়ে দেখি, সুন্দরী রমণীগণের ওই যৌবনচঞ্চল দেহকান্তি মহিলা-দর্শকদেরকেও মাঝে মধ্যে চঞ্চল করে তুলেছিল। বিশেষ করে নর্তকীদের মধ্যে যে-মেয়েটি সর্বাপেক্ষা সুশ্রী ও সুঠাম, সে যখন দর্শকদের কাছাকাছি এগিয়ে মঞ্চের উপরে দাঁড়িয়ে তার কালো মিহি-মসলিনের আবরণটির টিপ-বোতামগুলি একটি একটি করে খুলে আপন সম্পূর্ণ দেহশ্রীকে প্রকাশ করল, তখন শামপেন প্রভাবিতা ও মদিরেক্ষণা কয়েকটি সুবেশা মহিলা আপন আপন রোমাঞ্চ-চাঞ্চল্যকে সংযত রাখতে পারলেন না! মনে হচ্ছিল, সেই রাত্রে সমগ্র 'লিডো' শামপেনের স্রোতে ভাসমান ছিল।

রাত্রিশেষে যখন হোটেলের কাছে আমাকে নামিয়ে দিয়ে গেল, তখন উষাকালের বিদেশী জ্যোৎস্না প্রত্যুষের আভায় কিছু নিষ্প্রভ হয়ে এসেছে।

আমার প্যারিস ছেড়ে যাবার সময় হয়েছিল। শ্রীমান্ কালিদাস তার জননীকে নিয়ে প্যারিস ভ্রমণে এসেছিল। সে আবার ফিরে যাচ্ছে ক্যামব্রিজে। শ্রীমতী ইলাদেবী জুরিখ ও রোম হয়ে বাড়ি ফিরবেন, সুতরাং তিনি ও আমি যাব সুইৎজারল্যাণ্ডে। অতএব আমরা তিনজনেই ওরলি বিমানঘাঁটির দিকে মধ্যাহ্নের আগেই গিয়ে পেঁছিলুম। আমাদের বিমানটি আগে ছাড়বে। মায়ের কাছে এক-সময় কালিদাস হাসিমুখে বিদায় নিল। সে তার জননীর জ্যেষ্ঠপুত্র। তাকে দেখার জন্যই ইলাদেবী বিলাতে গিয়েছিলেন। এমন উদার, বুদ্ধিমতী, সুশিক্ষিতা এবং আধুনিক মনোভাবসম্পন্না মহিলা আমি কমই দেখেছি।

যাই হোক, ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আমরা সুইৎজারল্যাণ্ডের অন্যতম প্রধান শহরে এসে নামলুম। আমাদের অর্থসঙ্গতি যথেষ্ট ছিল না। কিন্তু ইলাদেবী সর্বদিক

ভেবেচিন্তে এবং জিজ্ঞেসপড়া করে আমাকে সঙ্গে নিয়ে একখানা ১১ নং ট্রামে উঠলেন এবং সুন্দর জুরিখ শহরের ভিতর দিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা ফ্রেজার স্ট্রাসে এসে একস্থলে নামলুম। যে-হোটেলটিতে আমরা উঠব সেটি কাছেই। হোটেলটির নাম 'আল্‌ফ্রেডো'। জনৈক মিষ্টভাষিণী এবং বর্ষীয়সী মহিলা এই হোটেলের কর্ত্রী এবং তিনি দোতলায় আমাদের জন্য একটি 'সুইট' বন্দোবস্ত করে দিলেন। সর্বত্রই যেমন, এখানেও তেমনি 'বেড ও ব্রেকফাষ্ট'—এই হল সর্ত। সুইটটিতে একটি শোবার ঘর এবং তার বাইরে একটি এণ্টিরুম। শ্রীমতী ইলা নিলেন সম্পূর্ণ আসবাবসজ্জিত ঘরটি, আমি বাইরের বিছানাটি দখল করলুম।

জুরিখ শহর একটি উপত্যকা প্রদেশ। কিন্তু এটি রমনীয় হয়ে উঠেছে কেবল নীলাভ পাহাড়গুলির জন্যই নয়, এই শহরের দীর্ঘ সুবিস্তৃত জলাশয় একে যেন চিত্রবৎ করে রেখেছে। ইউরোপের বহু রাষ্ট্র সুইৎজারল্যাণ্ডকে চারিদিক থেকে ঘিরে রয়েছে। এর পশ্চিমে ফ্রান্স, উত্তরে জার্মানি, পূর্বে অষ্ট্রিয়া এবং দক্ষিণে ইতালী। অষ্ট্রিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া, হাঙ্গারি—এরাও তাই। এরা 'অবরোধের' মধ্যে বাস করে। এই কারণে এরা প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে চট করে বিবাদ বাধায় না। বিশেষ করে সুইৎজারল্যাণ্ড কখনই কোনও বিশ্বযুদ্ধে লিপ্ত হয়নি, সে চিরদিন নিরপেক্ষ এবং সেই কারণে সে সকলেরই প্রিয়। অমন যে হিটলার, যাঁর দাপটে ইউরোপ ছিল কম্পমান, এবং যিনি প্রায় সমগ্র ইউরোপ জয় করেছিলেন, তিনিও সুইৎজারল্যাণ্ডের গায়ে হাত দেননি। সুইৎজারল্যাণ্ড শান্ত, নম্র এবং শান্তিবাদী। তার ওই ছোট্ট দেশটি ঐশ্বর্য, সম্পদ, খাদ্য প্রভৃতিতে চিরদিন স্বনির্ভর। সে তিনটি ভাষা—ফরাসী, জার্মান ও ইংরেজি—এই তিনটিকেই সে রাষ্ট্রভাষার পদমর্যাদা দিয়ে রেখেছে। আন্তর্জাতিক রাজনীতি নিয়ে সে মাথা ঘামায় না।

মধ্য ইউরোপের অন্তর্গত এই আল্‌পস্‌ পর্বতমালায় আকীর্ণ সুইৎজারল্যাণ্ডে বড় বড় জলাশয়গুলিকে 'সী' (See) বলা হয়। যেমন জুরিখ সী, বিলার সী, থুনার সী, ব্রিয়েনজার সী, জুগার সী ইত্যাদি। জুরিখ নগরীর দক্ষিণে এই অতি দীর্ঘ জলাশয়টিকে ধরে মনোরম নগর গড়ে উঠেছে সর্বপ্রকার আধুনিক সজ্জা নিয়ে। তারই প্রধান একটি রাজপথ 'বান হফ ষ্ট্রাসে' ধরে শ্রীমতী ইলার সঙ্গে পরিভ্রমণে বেরিয়েছিলুম। বিদেশের প্রত্যেকটি দর্শনীয় সামগ্রীর প্রতি তাঁর ঔৎসুক্য আমাকে আনন্দ দিচ্ছিল। অন্যদিকে নিজের পারিবারিক জীবনসম্বন্ধে তাঁর আলাপচারীর মধ্য দিয়ে তাঁর সদ্বিবেচনা ও দাক্ষিণ্যের পরিচয় পাচ্ছিলুম। তাঁর সংস্কারমুক্ত আধুনিক মন ও চিন্তাধারা আমাকে অনুপ্রাণিত করেছিল এবং তাঁর মুখে স্বামীর আলোচনা শুনে শঙ্করদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সম্বন্ধে আমি শ্রদ্ধাশীল হয়েছিলুম।

জুরিখ নগর, তার সৌন্দর্য ও শোভা, তার হাটবাজার এবং তার বিভিন্ন পল্লীর আনন্দদায়ক দৃশ্য দেখতে দেখতে আমাদের প্রায় দুদিন কেটে গেল। উনি যাবেন রোমে, আমাকে যেতে হবে ফ্রাঙ্কফার্টে। অর্থাৎ উনি যাবেন দক্ষিণপথে, আমি যাব উত্তরে। সুতরাং জুরিখ বিমানঘাঁটিতে এসে শ্রীমতী ইলাকে সাদর বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে আমি আমার নিজের পথ ধরলুম।

'ফ্র্যাঙ্কফার্ট মেইন' বিমানঘাঁটিতে নেমে কোনদিকে যেন থৈ পাচ্ছিলুম না, তবু কয়েক মিনিটের মধ্যে এই বিশাল বিমানঘাঁটির বিভিন্ন করিডর এবং একটির পর

একটি গেট পেরিয়ে একসময়ে এসে আমি 'প্যানাম' বা প্যান-আমেরিকান প্লেনটি ধরলুম। বিগত বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে আন্তর্জাতিক চুক্তি অনুসারে একমাত্র আমেরিকান বিমান কেবল পশ্চিম বার্লিন আনাগোনা করার অধিকার রক্ষা করে এসেছে। সবাই জানে, পূর্ব জার্মানির অন্তর্গত বার্লিন নগরী তখন দুইভাগে বিভক্ত হয়ে পশ্চিম বার্লিন মিত্রশক্তির হাতে আসে। আমেরিকা, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স এবং পশ্চিম জার্মানির কর্তৃপক্ষ এই পশ্চিম বার্লিনের সীমানাকে চারটি সেক্টরে ভাগ করে নেয়। কিন্তু এই নগরে পৌঁছতে গেলে পূর্ব জার্মানির ভিতর দিয়ে না এসে উপায় নেই। কিন্তু পূর্ব-জার্মানির কমিউনিষ্ট কর্তৃপক্ষ সকল পথ অবরোধ করায় ১৯৪৮ সালে পশ্চিম বার্লিনে খাদ্যের অভাবে প্রবল দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। বোধ হয় পূর্ব-জার্মানির কর্তৃপক্ষ এটি চেয়েছিলেন, অন্নবস্ত্রের অভাবে তাঁদের কাছে পশ্চিম বার্লিন আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হবে! যুক্তরাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষ সেটি হতে দেননি। তাঁরা অবস্থা বুঝে সেই কালে প্রতি ১০ মিনিট অন্তর একটি করে খাদ্যবোঝাই বিমান ফ্র্যাঙ্কফার্ট থেকে পশ্চিম বার্লিনে পাঠাতে থাকেন সেই সম্পূর্ণ বছরে। এই শতাব্দীর ইউরোপের সর্বনাশা দানব হিটলারের সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছে সোভিয়েট ইউনিয়ন, ফ্রান্স, ইংল্যান্ড এবং আমেরিকা। বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকাল থেকে আমেরিকার অবদান ইতিহাসপ্রসিদ্ধ।

পশ্চিম বার্লিনের বিমানঘাঁটিতে যখন এসে নামলুম তখন মধ্যাহ্নকাল উত্তীর্ণ। ফ্র্যাঙ্কফার্ট থেকে পূর্ব-জার্মানির আকাশপথ দিয়ে এখানে এসে নামতে প্রায় ঘণ্টা-খানেক লাগল। পশ্চিম জার্মান গভর্নমেন্টের ইণ্টারন্যাশিয়নেস বিভাগের থেকে আমাকে আমন্ত্রণ করে আনা হয়েছে। ব্যাগ নিয়ে বেরোতেই সামনে এক সুশ্রী যুবতী মহিলা এগিয়ে এসে আমাকে হাসিমুখে অভ্যর্থনা করলেন। ভিড়ের মধ্যে তখন একমাত্র ভারতীয় আমি প্লেন থেকে নেমেছি, সুতরাং আমাকে চিনে বার করতে তাঁর অসুবিধা হয়নি। এখানে পাসপোর্টের ব্যাপারে বাধা-নিষেধ বা 'স্ক্রুটিনি' বলে কিছু নেই এবং এ ব্যাপারে পৃথিবীর কোনও দেশে আমাকে কোনওদিন বেগ পেতে হয়নি। আমেরিকা, ইংল্যান্ড, ইউরোপ, সোভিয়েট ইউনিয়ন,—কোথাও না। আমি ভারতীয়, এবং পৃথিবীর সকল দেশে আমি বন্ধু খুঁজে পাই—এই আমার পরিচয়।

বড় একখানা গাড়িতে আমাকে তুলে নিয়ে মহিলাটি চললেন। ড্রাইভ করছিলেন অন্য ব্যক্তি। পিছনের সীটে পাশে বসে মহিলা বললেন, আমাদের ওয়েষ্ট বার্লিনের চারিদিকে এখন 'লোহিত সমুদ্র' অর্থাৎ আমাদের বেরোবার পথ নেই, এটি পূর্ব জার্মানির মধ্যে। আপনার কেমন লাগে?

আমি খুব হেসে উঠলুম। বললুম, আমাদের চোখে জার্মান জাতি অনেক বড়। তাদের গৌরবের ইতিহাস দু' হাজার বছরের। তাদের ক্ষাত্রশক্তি চিরদিন জগৎপ্রসিদ্ধ। সাহিত্যে, দর্শনে, বিজ্ঞানে, কারিগরী বিদ্যায় তারা অতুলনীয়। এখন দুই জার্মানি। দুই সহোদরের মধ্যে মতপার্থক্যহেতু উভয়ে আলাদা। হোক না আলাদা! এদিকে বাপের বাড়ি, ওদিকে শ্বশুরবাড়ি। এদিকে মামা, ওদিকে কাকা। ওদিকে ভাই, এদিকে বোন। আসল কথা হল পারস্পরিক ভালবাসা।

অনেকটা দূর পথ অতিক্রম করে আমরা এক প্রাসাদোপম অট্টালিকার সামনে এসে নামলুম। এটি হোটেল, নাম 'কেমপিন্স্কি।' ভিতরে চারিদিক সম্পদশোভায় যেন ঝলমল করছে। পশ্চিম বার্লিনে এই হোটেলটি নাকি সর্বাপেক্ষা অভিজাত

ও ব্যয়বহুল। দোতলায় আমাকে যে বড় ঘরটি দেওয়া হল সেটি আমেরিকান বা ব্রিটিশ হোটেলের তুলনায় কোনও অংশে কম নয়। আমার ঘরটির সঙ্গে একটি এণ্টিরুম। স্নানাগার ঘরেরই সংলগ্ন। ঘরটিতে আমার সামগ্রীপত্র গুছিয়ে রেখে এল এক সুসজ্জিত হোটেল বয়। আমি আবার ঘরের চাবিটি নিয়ে নিচে এসে রিসেপ্সনে জমা দিলুম।

মহিলা অতক্ষণ অপেক্ষা করছিলেন। এবার এগিয়ে এসে বললেন, আমার পোষাকী নাম বেশ গুরুগম্ভীর। আপনি আমাকে 'মেরিয়া' বলবেন। আসুন, আপনাকে নিয়ে যাব 'জার্মান ইন্ষ্টিটিউট অফ ডেভেলপিং কান্ট্রিজে', শহরের সেণ্টার থেকে একটু দূরে। ওখানেই আপনার লাঞ্চ হবে।

মাইল পনেরো পথ। কিন্তু ওর মধ্যেই দেখে নিচ্ছিলুম নগরের একেকটি সুবৃহৎ নবনির্মাণ। পূর্ববার্লিন অপেক্ষা পশ্চিম বার্লিন আয়তনে বড়। সামগ্রিক পরিধি বোধ করি প্রায় তিনশ' বর্গকিলোমিটার, কিন্তু তার মধ্যে অধিকাংশটা পড়েছে পশ্চিম বার্লিনের ভাগে। পথঘাট এবং বড় বড় নবনির্মিত অট্টালিকা দেখে এখন সহজে আর বুঝবার যো নেই যে, এই বিশাল নগরী গত বিশ্বযুদ্ধে ভয়াবহভাবে সোভিয়েট ইউনিয়ন ও মিত্রশক্তির দ্বারা বোমাবিধ্বস্ত হয়েছিল। শুধু মাঝে মাঝে চোখে পড়ছিল ঘনবসতির এখানে ওখানে বোমাবর্ষণের ফলে বাড়িঘর এখনও ভগ্নস্তূপে পরিণত রয়েছে। বলা বাহুল্য, সমগ্র পশ্চিম জার্মানি আমেরিকার নিকট হাজার-হাজার কোটি ডলারের সাহায্যলাভ করে আবার নতুন করে দাঁড়িয়ে উঠেছে। এই সাহায্যলাভ ঘটেছিল আমেরিকার 'মার্শাল প্ল্যানের' কল্যাণে।

যেখানে এসে পেঁছিলুম, সেটি মস্ত এক সুসজ্জিত ফুলবাগানঘেরা অট্টালিকা, যার বৃক্ষবহুল পরিবেশ অতি মনোরম। সামনেই দেখা যাচ্ছে বিশাল এক সরোবর। ভিতরে গিয়ে দেখি কয়েকজন বিদেশী অতিথিও এসেছেন। পৃথিবীর বহু দেশের সঙ্গে এঁরা সাংস্কৃতিক ও অর্থনীতিক যোগাযোগ স্থাপন করেন। এঁদের সৌজন্য ও শোভন ব্যবহার মাত্র পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমাকে অভিভূত করল। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এঁদের প্রচুর অনুরাগ লক্ষ্য করলুম। বিভিন্ন বিভাগগুলি আমাকে দেখানো হচ্ছিল। এই বৃহৎ এবং পৃথিবীখ্যাত প্রতিষ্ঠানের পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন জার্মানমন্ত্রীদল এবং সেনেটারগণ। এটিকে বলা হয় 'মাদার হাউস', কারণ এইটিকে কেন্দ্র করে বহু বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি হয়েছে। এই শিক্ষাকেন্দ্রে বহু এশিয়ান, আফ্রিকান ও জার্মান পরিচালকরা প্রাথমিক বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েন। এঁদের সঙ্গে 'ইউনেসকোর' যোগ খুবই ঘনিষ্ঠ।

মধ্যাহ্নভোজের পর আমার হাতে একটি প্রোগ্রাম এল। আমি অপরাহ্ণের দিকে শ্রীমতী মেরিয়ার সঙ্গে বেরিয়ে পড়লুম। দু ঘণ্টার মধ্যে আমাকে যেতে হবে তিন জায়গায়। তিনটিই কাল্চারাল্ সেণ্টার। প্রথমটি নৃত্যগীতের। কিন্তু আমার পথটি ছিল অধিকতরো আকর্ষণীয়। একসময় আমি বললুম, মেরিয়া, আমি খুশী হই যদি পথে-পথে তোমাদের পুনর্গঠনের চেহারাটা দেখতে পাই। আমার প্রধান আকর্ষণ বার্লিনকে দেখা, প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরে করলেও চলবে।

মেরিয়া খুশী মুখেই বলল, তবে চলুন, আপনাকে খানিকক্ষণ এখানে ওখানে ঘুরিয়ে হোটেলে ছেড়ে দেবো। রাত্রে আপনাকে এক বিশেষ ডিনারে বসতে হবে।

কিন্তু আমি যে জার্মান ভাষা জানিনে!

ওতে কোনও অসুবিধে হবে না।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানকালে সমগ্র জার্মান জাতি দেশব্যাপী ধ্বংসস্তূপের মধ্যে লুটিয়ে পড়ে। অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, চিকিৎসা, নাগরিক জীবনযাত্রা, শিক্ষা ও সংস্কৃতির সকল কেন্দ্র ছারখার হয়ে যায়। বিশ্ববিদ্যালয়, স্কুল, গির্জা, যাদুঘর, থিয়েটার, রেডিয়ো ষ্টেশন—আগাগোড়া সমস্তই নিশ্চিহ্ন হয়। হিটলারের আমলে সংবাদপত্রাদি, সর্বপ্রকার শিক্ষার ধারা, সাহিত্য-কাব্য-চিত্র ও শিল্পকলাদি, নৃত্যগীত বা রঙ্গমঞ্চাদি,—সমস্ত সেই সর্ববিধ্বংসী 'ন্যাশন্যাল সোস্যালিজম'-এর মন্ত্রের দ্বারা দীক্ষিত হয়। জার্মান জাতির চিন্তা, বুদ্ধি, ও বিবেকের স্বাধীনতা সম্পূর্ণ লোপ পায়। নাৎসী দর্শন চালু হবার ফলে ইউরোপের এই শ্রেষ্ঠ জাতির প্রকৃতি ও চরিত্রের আমূল পরিবর্তন ঘটতে থাকে। যাঁরা এই ব্যবস্থাপনার সঙ্গে মন মেলাতে পারেননি, সেই সব কৃতবিদ্য ব্যক্তি জার্মানি ত্যাগ করে দেশবিদেশে পালিয়ে যান। কমবেশি ২৫০ জন বিশিষ্ট লেখক, কবি ও শিল্পী দেশ ছেড়ে যান। পাঁচ হাজার ব্যক্তি আত্মহত্যা করেন। বড় বড় পণ্ডিত ও মনীষী যাঁরা অবস্থার দায়ে হিটলারকে সমর্থন করেছিলেন, যুদ্ধের পরে তাঁরা গ্রেপ্তার হন।

মেরিয়ার কথা শুনতে শুনতে আমি এ-পথ ও-পথ ঘুরছিলুম।

হিটলার মেয়েদের দিয়ে যুদ্ধের কালে বিশেষ কাজকর্ম কিছু করাননি। কিন্তু যুদ্ধের কালে মোট ১ কোটি লোকের মৃত্যুসংখ্যার মধ্যে কেবল জার্মানদের প্রাত্যহিক মৃত্যুসংখ্যা দাঁড়ায় ২৫০০ জন। এই যুদ্ধের মোটামুটি হিসাবে দেখা যায়, ৩ কোটি নাগরিকের মৃত্যু ঘটে, ৩॥ কোটি জখম হয়, ৩০ লক্ষ মানুষ হয় নিখোঁজ। যাই হোক, এই সব কারণে জার্মানিতে পুরুষ অপেক্ষা এখন মেয়েদের সংখ্যা বেশি।

দেখে যাচ্ছিলুম নবনির্মিত বিরাট ফেস্‌টিভাল্ হল্, প্লাস্টিক প্রডাকসন কনট্রোল ষ্টেশন, ফিলহারমনিক হল্, বড় বড় অট্টালিকা ও জনপ্রতিষ্ঠান, বিশ্ব-বিদ্যালয় ও সংস্কৃতি কেন্দ্র। এগুলি সমস্তই নতুন এবং এগুলির নক্সা অতীব চিত্তাকর্ষক। একথা একবারও ভুলিনি, আমি এসেছি নীট্‌শে, সোপেনহয়র, গ্যেটে, ম্যাক্সমুলার, আইনষ্টিন, অটো হান্, টমাস মান প্রভৃতি বিশ্বজয়ী প্রতিভাধরদের দেশে। একথা ভুলিনি কার্ল মার্কস বা এঞ্জেলের জন্ম এই দেশেই এবং এই দেশেই সোস্যালিষ্ট মূল আদর্শ ও পৃথিবীর নূতন এক সভ্যতার জন্ম। কে না জানে এই শতাব্দীর নবতন সভ্যতার জনক মহামতি লেনিনের গুরুবাড়ি হল জার্মানি। সবাই জানে, যে-আমেরিকা আজ বিজ্ঞানে ও কারিগরী বিদ্যায় পৃথিবীর শীর্ষস্থানীয়, তার অধিকাংশ সাফল্য ঘটেছে আমেরিকান-জার্মানদের কৃতিত্বের গুণে। অমন যে আনবিক শক্তির প্রথম বিস্ফোরণ ঘটেছে যাঁর প্রতিভাবলে, সেই অটো হান্ হলেন বিশ্ববিশ্রুত জার্মান রাসায়নিক ও পদার্থবিদ্। সাহিত্যে, বিজ্ঞানে, দর্শনে, নতুন-নতুন আবিষ্কারে, ওষোধি উদ্ভাবনে- অসংখ্য জার্মান মনীষী নোবেল পুরস্কার পেয়ে এসেছেন।

মেরিয়া আমাকে দেখালো সেই স্থলটি যেখানে হিটলারের নির্দেশে জার্মানীর সকল কালের কাব্য, সাহিত্য, উপন্যাস, দর্শন, চিত্রকলা, ধর্মগ্রন্থাদি—সমস্তই অগ্নি-সৎকার করা হয়। এই কাজ যাঁরা করেন তাঁরা ছিলেন তৎকালের নাৎসীদল প্রভাবিত অধ্যাপক ও ছাত্রসমাজ।

হিটলার ক্ষমতায় আসার (১৯৩৩) আগে যখন তাঁর ন্যাশন্যাল সোস্যালিজম

নিয়ে প্রবল প্রচারকার্যে নেমেছিলেন তখন জগৎপ্রসিদ্ধ জার্মান লেখক শ্রদ্ধেয় টমাস মান একটি সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন। বার্লিনের বীটোফেন্ (Beethoven) হলে দাঁড়িয়ে তিনি বলেন, "Is that German? Is fanaticism, indiscretion that casts all proportions aside, the orgiastic denial of reasons, human dignity, and a spiritual attitude really at home in the inmost depths of the German soul?..Would not the courage of the German, of whom mankind carries in its heart a picture of recitude, moderation and intellectual honesty, be more appropriate than the beserk desperation, the fanaticism, which today wishes to represent German and German alone?"

তখন ইউরোপে এবং বিশেষ করে জার্মানিতে চরম অর্থনীতিক সংকটকাল চলছিল। সেই সংকটকালের দেশজোড়া নৈরাশ্য এবং অসন্তোষের মধ্যে হিটলারের মতো অদূরদর্শী, স্বৈরাচারী, হিতাহিতজ্ঞানশূন্য এবং অন্ধজাতিয়তাবাদী উন্মাদ নেতা ক্ষমতালাভ করেন। দিগ্বিজয়ী সম্রাট নেপোলিয়ন এখনও অনেকটা শ্রদ্ধালাভ করেন বটে, কিন্তু বর্তমান পৃথিবীর ইতিহাসে হিটলারের মতো এমন ঘৃণ্য আর কেউ হননি। এই সর্বনাশা দানব এয়ার-রেইড-শেল্টারের তলায় ৩০ এপ্রিল ১৯৪৫ তারিখে আত্মহত্যা করেন। সেই 'মাউন্ড'-এর সামনে গিয়ে আমি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েছিলুম।

ফরাসীদের মতো প্রবল আত্মাভিমান বার্লিনে এসে দেখতে পাচ্ছিনে। এক দেশ থেকে অন্যদেশে যখন এগিয়ে যাচ্ছি তখন স্বভাবতই পরস্পরের মধ্যে তুলনামূলক সমালোচনা মনে আসে। জার্মান বিজ্ঞান-প্রতিভার খ্যাতি জগৎজোড়া, সেই তুলনায় ফরাসীর খ্যাতি কম। ফরাসীরা বন্ধুত্ব পাতায় মানুষ বুঝে, কিন্তু জার্মানি তার উদার আতিথেয়তার দরজা সর্বত্র খুলে রাখে। ক্ষাত্র-শক্তির সঙ্গে বিদ্যা ও পাণ্ডিত্য, বিজ্ঞানের সঙ্গে মানবতাবাদ, দর্শনের সঙ্গে সাহিত্য ও সংস্কৃতি—এরা জার্মান ইতিহাসকে শ্রদ্ধেয় করে রেখেছে চিরকাল। ফরাসীরা নিজেদের সাহিত্য, শিল্প বা চারুকলা নিয়ে নিজেদের গণ্ডী সীমাবদ্ধ রেখেছে, কিন্তু জার্মানি তা করেনি। সে তার সমস্ত উদ্ভাবনী বৃত্তিকে ছড়িয়ে দিয়ে চলেছে প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে শত শত বছর ধরে। ভারতবর্ষের কাব্য সাহিত্য পুরাণ সংস্কৃতি দর্শন অধ্যাত্মবাদ প্রভৃতির সম্বন্ধে তার যে ঔৎসুক্য এবং জিজ্ঞাসা, তার যে অনুরাগ ও শ্রদ্ধা,—তার বয়স দু'শ বছরেরও বেশি। লর্ড ক্লাইভ যখন ভারত লুণ্ঠনে ব্যস্ত, জার্মানি তখন শ্রদ্ধার সঙ্গে ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতি ও অধ্যাত্মবাদ নিয়ে মাথা ঘামাতে বসেছে। সমগ্র ইউরোপে জার্মান বীর্যবত্তা অতুলনীয়। আজ যখন ইউরোপে ও ব্রিটেনে বহু ক্ষেত্রে নিয়মানুগত্য ও শৃঙ্খলা-বোধের অভাবে সমাজজীবন জীর্ণ হতে বসেছে তখন জার্মানিতে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে কর্মকঠোরতা, নবজীবন রচনার আহবে কোটি কোটি মানুষের প্রতিবেদন,—এবং সেই সূত্রে তারা ডাক দিচ্ছে পৃথিবীর সকল দেশকে। আমেরিকার জর্জ মার্শালের প্ল্যান এবং আমেরিকান ডলার যেমন সে একহাতে নিয়ে নূতন জার্মানিকে গড়ে তুলেছে, অন্য হাতে তেমনি আমেরিকাকে বিজ্ঞান ও কারিগরীবিদ্যায় জগতের শীর্ষ-স্থানীয় করে তোলার চেষ্টা পেয়েছে। জার্মান ইহুদী বা এরিয়ান—যেই হোক,

তাদের প্রতি আমেরিকার শ্রদ্ধাশীল মনোভাব স্বচক্ষেই দেখে এলুম। ফরাসী বা ইংরেজ সেখানে দ্বিতীয় পর্যায় পড়ে। কানাডাতেও দেখেছি একই প্রকার। নির্মাণ-শিল্পে ও বিজ্ঞান-প্রবর্তনে জার্মানদের জুড়ি সেখানে খুঁজে পাওয়া ভার।

সেদিনকার নৈশভোজে অনেকেই জড়ো হয়েছিলেন। অধ্যাপক, শিক্ষাবিদ, সাহিত্যকর্মী, এবং দু' একজন অবাঙ্গালী ভারতীয় সেই ভোজে যোগদান করেছেন। আমার একপাশে বসেছিলেন একজন মহিলা—যিনি ইন্ডো-জার্মান সোসায়েটির এক অধিনায়িকা, অন্যপাশে বসেছিলেন এক প্রসিদ্ধ সুদর্শন সাংবাদিক—যিনি সরকারি প্রেস এসোসিয়েশনের ডাইরেক্টর। তাঁর নাম কার্ল ক্রাচমার (Karl Kratschmer)। উনি একজন বিশিষ্ট লেখক এবং নাট্যকার। ওঁর মিষ্ট ভাষণ ও সৌজন্যের ফলে ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে ঘন বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়। উনি এখানকার দু'খানি সংবাদপত্রের বিশেষ বিশেষ স্থলে প্রকাশিত আমার ছবি ও রাইট্-আপ্ দেখান্, এবং ইংরেজি অনুবাদ করে শোনান। অতঃপর ক্রাচমার বলেন, কাল সকাল থেকে আমি ও মেরিয়া ভাগাভাগি করে আপনার দায়িত্ব নেবো। বার্লিনের জীবন আপনি দেখবেন। তবে কোন কোনও জায়গায় হয়ত মেরিয়ার সঙ্গে আপনি যেতে চাইবেন না রাত্রের দিকে। —এই বলে তিনি নিজেই উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলেন।

আমি ক্লান্ত ছিলুম। আহারাদির পর আন্দাজ রাত ১১টায় দোতলায় উঠলুম।

॥ ২১ ॥

প্রিয়বরেষু,

বিশ্বযুদ্ধের পরে বার্লিনের ইতিহাস কারও অজানা নয়। কিন্তু বার্লিনের অবস্থানস্থলটি পূর্ব জার্মানিরও পূর্বদিকে। ১৯৪৫ সালের প্রথম দিকে মিত্র-শক্তির সেনাদল এগিয়ে আসে পশ্চিম থেকে এবং সোভিয়েট সেনাদল এগিয়ে যায় পূর্বদিক থেকে। সোভিয়েট ইউনিয়ন সম্পর্কে ইঙ্গ-মার্কিন মনোবৃত্তির কথা সকলেই জানে। কিন্তু সোভিয়েট ইউনিয়ন, পোল্যান্ড, হাঙ্গারী, চেকোস্লোভাকিয়া প্রভৃতি এরা নাৎসীদের হাতে প্রহার এবং উৎপীড়ন সহ্য করে সর্বাপেক্ষা বেশি। যাই হোক, মিত্রশক্তির সুপ্রীম কমান্ডার আইসেনহাওয়ারের কাছে জার্মানির পক্ষ থেকে এডমিরাল ডোনিৎজ্ আত্মসমর্পণ ও পরাজয় স্বীকার করেন রেম্স নামক জনপদে (মে ৭, ১৯৪৫) এবং তার পরদিন ডোনিৎজ্ বার্লিনে গিয়ে সোভিয়েট সেনাপতির নিকটও পরাজয় মেনে নেন। পরবর্তীকালে বার্লিন ৪ ভাগে বিভক্ত হয়। এককেটি ভাগ নেন আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স ও সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ। বলা বাহুল্য স্টালিন তখন জীবিত। স্বাভাবিক এবং যুক্তিসঙ্গত কারণেই স্টালিন অতি কঠোর সর্তাদি এবং নির্দয় ব্যবস্থাপনা জার্মানির উপর আরোপ করতে বাধ্য হন।

সেদিন সকালবেলা এই শক্তিচতুষ্টয়ের এক একটি সেক্টর পরিদর্শন করার জন্য শ্রীমতী মেরিয়া ওরফে মিসেস একলিন উইভের সঙ্গে বেরিয়ে পড়েছিলুম। আমাদের সঙ্গে ছিলেন সুভাষচন্দ্র বসুর ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান প্রদীপ বসু, স্বর্গত সাংবাদিক এবং আমার বিশেষ বন্ধু কৃষ্ণলাল শ্রীধরনীর স্ত্রী শ্রীমতী সুন্দরী। প্রদীপ হলেন

একজন সমাজতন্ত্রবাদী মিষ্টপ্রকৃতি যুবা। সুন্দরী হলেন নৃত্যশিল্পের গুণগ্রাহিকা। আমরা প্রথমেই গেলুম ব্রান্‌ডেনবার্গ গেটের সম্মুখে। এখানে এক জটিল ও গোলাকার কাঁটাতারের বেড়ায় আমাদের পথ আকীর্ণ। এই বেড়ার পিছন দিকে একটি ৬ ফুট উঁচু পাঁচিল পাথরের স্তর সাজিয়ে তোলা হয়েছে। এই পাঁচিলটি নির্মাণ করা হয় একরাত্রির মধ্যে। সেই তারিখটি ১৩ অগাষ্ট। এটি নির্মাণ করেন পূর্ব বার্লিনের পক্ষে সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ। ঠিক মনে পড়ছে না পাঁচিলটি কত মাইল লম্বা, তবে এটি সমগ্র বার্লিন নগরকে দুভাগে ভাগ করেছে। শক্তিচতুষ্টয়ের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া থাকা সত্ত্বেও কমিউনিষ্ট পূর্ব বার্লিনের সোভিয়েট কর্তৃপক্ষকে বাকি তিনটি গণতন্ত্রী রাষ্ট্র বিশ্বাস করে না। প্রাচীর নির্মাণের প্রধান উদ্দেশ্য, পূর্ব বার্লিন থেকে যারা পশ্চিম বার্লিনে সদাসর্বদা পালিয়ে আসছিল, তাদের পথ অবরোধ করা। পূর্বাংশের প্রতিটি লুক্কায়িত ঘাঁটিতে সোভিয়েট বা কমিউনিষ্ট জার্মান পাহারার দল রাইফেল উঁচিয়ে দিবারাত্র প্রস্তুত রয়েছে। পলায়নের চেষ্টা মানেই অবশ্যম্ভাবী অপমৃত্যু।

চারিদিকে চেয়ে দেখছিলুম সর্বব্যাপী শ্বাসরোধী ঘৃণা, অশ্রদ্ধা, অবিশ্বাস এবং উৎকণ্ঠিত অনিশ্চয়তা। মনে হচ্ছিল এই জগৎবরেণ্য জার্মান জাতির মৃত্যু ঘটে গেছে এই বার্লিনে, এবং আমরা তার প্রেতভূমির মধ্যে বিচরণ করছিলুম। কিন্তু তখনও ভাবিনি, অধিকতর বীভৎস দৃশ্য আমাদের দেখে যেতে হবে।

এই পাথরের পাঁচিলটাকে পশ্চিম বার্লিনে বলা হয় "কলঙ্কের প্রাচীর" (wall of infamy)। কিন্তু যুগান্তের ঐতিহাসিকরা বলবেন, এই কলঙ্কের মূলীভূত কারণ স্বয়ং হিটলার। আমার সোভিয়েট ইউনিয়ন ভ্রমণকালে দেখে এসেছি, হিটলারের অতর্কিত আক্রমণের (২১ জুন, ১৯৪১) ফলে সমগ্র পূর্ব ও দক্ষিণ সোভিয়েট ইউনিয়ন তিন বছরের জন্য নাৎসীদের কবলে আসে এবং তৎকালীন ২০ কোটি সোভিয়েট নরনারীর মধ্যে ৮ কোটি সংখ্যক লোক হিটলারের ক্রীতদাসে পরিণত হয়। তাদের উপরে যে জঘন্য এবং অমানুষিক উৎপীড়ন চলে, তার দ্বিতীয় উদাহরণ পাওয়া যায় একমাত্র আমেরিকায়,—যে দেশে বিগত তিনশ' বছরের মধ্যে ইউরোপের দুর্ধর্ষ শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়রা—যারা ছিল অধিকাংশ এ্যাংলো-সাক্‌সন—তারা গিয়ে রেড ইণ্ডিয়ান বা আমেরিকান আদিবাসীদেরকে কি প্রকারে নির্মূল (exterminate) করে। ("Bridging the continent" : by Martin Hillman, Aldus Books, London. "Custer died for your sins" : by Vine Deloria Jr., Avon Books, New York, N. Y.)

ফ্রান্স ও ব্রিটেনের দুটি সেক্‌টরের আশেপাশে কর্মতৎপরতা অপেক্ষাকৃত কম। হাজারে হাজারে মানুষ—যারা কমিউনিষ্ট শাসন বা সমাজব্যবস্থা মানতে চায় না,—তারা গোপনে পালিয়ে আসে পূর্ব বার্লিন থেকে। প্রায় ৫ লক্ষ লোক পালিয়ে আসার পর এই পাঁচিল উঠেছে। সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ পূর্ব জার্মানি তথা পূর্ব বার্লিনে ৩ লক্ষ সৈন্য মোতায়েন রেখেছেন—এটি আমার শোনা কথা। তাঁদের বিশ্বাস, পশ্চিম জার্মানি তথা পশ্চিম বার্লিনে নাৎসী আদর্শ এখনও গোপনে কাজ করে যাচ্ছে। আমরা এখানে ওখানে ঘুরে আমেরিকান সেক্‌টরের মধ্যস্থলে যেখানে এসে দাঁড়ালুম সেখানে পথের দু'পাশে জনতার দল ভিড় করে দাঁড়িয়ে পাঁচিলের ওপারের দিকে উৎসুক হয়ে তাকাচ্ছে। সামনে বিরাট এক প্রাসাদসম অট্টালিকার

তলায় এক সুবিশাল তোরণদ্বার,—যার উচ্চতা ৩০।৪০ ফুট হতে পারে। এই গেটটির নাম "চেক্‌পয়েন্ট চার্লি"। ওপারে পাঁচিলের গায়ে বুঝি এক মস্ত সমাধি-ক্ষেত্র। বড় বড় শ্রেণীবদ্ধ অট্টালিকা—এপার ওপারের ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে। এই সব অট্টালিকার সদর দরজাগুলি পড়েছে পূর্ব বার্লিনে, কিন্তু জানলাগুলি পড়েছে পশ্চিম বার্লিনে। এই জানলাগুলির ভিতর থেকে লাফ দিয়ে নিচের তলায় পড়ে যারা পশ্চিমদিকে পালাতে চেয়েছিল, তারা ওই ফুটপাথের উপরেই হাড়পাঁজরা বা মাথা ভেঙেগ মরেছে। তাদের মৃত্যুস্থলগুলি পুষ্পমাল্যের দ্বারা চিহ্নিত রয়েছে।

সমগ্র পরিবেশটি শোকাবহ। এপারের মানুষ নিরুপায়, ওপারের মানুষ অসহায়। ঠিক এই পরিস্থিতি দেখেছিলুম বাঙলায়—র‍্যাডক্লিফের কল্যাণে যখন পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব পাকিস্তানের জন্ম ঘটে। শয়নকক্ষ পড়েছে পশ্চিমবঙ্গে এবং রান্নাঘরটি পড়েছে পূর্ববঙ্গে। কিন্তু এদেশে এই ধরণের দয়ামায়াহীন নিষ্ঠুরতার খেলা সেখানে ছিল না। এখানে পিতামাতা, ভাই বোন, স্বামীস্ত্রী—সবাই পরস্পরের থেকে চিরকালের জন্য বিচ্ছিন্ন। এমন কোনও সরকারি ব্যবস্থা নেই যাতে সমস্ত জীবনের মধ্যে অন্তত একটিবারের জন্যও উভয়পক্ষের দেখাসাক্ষাৎ হতে পারে। সুতরাং সেখানে মৃত্যুবরণই শ্রেয়। কিন্তু এটি খোঁজখবর নিয়ে জেনেছি, পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে যাবার পক্ষে কোনও নিষেধ নেই। প্রবেশ নিষেধ ঘটছে অপর দিক থেকে। ছাড়পত্র বা ভিসার কোনও ব্যবস্থা নেই বার্লিনে।

"চেক্‌পয়েন্ট চার্লির" কাছেই পশ্চিম বার্লিন এলাকার মধ্যেই রয়েছে একটি রাশিয়ান ওয়ার মেমোরিয়াল অট্টালিকা। ওটিকে পাহারা দিচ্ছে দুজন সশস্ত্র রুশ সৈন্য। শুনলুম এর আগে কমিউনিষ্ট জার্মান পাহারা ছিল। কিন্তু সে পালিয়ে আসে পশ্চিম বার্লিনে। অতঃপর দুটি পাহারা দুই দেশের পক্ষে থাকে পরস্পরকে চোখে-চোখে রাখার জন্য। তারাও পালায়!

ব্রান্‌ডেনবার্গ গেট থেকে কিছুদূর এগিয়ে গেলে বার্লিনের নদীটি দেখা যায়। এই নদী একটি মৃত্যুর ফাঁদ। এটি পূর্ব ও পশ্চিমে বার্লিনের সমান্তরালভাবে প্রবাহিত। কিন্তু এই নদীর মধ্য দিয়ে ডুব সাঁতার কেটে পালাতে গিয়ে বহু লোক গুলীবিদ্ধ হয়ে মরেছে। ট্রাক আসছে ওধার থেকে এধারে মালপত্র নিয়ে। সেই ট্রাকের মালপত্রের তলায় আত্মগোপন করে বহু লোক পালিয়ে আসতে গিয়ে ধরা পড়ে প্রাণ হারিয়েছে। পলাতকরা একটি বড় ট্রাক নিয়ে একবার দ্রুতগতিতে ছুটে এসে পাঁচিল ভেঙেগ পশ্চিমে চলে আসে। জখম হয় কয়েকজন। কেউ কেউ মোটরের বুটের মধ্যে লুকিয়ে পালিয়ে এসেছে শুনলুম।

আমরা সেদিন কিছুদূর এগিয়ে গেছি এমন সময় প্রবল হৈ চৈ এবং গুলী-বর্ষণের আওয়াজ শোনা গেল। দুটি ১৭।১৮ বছরের ছেলে কোনওমতে গা ঢাকা দিয়ে পূর্ব বার্লিনের পাঁচিলটি টপকিয়ে পশ্চিম দিকে ঝাঁপ দিয়ে পালাতে চেয়েছিল। প্রথম ছেলেটি টপকিয়ে আসতে পেরেছিল কিন্তু দ্বিতীয়টির জামা কাঁটাতারে আটকিয়ে যায়। ঠিক সেই মুহূর্তে পিছন থেকে প্রহরীর গুলী ছুটে এসে তাকে বিদ্ধ করে। পাঁচিলের উপরেই তার রক্ত ঝরতে থাকে। কিন্তু কাঁটাতার তাকে ছাড়েনি। ছেলেটা মৃত্যুর আগে পর্যন্ত একটু খাবার জলের জন্য চেঁচায়। চারদিকে শত সহস্র লোক চিৎকার করে কাঁদতে থাকে এবং মার্কিন প্রহরীরা নিষ্ক্রিয়ভাবে দাঁড়িয়ে এই সকরুণ দৃশ্য দেখে। কিন্তু ওই পাঁচিলটি পূর্ব বার্লিনের এলাকায়

থাকার জন্য কেউ ওর কাছে যায়নি। ওর দেহের প্রায় সবটাই ছিল পূর্বদিকে, পশ্চিমে ছিল দুটো হাত ও মাথাটা। ঠিক সেই অবস্থায় আধঘন্টার মধ্যে ছেলেটার মৃত্যু ঘটে। মৃত্যুর পরে ওর শবদেহটা পাঁচিলের পশ্চিমে ছুড়ে দেওয়া হয়।

শ্রীমতী মেরিয়া ডুকরিয়ে-ডুকরিয়ে কাঁদছিল। যুদ্ধের সৈনিক হিসাবে তার বাবার মৃত্যু ঘটে এবং তার স্বামী এখন রুশ কারাগারে যুদ্ধবন্দী। মেরিয়াদের বাড়ি পড়েছে পূর্ব বার্লিনে। তার আত্মীয়পরিজন সকলেই ওপারে। এপারে সে একা। প্রতি রবিবার সকালে সে এই কাছাকাছি এসে একটি মইয়ের সাহায্যে উঁচুতে উঠে সম্মুখের 'গ্রেভ ইয়ার্ডের' বাগানের দিকে লক্ষ্য রাখে। ওখানে আসেন তার মা, মামা, বড় ভাই প্রভৃতি। ওঁদের দিকে চেয়ে মেরিয়ার চোখ দিয়ে ঝর-ঝর করে জল পড়ে। কিন্তু অপর দিকে ওঁরা থাকেন নির্বিকার এবং শূন্য উদাসীন দৃষ্টিতে চেয়ে। যদি চোখে বা মুখে ওঁদের ঈষৎ ভাবান্তর ঘটে, তবে পূর্ব বার্লিনের প্রহরী ওঁদেরকে ক্ষমা করবে না! সব দৃশ্য দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখা আমার পক্ষে আর সম্ভব ছিল না। মেরিয়াকে সান্ত্বনা দেবার মতো ভাষাও সেদিন আমরা খুঁজে পাইনি।

বিগত বিশ্বযুদ্ধের প্রথম দিকে (১৯৩৯-৪১) যখন অক্ষশক্তির আক্রমণে ইংরেজ লাঞ্ছিত ও ক্ষতবিক্ষত হচ্ছিল তখন একশ্রেণীর ভারতীয়কে উল্লসিত হতে দেখেছি। কিন্তু হিটলার যখন বিশ্বাসঘাতকের মতো সোভিয়েট ইউনিয়নকে আক্রমণ করল, তখন অনেকেরই চোখ খুলেছিল। এই আক্রমণ রবীন্দ্রনাথকেও মর্মাহত করেছিল। এরপর তিনি দেড়মাস কাল জীবিত ছিলেন।

পৃথিবীর কোন কোনও দেশ সম্বন্ধে ভারতীয় রাজনীতির বীতরাগ থাকতে পারে কিন্তু বিরূপতা কারও সম্বন্ধেই নেই। জার্মান জাতি নিজেদের মধ্যে আদর্শ-বিরোধের ফলে দ্বিধাবিভক্ত হয়েছে। ভারত তার জন্য দুঃখিত হতে পারে কিন্তু বৈরিতা নেই কারও সঙ্গে। পরদিন সকালে একজন সুদর্শন জর্দনদেশের ছাত্র যখন তার গাড়িতে শ্রীমান প্রদীপ এবং আমাকে তুলে নিয়ে ওই 'চেক্‌পয়েণ্ট চার্লি'-র গেট পেরিয়ে পূর্ব বার্লিনের এলাকায় ঢুকল, তখন আমার মনে ঈষৎ দুর্ভাবনা ছিল যে, আমরা কেউই পূর্ব বার্লিন থেকে আমন্ত্রিত হইনি। যাই হোক, কাছেই একটি একতলা বাড়ির বারান্দায় গিয়ে উঠতেই আমাদের পাসপোর্টগুলি পরীক্ষার জন্য নেওয়া হল, এবং জনৈক সামরিক ব্যক্তি অনেকগুলি প্রশ্নের জবাব চাইলেন। আমরা কেন এসেছি, আমাদের কী উদ্দেশ্য, কার কাছে আমরা যাব, কোনও সামগ্রী বা কাগজপত্র আমাদের সঙ্গে আছে কিনা, আমরা কখন ফিরব ইত্যাদি বিবিধ প্রশ্ন। ওখানেই প্রায় ঘণ্টা দেড়েক কেটে গেল। এই ব্রান্‌ডেনবার্গ গেটেরই অপর নাম 'চেক্‌পয়েণ্ট চার্লি'।

আমাদের গাড়িখানা তন্নতন্ন করে খানাতল্লাসী করা হল। গদিগুলি তুলে, বুটের ঢাকা খুলে, গাড়ির তলার দিকে হেঁট হয়ে,—যাকে বলে ইন্দিছিন্দি পরীক্ষা। আমাদের জামা ও ট্রাউজারের পকেট, আমাদের কোমরের দিকে হাত বুলিয়ে, জুতো খুলিয়ে,—সমস্তই পরীক্ষা করে নিল দু'জন মিলিটারি পুলিস। অবশেষে 'সসম্মানে' ছাড়া পেয়ে আমরা 'লোহিত সমুদ্র গর্ভে' প্রবেশ করলুম!

পশ্চিম বার্লিনে যেমন অহোরাত্র জনস্রোত গিজগিজ করছে, এখানে তার বিপরীত। নগরীর এই অংশ বোমাবর্ষণ ও ভগ্নদশার সাক্ষ্য দিচ্ছে, অন্যদিকে চারিদিক তেমনি জনবিরল। লক্ষ্য করছিলুম জর্দনীয় ছাত্রটি পূর্ব বার্লিনের

পথঘাট অনেকটা চেনে। একটি রাজপথের নাম কার্ল মার্কস এ্যালে, অন্যটি ফ্রাঙ্ক-ফার্ট এ্যালে। ফ্রাঙ্কফার্ট মোট দুটি। একটি পশ্চিমে, অন্যটি পূর্বে—ওডার নদীর সীমানায়। ওডার নদী দক্ষিণে গিয়ে মিলেছে নীসে নদীতে। এই ওডার-নীসের সীমানা ধরে এখন পূর্বদিকে পোলাণ্ডের নতুন রাষ্ট্রসীমানা নির্ধারিত হয়। বিশ্ব-যুদ্ধের পর জার্মানি মোটামুটি পাঁচ খণ্ডে ভাগ হয়ে গেছে। যেমন পশ্চিম ও পূর্ব জার্মানি, সাইলেসিয়া, উত্তর ও দক্ষিণ প্রাশিয়া। পশ্চিম জার্মানিকে বাদ দিলে বাকিগুলি এখন সোভিয়েট প্রভাবযুক্ত।

জনবিরল পূর্ব বার্লিনের প্রশস্ত রাজপথটির নাম—যতদূর মনে পড়ছে—লেনিন-ষ্ট্রাসে। ষ্ট্রাসে মানে বড় রাস্তা। অনেকগুলি সুন্দর সুসজ্জিত দোকান, কিন্তু মানুষের সংখ্যা একেবারেই সামান্য। কে যেন আমার কানে তুলল, জনসংখ্যার শতকরা ৯৫ জন এদেশে কমিউনিষ্ট সমাজব্যবস্থা ও অর্থনীতিক কাঠামো একে-বারেই পছন্দ করে না। পূর্ব বার্লিন যে জনবিরল হয়েছে, এও তার একটা কারণ। কিন্তু আমার মতো নিস্পৃহ পর্যটকের পক্ষে এ ধরনের আলোচনা বেমানান। স্বচক্ষে যা দেখব সেইটিই আমার বিষয়বস্তু।

রাজনীতির কথা থাক্। কিন্তু রাতারাতি সমাজব্যবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে মানুষের চরিত্ররূপ, তার মস্তিষ্কের আমূল সংস্কার, তার জীবনযাত্রার অভ্যস্ত রীতিনীতি, তার প্রচলিত অভ্যাসের ধারা, তার অর্থনীতিক চিন্তা ও বিলিব্যবস্থা—এগুলি ঠিক রাতারাতি পাঁচিল তুলে বদলানো সম্ভব কিনা, এ প্রশ্ন থেকে যায়। জার্মান কমিউনিষ্ট দলের উপর হিটলারের নাৎসীবাহিনীর অকথ্য এবং অমানুষিক উৎপীড়নের ইতিহাস সবাই জানে। কিন্তু দলবদ্ধ কোনও সম্প্রদায়ের রাজনীতিক স্লোগান বা তাদের সেই ধরনের কর্মতৎপরতা এক জিনিস,—প্রশাসন কর্মের দায়িত্ব-ভার গ্রহণ করা অন্য বস্তু। সেই শিক্ষা রাতারাতি আয়ত্ব করা কিছু কঠিন। সেই দিক থেকে সর্বার্থসাধক সোভিয়েট কর্তৃপক্ষের সর্বাঙ্গীণ সহায়তা না পেলে পূর্ব জার্মানির পক্ষে রাষ্ট্রশাসন চালানো কঠিন হতো। আমাদের মতো অনাসক্ত পর্য-বেক্ষক সেই সন্ধিযুগে জার্মানিতে এসে দাঁড়িয়েছে। আমরা এসে লক্ষ্য করছি, পূর্ব জার্মানিতে সর্বব্যাপী সোভিয়েট শক্তির অপ্রতিহত প্রভাব। কিন্তু আমরা ভালমন্দ বিচারের কেউ নই। ভারতবর্ষ কেবল এইটিই চায়, পূর্ব-পশ্চিম দুই জার্মানি আবার যেন ধনে-মানে-গৌরবে-কীর্তিতে-বিদ্যায় ও সংস্কৃতিতে তার সুপ্রাচীন ঐতিহ্য পুনরুদ্ধার করে।

আমরা এসে পৌঁছলুম এক বিশাল স্মৃতিসৌধসম্বলিত উদ্যানপ্রাঙ্গণে। সামনেই প্রায় একশ' ফুট উঁচু এক 'রাশিয়ান্ ওয়ার মেমোরিয়ালের' মালভূমি। এখানে বহু রুশ সেনাপতি ও মৃত্যুমুখী সোভিয়েট জনতার মূর্তি স্মারকচিহ্ন হিসাবে নির্মিত রয়েছে। বলা বাহুল্য, বিশ্বযুদ্ধের কালে জার্মান কমিউনিস্টদের কোনও সেনাবাহিনী ছিল না ; হিটলার ও নাৎসীবাহিনীর পতন ঘটিয়েছিল প্রধানত সোভিয়েট সেনাদল। এই কারণে মিত্রশক্তির মনে কিছু আতঙ্কের সঞ্চার ঘটে। তৎকালে মিঃ চার্চিলের মনোভাব ও আচার-আচরণ এখন ইতিহাসের অন্তর্গত।

ওখান থেকে আমরা এসে পৌঁছলুম অলিম্পিক ষ্ট্যাডিয়ামে। ১৯৩৬ সালে এই অতি বৃহৎ এবং ব্যাপক ষ্ট্যাডিয়ামটি হিটলারের পরিচালনায় নির্মিত হয়। এর ভিতর ও বাহিরের সর্বত্র ঘুরে-ঘুরে আমরা দেখছিলুম। বিস্ময়ের বিষয় এই, এত

বড় শহরের কোথাও বিশেষ মানুষের সংখ্যা দেখতে পাচ্ছিলুম না। চারিদিক যেন নিঃঝুম ও নিঃশব্দ। স্মৃতিসৌধের বাগানে যে কয়েকজনকে আশেপাশে দেখতে পাচ্ছিলুম, তারা আমাদের সঙ্গে আলাপ করার জন্য উৎসুক ছিল, কিন্তু বোধ হয় কিছু একটা সন্দেহ করে আমাদের দিকে এগোতে সাহস পায়নি।

বোমাবিধ্বস্ত পূর্ব বার্লিনের নানা ভগ্নাবশেষ আমরা দেখে বেড়াচ্ছিলুম। মার্শাল প্ল্যানের টাকা পূর্ব জার্মানিতে স্বাভাবিক কারণেই আসেনি, সেজন্য পূর্ব ও পশ্চিম বার্লিনের মধ্যে অবস্থার পার্থক্য খুবই স্পষ্ট। সম্পদের প্রাচুর্যে, শোভা-সমৃদ্ধিতে, নবনির্মাণের অধ্যবসায়ে, জীবনব্যবস্থার মানোন্নয়নে পশ্চিম অংশ ঝলমল করছে, কিন্তু পূর্বাংশ সেই তুলনায় হতশ্রী, দরিদ্র, সম্পদহারা এবং ম্লান। অদূরে কাঠকয়লার বর্ণ সেই ভস্মীভূত রাইখষ্ট্যাগ বিল্ডিং আজও দাঁড়িয়ে—যেটিকে নাৎসীরা গোপনে জ্বালিয়ে দিয়ে কমিউনিষ্টদের ঘাড়ে দোষ চাপিয়েছিল। এই সব ভগ্নাবশেষ দেখতে দেখতে আমরা বহুদূর পথ চলে গেলুম।

মধ্যাহ্ন ভোজের জন্য আমরা একটি রেস্তঁরায় এসে বসলুম। পশ্চিম বার্লিনের মুদ্রা পূর্বাংশে চলে না। কিন্তু জর্দনীয় ছাত্রটি তার জন্য প্রস্তুত ছিল। এই হোটেলের দরিদ্রদশা এবং আহার্যবস্তুর স্বল্পতা আমরা লক্ষ্য করছিলুম। বহু নাগরিক এখানে খেতে এসেছেন, কিন্তু অনেকগুলি টেবলে চাপা-চাপা ও চুপিচুপি আলাপ যেন ভিতরটাকে একপ্রকার গোয়েন্দা দপ্তরে পরিণত করেছিল। সবাই যেন সবাইকে সন্দেহ করে যাচ্ছে! মনে হচ্ছিল আহারাদিটা গৌণ, মুখ্য উদ্দেশ্যটা অন্যরূপ। শুনেছি কলকাতায় স্বদেশী আমলে (১৯০৫-৮) নাকি "জ্ঞানবাবুর চায়ের দোকান" (দিলখুশ কেবিনের পাশে) এইরূপ একটি রাজনীতিক দেখা-সাক্ষাতের গোপন কেন্দ্র ছিল—যেখানে তৎকালীন বিপ্লবীদলের নায়করা এসে পর-স্পরের মধ্যে নিঃশব্দে আদান প্রদান করে যেতেন। যাই হোক, আমরা এই শ্বাসরোধী আবহাওয়া এক সময় ত্যাগ করে পথে বেরিয়ে পড়লুম। পরবর্তীকালে জেনে-ছিলুম, পূর্ব জার্মানির কমিউনিষ্ট শাসন ব্যবস্থায় যথেষ্ট পরিমাণ অর্থনীতিক উন্নতি ঘটেছে এবং সর্বপ্রকারে তাঁরা গৌরব অর্জন করেছেন। বহু ভারতীয় পূর্ব জার্মানির সর্বাঙ্গীণ পুনর্গঠন পরিদর্শন করে আনন্দ পেয়ে এসেছেন।

একটি অনুন্নত গলিপথে ঢুকে এক পুরনো দোতলা বাড়ির উপরে এসে উঠলুম। এই দরিদ্র সাজসজ্জাহীন ফ্ল্যাটটিতে থাকেন এক নাট্যকার দম্পতী মিঃ ও মিসেস পিটার হ্যাক্‌স। স্বামী স্ত্রী প্রায় এক বয়সী অর্থাৎ আন্দাজ বছর ৩৫ বয়স। এঁরা জানতেন আমরা আসব, কিন্তু সীমান্তরক্ষী জার্মান পুলিশ জানে না, আমরা এখানে আসতে পারি!

সস্ত্রীক পিটার আমাদেরকে সাদর ও সহাস্য অভ্যর্থনা জানিয়ে ভিতরে নিয়ে গেলেন। এঁর নাটক পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানির রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়ে থাকে। ইনি জর্দনীয় ছাত্রটির বিশেষ বন্ধু এবং স্বামী-স্ত্রী উভয়েই ইংরেজি জানেন। শ্রীমান্‌ প্রদীপের মনে বিভিন্ন প্রশ্ন জমে উঠেছিল, এবং তিনি একে একে সেগুলির জবাব চাইছিলেন। স্বামীস্ত্রী উভয়েই প্রখরভাবে বুদ্ধিজীবী এবং তাঁদের অতি দ্রুতগতি বাকপটুতায় আমরা যেন থৈ পাচ্ছিলুম না। তাঁদের অনর্গল ও অচ্ছেদ্য বাক্যচ্ছটার ভিতর থেকে আমি যেন খুঁজে পাচ্ছিলুম একপ্রকার 'অপরাধী বিবেক—' যেটা অশান্ত স্নায়ুতন্ত্রের (nervous system) দিকে ইঙ্গিত করে। ওঁদের সামনে

একটি বড় কাঠের পাত্র পোড়া সিগারেটের শেষাংশে ভর্তি এবং আমার এক প্রশ্নের উত্তরে মিসেস পিটার বললেন, ওঁরা দুজন প্রতিদিন কমবেশি ২৫০ সিগারেট এবং প্রায় ৫০ কাপ চা বা কফি পান করেন। এই সুস্থকায় এবং অত্যুগ্র বুদ্ধিজীবী (intellectual) দম্পতির মানসিক চেহারার মধ্যে আমি যেন খুঁজে পাচ্ছিলুম এক-প্রকার অস্বাভাবিক মনোবিকার এবং আদর্শচ্যুতি।

পিটার বলছিলেন তাঁর নাটকের উপাদানের কথা। তিনি উভয় জার্মানিকেই ভালবাসেন। কিন্তু পূর্ব জার্মানিতে তাঁর গ্রন্থাদি এবং নাটকের সমাদর বেশি। এখানে তিনি প্রচুর অর্থ পেয়ে থাকেন, এবং এখানে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী কম। তাঁর ভাব ও চিন্তার স্বাধীনতায় এখানে কেউ হস্তক্ষেপ করে না এবং তিনি শুধু রাষ্ট্র-বিরোধী কোনও কথা বলতে পারেন না। কেউ তাঁকে কোনও নির্দেশ দান (dictate) করেন না বা নাটকের বিষয় নির্বাচন করে দেন না। তিনি বার্লিনভাগের দেওয়াল তোলার জন্য দুঃখিত, তবে গণতন্ত্রী পূর্ব জার্মানির তিনি সমর্থক। মিসেস পিটারও অনর্গলভাবে স্বামীকে সমর্থন করে যাচ্ছিলেন।

আমরা ঘণ্টা দুই ওখানে ছিলুম। হলঘরটি যখন সিগারেটের ধোঁয়ায় ও ঘনায়মান সন্ধ্যায় অন্ধকার হয়ে এসেছে, আমরা তখন বিদায় নিয়ে আবার বেরিয়ে পড়লুম।

ফিরবার পথে সীমান্ত গেটের কাছে আমাদের গাড়ি এসে থামতেই সেই একই প্রথা অনুযায়ী আমাদের সকলের সর্বাঙ্গ এবং আগাগোড়া গাড়িখানা সার্চ করা হয়েছিল।

সেই রাত্রে কেম্পিন্স্কি হোটেলের নিচের তলায় যখন আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও প্রেসব্যুরোর ডাইরেকটর মিঃ কার্ল ক্রাচ্মারের সঙ্গে ডিনারে বসেছি, সেই সময় সমস্বরে প্রায় তিনহাজার গাড়ির প্রবল কর্ণবিদারক 'হুটিং" আরম্ভ হয়। আমার প্রশ্নের উত্তরে ক্রাচ্মার বললেন, যে ছেলেটিকে সকালের দিকে দেওয়ালের উপরে পূর্ব বার্লিনের পুলিশ গুলী করে মেরেছে, তারই প্রতিবাদস্বরূপ পশ্চিম বার্লিন এই "ধিক্কার ধ্বনি" দিচ্ছে। ঘটনাটি হৃদয়বিদারক কিন্তু আমরা এখন নিরুপায়।

ঘণ্টাখানেক পরে এই প্রচণ্ড ও ক্রুদ্ধ হুটিং থামল। বিরাট সেই জনতার এই বিক্ষোভ প্রকাশের মধ্যে সেদিন অনিশ্চয়তা, রাজনীতিক উৎকণ্ঠা, হতাশা এবং প্রতিশোধ-স্পৃহাও দেখতে পাচ্ছিলুম। আমরা যখন হোটেলের বাইরে এলুম, শ্রীমান্ প্রদীপ এসে উপস্থিত হলেন। তিনি থাকেন অন্যত্র। এবার মিঃ ক্রাচ্মার আমাদের দুজনকে নিয়ে বেরোলেন, এবং কতকটা দূরে গিয়ে একটি বাড়ির দরজায় বেল্ টিপতেই মিনিট দু'য়েকের মধ্যেই একটি তরুণী সুসজ্জিতা মহিলা উপর থেকে নেমে এলেন। মহিলার মাথার চাঁদির উপর মস্ত উঁচু এক খোঁপা দেখে আমি বিস্মিত হয়েছিলুম। ক্রাচ্মার আমাদের সঙ্গে ওঁর পরিচয় করিয়ে দিলেন। উনি স্ত্রী নন্, গার্ল-ফ্রেন্ড এবং ওঁরা বসবাস করেন একত্রে স্বামীস্ত্রীর মতো। মেয়েটির নাম রোজেট্। রাত তখন ১০টা বেজে গেছে। আমরা পশ্চিম বার্লিনের নৈশ জীবন দেখতে যাচ্ছিলুম। পরে শুনেছিলুম এই ধরনের উঁচু খোঁপা, চুলের গোছা, ভুরু, চোখের পাতা এবং আরও কি-কি যেন বাজারে কিনতে পাওয়া যায়।

আলোকোজ্জ্বল পশ্চিম বার্লিন দিবালোকের মতো চারিদিকে ঝলমল করছে। সেই আলোর আভা দিগন্তকেও আলোকিত করে তুলেছে। এ এক নতুন নগর,

কে বলবে একদা এই নগর সোভিয়েট বোমায় ধূলিসাৎ হয়েছিল! ওরই ভিতর দিয়ে আমরা এসে পৌঁছলুম একটি স্বল্পালোকিত নৃত্য প্রতিষ্ঠানের দোতলায়—যেখানে বল্‌নাচের আসরের দুই পাশে সারিবদ্ধভাবে ছোট ছোট টেবলে বসে গেছে দর্শক নরনারী। এঁরা সকল বয়সের, এবং প্রায় প্রত্যেকেই হুইস্কির গেলাস হাতে নিয়ে আনন্দকৌতুকে মেতে রয়েছেন। কোথাও-কোথাও গা-ঢাকা ছায়াচ্ছন্নতায় দেখতে পাচ্ছিলুম নরনারীর আদিম বাসনার রঙ্গভঙ্গী এবং তাঁরা চান না তাঁদের এই প্রকার যৌথ দেহলীলা অন্য কেউ লক্ষ্য করে!

ক্রাচ্‌মার আমাদের তিনজনকে নিয়ে মাঝখানের ছোট দুটি টেবলে বসালেন, যেখানে আমাদের পাশেই আলিঙ্গনাবন্ধ অনেকগুলি মেয়ে-পুরুষ ঘুরে-ঘুরে নাচছিল। নাচের জন্য বৃহদায়তনের একটি পাটাতন ব্যবহৃত হচ্ছে। তারই উপর মেয়ে এবং পুরুষের জুতোর গোড়ালি থেকে ছন্দোবদ্ধ টুক্‌টাক্‌ আওয়াজ উঠছে। এই নাচে তাল ও মাত্রা মেনে চলতে হয়—যার জন্য শিক্ষার প্রয়োজন। এ নাচ শ্রমসাধ্য। স্বামীস্ত্রী মিলে বল্‌ নাচ নাচে এটি অবশ্যই অনুমান করতে পারি। কিন্তু পাশ্চাত্য সমাজের সাধারণ প্রথা হল, পরপুরুষ বা পরস্ত্রীর কটিদেশ জড়িয়ে আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে আনন্দের সঙ্গে নাচা। ওতে নাকি উৎসাহের জোয়ার আসে। কোন কোনও ক্ষেত্রে দেখছিলুম নৃত্যরত অবস্থায় একজন অন্যজনের কানে মাঝে মাঝে কি যেন হাসিমুখে বলছে।

একসময় ক্রাচ্‌মার উঠলেন পাটাতনের উপর এবং এক মহিলাকে নাচের জন্য ধরে নিলেন। তাঁর দেখাদেখি হঠাৎ শ্রীমান্‌ প্রদীপ গিয়ে উঠে একটি মেয়েকে ধরে নিয়ে ঠিক ওইরূপ তাল এবং মাত্রা মিলিয়ে নাচতে আরম্ভ করে দিলেন। রোজেট্‌ সেই দিকে হাসিমুখে তাকিয়ে রইল। রাত যত বাড়ে, আনন্দ উৎসব ততই যেন ফেনায়িত হয়ে ওঠে। লক্ষ্য করছিলুম মেয়েদের সংখ্যা যেন একটু বেশি। বিশ্বযুদ্ধের কালে পুরুষ মারা পড়ে লক্ষ লক্ষ, সেই কালে নিতান্ত শিশু যারা—তাদের মধ্যে মেয়েরা এখন বড় হয়েছে। অভিভাবকহীন মেয়েদের সংখ্যা এদেশে বেড়েছে প্রচুর। মেয়ে এখনও সহজলভ্য। একই পুরুষের একাধিক মেয়েবন্ধু! অনেক মেয়ে বিবাহ করে নির্দিষ্ট সময়ের চুক্তিতে। অনেক মেয়ে বেশ্যাবৃত্তি ছেড়ে আবার ঘরকন্না আরম্ভ করে একজন পুরুষকে নিয়ে।

সেদিন হোটেলে ফিরেছিলুম রাত দুটোয়। শ্রীমতী এক্‌লিন উইজি চলে গিয়েছেন অন্যকাজে। ক্রাচ্‌মার আমার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। পরদিন সারাক্ষণ তিনি আমাকে নিয়ে ঘুরছিলেন। তাঁর অফিসটি বেশ বড়, সেখানে সর্বোচ্চ পদে তিনি কাজ করেন। সেজন্য সহকর্মীদের হাতে দায়িত্ব দিয়ে তিনি ছুটি নিতে পারেন। আমি পশ্চিম জার্মান অর্থাৎ ফেডারাল গভর্নমেণ্টের অতিথি, সেই কারণে প্রায় প্রতিটি সরকারি প্রতিষ্ঠানে আমার যাতায়াত ছিল অবারিত। এই নগরের কর্তৃত্ব শক্তিচতুষ্টয়ের হাতে থাকলেও কার অধিকার কতখানি এ আমার জানা নেই। কিন্তু জার্মানদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠানগুলিতে জার্মান ছাড়া অপর কারও প্রভাব-প্রতিপত্তি আমি দেখিনি। বরং গুলীবিদ্ধ যে তরুণ বালকটি জলের তৃষ্ণায় চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে মারা গেল,—আমেরিকান পুলিশ তার মুখে এক ফোঁটাও জল দিল না, এজন্য আমেরিকানদের প্রতিও নাগরিকদের ঘৃণা জন্মেছিল।

আমার প্রবল সাধ, পথের ধারে কোনও একখানে বসে আমি লোক চলাচল দেখব।

একদা মস্কোতে আমি আমার দোভাষীকে বলে এক পথের ধারে একা বসেছিলুম কয়েকঘণ্টার জন্য। ওতে আমার দেখার সুবিধে হয়। নিউ ইয়র্কের পেন্ স্টেশনে, লণ্ডনে, প্যারিসে, জুরিখে, আলাস্কার ফেয়ারব্যাংকসে,—অমনি করে কাটিয়েছি ঘণ্টার পর ঘণ্টা। ওই নিঃসঙ্গতাই আমার মনে কাজ করে বেশি। আমার অনুরোধ রাখার জন্য ক্রাচ্মার আমাকে এক ফুটপাথের খাবারের দোকানের সামনে নামিয়ে দিয়ে চলে গেলেন হাসিমুখে। আমি সেই দোকানের একখানা চেয়ার দখল করে বসে পড়লুম। আমি ভারতীয়, হোটেলের মালিক সসম্ভ্রমে আমাকে অভ্যর্থনা জানালেন। আমার কাছে সামান্য ডয়েচ্ মার্ক ও কয়েকটা ফেনিস মুদ্রা ছিল। আমি একপেয়ালা চা নিয়ে বসে গেলুম।

ক্রাচ্মার যখন আবার হাসিমুখে এসে দাঁড়ালেন তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ। আমি বললুম, গাড়ি থাক্, এবার আমি একটু হাঁটতে চাই।

ক্রাচ্মার বললেন, বেশ ত, চলুন বড় রাস্তাটা ধরি।

উনি আমাকে গাড়িতে তুলে নিয়ে কেম্পিন্স্কি হোটেলে এসে গাড়িখানা রেখে আবার আমাকে নিয়ে বেরোলেন। হাঁটতে হাঁটতে এসে এক রাস্তার কোণে দেখি মস্ত এক সাইনবোর্ডে লেখা রয়েছে, "রিফিফি"। ক্রাচ্মার বললেন, এটা নাইট ক্লাব, আসুন না—ভেতরে ঢুকি।

আমরা পথের উপর থেকে ভূগর্ভে নেমে গেলুম। সামনেটা ছায়াচ্ছন্ন, কিন্তু তারপরেই আলোকোজ্জ্বল একটা বড় হল্, এবং সেখানে সকল বয়সের বহু ভদ্রলোক সম্ভ্রান্ত ঘরের মহিলারা জড়ো হয়েছেন।

দুই ধরনের নাইট ক্লাব পশ্চিম বার্লিনে অনেকগুলি বর্তমান। একটিকে বলা হয় ষ্ট্রিপ্‌টীজ (Striptease) এবং অন্যটি 'রিফিফি' (Riffiffee)। রিফিফি শব্দটি ফরাসী থেকে নেওয়া। এটির অর্থ হলো গুণ্ডাদল, স্বভাবদুর্বৃত্ত এবং অসাধু গোষ্ঠি। বিগত বিশ্বযুদ্ধের কালে পারিবারিক ও সমাজ জীবন ভেঙ্গে পড়ার ফলে এই ধরনের নাইট ক্লাবের সংখ্যা আগে যা ছিল তার চেয়ে অনেক বেশি বেড়ে ওঠে। জার্মানিতে এখন এদের সংখ্যা বোধ হয় সর্বাধিক। কিন্তু উদ্দেশ্য সর্বত্রই এক, অর্থাৎ মেয়েদেরকে উলঙ্গ করে দেখানো। এই রিফিফি হল্ এক নারী-প্রতিষ্ঠান। এখানে প্রবীণা ও শ্লথচরিত্রা স্ত্রীলোকরা তরুণী নগ্না মেয়েদেরকে পরিচালিত করে,—সরকারি কোনও বাধা পায় না। সন্দেহ নেই পশ্চিম বার্লিনে জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন যত বেশিই হোক, তার সমাজজীবনে বর্তমানে কোনও গ্রন্থি বা পারস্পরিক বন্ধনসূত্র নেই বললেই হয়। তারা চারিদিকে পুনর্গঠনের কাজ নিয়ে এসেছে,—এখানে সমাজ গঠনের দায়িত্ব তারা নেয়নি। এখানে এসে দেখছি আগেকার কালের জার্মান সমাজের ভগ্নাবশেষ। মেয়েরা এখানে এসেছে পুরুষকে সঙ্গে নিয়ে তাদের প্রয়োজন মেটাতে। তাদের কাজ এখানে কম, কিন্তু যে করেই হোক, তাদেরকে বাঁচতে হবে! ওই 'রিফিফি'-তে নাচের সময় এক বয়স্কা নারীকে হাসিমুখে জিজ্ঞেস করলুম, এ দৃশ্য তোমাদের চোখে কেমন লাগে?

ওই ডামাডোলের মধ্যে এই টপ্‌লেস স্ত্রীলোকটি শ্বেতবর্ণ পরচুলা পরে আমার ঠিক পিছনে কাউণ্টারে দাঁড়িয়ে হাসাহাসি করছিল। আমার প্রশ্নে থমকিয়ে সে মুখখানা গম্ভীর করল। পরে বলল, এসব কথা কেউ জানতে চায় না। এটা

মেয়েদের দুর্ভাগ্য। এটা অপমানজনক।

আমার পক্ষে আর কিছু জানার সুযোগ ছিল না। ক্লাচ্‌মার আমার দিকে চেয়ে হাসছিলেন। ওখানে দেখলুম সম্ভ্রান্ত মহিলারা এবং পক্ককেশ প্রবীণ পুরুষরাও সাগ্রহে সমস্তটা উপভোগ করছেন। আমি ক্লাচ্‌মারের সঙ্গে আবার বেরিয়ে পড়লুম।

জনবহুল রাজপথ ধরে আমরা অনেকদূর এগিয়ে যাচ্ছিলুম। চারিদিকে দোকান বাজার হোটেল যেন থৈ থৈ করছে। যেদিকে তাকাই ঝকঝকে নতুন। মার্শাল প্ল্যানের কৃপায় অবস্থা ফিরেছে, ক্রয়শক্তি বেড়েছে, ব্যবসা বাণিজ্যের প্রচুর উন্নতি ঘটেছে। ক্লাচ্‌মার একসময় বললেন, কিন্তু তবুও পশ্চিম বার্লিনের জীবন কখনও আগেকার মতো স্বাভাবিক হবে না। কেননা চারিদিকেই আমরা পূর্ব জার্মানির দ্বারা ঘেরাও হয়ে আছি। পশ্চিম বার্লিন একটি ছোট্ট দ্বীপের মতো। স্থলপথ ধরে আমরা বাইরে যেতে পারিনে। দুই জার্মানি কখনও একত্রে মিলবে—এ আশা কম। আপনাদের পূর্ব-পশ্চিম বাঙলাদেশের কথা ভাবুন। আয়ার্ল্যাণ্ড, কোরিয়া —এদের দিকে চেয়ে দেখুন।

ফুটপাথ ধরে যেতে-যেতে দেখছিলুম, এক একটা গলিপথ বেড়া দিয়ে আড়াল করা। গলির মুখের কাছে জ্বলছে এক একটা লাল আলো। আমার প্রশ্নের উত্তরে ক্লাচ্‌মার বললেন, এগুলো 'রেডলাইট এরিয়া'। আসুন, আপনাকে দেখিয়ে আনি।

স্বল্পালোকিত গলিপথ। কিছুদূর পর্যন্ত গিয়ে দেখি শো-কেসের মতো ছোট ছোট কাঁচের ঘরের মধ্যে অত্যুজ্জ্বল আলোর সামনে একেকটি মেয়ে মোমের পুতুলের মতো বসে রয়েছে। শুদ্ধভাষায় এদেরকে বলা হয় রূপোপজীবিনী। এরা বিশেষ ধরনের সাজগোছ করে ঠায়ে বসে রয়েছে পুরুষ-পতঙ্গের জন্য। ক্লাচ্‌মার বললেন, প্রতি সপ্তাহে এরা ডাক্তারের কাছ থেকে অথবা হাসপাতাল থেকে সার্টিফিকেট নিতে বাধ্য। এদের লাইসেন্স আছে। কোনও অসুস্থ বা যৌনব্যাধিগ্রস্ত মেয়ে এখানে বসবার অধিকার পায় না,—সেজন্য প্রতিদিন পুলিশ থেকে তদন্ত করতে আসে এবং প্রতি মেয়ের কাগজপত্র পরীক্ষা করে যায়। এ শহরে ঘুষ চলে না।

এরকম কত মেয়ে আছে?

হাসিমুখে ক্লাচ্‌মার বললেন, হান্‌ড্রেডস্‌। কিন্তু ইষ্ট বার্লিনে এসব একেবারেই নেই। সোস্যালিস্ট দেশে প্রসটিট্যুশন্‌ একদম নিষিদ্ধ। গোপনে কোথাও কিছু আছে কিনা আমার জানা নেই।

আমরা হাঁটতে হাঁটতে প্রায় মাইল তিনেক এসেছিলুম। সিনেমা, থিয়েটার, ক্যাবারে, নাইট ক্লাব—এরা সন্ধ্যা থেকে জাঁকিয়ে বসেছে পথের দুইপারে। গৃহস্থ পল্লী যে নেই তা নয়, কিন্তু তাদের ফ্যামিলির বহু নরনারী পূর্ব বার্লিনে বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়েছে। যদি তারা কখনও পালিয়ে আসতে পারে, তারই জন্য এরা দিন গুণছে।

ক্লাচ্‌মার এবার আমাকে ট্যাক্সিযোগে হোটেলে ফিরিয়ে আনলেন। নিচের তলার লাউঞ্জে বসে অপেক্ষা করছিল ক্লাচ্‌মারের বালিকাবন্ধু শ্রীমতী রোজেট্‌। অতঃপর আমরা তিনজনে নৈশভোজে বসে গেলুম। রোজেট্‌ আজ নতুন পোষাকে ঝলমল করছিল। আমার সারাদিনের পরিভ্রমণের ইতিবৃত্ত শুনতে শুনতে রোজেট্‌ হেসে খুন হচ্ছিল। মেয়েটি কোনও সম্ভ্রান্ত পরিবারের এই আমার ধারণা। তার সরলতা

ছিল আনন্দদায়ক। যখন শুতে গেলুম তখন প্রায় মধ্যরাত্রি।

পরদিন শ্রীমতী এক্‌লিন উইজি যখন এসে পেঁাছলেন তখন বেলা প্রায় ১১টা। আমি প্রস্তুত ছিলুম। কিন্তু আমি কথা দিয়েছিলুম শ্রীমতী রোজেট্‌কে, বিদায় নেবার আগে ওদের ফ্ল্যাটে গিয়ে দেখেশুনে আসব। সুতরাং ক্লাচ্‌মারও এসে হাজির হয়েছিলেন। ওঁদের বাড়িটি এক অতি সুশ্রী এবং ভদ্রপল্লীতে। সেটির নাম 'উইল্‌মার্সডর্ফ জাহ্‌রিংগার ষ্ট্রাসে।' বাড়িটি ছোট কিন্তু নতুন। সিঁড়ি দিয়ে উঠতেই দেখি ঘরোয়া পোষাকে ও বিনা প্রসাধনে হাস্যমুখী রোজেট্‌ অভ্যর্থনার জন্য দাঁড়িয়ে। ফ্ল্যাটে দুটি ঘর, কিচেন-প্যাণ্ট্রি ও বাথ। দুজনে থাকার পক্ষে চমৎকার। রোজেট্‌ সামান্য ইংরেজি বলে, ওতেই কাজ চলে যায়। আমাকে কিছু খাওয়াবার জন্য ঝুলোঝুলি,—কিন্তু তুলে নিলুম কয়েকটা আংগুর। না, আর নয়,—তিন মিনিট হয়ে গেছে। মেরিয়া অপেক্ষা করছে গাড়িতে। হাসিমুখে ওদের কাছে বিদায় নেবার সময় জানিয়ে এলুম, আপনাদের ঠিকানা নিয়ে যাচ্ছি, পরে চিঠি দেবো।

রোজেট্‌ ও ক্লাচ্‌মার নিচে এসে সাদরে বিদায় সম্ভাষণ জানালেন। মেরিয়া ও আমাকে নিয়ে ড্রাইভার গাড়ি ছুটিয়ে দিল। মেরিয়া আমার হাতে দিল হামবুর্গ যাবার জন্য 'প্যানামের' একটি টিকিট। আমাদের গাড়ি ঊর্ধ্বশ্বাসে চলল চারিদিকের ইন্দ্রপুরীর ভিতর দিয়ে সোজা বিমানঘাঁটির দিকে।

মেরিয়ার শান্ত চরিত্রমাধুর্য গত কয়েকদিনে আমাকে অভিভূত করেছিল। বিদায় নেবার কালে বললুম, মেরিয়া, তোমার সেদিনকার কান্না আর সেই চোখের জল আমি ভুলব না। নিরুপায় মানুষদের দুঃখে তোমার সেই বেদনাবোধ আমার কাছে অবিস্মরণীয় হয়ে রইল। তোমার মধ্যেই জার্মান জাতির জননী ও ভগিনী-দের দেখে গেলুম। তোমাকে নমস্কার।

মেরিয়ার স্লান হাসিমুখের উপরেই মিষ্ট চোখদুটি ছলছল করে উঠেছিল।

প্যান-আমেরিকান বিমান পূর্ব জার্মানির আকাশপথ দিয়ে উত্তর পশ্চিমে উড়ে যাচ্ছিল। নিচের দিকে দেখছিলুম লালবর্ণের টালিছাওয়া সুন্দর ছোট ছোট বাড়ি। মাঝে মাঝে নদী, জলাশয় ও বড় বড় ফসলের ক্ষেত, এখানে সেখানে চিত্রবৎ একেক-খানি জার্মান গ্রাম। অনেকের কাছেই শুনেছি, পশ্চিম জার্মানি শিল্পপ্রধান এবং পূর্ব জার্মানি কৃষিপ্রধান। কিন্তু পূর্ব-জার্মানি এবার বড় বড় শিল্পসংস্থা রচনায় হাত দিয়েছে। জার্মান প্রতিভা কোথাও স্থির হয়ে থাকবে না। নতুন সংস্কৃতি সে সৃষ্টি করবে এবং নতুন কালের অর্থনীতিক সৌভাগ্য সে অর্জন করবে।

এল্‌বা নদীর উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছিলুম। এই নদীর দক্ষিণ পার পশ্চিম জার্মানি। আমাদের বিমান ঘণ্টাখানেকের মধ্যে এসে নামল হামবুর্গ বিমানঘাঁটিতে, --যে বিরাট নগরীর ধার দিয়ে সুপ্রশস্ত এল্‌বা উত্তর সমুদ্রে গিয়ে পড়েছে। আমি ফিরে এলুম পশ্চিম জার্মানিতে।

আমার জন্য একটি যুবক-ছাত্র মিঃ বোদেন অপেক্ষা করছিল। আমি ভারতীয় সুতরাং চিনে বার করতে তার অসুবিধা হয়নি। হাসিমুখে এগিয়ে এসে সে আমার হাত ধরল। আমি বললুম, তোমাদের সুন্দর দেশ দেখতে এলুম। --বোদেন হাসি-মুখে বলল, কিন্তু ইণ্ডিয়া? সে যে অনেক সুন্দর দেশ!

দু' মিনিটে দুজনের গলাগলি বন্ধুত্ব হয়ে গেল। বোদেন নিজেই ছোট গাড়িটি ড্রাইভ করে আমাকে নিয়ে চলল এক অতি পরিচ্ছন্ন ও বনবাগানভরা এভেনুর ভিতর

দিয়ে। পথে পথে নরনারীর অশ্রান্ত স্রোতের ভিতর দিয়ে দেখতে পাচ্ছিলুম তাদের সুসজ্জিত স্বাস্থ্যোজ্জ্বল শ্রী। পথেই পড়ল এক অতি বৃহৎ সেন্‌ট্রাল পার্ক, সেখানে দেখি ১১২ ফুট উঁচু এক লৌহগম্বুজ। উৎসাহের চোটে বোদেনকে সঙ্গে নিয়ে আমি গিয়ে উঠলুম তার উপরে। সেখান থেকে দেখে নিলুম বিরাট হামবুর্গের একটি অংশ, এবং ওই সঙ্গে সুদূর প্রসারিত এল্‌বা-বে। তার সঙ্গে একাকার হয়েছে হেলিগোল্যান্ড বে। কিন্তু এই বে-গুলি সবই উত্তর সাগরের অন্তর্গত। সমগ্র জার্মানির উত্তরে একদিকে উত্তর সাগর, অন্যদিকে বল্‌টিক সাগর। এক এক সময় মনে হচ্ছে, নদী, পর্বত, অরণ্য, কৃষিক্ষেত্র, শিল্পাঞ্চল, খনিজ সামগ্রী,—সব মিলিয়ে জার্মানির মতো সম্পদশালী দেশ ইউরোপে বোধ হয় দ্বিতীয় নেই।

বোদেন আমাকে নিয়ে এল হামবুর্গের সর্বশ্রেষ্ঠ অভিজাত হোটেলে, যার নাম 'আটলাণ্টিক।' শ্বেতবর্ণ ভিতরটা,—এ যেন এক রাজবাড়ি। মার্বেল পাথরের মনোরম ভাস্কর্য প্রথমেই মনোহরণ করে। বিরাট লাউঞ্জ, বিভিন্ন কাউণ্টার, রিসেপশন, শাদা মার্বেলের সিঁড়ি ও দোতলা,—সমস্তই কার্পেট মোড়া। মেয়েরা কাজ করছে প্রত্যেক ক্ষেত্রে। সমগ্র হামবুর্গ অঞ্চল একটি উপত্যকা এবং জানলার বাইরে চেয়ে দেখি বিশাল এক সুন্দর ও বনময় সরোবর—যেখানে রক্তকমলদলের আশেপাশে শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণ রাজহাঁস ভেসে চলেছে। আমি দোতলার সবশেষের ঘরটি নিয়ে আনন্দ পেয়েছিলুম। এখানে আমি তিন দিন বিশ্রাম নেবো।

আহারাদির পর অপরাহ্ণে বোদেন আমাকে নিয়ে চলল জাহাজঘাটা বা বন্দরের দিকে। এটি হামবুর্গের জনবহুল অঞ্চল। বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে জার্মানির বহু অঞ্চল যেমন আন্তর্জাতিক জনতায় ভরে উঠেছে, এই বন্দরে তেমনি অনেক দেশের অনেক লোক এসে কাজ নিয়েছে। ড্যানিশ, বুলগেরিয়, যুগোস্লাভ, ইতালিয়ান ইত্যাদি কর্মীতে এই বন্দর ঠাসাঠাসি। এর ফলে, যেমন বহু দেশেই ঘটে, নাবিকদের সঙ্গে বন্দরকর্মীরা একত্র হয়ে একপ্রকার নৈতিক উচ্ছৃঙ্খলতা এনেছে। এখানেও বিভিন্ন রুচির নাইট ক্লাব, ক্যাবারে, মেয়েদের এবং পুরুষদের হোমোসেক্সুয়াল ক্লাব, বিভিন্ন ধরনের রেস্তেভো ইত্যাদিতে এদিকটা আকীর্ণ। শ্রীমান্‌ বোদেন মানুষের সেই ভিড় ঠেলে জাহাজঘাটার জেটি পেরিয়ে আমাকে এনে তুলল একটি 'প্লেজার ট্রিপ' জাহাজে। এখন উত্তর সমুদ্র থেকে ঠাণ্ডা হাওয়া নেমেছে। শীত পড়েছে বেশ ভাল মতো।

আমাদের ডায়মণ্ড হারবারের গঙ্গা যেমন ক্রমশ চওড়া হয়ে সমুদ্রে গিয়ে পড়েছে, হামবুর্গেও তাই। জাহাজটি বেশ দ্রুতগতি, এবং এখানকার সব জাহাজই সমুদ্রগামী। সেই জাহাজের খোলা ডেকের উপর বেঞ্চি পাতা। বড়নদীর উত্তরভাগ হল হামবুর্গ, দক্ষিণভাগে হারবুর্গ। দুই পারে যতদূর পর্যন্ত দেখা যায় শুধু শিল্পাঞ্চল, বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান, বড় বড় চিমনি, নদীতে অসংখ্য জনযান এবং অবেলার দিককার মেঘমলিন রৌদ্র। আমাদের জাহাজ পশ্চিম পথ ধরে উত্তর পশ্চিমে যাচ্ছিল। বোদেন আমার পাশে বসে খুশি মনে গল্প বলছিল। যুদ্ধের কালে তাদের পারিবারিক জীবন নষ্ট হয়েছিল। বোমাবর্ষণের ফলে এই নগর অনেকস্থলে ছারখার হয়। জাহাজঘাটা ধ্বংস হয়ে যায়। নাৎসীদের অত্যাচারে লোকরা এখান থেকে পালিয়ে বেড়াতে থাকে। বহু সৈন্য পোষাক ফেলে দিয়ে নাম ভাঁড়িয়ে যেখানে সেখানে গা ঢাকা দেয়। কোনও ফ্যামিলি সেই যুগে নিরাপদ ছিল না। বোদেন

অনর্গলভাবে বলে যাচ্ছিল।

আমরা প্রায় ৫০ মাইল পর্যন্ত গিয়ে 'গ্লাক্‌ষ্টাড্‌' শহর পর্যন্ত পৌঁছেছিলুম। এল্‌বার মোহানা শহর 'কাক্সহ্যাভেন্‌' তখনও অনেক দূর। সুতরাং এখান থেকেই জাহাজ ফিরল।

সেই রাত্রে বোদেন আমাকে এক অতি উচ্চ অট্টালিকার উপরতলাকার এক রেস্তরাঁয় নৈশভোজে নিয়ে গেল। সেখানে ব্যাণ্ড মিউজিকের সঙ্গে তখন বলডান্স চলছে। আমরা একান্তে বসে গেলুম।

পরদিন সকালে বোদেন আমাকে নিয়ে চলল নগর ছাড়িয়ে গ্রামের দিকে। কিন্তু গ্রামের দিকের যে চেহারা, সে অন্য ছবি। মাঝে মাঝে পাহাড়ি অঞ্চল,—যেগুলিকে উচ্চ উপত্যকা বলা চলে। এদিকে নাগরিক উন্মাদনা বা কর্মচাঞ্চল্য চোখে পড়ে না। মাঝে মাঝে ছোট ছোট বাজার, কোথাও কোথাও এক একটা 'ট্যাভার্ণ'—যেখানে তুমি বিশ্রাম, আহার ও পানীয় পেতে পারো। কেউ এক গেলাস জল খেতে চাইলে ওরা অবাক। জলে হাত ধোওয়া, কাঁচের বাসন পরিষ্কার করা, পোষাকপত্র কাচা, মেসিনে জল ঢালা প্রভৃতি ওরা বোঝে। কিন্তু খাবার জন্য জল! ওরা অবাক হয়। কারণ পানীয় বলতে জার্মানরা প্রায় সর্বত্রই 'বীয়ার' বোঝে। মা-বাপ-ভাই-বোন-মেয়ে-জামাই অর্থাৎ সপরিবারে একত্র আহারে বসলে হুইস্কি-ওয়াইন-শামপেন-শেরি-বীয়ার—এসব ছাড়া পানীয় নেই। শিশুরা জল খেতে চাইলে কোকাকোলা বা কোক্‌। ক্বচিৎ কোথাও যে 'মিনারাল্‌ ওয়াটার' দেখিনি তা নয়। ওরা কলের জলকে যথেষ্ট নিরাপদ মনে করে না। নদীর জল ওরা ছোঁয় না। ইউরোপ বা ব্রিটেনের কোনও নদীর জল ভারতের নদীর মতো এতটা পরিচ্ছন্ন নয়।

আমরা 'লওয়েনবুর্গ' নামক একটি সীমান্ত জনপদে এসে পৌঁছলুম। এটি পূর্ব পশ্চিম জার্মানির সীমারেখা। এই রেখা উত্তরে গিয়ে 'লিউবেক' উপসাগরে শেষ হয়েছে। এই রেখা চিহ্নিত করা। অপর পারে সীমান্তরক্ষী জার্মান পুলিশ ঝোপঝাড়ের ভিতরে গা ঢাকা দিয়ে রাইফেল ধরে রয়েছে। মধ্যবর্তী ৫০ বা ৬০ গজ ভূমিকে বলা হয়, no mans land. এখানে পদক্ষেপের অর্থ অতর্কিত মৃত্যু! এক জার্মান অন্য জার্মানকে গুলী করবে এজন্য ওরা চক্ষুলজ্জায় একটু আড়ালে থাকে। —আমার এক প্রশ্নের উত্তরে বোদেন বলল, আমাদের দিকে কোনও পাহারা নেই। আমরা চাই দুই জার্মানি এক হয়ে মিলুক।

উভয় দেশের মধ্যে একটি অর্থনীতিক বোঝাপড়ার ফলে সম্প্রতি পূর্ব জার্মানির থেকে দুধ, মাখন, মাংস, শাকসব্জি, গম প্রভৃতি বহুপ্রকার খাদ্যসামগ্রী আসছে পশ্চিমে। এটি শুভ অধ্যায়ের সূচনা। ওখান থেকেই আবার আমরা ফিরে এলুম।

সেদিন সন্ধ্যার দিকে একে একে আলাপ করছিলুম বিশিষ্ট কয়েকজনের সঙ্গে—যাঁরা ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, সাংবাদিক এবং একজন সুরূপা অভিনেত্রী। এঁদের নাম যথাক্রমে মুলেনক্যামপার, এগব্রেখট্‌ ও মেরিয়া লুইসেনষ্টিগ। সেদিন আমরা দল বেঁধে গিয়েছিলুম এক অপেরায়। সেখানে নৃত্যগীত চলছে। আসনে যখন একে একে বসছিলুম, তখন আমি বললুম, আমি আপনাদের সম্মানিত অতিথি হতে পারি, কিন্তু আমি এই সুন্দরী অভিনেত্রীর পাশে বসতে রাজি নই।

কেন?

পাছে আমার এই বাঁদুরে চেহারার পাশে ওঁকে আরও বেশি সুন্দর দেখায়!

মেয়েটি হেসে অস্থির হয়েছিল। আমাকে পাশে বসিয়ে তবে ছাড়ল। আমি অনেকটা অবাক হয়ে এই দ্বিতীয়বার 'লা বোহেমি' নামক নৃত্যনাট্যটি দেখেছিলুম। অনেক রাত্রে ফিরেছিলুম হোটেলে।

পরদিন সন্ধ্যায় 'লুফথানসা' বিমানে মাত্র দেড়ঘণ্টার মধ্যে কালোন শহরে এসে নামলুম। তখন রাত ৮টা। ওখানে যথারীতি যিনি আমার জন্য অপেক্ষা করছিলেন সেই পরিণত যুবা ভদ্রলোকটির নাম মিঃ জিক্‌গ্রাফ (Zickgraf)। হাসিমুখে হাত ধরে জিক্‌গ্রাফ বললেন, কলোন (Koln বা Cologne) শহরে আমরা পরে আসব, এখন আমরা বন্‌-এ যাই চলুন। আমরা খবর পেয়েছি আপনি খুবই ক্লান্ত।

ভদ্রলোকের অমায়িক চেহারা ও মিষ্ট কথা শুনে আমি সোজা তাঁর গাড়িতে গিয়ে উঠলুম। উনি এখন থেকে আমার গাইড এবং সারাদিনের বন্ধু। রাত্রির কলোন নগরী আলোয় আর শোভায় ঝলমল করছিল। পথের মসৃণতা এমন যে মনে হয় কাঁচের টেবলের উপর দিয়ে গাড়িখানা যেন পিছলিয়ে যাচ্ছে। পথের দূরত্ব হয়ত বা মাইল পনেরো। এরই মধ্যে দেখছিলুম ট্রাম (street car) চলছে, ট্রেন চলছে। এই সমগ্র ভূখণ্ডটিকে বলা হয় 'রাইনল্যাণ্ড',—কারণ এটি রাইন নদীর তীরভূমি। অনেকে বলে 'রাইনভ্যালি'। উপত্যকার প্রায় চারিদিকে অরণ্যবহুল পার্বত্যলোক। আমরা ওই নদীপথের ধার দিয়ে এসে একসময় যেখানে পেঁছলুম, সেটি পশ্চিম জার্মানির রাজধানী বন্ (Bonn) নগরীর প্রান্তবর্তী একটি জনপদ, যার নাম 'ব্যাড গডেসবার্গ।' রোমান হরফে বার্গ ও বুর্গ (Burg) একই বানান। কিন্তু কোন্‌টা কখন ব্যবহার করতে হয়, এটি কিছুদিন বসবাস না করলে জানা যায় না।

ব্যাড গডেসবার্গ জনপদের ঠিক মাঝখানে অসংখ্য অট্টালিকার একটির নাম হল "ইন্‌সেল" হোটেল। মিঃ জিক্‌গ্রাফ তারই দোতলায় পূর্বমুখী একটি সুসজ্জিত সুশ্রী ঘরে আমাকে প্রতিষ্ঠিত করে বিদায় নেবার আগে জানিয়ে গেলেন, এখন ন'টা বাজেনি। আপনি ঘরে বসেই ডিনার খাবেন। আমি বলে দিয়ে যাচ্ছি। গুড নাইট।

তিনি চলে যাবার পর কিছুক্ষণের জন্য আলোটা নিবিয়ে দিলুম। বোধ হয় সেদিন শুক্লা চতুর্দশী। রাইন নদীর ওপারের পাহাড়ের উপর থেকে জ্যোৎস্নায় আমার ঘরটি প্লাবিত করে ছিল।—

॥ ২২ ॥

প্রিয়বরেষু,

আধুনিক ইউরোপে—পূর্বেই বলো আর পশ্চিমেই বলো—বড় কোনও মনীষীর উন্নতশির দেখা যাচ্ছে না। শুধু স্বদেশের নয়, সমগ্র ইউরোপের মুখপত্র হয়ে যিনি কোনও মহৎ চিন্তা বা নতুন কালের ভাবনাকে প্রকাশ করবেন, তেমন বিরাট ব্যক্তিত্বকে এখন আর ইউরোপে খুঁজে পাওয়া কঠিন। অধ্যাপকসমাজ, দার্শনিক-সমাজ, বিজ্ঞানী বা সাহিত্য কর্মীর সমাজ—এদের ধরে কোথাও নবীন যুগের কোনও সংস্কৃতিমান নেতৃত্ব চোখে পড়ছে না। এখন শুধু চলছে রাষ্ট্রের সঙ্গে রাষ্ট্রের বোঝাপড়া, কমনমার্কেট নিয়ে অর্থনীতিক তর্ক বিতর্ক, এক স্বার্থের সঙ্গে অন্য স্বার্থের তুল্যমূল্য আলোচনা, এবং আপন-আপন রাষ্ট্রসীমানার মধ্যে প্রত্যেক জাতি এখন নিজের কড়া-ক্রান্তি হিসাব মিলিয়ে নিচ্ছে। একথা আজ ইউরোপে সহসা কোথাও শোনা যাচ্ছে না, মানবজাতির কল্যাণ কোন্ পথে আসবে, কেমন করে সে মহত্তর জীবনে উন্নীত হবে, নতুন কালের মানবসাধারণ কোন্ চিত্তজয়ী মন্ত্রে দীক্ষা নেবে। ইউরোপে সর্বত্রই যেন আত্মিকশক্তির সাধনা কমে এসেছে।

পূর্ব ইউরোপের সোস্যালিষ্ট দেশগুলি পশ্চিম জার্মানিকে অদ্যাবধি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে না। তাদের ধারণা, হিটলারের ভূত এখনও কোথাও-কোথাও গা ঢাকা দিয়ে আছে। জার্মানিকে ভয় করে সবাই, কারণ জার্মানি ক্ষাত্রধর্মী। কিন্তু ওর মধ্যে আমেরিকা জার্মানির প্রতি অনুরক্ত এবং জার্মান ভূমিতে অদ্যাবধি মার্কিন সৈন্যদল থাকার জন্য আমেরিকার প্রতি জার্মানি অতিশয় বিরক্ত। এই আনুরক্তি ও বিরক্তির আলোচনা উঠলেই একটি কথা সুস্পষ্ট হয়। নাৎসী আমলে পদার্থ, রসায়ন ও গণিত বিদ্যার উৎকর্ষের ফলে জার্মান বিজ্ঞান-প্রতিভা এবং তাদের বিচিত্র রকেট, অন্যান্য মারণাস্ত্র এবং পরমানবিক গবেষণার সাফল্য পৃথিবীব্যাপী ত্রাসের সঞ্চার করে। যুদ্ধের কালে সেই প্রতিভাধর জার্মান বিজ্ঞানীদেরকে অতি সমাদরের সঙ্গে ডেকে নিয়ে যাওয়া হয় মার্কিন দেশে। এলবার্ট আইনস্টাইনকে কেন্দ্র করে বহু বিশ্ববিশ্রুত জার্মান বিজ্ঞানী নিউ জার্সি স্টেটের প্রিন্সটন শহরে গিয়ে হাজির হন এবং সেখানে অব্রাহাম ফ্লেক্সনার কর্তৃক স্থাপিত 'ইনষ্টিটিউট ফর এ্যাডভান্সড্ ষ্টাটিজে' যোগদান করেন। অটো হান্স্ আমেরিকায় যান অনেক পরে। বিগত ৪০ বছরে মার্কিন দেশে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যায় যত উন্নতি ঘটেছে, তার অধিকাংশের দাবিদার হতে পারেন জার্মান বিজ্ঞানীরা। সেই কারণে জার্মানির প্রতি মার্কিন অনুরাগ আন্তরিক। জনশ্রুতি এই, যুদ্ধবন্দী জার্মান বিজ্ঞানীরাই নাকি সোভিয়েট ইউনিয়নে গিয়ে একদা হাইড্রজেন বোমা বিস্ফোরণ করেন (১৯৪৮)।

ছোট একটি ঝকঝকে নতুন শহর 'ব্যাড গডেসবার্গে' বসে আছি রাইন নদীর তীরে। 'ব্যাড' মানে এদেশে ধাতব মিশ্রিত জলের উৎসস্থান অর্থাৎ স্পা। ধাতব জলের সন্ধান এখনও পাইনি বটে, তবে নদীতটের দৃশ্য জার্মানির ধনীসমাজকে এখানে আকৃষ্ট করে রাখে বহুকাল থেকে। এখান থেকে পশ্চিম জার্মানির রাজধানী বন্ নগর মাত্র মাইল পাঁচেক দূরে। ২৫।৩০ বছর আগেই বন্ ছিল এক গ্রামীণ

জনপদ। জলহাওয়া এ অঞ্চলে খুবই ভাল, তাই অনেকে এখানে বেড়িয়ে যেত গ্রামাঞ্চলে রাইন নদীর তীরে-তীরে। যুদ্ধের পর ১৯৪৯ সাল থেকে এটিকে রাজধানীতে পরিণত করা হয়। তখন বন্-এর সঙ্গে গডেসবার্গ একাকার হয়ে যায়।

রাইন নদীর তীরে পরিভ্রমণ করছিলুম। নদীর ওপার হল বনময় এবং তার পটভূমি হল পাহাড়ের পর পাহাড়,—এ যেন শোভা-সৌন্দর্যের অমরাবতী। নদীর তটের ধারে একটি মস্ত বড় হোটেল—যেটি আগাগোড়া,—এমন কি মাথার চালা পর্যন্ত কাঁচনির্মিত।ভিতরে রোদ আসবে, সারাদিন ধরে আলোয় ঝলমল করবে।কিন্তু শীতের দিনে ঠাণ্ডা হাওয়া বা তুষারপাতের আক্রমণ ঘটবে না। ওইখানে বসেই মিঃ জিক্‌গ্রাফ বলছিল, এই সেই রাইন, মানুষের রক্তে যার রং বার বার রাঙ্গা হয়েছে! এই উপত্যকা নিয়ে মনোমালিন্যের ইতিহাস অনেক কালের। সে কেবল ভাঙ্গা আর গড়ার কাহিনী।

সেদিন সকালে বন্-এ সরকারি প্রশাসন ভবনে ঢুকলুম। বন্ এখন বড় হয়েছে। কিন্তু গ্রামের সেই পরিবেশ, বন-বাগান-বৃক্ষজটলা-জলাশয়াদি আশেপাশে রেখেও বন্-এর সুন্দর চেহারাটি দাঁড়িয়ে রয়েছে। সমগ্র ইউরোপে মনে হয় বন্ যেন সর্বাপেক্ষা সুশ্রী। ওদের সংস্কৃতিবিভাগের মন্ত্রীর সঙ্গে আধঘণ্টাখানেক আলাপ করে খুশী হলুম। অনেকগুলি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে উনি আমার সংযোগ ঘটিয়ে দিলেন। ভারত সম্বন্ধে এঁর যে শ্রদ্ধাপ্রকাশটি দেখলুম সেটি খুবই মূল্যবান। জার্মান ভাষায় ভারতের বহু গ্রন্থ বহুকাল থেকে জার্মানিতে প্রচলিত আছে। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এঁদের অপরিসীম শ্রদ্ধা। আমি সেই সূত্রেই কাউণ্ট কাইজারলিংয়ের কথা তুললুম। মন্ত্রীমহাশয় তাঁর সহকর্মীদের নিয়ে অতঃপর সেদিন মধ্যাহ্নভোজে আমাকে ঘণ্টা দুই আগেই আমন্ত্রণ জানিয়ে রাখলেন। সেই আমন্ত্রণ আমি গ্রহণ করেছিলুম।

পরদিন জিক্‌গ্রাফ আমাকে কলোন নগরে নিয়ে এলেন। রাত্রে সেদিন ঘণ্টাখানেকের জন্য কলোন দেখে গিয়েছিলুম, কিন্তু দিনমানে সেই নগরের নির্মাণসজ্জা চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। বিগত বিশ্বযুদ্ধের সকল অভিশাপের মধ্যে এই আশীর্বাদও যেন কোথাও লুকিয়ে ছিল। লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যু ও সামগ্রিক ধ্বংসের পর চারিদিকে এই পরমসুন্দর স্থাপত্য এবং ভাস্কর্য আবার মাথা তুলেছে। ঘরবাড়ি, প্রাসাদ, অট্টালিকা, নগরের সর্বাঙ্গীণ অলঙ্করণ, পথ ঘাট অলিগলির আমূল সংস্কার, —সব যেন মায়াবী মন্ত্রে নির্মিত। কলোন ক্যাথিড্রালের ভিতরটা যেন রূপলোক এবং এক বিরাট স্বপ্নপুরী। বার্মিংহামের লিচ্‌ফিল্ড গির্জা, প্যারিসের নোটার দাম, এবং কলোনের প্রাচীন ১৪শ শতাব্দীর গির্জা, —বোধহয় এই তিনটি গির্জাই ইউরোপের প্রধান সম্পদ। কিন্তু সোভিয়েট কিংবা মিত্রশক্তির বোমাবর্ষণে সমগ্র কলোন নগরীর মতো এই গির্জারও যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছিল।

কলোন থেকে আমরা রাইনল্যাণ্ডের ভিতর দিয়ে যাচ্ছিলুম ডুসেলডর্ফের দিকে। সমগ্র পথটি এমনই মসৃণ ও মোলায়েম,—যেন শয়নকক্ষের পালিশকরা মোজাইক মেঝের উপর দিয়ে গাড়িখানা পিছলিয়ে চলে। পথের দুইধারে দেখতে-দেখতে যাচ্ছি হরিৎক্ষেত্রের আশেপাশে ছবির মতো গ্রাম ও ছোট ছোট জনপদ। ওই সঙ্গে দেখছি মনোরেল ও মনোট্রেন, দেখতে পাচ্ছি মাঝে মাঝে ইন্ ও ট্যাভার্ন, আবার দেখছি কোথাও শিল্পসংস্থা আর কারখানা, বন আর অরণ্য, পাহাড়তলীর ধারে শস্যরক্ষণ-

শালা,—এবং তারপরেই এসে উপস্থিত হল নদীতটপ্রান্ত। রাইন নদীর এপার থেকে ওপারে যাবার জন্য একটি রজ্জুপথ। রজ্জুর উপর থেকে ঝুলছে ছোট একটি কেবিন, এবং সমস্তটা বিদ্যুৎচালিত। জিকগ্রাফের সঙ্গে সেই কেবিনে উঠলুম। তারপর কে যেন কোথায় বোতাম টিপে দিল। ছিন্নমুণ্ড অসুরের চুলের ঝুঁটি যেমন ধরে থাকেন অসুরনাশিনী, তেমনি একটা আংটার সাহায্যে আমাদের কেবিনটি শূন্যে ঝুলতে লাগল,—এবং আমরা সেই ভাবে ধীরগতিতে রাইন নদী পারাপার করে এলুম।

ডুসেলডর্ফের খ্যাতি তার ব্যাঙ্কগুলির জন্য। পশ্চিম জার্মানিতে যত ব্যাঙ্ক আছে, সব এইখানে। এই বৃহৎ নগরীর সম্পদশ্রী দুই চক্ষুকে অভিভূত করে। অশ্রান্তভাবে এক এক অঞ্চলে নবনির্মাণ চলছে। নগরের পথে বড় বড় শিল্প-প্রতিষ্ঠান। জনবহুল রাজপথগুলির দুই ধারে বড় বড় 'শো-কেস'—যাদের একেকটি লক্ষ লক্ষ মার্ক মূল্যের পণ্যবিপনিতে ভরা। এদেশ কখনও বোমাবিধ্বস্ত হয়েছিল কিনা, এখন সন্দেহ হয়। আমরা দু ঘণ্টা কাল এপথ-ওপথ পরিদর্শন করে বেড়ালুম। আবার ফিরে এলুম কলোন হয়ে গডেসবার্গে।

পরদিন দুপুরে বিদ্যুৎচালিত ট্রেনযোগে আমরা প্রায় দুশ' মাইল দক্ষিণে এক বিশাল পার্বত্যশহর হাইডেলবার্গে এসে পৌঁছলুম। এই নগরের পাহাড়তলীর নিচে 'নেকার' নামক এক বন্য নদী বয়ে চলেছে, এবং এই ভূখণ্ড 'নেকার উপত্যকা' নামে পরিচিত। আমরা যে হোটেলে এসে দুটি ঘর নিলুম তার নাম 'স্ক্রিডার' (Schrieder) হোটেল। এর মালিক হলেন এক সুশ্রী অল্পবয়সী মহিলা—যিনি নৃত্যগীতে নাম করেছেন। সন্ধ্যার আগে পর্যন্ত তিনি হোটেল পরিচালনা করেন, রাত্রের দিকে ব্যস্ত থাকেন। আমরা এমন দুটি ঘর বেছে নিলুম, যেখান থেকে অবারিত প্রান্তর দেখা যায়। এখানে আমার দিন তিনেকের জন্য ব্যবস্থা ছিল।

হাইডেলবার্গ শব্দটির অর্থ 'ব্লু-বেরি হিল্‌স্।' এ যেন এসে পড়েছি আলমোড়া শহরে। প্রায় চারিদিক পাহাড়ঘেরা, এবং পাহাড়ে-পাহাড়ে অরণ্যের শোভা। নিচে দিয়ে চলেছে নেকার নদী, এবং শহরের প্রবেশপথে একটি সুবৃহৎ প্রাচীন তোরণ। আমাদের পাহাড় পরিক্রমাকালে দেখছিলুম পুরনো একেকটি প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ। আমরা দেখছিলুম বিশ্ববিদ্যালয় এবং ছাত্রাবাস। দেখছিলুম প্রাচীন আমলের বহু স্মৃতিসৌধ। এক পাহাড় থেকে অন্য পাহাড়ে যাবার জন্য তিনটি সেতু নির্মাণ করা হয়েছে। একটি সেতু পার হয়ে আমরা বৃহত্তর দেশের উপত্যকাপথে বেরিয়ে পড়লুম। আমরা একটির পর একটি ট্যাভার্ন পেরিয়ে যাচ্ছিলুম। জিকগ্রাফের এক বন্ধু হারমুখ লেহর আমাদের গাড়ির ষ্টিয়ারিং ধরলেন, এবং আমরা তিনজনে অতঃপর সেই অজানা অনামা নেকার-উপত্যকাপথ ধরে কোথায় গিয়ে সেদিন পৌঁছলুম, এখন অতটা আর মনে নেই। আমাদের তিনজনের হাস্যমুখর দিনমান কেমন করে কাটল, কোথায় কোথায় গেলুম, কোন্ কোন্ পান্থশালায় বসে কি কি খেলুম, কৌতুকে আলাপে ও আনন্দে কেমন করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেল, বিদেশী আকাশের পশ্চিম দিকে সূর্যাস্ত কেমন রঙ্গীন হয়ে উঠেছিল,—সেসব আলোচনা এখানে অবান্তর মনে হতে পারে।

ক্লান্তদেহে হোটেলের ঘরে যখন ঢুকলুম তখন অকাল নিদ্রায় দুই চোখ জড়িয়ে এসেছে।

পরদিন মাইল দশেক দূরে পাহাড় ও উপত্যকার ভিতর দিয়ে আমরা দেখতে গেলুম মুদ্রাযন্ত্র নির্মাণের এক অতি বৃহৎ শিল্পপ্রতিষ্ঠান। এখান থেকে পৃথিবীর বহু দেশে রোটারি, ফ্ল্যাট, যব-ওয়ার্ক, ট্রেডল্ প্রভৃতি বহুপ্রকার মেসিন সরবরাহ করা হয়। অফসেট, মনোটাইপ ইত্যাদি সম্বন্ধে আমার কিছু ঔৎসুক্য ছিল। এই প্রতিষ্ঠানের যিনি ডাইরেকটর তিনি আমাদেরকে লাঞ্চে আমন্ত্রণ করেছিলেন। ইনি অবস্থাপন্ন ব্যক্তি, কিন্তু ইনি যে-পরিবারে বিবাহ করেন সেই পরিবার বিশেষভাবে ধনী, সম্ভ্রান্ত ও উচ্চশিক্ষিত। দুর্ভাগ্যের বিষয়, সেই দাস-দাসী পরিবৃত ধনাঢ্য পরিবার ভাগ্যচক্রান্তে পড়ে গেছেন পূর্ব জার্মানির অর্থাৎ জার্মান ডেমোক্রাটিক রিপাবলিক এলাকার মধ্যে। তাঁরা এখন সর্বস্বান্ত এবং সর্বপ্রকার স্বাচ্ছল্য থেকে বঞ্চিত। খবর পাওয়া গেছে একখানা আসবাবপত্রহীন ঘরে তাঁরা বাস করতে বাধ্য হচ্ছেন, অতিশয় পরিশ্রমের ফলে শ্বশুর মহাশয়ের মস্তিষ্কের কিছু বিকার ঘটেছে, শাশুড়ি কেঁদে-কেঁদে অন্ধ, এবং তাঁর একমাত্র শ্যালিকা—যাঁর স্বামী রয়েছেন পশ্চিম বার্লিনে—সেই শ্যালিকা ফসলের ক্ষেতে কাজ করে দৈনিক ৮ ঘণ্টা। কাজ খারাপ হলে, বা কাজে গাফিলতি প্রকাশ পেলে বা কামাই করলে দৈনিক রেশন বন্ধ হয়ে যায়। মেয়েটার বিয়ে হয়েছে মাত্র বছর তিনেক,—ছেলেপুলে হয়নি। যে-মেয়ে কখনও এক পা হাঁটেনি, যে-মেয়ে কখনও পেটের দায়ে খাবার কিনতে বেরোয়নি,—তাকে 'কিউ' দিয়ে বাসি পাউরুটির জন্য দাঁড়াতে হয় রেশনের দোকানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। আমরা এখন ওদের সকলের মৃত্যু কামনা করছি!

ভদ্রলোকের মুখে অন্যান্য বর্ণনা শুনে সেদিন আমার আহারে রুচি চলে গিয়েছিল।

এবার আমি হাইডেলবার্গ ছেড়ে ষ্টুটগার্ট-এর দিকে ট্রেনযোগে রওনা হলুম। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এবার আমার প্রিয়বন্ধু, গাইড এবং নিত্যসহচর শ্রীমান্ জিক্‌গ্রাফকে কিছুক্ষণের জন্য ছাড়তে হল। তখনকার মতো আমাকে ট্রেনে তুলে দিয়ে সে বিদায় সম্ভাষণ জানাল। এবার আমি একা। এই অপরিচিত দেশে একা ভ্রমণ করা রোমাঞ্চকর,—বিশেষ করে জার্মান ভাষা যখন জানিনে। চারিদিকে ঐশ্বর্যশালী দেশ, এপাশে ওপাশে শিল্পনগরী,—তাদেরই ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎচালিত ট্রেন বায়ুবেগে চলে যাচ্ছিল দক্ষিণপথে। আমার পাশে বসেছিলেন এক ভদ্রমহিলা এবং সামনের সীটে বসে রয়েছে এক কুঞ্চিত কেশ তরুণ,—যে এখনও যুবক হয়ে ওঠেনি। ঘণ্টাখানেক হয়ত হবে, এমন সময় পাশ থেকে পরিচ্ছন্ন ইংরেজিতে ভদ্রমহিলা স্মিতমুখে প্রশ্ন করলেন, আপনি কি ইণ্ডিয়া থেকে আসছেন?

আজ্ঞে হ্যাঁ—।

দেখুন,—মহিলা বললেন, ইণ্ডিয়া সম্বন্ধে আমার খুবই কৌতূহল। সে দেশের আচার বিচার, মেয়েদের 'ফ্লোয়িং' পোষাক, অনেকের পাকানো পায়জামা,—পুরুষরা একরকম ক্লথ পরে, আবার অনেক মেয়ে মাথায় 'ভার্মিলিয়ন মার্ক' দেয়—এগুলো জানতে আমার ভারি আগ্রহ।

ওঁর কৌতূহলে আমার হাসি পেল। বললুম, অল্প সময়ের মধ্যে আপনাকে কেমন করে সব গুছিয়ে বলব? ভারতবর্ষ ২২টা স্টেটে ভাগ করা। এক একটা স্টেটে এক এক রকম প্রথা আর রীতিনীতি। খুঁটিয়ে বলতে গেলে একটু সময়

লাগে।

মহিলা সোৎসাহে বললেন, আপনার সামনে বসে রয়েছে আমারই ছেলে। আমরা মিউনিখে যাচ্ছি। সেখানেই আমাদের বাড়ি। আপনি যদি মিউনিখে আসেন, আমি আপনাকে নেমন্তন্ন করে রাখছি।

মহিলা আগ্রহ সহকারে তাঁর ঠিকানা ও ফোন নম্বর লিখে দিলেন। আমি তাঁর আমন্ত্রণ গ্রহণ করলুম। অতঃপর আমি যখন ভারতীয় মেয়েদের শাড়িপরা, মাথায় সিঁদুর দেবার তাৎপর্য, বিবাহের রীতি, যৌথ পরিবার, সমাজনীতি, শাস্ত্রীয় আচার, বৈদিক বিবাহ ও উপনয়ন—প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা করে যাচ্ছি, তখন ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই ষ্টুটগার্ট এসে পড়ল, এবং বাধ্য হয়ে আমাকে বক্তৃতা থামাতে হল। নামবার সময় মহিলা বললেন, নিশ্চয় আসবেন অনুরোধ রইল।

ষ্টুটগার্টের বিরাট স্টেশনে নামতেই দুজন ভদ্রলোক এবং এক তরুণী মহিলা এগিয়ে এলেন। মেয়েটি এসেছে ইন্টারন্যাশিওনেস সার্ভিস অফিস থেকে এবং ওঁরা দুজন এসেছেন ভারত-জার্মান সোসায়েটির মুখপাত্ররূপে। ওঁরা আমাকে পরদিন সকালের জন্য আমন্ত্রণ জানালেন।

যে হোটেলে ওঁরা আমাকে নিয়ে গিয়ে তুললেন সেটির নাম "এ্যাম্স্লস্গার্টেন (Amschlossgarten)। বোধ হয় এখন পর্যন্ত যতগুলি রুমে বাস করেছি, এই ঘরটি তাদের মধ্যে সর্বোত্তম। এর সাজসজ্জা এবং ভিতরের অবকাশ শুধু আরাম-দায়কই নয়, এর সর্বাঙ্গীণ সুযোগ-সুবিধা আমাকে আনন্দিত করেছিল। তবে কিনা ঘড়ির কাঁটা মিলিয়ে বিশ্রাম নিতে হয়। ঘণ্টাখানেক বিছানায় গড়িয়ে আবার যখন নিচে নেমে এলুম তখন সন্ধ্যা সাতটা বাজে। জনতিনেক প্রেস রিপোর্টার অপেক্ষা করছিলেন। ওই মেয়েটিও তাঁদের সঙ্গে রয়েছে। সংবাদপত্রের প্রতিনিধি বিশেষ সম্মানের সঙ্গে একটির পর একটি প্রশ্ন তুলে আমার জবাব চাইছিলেন। আমি হাসিমুখে বললুম, দেখুন, আমি রাজনীতির কেউ নই, সাহিত্য বা সংস্কৃতির বিষয় নিয়ে থাকি। তবে ভারত ভাগ্য-বিধাতা মাঝে মাঝে একটু আধটু নড়াচড়া করেন এবং নটরাজের মতন এক একবার তাণ্ডবনৃত্য করেন—এই মাত্র। তারপর আবার তিনি যোগতন্দ্রায় স্থির হয়ে যান। ভারতের জাতীয় প্রতীক্-জন্তু হল হাতী! হাতী যদি হঠাৎ দৌড়তে থাকে, তখন একটু ভয় করে! আবার হাতী ছেড়ে যখন আমাদের জাতীয় পক্ষী ময়ূরের দিকে তাকাই, পেখম তুলে যখন সে নাচে,—আমরা মুগ্ধ হয়ে যাই।

ওঁরা সবাই হেসে অস্থির হচ্ছিলেন। আমি হাসিমুখেই বললুম, নিজের দেশের সুখ্যাতি নিজের মুখে নাই বা করলুম। অন্যদিকে আবার দেখুন, দেশের বাইরে এসে দেশের সমালোচনা করব, সেও আমি পারব না। আমি আপনাদের দেশ ও জীবন দেখতে এসেছি। এতেই আমার আনন্দ।

পরদিন দুখানি সংবাদপত্রে ছবিসুদ্ধ এই সাক্ষাৎকারটি ছাপা হয়েছিল বটে, কিন্তু জার্মান ভাষা না জানায় একটি বর্ণও আমার মাথায় ঢোকেনি।

যাই হোক, সেই সন্ধ্যায় ওই মেয়েটি যখন আমাকে ডিনারে নিয়ে যাবার উদ্যোগ করছে, সেইক্ষণে প্রিয় বন্ধু জিক্গ্রাফ অপর একজন ভারতীয় মিঃ জৈনকে সঙ্গে নিয়ে এলেন। জৈনকে পেয়ে আনন্দিত হলুম। ষ্টুটগার্টের টেলিভিশন টাওয়ার এই হোটেল থেকে অনেকটা দূরে। আমরা কয়জন সেখানকার মস্ত বাগানে ওই

টাওয়ারের ভিতরকার লিফ্‌ট-এ উঠলুম এবং ওটি আমাদের তুলে নিয়ে এল বহু উচ্চচূড়ায়—যেখানে পৌঁছে দেখি, চতুস্তল বৃহৎ একটি গোলাকার রেস্তরাঁ। কানাডার অন্তর্গত নায়াগারা প্রপাতের কাছে এমনি একটি ভোজনালয় দেখেছিলুম, যার উচ্চতা ৭৫০ ফুট। এটি কমপক্ষে ৩০০ ফুট হতে পারে। কিন্তু এই উঁচু টাওয়ার থেকে বিশাল ষ্টুটগার্ট শহরের আলোকমালার বর্ণাঢ্যতা দর্শককে কিয়ৎক্ষণের জন্য অভিভূত করে। আমি ঘুরে ঘুরে ষ্টুটগার্টের নৈশশোভা দেখে বেড়াচ্ছিলুম। খেতে বসলুম আমরা চারজন, এবং এতক্ষণ পরে জানলুম, মেয়েটির নাম এলিজাবেথ। সম্ভবত এ্যাংলো-স্যাকসন পরিবারের মেয়ে। লক্ষ্য করছিলুম, এমন করিৎকর্মা, অধ্যবসায়ী এবং মিষ্টভাষিণী মেয়ে এ যাত্রায় কমই দেখেছি। আমি ওকে ৩।৪ খানা পুস্তিকা সংগ্রহ করবার জন্য অনুরোধ জানিয়ে রাখলুম। মিঃ জৈন এদেশে ভিন্ন কাজে এসেছেন।

শ্রীমতী এলিজাবেথ পরদিন আমাকে নিয়ে গেলেন ইন্দো-জার্মান সোসায়েটির আপিসে। এখানকার যিনি প্রেসিডেণ্ট তাঁর নাম মিঃ ফ্রিটিজ্‌। কথাপ্রসঙ্গে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের আলোচনায় বললেন, ভারতীয় যে সব ছেলেমেয়ে জার্মানিতে আসে, তাদেরকে এখানে এনে এক সপ্তাহের জন্য বিনামূল্যে রাখা হয়। তারা হয় কাজ নিয়ে আসে অথবা কাজ খুঁজে নেয়। আমাদের প্রধান কেন্দ্র হল মিউনিখে।

এখানে ইনটারন্যাশিয়োনেস আপিস এবং লাইব্রেরীটি দেখার মতো। ফ্রিটিজ্‌ বললেন, ইউরোপের মধ্যে একমাত্র জার্মানি যেখানে পাসপোর্ট লাগে না। জার্মানিকে নতুন করে গড়ে তোলার জন্য পৃথিবীর অনেক দেশের লোক এগিয়ে এসেছে। ভারত বা পাকিস্তান কেউ বাদ যায়নি।

ওখান থেকে বেরিয়ে জনস্রোতের ভিতর দিয়ে জিক্‌গ্রাফ আমাকে নিয়ে চললেন শহরের একটু বাইরে,—যেখানে জগদ্বিখ্যাত "মার্সিডিস বেন্‌জ্‌"-এর মোটর নির্মাণের কারখানা। ভারতেও ওঁদের যৌথপ্রচেষ্টার একটি বা একাধিক প্রতিষ্ঠান আছে, যেখানকার গাড়িগুলির নাম "টাটা-মার্সিডিস বেনজ্‌"। অর্থাৎ ভারতীয় টাটা কোম্পানি এঁদের সঙ্গে যুক্ত। আমার আকর্ষণ হল, আমি দেখে যেতে চাই, কেমন করে প্রতি ১৪ মিনিটে একখানি নতুন গাড়ি নির্মিত হয়ে বিক্রির জন্য বেরিয়ে আসে। ইতিমধ্যেই দেখেছি জার্মান মোটর সর্বাপেক্ষা মজবুত, সর্বাপেক্ষা স্বল্পমূল্যে, এবং সর্বাপেক্ষা কম পেট্রল খায়। যেমন ধরো দুই থেকে আড়াই হাজার মার্ক-এ একখানি ছোট্ট গাড়ি কেনা যায়। মার্ক হল জার্মান টাকা। লক্ষ্য করেছি প্রায় প্রত্যেক শ্রমিকের গাড়ি আছে। তিন হাজার মার্ক-এ চমৎকার টু-সীটার গাড়ি মেলে। যাই হোক মার্সিডিস-বেন্‌জ্‌-এর যিনি পাবলিক রিলেশনস অফিসার—তিনি আমাদেরকে সোজা নিয়ে গেলেন যেখানে কেবলমাত্র যন্ত্রের সাহায্যে প্রথম এক একটি "পার্ট সম্মিলিত" হচ্ছে। এমনটি আগে দেখিনি। আমি ঘড়ি মিলিয়ে দেখছিলুম। এ যেন আগাগোড়া ম্যাজিক। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ—প্রত্যেকটি স্তরে পর্যায়ক্রমে এক একখানি গাড়ির কাঠামো যেন একে একে দানা বেঁধে গড়ে উঠছে। সমস্ত ব্যাপারটা বিদ্যুৎচালিত এবং অটোমাটিক। এখানে প্রতি ২৪ ঘণ্টায় ১০০ গাড়ি বেরিয়ে বাক্সবন্দী হয়ে পৃথিবীর সকল দেশে জাহাজযোগে চালান যায়। প্রতি ১৪ মিনিটে যখন একটি করে গাড়ি তৈরি হয়ে বেরিয়ে আসতে থাকে, তখন এক ব্যক্তি সেই গাড়ির উপর চকখড়ির একটি

দাগ টেনে দেয়,—অর্থাৎ নিখুঁৎ! এই প্রতিষ্ঠান দেখে খুবই আনন্দ পেয়েছিলুম। আমরা পি-আর-ওর সঙ্গে সেদিন লাঞ্চে বসে এঁদের পৃথিবীজোড়া কারবারের গল্প শুনেছিলুম।

এর মধ্যে একদিন এক জার্মান গ্রন্থ প্রকাশক আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। জার্মান ভাষায় তিনিই বোধ করি প্রথম কয়েকজন ভারতীয় কথাশিল্পীর ছোট গল্প সংগ্রহ গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেছিলেন। বইটি বেশ ভালই বিক্রি হয়। সম্ভবত ওই গ্রন্থের মধ্যে আমার গল্পটি তাঁর মনে কিছু রং ধরিয়ে থাকবে। কাগজে আমার খবরটি পড়ে তিনি ইন্দো-জার্মান সোসায়েটির মারফৎ আমাকে আমন্ত্রণ জানান। সুতরাং জিক্‌গ্রাফ সেদিন আমাকে নিয়ে বেরোলেন।

ষ্টুটগার্ট শহর থেকে বেরিয়ে আমরা 'নেকার' নদীতীরের পথ ধরলুম। কর্তৃপক্ষ জানতেন, বন-জঙ্গল-পাহাড় ইত্যাদি আমার প্রিয়। সুতরাং জার্মান প্রকাশক মহাশয় তাঁর যে কর্মকেন্দ্রে আমন্ত্রণ করেছেন, সেটি যে দক্ষিণ পশ্চিম জার্মানির সুপ্রসিদ্ধ 'ব্ল্যাক ফরেষ্ট' এটি আগে আমি বুঝতে পারিনি। এটি বাভারিয়া প্রদেশেরই একটি অংশ। এখানে পশ্চিম অষ্ট্রিয়া এবং দক্ষিণ জার্মানির সীমা বরাবর আল্‌পস্‌ পর্বতমালার পাহাড়তলী নেমে এসেছে বাভারিয়ার অন্তর্গত 'ব্ল্যাক ফরেষ্টে' বা কৃষ্ণারণ্যে। আমাদের সুন্দর ও মসৃণপথটি এক সময় সেই বিশাল উপত্যকার ভিতর দিয়ে অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করল। ঘন গভীর অরণ্য, সন্দেহ নেই। কিন্তু ভারতীয় অরণ্যের দুর্ভেদ্যতা কোথাও নেই। যতদূর চোখ যায়, দেখতে পাচ্ছি সব। দিক-দিগন্তব্যাপী শুধু পাইনের মহারণ্য, তার নিসর্গশোভা বর্ণনাতীত সৌন্দর্যে সুন্দর। কিন্তু এখানে হরিণ ছোটে না, বাইসন তাড়া করে না, ভালুক বেরোয় না, বাঘের ভয় নেই, 'রোগ্‌' এলিফ্যাণ্ট্‌ কাকে বলে কেউ জানে না,—সুতরাং এ অরণ্য কেমন-তরো? এখানে লোকেরা বাসভাড়া নিয়ে পিক্‌নিক করতে যাচ্ছে, তিন বন্ধু সাইকেল চড়ে ঢুকছে পাইনের বনে, একা মেয়েরা চলেছে গাড়ি হাঁকিয়ে—এ কেমন বন? এখানে ভারতীয় অরণ্যের মতো ভয়, উৎকণ্ঠা, হৃৎকম্প, থ্রীল্‌—কিছু নেই। এ যেন সাজানো গোছানো, এ যেন মানুষের পরিভ্রমণের উৎসাহকে জাগিয়ে তোলে।

ওই অরণ্যের ভিতরে ভিতরেই ছোট ছোট বাগান বাড়ি যেন চারিদিকের বিশালতার পটভূমিতে এক একটি আঁকা ছবি। মাঝে মাঝে শপিং সেণ্টার, প্রত্যেকের আছে গাড়ি এবং টেলিফোন—কোথাও কোনও অভাব বা অসুবিধার চিহ্ন নেই। আমরা যখন নির্দিষ্ট ঠিকানায় এসে পৌঁছলুম তখনও অপরাহ্ণের রোদ রয়েছে। খবর পেয়ে যিনি এসে অভ্যর্থনা করলেন তিনি স্বয়ং গ্রন্থ প্রকাশক, তাঁর নাম হরসট্‌ এর্দমান্‌ ভের্লাগ। তিনি জার্মান ইহুদী, এবং সুপণ্ডিত। আমাদেরকে সাদরে ভিতরে নিয়ে গেলেন। ভিতরে তাঁর আপিস। সেখানে কাজ করছেন এক তরুণী মহিলা—এর্দমানের সেক্রেটারি। ওঁরা আমাদের জন্য চা ও জলযোগের ব্যবস্থা করলেন। ভদ্রলোকের মাথায় মস্ত টাক, বয়স আন্দাজ পঞ্চাশ। বহুক্ষণ অবধি তিনি ভারতীয় বিভিন্ন সাহিত্য সম্বন্ধে আমার সঙ্গে আলাপ আলোচনা করলেন।

বোধ হয় এই গ্রন্থব্যবসায়ীর একটু সুনজরেই আমি পড়ে থাকব। সেই জন্য আমার একখানি গ্রন্থের [দেবতাত্মা হিমালয়] জার্মান অনুবাদের ভার নিয়ে সেদিন তিনি আমার সঙ্গে একটি চুক্তিবন্ধ হলেন। আমি তাঁর কাজের জন্য ভারতীয় ৪টি ভাষা নিয়ে একটি পরিকল্পনা পেশ করলুম। বহুদিন পরে তিনি আমাকে এক

সাক্ষাৎকারে বলেন, "You are the father of the whole scheme."

জিক্‌গ্রাফের সঙ্গে যখন ষ্টুটগার্টে আবার ফিরে এলুম তখন রাত্রিকাল। সেদিন ডিনারে বসে আমাকে অভিনন্দন জানালো এলিজাবেথ, কারণ আমার গ্রন্থ 'দেবতাত্মা হিমালয়' জার্মান ভাষায় প্রকাশিত হলে ওঁরা পড়ে আনন্দ পাবেন। হাসিমুখে আমি বললুম, আমিও খুশী, কারণ আপাতত কিছু বিদেশী মুদ্রায় আমার পকেটটা ঈষৎ ভারি মনে হচ্ছে!

উচ্চ রোলে জিক্‌গ্রাফ ও এলিজাবেথ হেসে উঠল।

কিন্তু আমার বিশ্রাম ছিলনা। পরদিন সকালে গিয়ে পেঁাছলুম মিঃ মাইয়ার নামক এক অতি প্রসিদ্ধ ছুতোর মিস্ত্রির কারখানায়। ইনি একজন বিশিষ্ট যন্ত্রবিদ্ এবং বিজ্ঞানী। ইনি নিজের চেষ্টায় এবং পরিশ্রমে এমন একটি বিদ্যুৎ চালিত কারখানা গড়ে তুলেছেন—যেটি স্বচক্ষে দেখার জন্য দূর দূরান্তর থেকে লোকেরা এখানে আসে। প্রতিষ্ঠানটি ওঁর বাড়ির সঙ্গেই লাগোয়া। সেইটির মধ্যে ঢুকে দেখি, বিচিত্র তাঁর কর্মযন্ত্র। অন্তত ২০টি মেসিন ও যন্ত্রপাতি তিনি নিজে আবিষ্কার করেছেন এই ছুতোরের কাজের জন্য—যার ফলে সাত দিনের পরিশ্রমের কাজ মাত্র ২ দিনে সম্পন্ন করা যায়। ঘন্টা দেড়েক ধরে আমরা মিঃ মাইয়ারের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে তাঁর অভিনব আবিষ্কার ও কর্মপদ্ধতি পর্যবেক্ষণ করলুম।

বিদায় নেবার আগে মিসেস মাইয়ার চা ও মিষ্টান্নের দ্বারা আমাদেরকে আপ্যায়িত করলেন। একালে জার্মানি তার সমবেত চেষ্টায় নতুন এক জীবন নির্মাণ করে চলেছে সন্দেহ নেই।

ষ্টুটগার্ট ভ্রমণ আমার শেষ হয়েছিল। জিক্‌গ্রাফ আমাকে একাধিকবার অভিনন্দন জানাচ্ছিলেন, কারণ আমার অধ্যবসায় এবং ঔৎসুক্য নাকি অফুরন্ত। আমরা দু'জনে পথের এক রেস্তরাঁয় সামান্য কিছু খেয়ে সন্ধ্যার সময় যাচ্ছিলুম স্টেশনের দিকে। মিউনিখের গাড়ি ছাড়বে ৭-৪০ মিনিটে। এদেশের গাড়ি মিনিট ও সেকেন্ড ধরে ছাড়ে। গাড়িতে উঠে দেখি, মিনিট খানেক তখনও বাকি। এমন সময় অনেক দূর থেকে দেখি. এলিজাবেথ আসছে ছুটতে ছুটতে। হাতে তার এক গোছা বই। কিন্তু গাড়ি ততক্ষণে ছেড়ে দিয়েছে। গাড়িও ছোটে, এলিজাবেথও ছোটে। গাড়ির গতি বেড়ে ওঠে। কিন্তু জার্মান মেয়ে অত সহজে হার মানেনা। সে প্রাণপণে ওই প্লাটফরমে স্পীড দিল। আমি হাত বাড়িয়েই ছিলুম। সে তড়িৎবেগে ছুটে এসে বাণ্ডিলটা আমার হাতে ধরিয়ে দিল। আমি এই অপরাজেয়া তরুণীর দিকে চেয়ে শুধু বললুম, বন্ধু, তোমাকে নমস্কার!—দেখলুম থমকিয়ে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে সে হাঁপাচ্ছে।

মিউনিখ থেকে তাকে একখানি চিঠি দিয়েছিলুম।

অন্ধকার রাত্রে গাড়ি ছুটছিল গমগমিয়ে। আমরা যাচ্ছিলুম দক্ষিণপূর্ব পথে। জলাশয় পার হচ্ছিলুম একটির পর একটি। উপত্যকাবহুল পথ, কিন্তু উঁচু-নিচু ছুটতে গিয়ে গাড়িতে দোলা লাগে না। এটির নাম "যুরা" অঞ্চল এবং এটি অরণ্যবহুল। অন্ধকারেও আল্‌পস্ পর্বতমালার শীর্ষলোক দেখা যাচ্ছে। কিন্তু আলোর চিহ্ন দেখে বোঝা যায়, মানুষের বসবাস সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে। গাড়ি এসে দাঁড়াল 'উল্‌স্' স্টেশনে। আমরা 'দানিয়ুব' নদী পার হয়ে গেলুম। ইউরোপের কোনও নদী গঙ্গা-পদ্মা-ব্রহ্মপুত্রের মতো প্রশস্ত নয়। বন্যা কাকে বলে, ইউরোপ বিশেষ জানে না।

দানিয়ুব নদীর পরে পেলুম ইউয়ার নদী। সেটি পার হয়ে আবার আমরা একটি নদী পার হলুম, তার নাম 'লেচ।' লেচ নদীর তীরে মস্ত শহর অগ্‌স্‌বার্গ। আবার নদী, নদীর পর নদী, এবং অ্যাম্‌পার নদী,—প্রত্যেকটি আমরা পার হচ্ছিলুম। রাত প্রায় সাড়ে দশটায় যখন মিউনিখে এসে পৌঁছলুম তখন দেখি নগরের কোলের ভিতর বয়ে চলেছে 'ইজার' নদী।

মিউনিখ হল জার্মানির প্রধানতম শহরের অন্যতম। জার্মান ভাষায় এই নগরের নাম 'মুন্‌সেন বা মুন্‌চেন।' অনেকে বলে, মিউনিখ্ বা মুনিখ। আমি একে মিউনিখ বলেই চলেছি। স্টেশনের বাইরে এসে প্রথমটা একটু হকচাকিয়ে গিয়েছিলুম। কিন্তু জনবহুলতার মধ্যে পথ হারাবার আগেই বন্ধুবর জিক্‌গ্রাফ আমাকে গাড়িতে তুলে নিল।

যানবাহনে আর লোক চলাচলে বিরাট মিউনিখ নগর চারদিকে থৈ থৈ করছে। তাদেরই ভিতর দিয়ে আমাদের গাড়ি এসে দাঁড়াল চওড়া ফুটপাথের ধারে। সামনেই বড় হোটেল, নাম 'দয়েচের কেইজার' (Deutcher Kaizar)। আমি সরকারি অতিথি, সুতরাং সর্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং অভিজাত হোটেলে আমার থাকার ব্যবস্থা হবে এ বলাই বাহুল্য। এখানে পৌঁছে আজকের মতো জিক্‌গ্রাফ বিদায় নিল এবং 'রিসেপ-সনের' একটি যুবক আমাকে লিফট-এর সাহায্যে আটতলায় তুলে ৮০৪ নম্বর ঘর-টিতে আমাকে বসিয়ে দিয়ে গেল। আমি সেই রাত্রির মতো নধর ও আরামদায়ক বিছানায় গা এলিয়ে দিলুম।

মিউনিখে দ্রষ্টব্য প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা অগণন। হিটলারের আমলে 'মিউনিখ বীয়ার হল্' বারবার সংবাদপত্রের শিরোনামায় এসেছিল, সেটি আমার দেখা দরকার। তার-পর গেটে (Goethe) ইন্‌ষ্টিটিউট, ইউনিভার্সিটি, ইন্দো-জার্মান সোসায়েটির প্রধান আপিস, প্রযুক্তিবিদ্যার কেন্দ্র, সরকারি বিভিন্ন প্রজেক্টের দপ্তর, সুপ্রসিদ্ধ এক প্রকাশক মিঃ মার্টিনের ওখানে লেখকদের সঙ্গে দেখাশোনা,—এগুলি একে একে শেষ করতে হবে। এগুলির মধ্যে গেটে ইন্‌ষ্টিটিউটের কর্মপদ্ধতি এবং তাঁদের পাঠাগার আমার ভাল লেগেছিল। ভারতের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ডঃ রাধাকৃষ্ণনের প্রতিষ্ঠা ও সমা-দর এদেশে প্রচুর।

আমি এখন বাভারিয়া প্রদেশের মধ্যে ঘোরাফেরা করছি এবং এই প্রদেশটির উত্তরে, পূর্বে ও পশ্চিমে দানিয়ুব নদী প্রবাহিত। মিউনিখ বাভারিয়ার সর্বপ্রধান শহর। যাই হোক, সেদিন এক হোটেলে আমার মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন ছিল। এখানে যাঁদের দেখা পেয়েছিলুম তাঁদের মধ্যে ছিলেন মিউনিখ বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত বৃদ্ধ ভাইস-চ্যান্সেলর, বিশিষ্ট কয়েকজন সরকারি কর্মচারি,—তাঁরা শ্রমিক ও সমাজ উন্নয়ন বিভাগের মন্ত্রী এবং কয়েকজন অধ্যাপক। আমার প্রশ্ন ছিল এই, আপনারা সকলে থাকতে হিটলার কেমন করে ক্ষমতায় এসেছিলেন? আপনারাও কি ভোট দিয়েছিলেন?

ভাইস-চ্যান্সেলর ভদ্রলোকের বয়স প্রায় আশী। তিনি জবাব দিলেন, আজ্ঞে হ্যাঁ, ভোট দিয়েছিলুম বৈ কি। কিন্তু কেন জানেন? লোকটা ছিল যাদুকর, এবং আমা-দেরও ভূতে পেয়েছিল!

উপস্থিত সবাই তাঁর কথায় হেসে উঠলেন।

রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে কথা উঠেছিল। তিনি তিনবার এসেছিলেন জার্মানিতে। সেটি

১৯২১ থেকে ১৯৩০-এর মধ্যে। জার্মানির ইতিহাসে তাঁর তিনবারের ভ্রমণ উজ্জ্বল অক্ষরে লেখা হয়ে আছে। একজন ঋষিতুল্য বিদেশী কবিকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য জার্মানির একেকটি শহর উত্তাল হয়ে উঠেছিল। বার্লিন এবং মিউনিখে তিনি তিনবারই আসেন। ওই ১০ বছরটি ছিল জার্মান সংস্কৃতির স্বর্ণযুগ। আমরা প্রথম মহাযুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি ভুলতে পেরেছিলুম মহাকবির করুণা, মমতা ও শান্তির শাশ্বতবাণীর কল্যাণে। রবীন্দ্রনাথের পরম অনুরাগী জার্মানি।

পূর্ব জার্মানিতে জার্মান সংস্কৃতি ও সাহিত্য বর্তমানে কি ভাবে প্রভাবিত হচ্ছে সে আলোচনাও তুললেন দু'একজন। কিন্তু এখন উভয় জার্মানির সম্পর্কের অনেকটা উন্নতি ঘটেছে। রাষ্ট্রসংঘ দুই জার্মানিকে স্বীকার করে নিয়েছে।

মধ্যাহ্নভোজের পরে জিক্‌গ্রাফ আমাকে নিয়ে চললেন মিউনিখ শহরের বাইরে মাইল পঁচিশেক দূরে একটি রেফুজি শহরে। শহরটির নাম মনে পড়ছে না, তবে এটি 'কোডাক' ক্যামেরার প্রধান কারখানা। এটি আগে ছিল ঘন জঙ্গল। কিন্তু সেই জঙ্গলে পূর্ব জার্মানি ও অন্যান্য সোস্যালিষ্ট দেশের জার্মান অধিবাসীরা এখানে শরণার্থী হয়ে এসে দাঁড়ায়। তারা সম্পূর্ণ নিঃসম্বল, অন্নবস্ত্রহীন ও বাস্তুহারা ছিল। এটি মাত্র এক বছর আগের কথা। এই এক বছরের মধ্যে সরকারি সাহায্য পেয়ে মোট ৩ হাজার পরিবার তাঁদের প্রত্যেকের জন্য নিজেদের হাতে ও পরিশ্রমে এক একটি সুদৃশ্য ও রুচিসম্পন্ন বাংলো বা ফুলবাগানভরা বাড়ি নির্মাণ করেছেন। একেকটি বাড়ি নির্মাণ করতে লেগেছে কমবেশি ৩০ হাজার জার্মান টাকা। এই সুন্দর ও সুদৃশ্য নগরের পিছনে রয়েছে একদিকে অন্তহীন পার্বত্য পাইনের বন, এবং অন্যদিকে পাকা ফসলের প্রান্তর। মাঝে মাঝে স্বচ্ছ সুনীল জলাশয়, গোচারণের মাঠ, পোলট্রি, স্কুল ও কলেজ, টাউন হল, সিনেমা, অপেরা—কী নেই? আমার মনে সন্দেহ হল, মাত্র এক বছরের মধ্যে এই বিরাট কীর্তি কেমন করে সম্ভব?

আমার সন্দেহ এবং অবিশ্বাস নিয়ে এই রেফুজি সেটল্‌মেন্টের দপ্তরে গিয়ে এখানকার বৃদ্ধ মেয়র ও নগরের প্রশাসক—এই দুজনের দপ্তরে গিয়ে বসলুম। ওঁরা প্রথমেই এক বছর আগেকার স্থানীয় জঙ্গলের মানচিত্রটি দেখালেন। অতঃপর প্রতি মাসের ক্রমোন্নতির নক্সাগুলি একে একে বার করলেন। প্রতি মাসে সরকারি সাহায্যে প্রায় আড়াইশ' পাকা একতলা (দ্বিধাবিভক্ত) বাংলো তৈরি হয়েছে। এখানে জার্মানির সর্বপ্রধান চকোলেটের কারখানা গড়ে উঠেছে। দু'হাজার পরিবারের প্রত্যেকের একখানা গাড়ি। লোকসংখ্যা এখানে এখন ১৬ হাজার। প্রত্যেক কর্মীর মাসিক উপার্জন ৬শ' থেকে ৮শ' টাকা। মেয়র মহাশয় বললেন, এখনও সম্পূর্ণ এক বছর হয়নি। আমি চেয়ে-চেয়ে দেখছিলুম, পরিচ্ছন্ন পোষাকে নরনারী ও ছেলেমেয়েরা প্রোজ্জ্বল স্বাস্থ্য নিয়ে ঘোরাফেরা করছে, এবং ওরই মধ্যে লক্ষ্য করছিলুম দু'একটি অসমাপ্ত প্রশস্ত পথে তখনও রাস্তা-পেষা এঞ্জিন চলাফেলা করছে। প্রশাসক মশায় বললেন, রুটি, সব্জি, মাখন, ডিম, দুধ, ফল, মাংস, মাছ প্রভৃতি সর্বপ্রকার খাদ্য এখানেই উৎপাদন করা হয়। সম্প্রতি পোষাকপত্রাদি তৈরি হচ্ছে। এখানে ৩টি হাসপাতাল, কিন্তু রোগী কম। এখানে বহু মেয়ে ফ্যামিলি প্ল্যানিং নিয়ে কাজ করে, তারা জানে সন্তান সংখ্যা বাড়লে সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও সচ্ছলতা কমে যায়। এখানে আবালবৃদ্ধবনিতা-নির্বিচারে প্রতি ব্যক্তির জন্য ১ কেজি দুধ, ৫শ' গ্রাম রুটি, ৩শ' গ্রাম মাংস, মাথা পিছু ২টি ডিম, ৫০ গ্রাম মাখন—এগুলি দৈনিক বরাদ্দ থাকে।

এগুলি সবাই বাড়িতে বসে পায় প্রতিদিন সকাল সাড়ে ছ'টায়। চিনি, সব্জি, ফল ও মাছ—যত খুশী। আমাদের এখানে বড় বড় ৮টা শপিং সেন্টার আছে। বাভারিয়া সরকারের কৃপায় এখানে একজনও বেকার নেই। পড়াশুনো, বই কাগজ ইত্যাদি সবই বিনামূল্যে। এখানে সব শ্রেণীর মিস্ত্রি প্রচুর সংখ্যায় রয়েছে। এ ছাড়া ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, টেকনিশিয়ান, প্রফেসর, মিডওয়াইফ, বিজ্ঞানী—কারও অভাব নেই। আমরা দুজন ঘুরে ঘুরে দেখলুম, সমগ্র শহর শান্ত ও হাসিখুশী। জার্মানরা বোধ হয় জাদু জানে।

সেদিন সন্ধ্যার সময় মিউনিখে ফিরে এলুম।

অতঃপর এই বিরাট সুদৃশ্য নগরের যেটি সর্বপ্রধান অপেরা হাউস, সেইটিতে জিক্‌গ্রাফ আমাকে নিয়ে চলল। আমি যেন এক বিপুল ঐশ্বর্যময় স্বপ্নপুরীর মধ্যে অক্লান্তভাবে বিচরণ করছিলুম। সেই স্বপ্নেরই ঘোরে আমি এসে সেই অপেরা হাউসে ঢুকলুম, যেখানে গীতিনাট্য 'মার্থা' অভিনীত হবে। ভিতরে ঢুকে দেখি এক পরম রমণীয় রঙ্গীন ও বিচিত্র জগৎ। ওই জগতে আমি যেন সর্বাপেক্ষা দরিদ্র, হৃতশ্রী ও বেমানান। আমার মনে পড়ছিল মস্কোর 'বলশয়' থিয়েটার ও প্যারিসের ন্যাশন্যাল অপেরার সৌন্দর্যলোক। এ যেন কথায়-কথায় মানুষকে বাহ্যজ্ঞানশূন্য করে। নৃত্যগীত সমন্বয়ে সেই বিরাট মঞ্চের উপরে যে দৃশ্য উদ্‌ঘাটিত হচ্ছিল, তার চেয়েও কি অপরূপ ইন্দ্রসভা এবং কিন্নর লোক? আমি তন্ময় হয়ে ছিলুম।

মাঝখানে যখন একবার আলো জ্বলে উঠল, আমি যেন গ্রহান্তর থেকে পৃথিবীর উপর আছড়িয়ে পড়লুম। জিক্‌গ্রাফ কানে-কানে বলল, 'নাইট লাইফ' দেখার কথা ভুলবেন না। রাত নটা বাজে।

ওর সঙ্গে বাইরে এসে অতি সুদৃশ্য যে বড় কালো গাড়িখানায় উঠলুম, সে-গাড়ি রাজা-মহারাজাকেই মানায়। কিন্তু জার্মানিতে এই গাড়ি ট্যাক্সিমাত্র! এই ট্যাক্সিতে বসে বাভারিয়ার রাজধানী মিউনিখের নৈশরূপ না দেখলে জার্মানিকে ভাল করে চেনা যায় না। আলোকোচ্ছটায় যেন প্রজ্বলন্ত নগরী। তার প্রাচীন রাজপ্রাসাদ ৪।৫শ' বছর পরেও যেন আন্‌কোরা! প্রাসাদে, অট্টালিকায়, জাতীয় রঙ্গশালায়, যাদুঘরে, আর্ট গ্যালারিতে—সর্বত্র প্রস্তরমূর্তি রচনায় কী সুন্দর ভাস্কর্য। বার্লিনে, বন্‌-এ, ষ্টুটগার্টে, হামবুর্গে, কলোনে, ডুসেলডর্ফে, হাইডেলবার্গে—আধুনিক কালের যে অত্যাশ্চর্য ভাস্কর্য শিল্প দেখতে দেখতে এতদূর এসেছি, এর তুলনা প্যারিসে বা লন্ডনে এমন ফলাও করে নেই। আমার মনে হয় জার্মানি এখন ইউরোপের মধ্যে ধনে, প্রাচুর্যে, সম্পদে, প্রাকৃতের অনন্ত ঐশ্বর্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। আমাদের গাড়ি নগরের বিভিন্ন অঞ্চলে পরিক্রমা করছিল।

সেদিন ইন্দো-জার্মান সোসায়েটির এক পন্ডিত বলছিলেন, ভারত একথা বোধ হয় জানেনা, আমরা ভারতকে জানবার চেষ্টা করে আসছি প্রায় পাঁচশ' বছর থেকে, কিন্তু ভারত আমাদেরকে জানছে মাত্র এই শতাব্দীতে। রবীন্দ্রনাথ আমাদের দেশে আসবার পর থেকে ভারত আমাদেরকে জানতে চাইছে। সংস্কৃতি, সভ্যতা ও দর্শন-শাস্ত্রের দিক থেকে সমস্ত ইউরোপের মধ্যে একমাত্র জার্মানি হল ভারতের সর্বাপেক্ষা নিকট আত্মীয়! ওরা বলে, জার্মানি শান্ত থাকলে ইউরোপ শান্ত! কিন্তু জার্মানির সর্বপ্রকার উন্নতি দেখে যখন বিদ্বেষের ও ঈর্ষার বিষবাষ্প চারিদিকে ঘুলিয়ে ওঠে তখন আসে সংঘর্ষের মনোভাব। হিটলারের মতন পশুপ্রকৃতি দানবের যে আবির্ভাব

ঘটেছিল, তার সব অপরাধ জার্মানির নয়! আপনাকে একথা স্পষ্টই জানাই, পৃথিবীর সব দেশের মধ্যে ভারত-সংস্কৃতি আমাদের কাছে সর্বাপেক্ষা শ্রদ্ধেয়। যদি কখনও আপনারা ইংরেজির মতন জার্মান ভাষা শেখেন, দেখবেন আমরা প্রায় আড়াইশ' বছর ধরে ভারতের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে গ্রন্থাদি প্রকাশ করে আসছি।

সেদিন রাত্রে দুটি নাইট ক্লাবের 'ফ্লোর-ডান্স' দেখে আমরা হোটেলে ফিরেছিলুম। এসব ক্ষেত্রে নৈশভোজের ব্যাপারটা বাইরে বাইরে ঘটে থাকে, এ বলাই বাহুল্য। জিক্‌গ্রাফ যাবার সময় আমাকে একটি সার্টিফিকেট দিয়ে গেল, আপনার প্রাণশক্তি দেখে আমি অবাক হই!

ওকে শুভরাত্রি জানিয়ে আমি লিফ্‌টে উঠে গেলুম। রাত তখন প্রায় ১টা।

॥ ২৩ ॥

প্রিয়বরেষু,

দক্ষিণ বাভারিয়ার বিস্তীর্ণ পার্বত্য এবং আরণ্য অঞ্চলের ভিতর দিয়ে চলে যাচ্ছিলুম। মিউনিখের সঙ্গে 'ইজার' নদী ছেড়ে এসেছি। সামনে আমাদের অন্তহীন নীলাভ আল্‌পস্‌ পর্বতমালা, এবং তার নিচে নিচে নিবিড় ঘন বনপথ। সেই রমণীয় সুদীর্ঘ পথ যেন আমাদেরকে এক বিস্ময় থেকে অন্য বিস্ময়ে নিয়ে চলেছে। মাঝে মাঝে দেখে যাচ্ছি দূরান্তর বিস্তৃত কোমল নীলাভ বিশাল এক একটি জলাশয়। তাদের উপরে রৌদ্রালোকিত আকাশের ছায়া এবং তাদের সুস্থির জলরাশির উপরে আল্‌পস্‌-এর একেকটি চূড়া প্রতিবিম্বিত। আমার মনে পড়ছিল কাশ্মীরের মহাগুনাসের ওপারে তুষারধবল কোহিনূর পর্বতের নিচে সেই দিক্‌চিহ্নহীন জলাশয়—যেটি নীলগঙ্গার (লিডার) উৎস। আমি যেন এক আশ্চর্য পৃথিবীর মধ্যে বিচরণ করছিলুম। এখানে হিমালয়ের আস্বাদ পাচ্ছিলুম।

আল্‌পস্‌ যেন উত্তর ও দক্ষিণ ইউরোপের মাঝখানে মেরুদন্ডের কাজ করছে। একদা মহাকবি কালিদাস যেমন হিমালয়ের দিকে চেয়ে বলেছিলেন, 'পৃথিব্যা ইব মানদন্ডঃ।' অর্থাৎ তখনকার উত্তর ও দক্ষিণ প্রাচ্যের মধ্যকার মেরুদন্ড হ'ল হিমালয়। যাই হোক, আমাদের পথ যেন ধীরে ধীরে গভীর ছায়ালোকের মধ্যে ডুবে যাচ্ছিল। এটি বাভারিয়ার হৃৎকেন্দ্র। এই পথে আল্‌পস্‌-এর সর্বোচ্চ চূড়া 'মন্ট ব্লাঙ্ক' (Mont Blanc) দেখা যায়—যার উচ্চতা ১৮ হাজার কত ফুট যেন। হিমালয়ের তুলনায় এই পর্বতশ্রেণীকে নাবালক বলা চলে জানি, কিন্তু এই আল্‌পস্‌-এর নামে যে অগণিত সংখ্যক আল্‌পাইন্‌ ক্লাব গড়ে উঠেছে পৃথিবীর বহু দেশে, হিমালয়কে কেন্দ্র করে সেই ধরণের প্রতিষ্ঠান অতি অল্প সংখ্যক। জার্মানি, সুইৎজারল্যান্ড, অষ্ট্রিয়া, উত্তর ইতালি, যুগোশ্লাভিয়া, হাঙ্গারি প্রভৃতি দেশগুলিকে আল্‌পস্‌ যেন ভাগ করে দিয়েছে। কিন্তু বাভারিয়ান আল্‌পস্‌-এর ক্রোড়ভূমি না দেখলে এর সম্পূর্ণ শোভা ও শ্রী উপলব্ধি করা যায় না।

আল্‌পস্‌-এর সঙ্গে আমাদের ধওলাধারের মিল রয়েছে অনেক ক্ষেত্রে। চারিদিকে তার নিবিড় ও দুর্ভেদ্য অরণ্য, কিন্তু মাঝখানে তার উচ্চতর যেন উলঙ্গ ফকির—গুল্মলতা বৃক্ষহীন নাগা সন্ন্যাসী।' এর কারণ তার ভৌগোলিক সংস্থা।

বছরের অধিকাংশ কাল সে তুষার সমাচ্ছন্ন থাকে, এবং তার শত শত বিরাট পাথরের দেওয়ালে কোনও উদ্ভিদ্ জন্মায় না। সেই কারণে এদেশে যতগুলি আল্পাইন ক্লাব রয়েছে—যাদের মধ্যে সম্ভবত সুইৎজারল্যাণ্ড প্রধান—তারা 'রক-ক্লাইম্বিংয়ে' সিদ্ধহস্ত। রক-ক্লাইম্বিং এবং আইস-কাটিং—এই দুই বিদ্যায় সুইসরাই বোধ হয় শ্রেষ্ঠ। জার্মানির এই বিদ্যা একদা কারাকোরম বিজয়ে (কে-২) সব চেয়ে বেশি কাজে লেগেছিল।

হাজার হাজার বছর আগে বাভারিয়ানরা উপজাতির পর্যায়ভুক্ত ছিল কিনা আমার জানা নেই। কিন্তু ওই আরণ্য উপত্যকার ফাঁকে ফাঁকে বৃহদাকার হরিৎশোভা-যুক্ত ময়দানের ধারে ধারে বা জলাশয়ের তীরভূমিতে যে আবাসগৃহগুলি দেখছিলুম তাদের বিচিত্র নক্সা এবং গুহাকারসদৃশ অবরোধ ব্যবস্থাদি আমার চোখে অভিনব মনে হচ্ছিল। আমরা অনেক সময় আদিবাসী বা উপজাতিদেরকে একটু অনকম্পার চোখে দেখি, এটি আমাদেরই দৈন্য। যেমন ধরো, আমেরিকার আদিবাসী (রেড ইন্ডিয়ান) বা 'আমিস্' সম্প্রদায়, বা মাফিয়া, বা প্রাচীন স্প্যানিশ-মেক্সিকান, স্কট-ল্যান্ডের 'প্রিটানি', প্রাচ্যের আদি মঙ্গোলীয়, ভারতের ভীল বা সাঁওতাল ইত্যাদি,—এদের সহজাত শিল্পচেতনা, সৌন্দর্যজ্ঞান ও নির্মাণকলা আমাদের আধুনিক বিবে-চনাকে অনেক সময়ে অভিভূত করে। আদি বাভারিয়ানরা তাদের সেই নির্মাণ শিল্পকে একালেও যে সজীব রেখে চলেছে, এটি দেখে আনন্দ পাচ্ছিলুম। আমাদের দেশে প্রাচীন মঙ্গোলীয় স্থাপত্যকলার সংখ্যাতীত নিদর্শন হিমালয়ের উচ্চতর স্তরে যেখানে-সেখানে পাওয়া যায়।

আমাদের গাড়ি চলে যাচ্ছিল একটি বাভারিয়ান জনপদের ভিতর দিয়ে—যার নাম 'হহেন্সওয়াংগ' (Hohenschwangau)। এই জনপদটি প্রাচীন নির্মাণশিল্পের সঙ্গে আধুনিক ফ্যাশনকে মিলিয়ে একটি সুদৃশ্য ল্যান্ডস্কেপ সৃষ্টি করেছে। আমরা তাদেরই ভিতর দিয়ে অগ্রসর হয়ে অবশেষে আল্পস্-এর একটি বৃহৎ উচ্চতার নীচে পাহাড়তলীর ধারে এসে দাঁড়ালুম।

এটি পার্বত্য স্যানাটোরিয়ম। এটিও একটি ব্যাড (bad) অর্থাৎ ইংরেজির স্পা (spa)। এখানে ঝরণা, ওপাশে জলাশয়, পিছনে দূর পাহাড়ের উপরে অনেকগুলি প্রাসাদসদৃশ অট্টালিকা, কয়েকটি শপিং সেন্টার, পেট্রল পাম্প, ক্যাবারে, ছোট বড় অনেকগুলি হোটেল, ট্যাভার্ণ, ক্যান্টিন—চারিদিক একেবারে জাজ্জ্বল্যমান। দলে দলে ছড়িয়ে রয়েছে বাভারিয়ান মেয়ে-পুরুষ,—ফল ও সব্জির দোকান দিয়েছে তাদের মধ্যে অনেকেই। সমগ্র বাভারিয়ায় এবং ফেডারাল রিপাবলিক অফ জার্মানির অন্যান্য অঞ্চলেও এই ধরণের 'ব্যাড্' অসংখ্য। ছুটির অবকাশ এবং অবসর বিনো-দনের বড় বড় জনপদগুলি এক একটি 'ব্যাড্।'

আমরা নানা দৃশ্য দেখতে দেখতে আলপস-এর তলা দিয়ে কমবেশি তিনশ মাইল এসে পড়েছি, এবার ফিরবার পালা। বেলা পড়ে আসছে। আলপস-এর শৃঙ্গলোকে নীলাভ পাথরের বড় বড় দেওয়ালে প্রথম অপরাহ্ণের প্রখর রৌদ্র প্রতি বিম্বিত হয়ে একপ্রকার অনৈসর্গিক বর্ণাঢ্যতা লাভ করেছে। সেই বিচ্ছুরিত বর্ণাভার কাঁপন হৃৎপিণ্ডকে যেন অস্থির করে তোলে। বাভারিয়া অবিস্মরণীয় হয়ে রইল।

আমরা লাঞ্চ খেলুম 'লিস্ল' নামক এক বড় হোটেলে। রাঙ্গা রাঙ্গা তরুণীরা

খাবার দিয়ে যাচ্ছে—যেন রক্তকমলের দল! সামনে পর্বতশ্রেণীর বেষ্টনীর মধ্যে বিশাল নীলাভ হ্রদ—তার চতুর্দিকে ঘন পাইনের আরণ্য শোভা। এই হ্রদের অনেক স্থলে নৌকাচালনার কেন্দ্র দেখা যাচ্ছিল। আমন্ত্রিত হলে এক একটি মেয়েও ভিজিটরদের সঙ্গে তরণীযাত্রায় প্রস্তুত থাকে।

ফিরবার সময় আমরা সীমানা পেরিয়ে অষ্ট্রিয়ার মধ্যে প্রবেশ করলুম। আমাদের গন্তব্যস্থল ছিল 'ইন্‌সব্রাক নগরী।' এটি পশ্চিম অষ্ট্রিয়ার 'টাইরল্‌' অঞ্চলে পড়ে। নূতন দেশের প্রবেশ পথে যা ঘটে, এখানেও পুলিসের কাছে ছাড়পত্র নিয়ে এগোতে হল। আবার আমরা একটি বনপথ ধরলুম। অষ্ট্রিয়ার ভাষা হল জার্মান, এবং বাহ্যদৃশ্যে জার্মানির সঙ্গে কোনও পার্থক্যই চোখে পড়ে না। 'ইন্‌সব্রাক' নগরী পরিভ্রমণ করে ঘণ্টাখানেক পরে আমরা সোজা দক্ষিণপথে চললুম। বেশি নয়, মাইল পঁচিশেক, তারপরেই এক গিরিসংকটের ধারে এসে দাঁড়ালুম—যার এপারে অষ্ট্রিয়া এবং ওপারে উত্তর ইতালী। এই দুইয়ের মাঝখানকার গিরিসংকটের নাম 'ব্রেনার পাস।' বিগত বিশ্বযুদ্ধের কালে এই 'ব্রেনার পাস' একটি বিশেষ কারণে খ্যাতিলাভ করে। এই গিরিসংকটের এক স্থলে অক্ষশক্তির প্রথম দুই নিয়ামক হিটলার এবং মুসোলিনী সঙ্গোপনে দেখাশোনা করতেন এবং তাঁদের ভবিষ্যৎ কর্ম-পন্থা এখানেই স্থির করা হতো। কিন্তু উভয় রাষ্ট্রনিয়ন্তার ভাগ্য ছিল বিরূপ। ১৯৪৫-এর এপ্রিলের শেষ সপ্তাহে বিশ্বযুদ্ধের পরিণামকালে যখন ইতালীর অপমানজনক পতন ঘটে, তখন মুসোলিনী ছদ্মবেশে তাঁর রক্ষিতা পেটাসিকে (Petacci) নিয়ে উত্তরপথে সুইৎজারল্যাণ্ডে পালাবার চেষ্টা করেছিলেন। বোধ হয় মাইল দশেক পথ তখনও বাকি ছিল, এমন সময় 'কমো' নামক এক হ্রদতীরবর্তী শহরে তিনি জাতিয়তাবাদীদের হাতে ধরা পড়েন। সেই ট্রাকের উপরেই সশস্ত্র ১৫ জন জাতিয়তাবাদী উঠে মুসোলিনী ও পেটাসিকে আপাদমস্তক গুলীবিদ্ধ করে হত্যা করে এবং সেই দুটি মৃতদেহ ট্রাকের উপর থেকে ছুড়ে পথে ফেলে দেয়। অতঃপর জনসাধারণ সেই দুই মৃতদেহের উপর থুতু দিতে থাকে। —"and twenty five thousand men like wild animals faught into the crowd to kick Mussolini's body and spit on it. Mussolini's mistress Petacci was also murdered by the men and their bodies were thrown from the truck to the ground." (Reuter, 28. 4. 45). এই ঘটনার দুদিন পরে হিটলার স্বয়ং তাঁর এয়ার-রেড-শেলটারের মধ্যে তাঁর শেষ মুহূর্তের স্ত্রী ইভা ব্রণকে বিষপান করিয়ে নিজেকে গুলী করে মারেন। তাঁর সেই মৃত্যুস্থলটি পশ্চিম বার্লিনে কিছুদিন আগে দেখে এসেছি।

সেদিন অনেক রাত্রে বন্ধুবর বার্ণহার্ড জিক্‌গ্রাফ আমাকে মিউনিখে ফিরিয়ে এনে 'কেইজার' হোটেলের আটতলায় তুলে দিয়ে বিদায় নিয়েছিলেন।

পরদিন সকালে মিউনিখের কতকগুলি বিশেষ বিশেষ প্রতিষ্ঠানে যাবার পালা ছিল। উনি এসে প্রথমেই আমাকে নিয়ে চললেন সুপ্রসিদ্ধ আর্ট গ্যালারিতে। এটিকে চিত্রাঙ্কনের যাদুঘরও বলা চলে। এই সুবৃহৎ জাতীয় চিত্র-শালায় শত শত বছরের বিভিন্ন যুগের রঙগীন চিত্রাদির সঙ্গে আধুনিক কালের সার্থক চারু ও ললিতকলার পরিচয়টিও সযত্নে সুরক্ষিত রয়েছে। ওখান থেকে আমরা চললুম ডাউন টাউনে,—যেখানে বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্র। তারপর

একে একে সরকারি ভবন, বিশ্ববিদ্যালয়, বিজ্ঞান-উন্নয়নের বিভিন্ন কেন্দ্র, মেয়েদের নানাবিধ কর্মপ্রচেষ্টার ক্যাম্প,—একটির পর একটি পরিদর্শন করে এবং মধ্যাহ্নভোজ সেরে যখন ফিরলুম, বেলা তখন তিনটে। মিউনিখে কয়েকজন ভারতীয় ও পাকিস্তানীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল।

একদা হাইডেলবার্গ থেকে ষ্টুটগার্টে যাবার কালে ট্রেনের মধ্যে যে-মহিলার আমন্ত্রণ নিয়েছিলুম তাঁর কথা আমার মনে ছিল। টেলিফোনে তাঁকে পাওয়া গেল। তিনি জানালেন, বিকাল সাড়ে চারটের সময় তাঁর সেই ছেলেটি এসে আমাকে ওঁদের বাড়িতে নিয়ে যাবে। ছেলেটিকে আমি চিনে রেখেছিলুম। সে যখন হাসিমুখে এসে নিচে দাঁড়াল আমি তখন তৈরি। দুজনে বেরিয়ে সে বড়রাস্তায় আমাকে ট্রামগাড়িতে তুললো। এই প্রথম আমি পথে হেঁটে বেরোলুম। বেশ লাগছিল ট্রামে যেতে। ছেলেটি মোটামুটি ইংরেজি বলতে পারে, তবে ভাঙ্গাভাঙ্গা। ওকেই আমি নানাগল্প বলে হাসিয়ে তুলছিলুম। বয়সে ছেলেটি তরুণ কিশোর। ওর মা-বাপের একই সন্তান। এখন সে ইস্কুলের উঁচু ক্লাসে উঠেছে। এমনি করে মাইল তিনেক পথ পেরিয়ে একস্থলে এসে ট্রাম থেকে নামলুম। যে পাড়ার মধ্যে ঢুকলুম সেটি সাধারণ গৃহস্থের বসবাস পল্লী। পথঘাট পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর, প্রায় গায়ে-গায়ে বাড়ি, এবং প্রত্যেকেরই বাড়ির সঙ্গে একটু করে খোলা জায়গা। পাড়াপল্লীর চকচকে চেহারা দেখলেই বুঝতে পারা যায়, এগুলি এই শহরের একেকটি কলোনি। সব দিক নিঃঝুম, কোনও গৃহস্থের কোথাও সাড়াশব্দ নেই। ছেলেটি আমাকে সঙ্গে নিয়ে একস্থলে এসে যখন থামলো, দেখি দোতলার বারান্দা থেকে স্বামীস্ত্রী হাতের ইশারায় আমাকে স্বাগত জানালেন, এবং ভদ্রলোকটি উপর থেকে নেমে এলেন।

ভদ্রলোকের বয়স বছর পঁয়তাল্লিশ। তিনি আমার কোমরে হাত জড়িয়ে সাদরে সম্বর্ধনা করে ভিতরে নিয়ে গেলেন। সিঁড়িতে ওঠবার ঠিক আগে দেখি কুচকুচে কালো লোমশ এক বৃহদাকার ভালুক। উনি বললেন, না না, ভয় পাবেন না, ওটি আমার পোষা কুকুর। ও কিচ্ছু বলবে না।

কুকুর! আরেকবার ফিরে তাকালুম। এত বড় কুকুর আগে কখনও দেখিনি। আমরা দোতলায় গিয়ে উঠলুম। মহিলা সিঁড়ির কাছে এসে হাসিমুখে কলস্বরে অভ্যর্থনা করে তাঁদের বসবার ঘরে নিয়ে বসালেন। বুঝলুম ওঁরা তৈরী ছিলেন। ছেলেটি তার পড়ার ঘরে গিয়ে বসল। মাঝখানে আমি বসলুম। স্বামী আমার পাশে, স্ত্রী মুখোমুখি। ওঁরা বললেন, কোনও ভারতীয়কে এত কাছে থেকে ওঁরা কখনও দেখেননি।

ডিনারে কি-কি খাবেন বলুন? ঠিক ক'টায় আপনার খাবার অভ্যাস? ভারতীয়রা সাধারণত রাত্রে কী খায়? কী ধরণের রান্নাবান্না হয়? আপনারা নাকি হাত দিয়ে খান? জল খান নাকি খাবার সময়? ভারতীয়রা নাকি থালাভরে ভাত-রুটি খায়, এবং মাংস খায় না?

ওঁদের প্রশ্ন করার ভঙ্গী দেখে আমি খুব হাসছিলুম। এবার একটু গুছিয়ে বসলুম। ছেলেটি মধ্যে একবার ট্রে করে তিন পেয়ালা চা, কেক ও বিস্কুট দিয়ে গেল। আমরা গাল-গল্পে বসে গেলুম। ওঁরা যখন শুনলেন, ভারতের ২২টি ষ্টেটে ২২ রকমের আহার্য, এবং ২২ রকম পোষাক-পরিচ্ছদ, যখন শুনলেন কমবেশি শতকরা ৮০ জন কোনও আমীষ সামগ্রী খায় না এবং ছোঁয় না,—তখন ওঁরা অবাক

হলেন। ভারতীয় মেয়েদের পোষাকের বর্ণাঢ্যতা, তাদের অলঙ্কার ব্যবহারের পদ্ধতি, জীবনযাত্রার সরলতা—এগুলি একে একে বলতে হল। ইউরোপ বা আমেরিকায় খাদ্য, পোষাক, বসবাস ব্যবস্থা, ছেলেমেয়েদের বিবাহরীতি—এগুলির মধ্যে কোনও বৈচিত্র্য বা অভিনবত্ব নেই। ভারতে দুশ রকমের শাকসব্জি, তিনশ রকমের ফল, পাঁচশ রকমের শুধু আম—যা ইউরোপ বা আমেরিকার কোথাও নেই। ভারতীয় ছেলেমেয়ের বিয়ের সময়কার আয়োজন বা সমারোহ উৎসব বলে গণ্য হয়। সেই উৎসব এক এক ষ্টেটে এক এক প্রকার। তার শোভা, সৌন্দর্য এবং বর্ণের বাহার বোধ হয় পৃথিবীর কোথাও নেই। মেয়েদের সিঁথিতে সিঁদুর, হাতে শাঁখা, পায়ে আলতা, রাঙাপাড় শাড়ি—এগুলি বিবাহিত মেয়ের চিহ্ন।

এহার্ড দম্পতি একাগ্র মনোযোগে গল্প শুনছিলেন। ওঁরা বেদশাস্ত্রীয় বিবাহের কথা শুনেছেন। ব্রাহ্মণের উপনয়ন ও যজ্ঞোপবীত ধারণের কাহিনী, হোমাগ্নির ব্যাখ্যা, বিবাহের পরে কুশণ্ডিকা, কালরাত্রির তাৎপর্য, শ্রাদ্ধশান্তি এবং আভ্যুদয়িকের ব্যঞ্জনা, পিতৃতর্পণ, দুর্গাপুজার আদি ইতিহাস, রামায়ণ ও মহাভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিবৃত্ত—ওঁদের অপরিসীম কৌতূহলের জবাব দিতে গিয়ে রাত দশটা বাজতে চলল।

আহারাদির পর্ব শেষ করে যখন সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছিলুম মিঃ এহার্ড বললেন, না, একলা আপনার যাওয়া হবে না। আমরা দুজনেই আপনাকে হোটেলে পৌঁছিয়ে দিয়ে আসব, —চলুন।

ওঁদের সেদিনের আতিথেয়তা আমার পক্ষে স্মরণীয় হয়ে রইল।

এবার আমার ফিরবার পালা। পরদিন সকাল সাড়ে নটার মধ্যে নিচে নেমে এলুম আমার সুটকেস নিয়ে। রিসেপসনের সামনে জিকগ্রাফ হাসিমুখে দাঁড়িয়ে। এবার 'আমার যাবার বেলা পিছু ডাকে' জার্মানি। দরজার বাইরে ফুটপাথের ধারে গাড়ি প্রস্তুত। রিসেপসনের মেয়েটাকে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে গাড়িতে উঠলুম। জিকগ্রাফ গল্পগুজব করতে করতে গাড়ি নিয়ে চলল বিমানঘাঁটির দিকে। যেমন করে বহুবার বহু ব্যক্তিকে সাদর আলিঙ্গন করে বিদায় নিয়েছি, জিকগ্রাফের বেলাতেও তাই। সাড়ে দশটায় আমার বিমান ছাড়বে। জিকগ্রাফ করমর্দন করে বিদায় নিয়ে গেল।

ট্রেনের মতো হুইসল দিয়ে প্লেন ছাড়ে না। শুধু সিঁড়িটা সরে যায় এবং দরজাটা বন্ধ হয়। আমি বেশ গুছিয়ে জানলার ধারে—যেটা আমার অভ্যাস—সুস্থ হয়ে বসেছি। প্লেন ছাড়ার পর দেখি একটি তরুণী মেয়ে ওই ভিড়ের মধ্যে বসবার জায়গা খুঁজতে খুঁজতে আমার সামনে এসে থমকিয়ে দাঁড়াল। তার সীট নম্বর আমারই পাশে। টাইট ট্রাউজার ও শার্ট জ্যাকেটপরা মেয়েটির বয়স বছর কুড়ি। 'ক্ষমা করবেন'—বলে আমারই পাশে সে বসল। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই রানওয়ে দিয়ে ছুটতে ছুটতে এক সময় বিমান দূর শূন্যে উড়ে চলল। যখন 'নো স্মোকিং' ও 'ফেস্‌ন্‌ সীট বেল্ট'—এই দুটোর আলো নিবে গেল, আমি তখন ধীরে সুস্থে পকেট থেকে সিগারেট ও দেশালাই বার করে সিগারেট ধরালুম। ঈষৎ সঙ্কোচের সঙ্গে এবার মেয়েটি বলল, আপনার দেশালাইটা একবারটি দেবেন?

দেশালাই! সে কি? এই কচি বয়স তোমার, তুমি ধূমপান করো?

আমার অমায়িক মূঢ়তা দেখে মেয়েটা হঠাৎ হেসে উঠল। বলল, মশিয়ে, আমি

রোজ ৪০।৫০ বার 'স্মোক' করি। আপনার দেশ কোথায়?

দাঁড়াও বলছি। এসো, আগে সীট বদলিয়ে নাও।

দুজনেই উঠে দাঁড়ালুম। জানলার ধারের সীটটা ওকে ছেড়ে দিলুম। তারপর ভব্যতার নীতি অনুযায়ী ওর সিগারেটটা ধরিয়ে দিলুম। ওর রাঙ্গা ওষ্ঠাধরে সিগারেট ঠিক মানায় না। কিন্তু ওই ফাঁকেই দেখে নিলুম, ওর প্যাকেটটা খালি হয়ে গেল। বললুম, আমার দেশ কোথায় পরে বলব। তুমি কোথাকার?

আমি? আমি ফ্রেঞ্চ। মিউনিখে এসেছিলুম আমার এক বন্ধুর কাছে। সকালে এসেছিলুম, এবার ব্রুসেলসে আমার দিদির সঙ্গে দেখা করে প্যারিসে চলে যাব।

তোমার সঙ্গে কে আছে?

সঙ্গে? সঙ্গে আবার কে থাকবে? আমি সপ্তাহে দু' তিনবার আসি।

তোমার মা-বাবা বাধা দেন না? এত অল্প বয়স তোমার!

মেয়েটা কুলকুলিয়ে হেসে উঠল। বলল, মশিয়েঁ, আমার ১৯ বছর বয়স হয়েছে মনে রাখবেন।—এই বলে সে সিগারেটে টান দিল। পরে বলল, বলুন না, আপনি কোন্ দেশের লোক?

এই বলছি, একটু সময় দাও। তোমার মতন অসমসাহসিক মেয়ে দেখে আমি অবাক। তোমার নাম কি? কোন্ ইস্কুলে পড়ো?

এবার মেয়েটা বলল, ইউ আর ফানি! আমি পলিটিক্যাল সায়েন্স পড়ি। আমার নাম ফ্রানকয় ফেলন্।

বললুম, আচ্ছা ফ্রানকয়, তুমি বলতে চাও, তোমার মা একলা তোমাকে ছেড়ে দিলেন? তুমি মেয়ে, —কত বিপদ-আপদ ঘটতে পারে তোমার বিদেশ বিভুঁয়ে...

হাসিমুখে মেয়েটা বলল, গুডনেস! এসব কি বলছেন? আমার মা নিজেও খুব স্মার্ট। এইত, আমার মা তিন সপ্তাহের ছুটি নিয়ে এক চমৎকার যুবকের সঙ্গে সাউথ সী আইল্যান্ডে বেড়াতে গেছেন। মায়ের ভাগ্য ভাল, অমন সুন্দর বন্ধুর সঙ্গে ভাব হয়েছে!

সে কি? তোমার বাবা তাঁকে ছেড়ে দিলেন ওই যুবকের সঙ্গে?

Why not? She's a free woman! She's quite beautiful! আমার বাবা তাঁর হোটেল নিয়ে এখন খুব ব্যস্ত!

ধরো, তোমার বাবা যদি রাগ করে তোমার মাকে ডিভোর্স করেন?

কেন করবেন? —ফ্রান্কয় বাঁকা চোখে বলল, She hasn't done any wrong! She'll come back in three weeks!

এবার আমি একটু দম নিয়ে প্রশ্ন করলুম, আচ্ছা ফ্রান্কয়, তুমি পলিটিক্যাল সায়েন্স পড়ে কি করবে?

মিষ্টকণ্ঠে ফ্রানকয় বলল, আমি আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে গোয়েন্দার (secret service) কাজ নিয়ে থাকব। পলিটিক্স আমার খুব ভাল লাগে। মনে রাখবেন, আমি ফরাসী মেয়ে। And I am a half-boy!

এবার আমিও হেসে বললুম, কিন্তু তোমার বাকি আধখানায় কেউ যদি interested হয়?

ফ্রানকয় হেসে অস্থির হল, এবং জ্যাকেটটা একটু টানতে লাগল দুই উরুদেশের মাঝখানে। আমি ওকে আরেকটি সিগারেট ধরিয়ে দিলুম। ইতিমধ্যে দানিয়ুব

নদী পার হয়ে ষ্টুটগার্টে এসে থেমেছি। কিন্তু আমি যাব ফ্রাঙ্কফার্ট মেইন-এ, অর্থাৎ সোজা উত্তরে। এখন বেলা ১২টা বাজেনি। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই পেঁাছে যাব ফ্রাঙ্কফার্টে, এবং সেখানে বিমানঘাঁটিতে আমাকে অপেক্ষা করতে হবে বিকেল সাড়ে চারটা পর্যন্ত। ফ্রান্‌কয় বলল, তার চেয়ে চলুন না ব্রুসেলস-এ আমার দিদির ওখানে? একটু শাম্‌পেন খেয়ে গল্প করে পরের প্লেনে ফ্রাঙ্কফার্ট ফিরবেন?

চুপ করে ফ্রানকয়ের কণ্ঠস্বরের আন্তরিকতা উপলব্ধি করছিলুম। আমার এই প্রবীণ বয়সে এখন আর ভাববার সময় নেই, কী কারণে মুনি বিশ্বমিত্রের তপোভঙ্গ হয়েছিল! অনর্গল গল্প করছিলুম মেয়েটার সঙ্গে, এবং আমার পরিচয় শুনে মেয়েটার ধারণা হয়েছে ভারতীয়রা বড়ই নিরীহ নিষ্প্রাণ জীব। সুতরাং ওর ওই শামপেনী প্রস্তাব শুনে আমার কানদুটো কতক্ষণ ধরে ভোঁ ভোঁ করেছিল, এখন আর মনে নেই, তবে ইতিমধ্যে কখন ষ্টুটগার্ট চলে গেছে এবং ফ্রাঙ্কফার্টও আসন্ন— এইটি আমি ভুলেছিলুম।

ফ্রাঙ্কফার্টে থামবার সঙ্গে সঙ্গেই ফ্রানকয় আমার লগেজের কার্ডটা চেয়ে নিল এবং নিজের এটাচি কেসটা সীটের উপর রেখে সে সোজা প্লেন থেকে নেমে করিডরের দিকে চলে গেল। আমি খুব পুলকিত হইনি, কারণ আমার লগেজের কার্ডটি আমার পক্ষে বিশেষ মূল্যবান। দ্বিতীয়ত, মেয়েটা মরিয়া ধরণের এবং বলা বাহুল্য, স্বেচ্ছাচারী। কথায় মনে হচ্ছিল, ইউরোপ তার নখদর্পণে, এবং আমার মতন বিদেশীকে এ ধরণের মেয়ে তুড়ি দিয়ে উড়িয়ে দিতে পারে! এখানে আমার নামবার কথা, কিন্তু কুহকিনী মায়া আমাকে যেন আচ্ছন্ন করে রইল। হাতঘড়িতে দেখলুম বেলা দেড়টা বাজে। আমি আড়ষ্ট, নিষ্ক্রিয় এবং হতবুদ্ধির মতো বসে রইলুম। চাবুকের মতো এই স্মার্ট মেয়েটার হাতে আমার কোনও দুর্গতি আছে কিনা তাই ভাবছিলুম।

যতক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল প্লেন, ততক্ষণ মেয়েটার দেখা নেই। কিন্তু সে যে শেষ-মুহূর্তের মেয়ে, সেটি জানলুম প্লেনটি যখন ছাড়ল। দেখি সে ঠিকই এসে হাজির। প্রথমে আমাকে ফিরিয়ে দিল আমার লগেজ কার্ড, এবং দ্বিতীয়—আমার হাতে গুঁজে দিল এক প্যাকেট ঈগলমার্কা জার্মান সিগারেট। আমি চট করে উপহারাদি নিইনে, কিন্তু মেয়েটিকে আহত করতেও মন সরল না। আমি উঠে সরে দাঁড়ালুম। সে নিজের সীটে বসল। ওর পরিবেশে কেমন একটা তারুণ্যের সুগন্ধ পাচ্ছিলুম।

আপনি ব্রুসেলস্-এ নেমে আপনার লগেজ এবং ফ্রাঙ্কফার্টে ফিরবার টিকিটও পাবেন। আপনার ফিরবার ফ্লাইট নম্বর ১১২।

একি করলে ফ্রান্‌কয়? তুমি খরচ করলে? আমি যে—

না, ওসব ভাববেন না। আমি যে প্রথম ভারতীয়কে দেখলুম,—ফ্রান্‌কয় বলল, সেটা বুঝি কিছু না? কিন্তু ভারতীয়রা কি সবাই আপনার মতন গুডি-গুডি?

এবার আমি খুব হেসে উঠলুম। বললুম, চলো না ভারতবর্ষে—দেখবে সব স্বচক্ষে।

মেয়েটা হঠাৎ বলল, I become quiet when I watch your eyes!

কেন বলো ত?

কি জানি, but I feel shy about myself. আপনাকে আমার অনেকদিন মনে থাকবে।

আমি চুপ। ফ্রান্‌কয় আবার বলল, মনে হচ্ছে আপনি চেনা যেন লোক! আপনাকে ঠিক বলতে পারি আমার এই ছুটোছুটির মধ্যে একটা ডিপ্রেসন আছে। বাড়িতে থাকতে মন চায় না। কেন জানেন? আমার মা আমার সম্বন্ধে কোনও এটাচমেণ্ট বোধ করেন না! তিনি আমার চেয়ে অনেক সুন্দরী আর সৌখীন। আমাদের খোঁজ খবরও তিনি নেন না, অথচ আমরা একই সঙ্গে থাকি প্যারিসের 'ক্লেবর এভেনুতে।'

মেয়েটার কণ্ঠে কেমন একটা বিষাদ ও ব্যথার সুর বাজলো। বললুম, তোমার মা কী চান?

ফ্রানকয় বলল, মা? মা বলেন, তোমরা না থাকলে আমি আবার বিয়ে করতে পারতুম! আমি ওই 'পট্‌-বেলিড্‌' হোটেল-কীপারের সঙ্গে এক বিছানায় শুতে ঘৃণা বোধ করি! —আমার বাবা কিন্তু অত্যন্ত ভালো। আচ্ছা, আপনাদের দেশে আমার মার মতন স্মার্ট মহিলা আছেন?

বললুম, হয়ত আছেন কোথাও কোথাও? মনে-মনে হয়ত আছেন অনেকেই। তবে সাবালিকা মেয়ের কাছে ঠিক এ ধরণের কথা তাঁরা বলেন না। কিন্তু কি জানো ফ্রান্‌কয়, মানুষ ত আনন্দ পেতে চায়!

ফ্রানকয় বোধ হয় খুশী হল না। অন্যমনে সিগারেট টানতে লাগল।

দেখতে দেখতে এক সময় 'নো স্মোকিং' ও 'ফেস্‌ন্‌ সীট বেল্ট'-এর আলো জ্বলে উঠল এবং ব্রুসেল্‌স্‌-এর বিশাল বিমানঘাঁটি দূর থেকে দেখা গেল। বেলা তিনটে বাজে। এক সময় লুফ্‌থান্‌সা বিমান নেমে এসে রানওয়েতে ধাক্কা খেয়ে ছুটতে ছুটতে যথাস্থানে থামল। আন্তর্জাতিক বিমানঘাঁটির যে কোনটায় নামলে সেই

ফ্রানকয় এবং আমি বিমান ছেড়ে বাইরে এসে 'লগেজ ক্লেমে' আমার স্যুটকেসটা

একই করিডর, একই চেহারা এবং একই সাঙ্কেতিক নিশানা।

ফ্রানকয় এবং আমি বিমান ছেড়ে বাইরে এসে 'লগেজ ক্লেমে' আমার স্যুটকেসটা গোলাকার ঘূর্ণীচক্র থেকে বের করে নিতেই ফ্রানকয় একপ্রকার জোর করে সেটা নিজের হাতে নিল। বলল, তা হোক চলুন। বাইরে গিয়েই ট্যাক্সি পাবো। দিদির বাড়ি খুব কাছেই। আপনার প্লেন পৌনে পাঁচটায়।

বললুম, কিন্তু তার আগে এই সামনের রেস্তরাঁয় একটু চা খাবো, ফ্রানকয়।

বেশ, আসুন। তবে এখানে চায়ের চেয়ে কফি ভাল। আপনি কফি খান, কেমন?

ফ্রানকয় ভিতরে এসে ছোট টেবিলে মুখোমুখি বসে কফির অর্ডার দিল। প্রথমটায় তার যে চাঞ্চল্য বা অস্থিরতা লক্ষ্য করেছিলুম এখন তার সঙ্গে ওর আচরণ মিলছে না। কফির পাত্রে চুমুক দিয়ে আগে দুজনে সিগারেট ধরিয়ে নিলুম। পরে বললুম, তুমি সিক্রেট সার্ভিস নিয়ে পৃথিবীময় ঘুরে বেড়াবে, সেটি ভেবে আমার হিংসে হচ্ছে, মিস ফেলোঁ।

আমারও ভাবতে খুব ভাল লাগছে, মশিয়ে।

ওকে পরীক্ষা করার জন্যই বললুম, তোমার মতন এ্যামবিশস্‌ মেয়ে কমই দেখেছি, ফ্রানকয়। কিন্তু একটা কথা থেকেই যাচ্ছে। থামবে কোথায় তুমি? কোন্‌ দেশে, কত দূরে, কোন্‌ অজানায়? কেউ কি থাকবে তোমার সঙ্গে?

কফিতে চুমুক দিল ফ্রানকয়, সিগারেট টানল, জ্যাকেটটা টেনে আরেকটু লজ্জা

টাকল। পরে বলল, নাঃ কেউ থাকবে না। I can't stand any companioı
একা আমার খুব ভাল লাগে।,

কতকাল একা তোমার ভাল লাগবে, ফ্রানকয়? —আমি হাসছিলুম।

আ, গুডনেস, এবার আপনি 'সারমনাইজ্' করছেন। চলুন, যাই।

দাঁড়াও, এবার আমি দাম দেবো। এই বলে আমি উঠলুম। বোধ হয় আমা. কণ্ঠে ঈষৎ আত্মপ্রত্যয় প্রকাশ পেয়ে থাকবে, ফ্রানকয় বাধা দিল না। আমি টিপস সুদ্ধ দুই মার্ক দিয়ে দিলুম। পরে বললুম, তুমি আমাকে বাজপাখির মতন ছে মেরে দেশান্তরে এনেছ। আমি তোমার দিদির ওখানে যাব না, ফ্রানকয়। এখা থেকেই বিদায় নেবো।

ফ্রানকয় এক্‌বার আমাকে নিরীক্ষণ করল। পরে বলল, ও, যাবেন না? বেশ চলুন—আপনাকে এগিয়ে দিয়ে আসি তবে? আমাকে মনে রাখবেন ত?

নিশ্চয়ই। তোমাকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানিয়ে যাচ্ছি। তোমার ভবিষ্য জীবন যেন সুন্দর হয়, মিস ফেলোঁ।

সেদিন মলিন হাসিমুখে ফ্রানকয় বিদায় নিয়েছিল, এবং পিছন থেকে আ তার ক্লান্ত সুন্দর দেহলতার দিকে চেয়েছিলুম। ওর সেই অদৃশ্য জননীর প্রতি আমি কিছু বিরক্তি বোধ করেছিলুম, সন্দেহ নেই।

ফ্রাঙ্কফার্টে পেঁছে যাঁকে ফোন করে ডেকেছিলুম, তিনি আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত। তিনি এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে মানুষের জন্ম বা প্রজননতত্ত্ব বিষয়ব (Human genetics) গবেষণা করেন। নাম ডক্টর পি এম গোপীনাথ। আধ ঘণ্টার মধ্যে উনি যখন বিমানঘাঁটিতে এসে পেঁছলেন, চেয়ে দেখলুম খর্বকায় এব পরিণত যুবা, এবং নারকেলের মতো শুষ্ক মুখ। কিন্তু যখন আমরা আলিঙ্গন বদ্ধ হলুম এবং প্রথম মিনিট তিনেক আলাপ করলুম, তখন এই নারকেলের মধু কোমল শাঁসের স্বাদ পেলুম, এবং জানলুম তিনি নারকেলের দেশ কেরালার মানুষ। গোপীনাথ আমাকে সাদর সহাস্য মুখে গ্রহণ করে জানালেন, লণ্ডন থেকে ত এক সতীর্থ অমিয় মুখার্জির চিঠিতে আমার সম্বন্ধে সব কথা তিনি জেনেছে গোপীনাথ আমার সুটকেসটি নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে চললেন।

ফ্রাঙ্কফার্ট আমার পরিচিত। এই বিমানঘাঁটির ঘূর্ণীপাকের তলা দিয়ে নে গেলে এরই সংলগ্ন রেল স্টেশন। সেখান থেকে ট্রেন ধরে মাইল পনেরো পথ পেরি আমরা এই বিরাট নগরের মাঝখানে এসে পেঁছলুম। তারপরে উঠলুম ৮নং ট্রামে সেই ট্রাম মাইল তিনেক পথ অতিক্রম করে যেখানে এসে দাঁড়াল, আমরা সেখ থেকে রাজপথ ধরে এসে পেঁছলুম এক হোটেলে। চেয়ে দেখলুম হোটেলটির নাম 'পেনসন'—উচ্চারণ 'পেঁজিয়ো'। বড় রাস্তার নামটি উচ্চারণ করা কঠিন। যেম 'মেন্‌ডেলেসহন (Mendelessohn) স্ট্রাসে, ৪২।' গোপীনাথ দোতলায় আমাকে তুলে এনে এক বয়স্কা মহিলার সঙ্গে অনর্গল জার্মান ভাষায় কথা বলতে লাগলেন। মহিলার নাম মিস প্রন্‌জ্। তিনি এতটুকুও ইংরেজি বোঝেন না। তবে গোপী নাথের কথা শুনে মাঝে মাঝে আমার দিকে সপ্রশংস চোখে তাকাচ্ছিলেন,—চাহনিতে আমি আড়ষ্ট বোধ করছিলুম। মহিলার সঙ্গে রফা হল, ঘর-বিছানা-ব্রেকফাস্ট এই তিন মিলিয়ে দৈনিক ২৮ মার্ক, অর্থাৎ তখন ভারতীয় ৮৮ টাকার সামান্য বেশি। গোপীনাথ আমাকে ওখানে প্রতিষ্ঠিত করলেন বটে, কিন্তু মহিলার সঙ্গে

আমার 'নির্বাক' সম্পর্কটাই দাঁড়িয়ে গেল। আমি প্রশ্ন করলুম, ওঁর চোখ দুটো গুলীভাঁটার মতন কেন? একটু যেন ডাকাতে-ডাকাতে চাহনি?

গোপীনাথ হো হো করে হেসে উঠলেন। বললেন, মহিলাকে আমি চিনি। গত যুদ্ধের সময় ওঁর চোখের সামনে ওঁর প্রণয়ী বোমার ঘায়ে ছিন্নভিন্ন হন, সেই দৃশ্য দেখে উনি শিউরে ওঠেন। ভয়ে ওঁর চোখদুটো বেরিয়ে আসে। পরে আর বিবাহ করেননি। এই অট্টালিকা ওঁরই সম্পত্তি।

প্রনজ্ আমাদের জন্য কিছু খাদ্য এবং কফি এনে দিলেন। বহুদিন আমি ভাত খাইনি, সুতরাং ডিম, ফুলকপি ও আলুসিদ্ধ সহ ভবিষ্যান্ন বরাদ্দ হল রাত্রের জন্য। ঘণ্টা দুই গল্পগুজবের পর গোপীনাথ বিদায় নিলেন। এমন হৃদয়বান ও সুবিবেচক ব্যক্তি এ যাত্রায় কমই দেখেছি। আমার কেরালা ভ্রমণের কথা উনি সবিস্তারে শুনে গেলেন।

পরবর্তী তিন দিন আমার নিঃশ্বাস নেবার সময় ছিল না। প্রধান দর্শনীয় স্থানগুলি ছিল ১৩ শতকের ইম্পিরিয়াল ক্যাথিড্রল, তারপর ১৬ শতকের সেণ্ট লেয়োনার্ড, সেণ্ট নিকলাস, 'রোমার' টাউন হল, যে বাড়িতে মহামতি গেটে জন্মগ্রহণ করেন,—নগর পরিক্রমায় এগুলি একে একে দেখে যাচ্ছিলুম।

ফ্রাঙ্কফার্ট মস্ত বড় ব্যবসা বাণিজ্যের কেন্দ্র। এখান থেকে প্রতিনিয়ত বিমান-পথে পশ্চিম বার্লিনে রসদ সরবরাহ করা হয়। সে ক্ষেত্রে একমাত্র 'প্যানাম' বিমান ছাড়া অন্য কোনও বিমান সেখানে যেতে পারবে না, এই হল নির্দেশ। পশ্চিম বার্লিনের ওই বিরাট নগরী—যার পরিধি প্রায় দেড়শ মাইল—তাকে পরিপোষণ করা আমেরিকার পক্ষে দুঃসাধ্যসাধনের মতো। এ ছাড়া পশ্চিম জার্মানির দৈনন্দিন উন্নতি দেখে হকচকিয়ে যেতে হয়। পৃথিবীর বহু জাতির লোক—এমন কি ভারত ও পাকিস্তানের শ্রমিক ও কর্মীরাও জার্মানিকে নতুন করে গড়ে তোলবার কাজে নিযুক্ত। খাদ্য, বস্ত্র, অর্থ, আশ্রয় এবং কর্মলাভের সুযোগ—জার্মানীকে নবজীবন দান করেছে। এত বড় একটা ক্ষাত্রধর্মী জাতি—যার 'সুস্পষ্ট' ঐতিহাসিক তথ্যাবলী দু' হাজার বছরেরও বেশি, তার সামগ্রিক পরিচয় মাত্র কয়েকদিনের মধ্যে করায়ত্ব করে নেবো, এ অসম্ভব। আমি এবার বিদায় নেবো। এবার আমার ভ্রমণকালের সমাপ্তি ঘটবে। বহু দূর থেকে আমার দেশজননী আমাকে যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছেন। এবার আমি ক্লান্ত।

চতুর্থ দিন সকালে ডঃ গোপীনাথ আমাকে হোটেল থেকে তুলে সোজা ফ্রাঙ্কফার্ট মইন বিমানঘাঁটিতে তুলে দিয়ে গেলেন। আমার বিমান ছাড়ল সকাল সাড়ে ন'টায়। আমি দক্ষিণ ইউরোপের পথ ধরলুম। একে একে সুইৎজারল্যাণ্ড এবং উত্তর ইতালীর আকাশপথ ধরে যখন ভূমধ্যসাগরের পূর্বতীর ঘেঁষে রোম নগরীর বিমান-ঘাঁটিতে এসে নামলুম তখন মধ্যাহ্নকাল। আমার পাকস্থলীতে এতকাল পরে কতকটা বিপর্যয় ঘটেছিল। আমি অসুস্থ অবস্থায় একখানা ট্যাক্সি নিয়ে যখন 'আমেরিকান' নামক একটি হোটেলে এসে উঠলুম, তখন ট্যাক্সিভাড়া নিল প্রায় ৭০০ 'লিরা' এবং একরাত্রির জন্য হোটেলে অগ্রিম অর্থ নিল ২ হাজার লিরা। এয়ারপোর্টে কাগজপত্র পরীক্ষার কালে এবং ২৪ ঘণ্টার ট্রানজিট্ ভিসা দেবার বিনিময়ে জনৈক ইতালিয়ান কর্মচারী টেবিলের তলা দিয়ে হাতের ইশারায় জানিয়ে কিছু 'ঘুষ' আদায় করে নিল। সে যেন জানিয়ে দিল, ইতালীর মতো দরিদ্র দেশে প্রাত্যহিক

জীবনের সর্বক্ষেত্রে ঘুষ নেওয়া ছাড়া মানুষের চলে না! আমি ৮ পাউন্ড ভাঙিয়ে প্রায় ১১ হাজার লিরা পেয়েছিলুম। লোকটা বোধ হয় ভেবেছিল, আমার কাগজপত্র ঠিকভাবে গুছিয়ে দিলে আমি অন্তত শ পাঁচেক লিরা তাকে দিয়ে যাব। কিন্তু আমি যখন মাত্র ২টি লিরা টেবিলের তলা দিয়ে তার হাতে গুঁজে দিলুম, তখন সেই হাতখানা সহসা যেন পক্ষাঘাতগ্রস্ত ও স্থির হয়ে গেল। তার চোখ দুটো হয়ে উঠল যেন ইতালীয়ান মার্বেলের ডেলা, এবং সেই দিকে চেয়ে আমি অমায়িক সারল্যের হাসি হাসছিলুম। আমি যেন হোমিওপ্যাথী ওষুধ দিয়ে তার দুরারোগ্য ব্যাধি সারাবার চেষ্টা পেয়েছিলুম।

দোতলার ঘরে উঠে আমি অসুস্থ শরীরে সারাদিনের মতো শয্যা নিলুম। সন্ধ্যার দিকে উঠে পথ চিনে-চিনে একটি রেস্তরাঁয় গিয়ে ঢুকলুম। একটি প্লেটে সামান্য দুটি ভাত, একটু বিদেশগন্ধী সিদ্ধ মাছ, সামান্য আলু সিদ্ধ—এর দাম প্রায় ১ হাজার লিরা। পরদিন সকালে যখন মোটরবাসে কন্‌ডাক্‌টেড্‌ টুরে বেরোলুম, আমার কাছে নিল ৬ হাজার লিরা। আমি প্রাচীন রোম নগরীর দরিদ্র ও ঘিঞ্জি অঞ্চলগুলিই দেখছিলুম। আমি জানি এ ভ্রমণ আমার পক্ষে অর্থহীন। রোমের শোভাসৌন্দর্য, ইতালীর প্রাকৃত কাব্য পরিবেশ, ভেনিস, ফ্লোরেন্স, জেনোয়া, মিলানো—এরা চিরকাল মানুষকে আনন্দ দিয়ে এসেছে। কিন্তু এ যাত্রায় আমি অপারগ, অনেকটা ক্লান্ত এবং কতকটা অসুস্থ।

রোমে একরাত্রি বাস করে রোমনগরী সম্বন্ধে কিছু লেখা বেমানান। সমস্ত ইউরোপ ঘুরে যারা এখানে আসে, তারা দেখে যায় প্রাচীন রোমক সভ্যতার অবশেষ,—এখানে সর্বাধুনিক পশ্চিম ইউরোপকে দেখার চেষ্টা বৃথা। কিন্তু প্রাচীনকে দেখার উৎসাহ এ যাত্রায় স্থগিত রাখতে হল। পরদিন অপরাহ্ণে আমি প্রাচ্যালোকের দিকে আকাশপথে ভেসে চললুম।

এথেন্স থেকে ভূমধ্যসাগর পেরিয়ে যখন আলেকজান্দ্রিয়ার উপর দিয়ে আসছি, নিচের দিকে চেয়ে দেখি একটির পর একটি পিরামিড। তারপর 'নাইল' নদের মোহানা ঘুরে বিমান এসে নামল কায়রোর বিমানঘাঁটিতে। একবার নেমে গিয়ে আফ্রিকার মাটিতে এখানে ওখানে ঘুরে চা খেয়ে ফিরে এলুম। আধঘণ্টা পরে বিমান ছাড়ল, এবং সন্ধ্যারাত্রে এক সময় সৌদী আরবের উত্তর প্রান্তে ছোট্ট হীরক-খণ্ডের মতো আলোকোজ্জ্বল কুয়াইট—যার উত্তরে ইরাক ও দক্ষিণে সৌদী আরবের অনন্ত মরুভূমি—সেখানে বিমান এসে নামল। বিমানের ভিতরে সংবাদ ঘোষণায় শুনলুম, এটি নাকি চোরাচালানদারদের স্বর্গভূমি! পৃথিবীর মধ্যে নাকি সর্বাপেক্ষা ধনাঢ্য দেশ এই অতি ক্ষুদ্র কুয়াইট—যেটির অপর নাম তৈলরাজ্য। এটি গাল্‌ফ্‌ স্টেটগুলির অন্যতম। এখান থেকে উঠলেন কয়েকজন ভারতীয়, তাঁদের মধ্যে একজন বাঙালী মিঃ চ্যাটার্জিকেও দেখলুম। তাঁর বাড়ি শ্যামবাজারে। তিনি হাসিখুশী মুখে কুয়াইট এবং ভারত গভর্নমেণ্টের ব্যবস্থাপনার প্রচুর সুখ্যাতি করলেন। সেই সঙ্গেই সহাস্যে বললেন, যদি দশ-বিশ হাজার পেট্র-ডলার নিয়ে বাড়ি ফিরতে চান তবে এখনই এখানে নেমে পড়ুন, মাস দুই রাজভোগে থেকে যান।

আমি খুব হাসছিলুম। আমাদের বিমান আবার ছেড়ে দিল। অতঃপর অন্ধকার মরুপাথরের উপর দিয়ে বিমানটি আবার ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যে এসে নামল সৌদী আরবের বাহারান বিমানঘাঁটিতে। তখন উত্তপ্ত বালুভূমির উপর দিয়ে গরম বাতাস

বয়ে চলেছে এবং বিমানঘাঁটির কর্মীরা ঝালরযুক্ত ঝুলানো পোষাক পরে আনাগোনা করছিল। সম্ভবত এদেরই অপর নাম বেদুইন। এরা অনেকটা কৃষ্ণকায়। দুজনের সঙ্গে আলাপ করার চেষ্টা করলুম বটে, কিন্তু আরবীয় ডায়লেক্ট এক বর্ণও বুঝলুম না। বুঝলুম শুধু ওদের হাসি, চাহনি এবং সৌজন্য।

প্লেনে উঠে যখন ঘড়ি মিলিয়ে নিচ্ছিলুম, ইউরোপে তখন মধ্যরাত্রি—কিন্তু আমাদের ধাবমান বিমানটি প্রাচ্যলোকের সূর্যোদয়ের দিকে ততক্ষণে এগিয়ে এসেছে। প্রথম প্রভাতে এসে নামলুম বোম্বাইয়ের সান্তাক্রুজ বিমানঘাঁটিতে। অল্পক্ষণের মধ্যে সেখান থেকে দিল্লীর বিমান। সেই বিমান এসে যখন পালম্-এ নামল, সকাল তখন প্রায় ন'টা। সন্দেহ নেই, বহু ভ্রমণের ফলে স্বদেশের জন্য আমার মন এবার আতুর হয়ে উঠেছিল। এ আমার দেশের মাটি, এর ধুলোয়-ধুলোয় আমি ধূসর হয়ে থাকতে চাই!

পৃথিবীর উপরকার মহাকাশে স্যাটিলাইটের মতো ঘুরছিলুম মাসের পর মাস। এবার ঝাঁপ দিয়ে পড়লুম আপন দেশমৃত্তিকার পরে—জননীর সকরুণ স্নেহচ্ছায়ায়। "হে মোর চিত্ত, পুণ্যতীর্থে জাগো রে ধীরে—"

সমাপ্ত